নজরুল-রচনাবলী

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

ষষ্ঠ খণ্ড

বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ ৪৯৯৩

প্রথম প্রকাশ : কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড (আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় তিন খণ্ডে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭০)। বাংলা একাডেমী সংস্করণ (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ ও ১৯৮৪)। পুনর্মুদ্রণ : ১৯৭৫, ১৯৭৬ ও ১৯৮৪। নতুন সম্পাদক মণ্ডলীর সম্পাদনায় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ (চার খণ্ডে) : ১৯৯৩। নতুন সম্পাদনা–পরিষদ সম্পাদিত নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ [ষষ্ঠ খণ্ড] : ১২ই ভাদ্র ১৪১৪/২৭শে আগস্ট ২০০৭। প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) : জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯/জুন ২০১২। প্রকাশক : শাহিদা খাতুন, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ [পুনর্মুদ্রণ সেল], বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : সমীর কুমার সরকার, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০ কপি। মূল্য : ২৪০.০০ টাকা।

Abdul Quadir (ed.) NAZRUL RACHANABALI, Central Board for the development of Bengali edition (Three Volumes in 1966, 1967 & 1970 respectively), Bangla Academy edition (Fourth & Fifth Volumes) in 1977 & 1984. New edition (Four Volumes) in 1993, Nazrul Birth Centenary edition [Vol. VI] : 27th August, 2007. First Reprint (Birth Centenary edition) : June 2012. Published by Shahida Khatun, Director. Establishment, Planning & Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. Price : Taka 240.00 only.

ISBN 984-07-5011-9

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

ষষ্ঠ খণ্ড

সম্পাদনা-পরিষদ

রফিকুল ইসলাম
সভাপতি

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

আবুল কাসেম ফজলুল হক
সদস্য

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম সংস্করণের সম্পাদক

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ

আনিসুজ্জামান
সভাপতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
সদস্য

রফিকুল ইসলাম
সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্
সদস্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সদস্য

মনিরুজ্জামান
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

করুণাময় গোস্বামী
সদস্য

সেলিনা হোসেন
সদস্য-সচিব

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

অতুলনীয় জীবনবৈচিত্র্য ও বিপুল সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্য, বিশেষত বাংলা কবিতার ধারায় একটি নবতর স্রোতের সৃষ্টি করেছিলেন। কৈশোরে লেটোর দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুবাদে তাঁর সাহিত্যচর্চার যে সূচনা, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ধারাবাহিকভাবে তা চলেছিল গুরুতর অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষমতা না হারানো পর্যন্ত (১৯৪২)। জীবিতকালেই সাহিত্যিক ও সঙ্গীতকাররূপে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন নজরুল। কিন্তু তিনি খুব সুগুছালো মানুষ ছিলেন না। ফলে জীবিতকালে তাঁর রচনা গ্রন্থাকারে যতটা প্রকাশিত হয়েছিল ; তার তুলনায় অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত ছিল অনেক বেশি। গত অর্ধ-শতকেরও বেশি সময় ধরে সেসব রচনা নানারূপে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলামের মত একজন কবির রচনাবলীর প্রকাশ আমাদের সকলের জাতীয় কর্তব্য। বাংলাদেশের জাতীয় কবি হওয়ার কারণে সে-দায়িত্ব আমাদের আরও বেশি। বস্তুত বাঙালির জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এ-দায়িত্ব পালনেরও সূচনা।

এরই ফল নজরুল-বিশেষজ্ঞ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রকাশ (১৯৬৬, ৬৭, ৭০)। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত হলে (১৯৭২) একাডেমী থেকে অবশিষ্ট চতুর্থ খণ্ড (১৯৭৭) এবং পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ (১৯৮৪) প্রকাশিত হয়। কবি আবদুল কাদিরের মৃত্যুর পর ১৯৯৩ সালে নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী' সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়ে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় চার খণ্ডে।

বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালের অক্টোবরে 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলী, বাংলা একাডেমী থেকে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গঠিত সম্পাদনা-পরিষদের তত্ত্বাবধানে চার খণ্ডে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র, নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ পর্যালোচনার পরই সম্পাদকমণ্ডলী বর্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। 'নজরুল-রচনাবলী'র ষষ্ঠ খণ্ডে রয়েছে দুটি কাব্যগ্রন্থ—নতুন চাঁদ ও শেষ সওগাত ; গীতি-সংকলন—গানের মালা ও বুলবুল-এর দ্বিতীয় খণ্ড এবং মক্তব সাহিত্য শীর্ষক পাঠ্যপুস্তক। তবে এ-খণ্ডে এ-সবের চেয়ে মূল্যবান সংকলন হচ্ছে

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-এর অনুবাদ ; যাতে একদিকে অনুবাদক হিসেবে নজরুলের বৈশিষ্ট্য এবং পাশাপাশি পারস্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের পরিচয় বিস্তৃত। এছাড়াও গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে নজরুলের তিনটি নাটককে গ্রন্থরূপ দেওয়ার মধ্যেও সম্পাদকমণ্ডলীর মেধা ও শ্রমের স্বাক্ষর স্পষ্ট। আদি গ্রামোফোন রেকর্ড মিলিয়ে নজরুলের গানের যে পাঠান্তর তৈরি করা হয়েছে, তাও অত্যন্ত মূল্যবান।

সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যবৃন্দ, নজরুল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কবি ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, ভাষাবিদ অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, কবি ও প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং প্রাবন্ধিক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক নিষ্ঠা ও ধৈর্যসহকারে যেভাবে 'নজরুল-রচনাবলী'র ষষ্ঠ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন সেজন্যে তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে সম্পাদকমণ্ডলীকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন সংকলন উপবিভাগের ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ, জনাব ফারহানা খানম, জনাব সুলতানা মাহমুদা বেগম, জনাব আবু মোঃ ইমদাদুল হক, জনাব শুভ্রা বড়ুয়া, জনাব মোঃ মোবারক হোসেন এবং প্রেস ব্যবস্থাপক মোবারক হোসেন। দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
মহাপরিচালক

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১২ই ভাদ্র ১৪১৪ ।। ২৭শে আগস্ট ২০০৭

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড ১৯৮৪ সালে দুই ভাগে। চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদন'সহ।

'নজরুল-রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী-র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিক-বার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি

নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে। এই নতুন সম্পাদনা পরিষদ অদ্যাবধি ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলী-র বিভিন্ন সংস্করণ এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের আদি বা পরবর্তী সংস্করণসমূহে সন্নিবেশিত প্রতিটি রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিয়ে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করেন।

'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ ষষ্ঠ খণ্ডে নতুন চাঁদ, শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, গানের মালা, বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড), বিদ্যাপতি (পালানাটিকা), বিদ্যাপতি (রেকর্ডনাটিকা), বাসন্তিকা (একাঙ্কনাটিকা), মক্তব সাহিত্য সংকলিত হলো। 'নজরুল-রচনাবলী'র নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রতিটি খণ্ডের শেষে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি এবং তাঁর গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক সূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ষষ্ঠ খণ্ডের পরিশিষ্টে নজরুলের গানের বই এবং আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে বিধৃত গানের বাণীর পাঠান্তর যথাসম্ভব নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'নজরুল-রচনাবলী'র বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রণজনিত ত্রুটির দরুন এবং অন্যান্য কারণে যেসব বিচ্যুতি ঘটেছে, বর্তমান সংস্করণে সেগুলো সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা সম্পাদনা পরিষদ করেছেন। সুস্থাবস্থায় নজরুল একই গান একাধিক গ্রন্থে সংযোজন করে থাকলে পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও তা বাদ দেওয়া হয়নি।

'নজরুল-রচনাবলী'র এই সংস্করণে নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের কালানুক্রম বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে কবির অসুস্থতার পর সংকলিত এবং প্রকাশিত রচনাবলী তথ্যসূত্রের অভাবে কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। এই বাস্তবতায় 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণকে যথাসম্ভব প্রামাণিক করার চেষ্টা ও শ্রম সম্পাদনা-পরিষদ আন্তরিকভাবেই করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও নজরুলের সমস্ত রচনা এ-সংস্করণে সংকলিত—এমন দাবি করা যাবে না। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, এই রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্গত রচনাসমূহের বাইরেও নজরুলের কিছু রচনা থাকা সম্ভব—যা এখনও জানা বা সংগ্রহ করা যায়নি। বস্তুত, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনা ও প্রকাশনা একটি চলমান প্রক্রিয়া ; ভবিষ্যতে নজরুলের দুষ্প্রাপ্য কোনো রচনা সংগৃহীত হলে সেগুলোকে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। আমরা এ-পর্যন্ত সংগৃহীত নজরুলের রচনাসমূহ সংকলন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তবু হয়তো কিছু রচনা বাদ পড়ে যেতে পারে। শত সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিও ঘটে থাকতে পারে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

উল্লেখযোগ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। 'নজরুল-রচনাবলী'র শুধু প্রথম সংস্করণই নয়, পরে প্রকাশিত সব সংস্করণ আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ভিত্তিতেই করা হয়েছে। সব সংস্করণেই সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত রয়েছে তাঁর নাম, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর লেখা প্রতিটি সংস্করণের 'সম্পাদকের নিবেদন' এবং গ্রন্থ পরিচয়। সুতরাং, কবি আবদুল কাদিরের

প্রয়াণের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করা হলেও 'নজরুল-রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল কাদির। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন। এই সংস্করণের 'সম্পাদনা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
১২ই ভাদ্র ১৪১৪ ॥ ২৭শে আগস্ট ২০০৭

রফিকুল ইসলাম
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

১৯৬৪ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড বিদ্রোহী-কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমগ্র রচনাবলী কয়েক খণ্ডে প্রকাশের এক সময়োচিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তদনুসারে রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগের—যেই যুগে তাঁর অন্তরে দেশাত্মবোধ ছিল প্রধানতম প্রেরণা—সকল রচনা সংগ্রথিত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'-বিভাগে কবির কিশোর বয়সের রচনার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর কয়েকটি কবিতা ও গান সন্নিবেশিত হয়েছে। এই যুগে তিনি যে-সকল শিশুপাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলী-র তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।

নজরুলের দেশাত্মবোধের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা নানাজনে নানাভাবে করেছেন। রাজনীতিক পরাধীনতা ও আর্থনীতিক পরবশতা থেকে তিনি দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি চেয়েছিলেন। তার পথও তিনি নির্দেশ করেছিলেন। সেদিনের তাঁর সেই পথকে কেউ ভেবেছেন সন্ত্রাসবাদ—কারণ তিনি ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের উদাহরণ দিয়ে তরুণদের অগ্নিমন্ত্রে আহ্বান করেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিয়মতান্ত্রিকতা—কারণ তিনি 'চিত্তনামা' লিখেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন প্যান-ইস্‌লামিজম—কারণ তিনি আনোয়ার পাশার প্রশস্তি গেয়েছিলেন ; আবার কেউ ভেবেছেন মহাত্মা গান্ধীর চরকা-তত্ত্ব—কারণ তিনি গান্ধীজীকে তাঁর রচিত 'চরকার গান' শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছিলেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এসব ভাবনার কোনোটাই সত্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সহায় নয়। প্রকৃতপক্ষে নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে ছিলেন কামাল-পন্থী,—কামাল আতাতুর্কের সুশৃঙ্খল সংগ্রামের পথই তিনি ভেবেছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সর্বাপেক্ষা সমীচীন পথ। ১৩২৯ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখের ১ম বর্ষের ১৪শ সংখ্যক 'ধূমকেতু'তে তিনি 'কামাল' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল' যে, 'খিলাফত উদ্ধার' ও 'দেশ উদ্ধার' করতে হলে 'হায়দারী হাঁক হাঁকা চাই ; .... ও-সব ভণ্ডামি দিয়ে ইসলাম উদ্ধার হবে না। ... ইসলামের বিশেষত্ব তলোয়ার।' কামাল আতাতুর্কের প্রবল দেশপ্রেম, মুক্ত বিচারবুদ্ধি ও উদার মানবিকতা নজরুলের এই যুগের রচনায় যে প্রভূত প্রেরণা যুগিয়েছিল তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো একত্রে পড়ে সম্যক উপলব্ধ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

নজরুল-রচনাবলী প্রকাশের কাজে হাত দিয়ে আমরা দেখেছি যে, কবির অনেক কাব্যগ্রন্থেরই প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা ইতোমধ্যেই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। তাঁর কোনো

কোনো কাব্যগ্রন্থ পরের সংস্করণে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দোলন-চাঁপা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। তার তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের বহু বিখ্যাত কবিতা বাদ পড়েছে ; সে-স্থলে 'ছায়ানট' ও 'পূবের হাওয়া'র কিছু কবিতা সংযুক্ত হয়েছে। 'দোলন-চাঁপা'র গোড়ার দিকে 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' স্থান পেয়েছিল ; তৃতীয় সংস্করণে সেটি বর্জিত হয়েছে। এই খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়ে তা সঙ্কলিত হলো। বলা বাহুল্য যে, আমরা রচনাবলীতে কবির কবিতাগ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণই অনুসরণ করেছি।

আমাদের ধারণা যে, 'সংযোজন'-বিভাগে আমরা যেসব লেখা দিয়েছি, তাছাড়াও সে-সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরো কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা অদ্যাবধি গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। কেউ যদি তেমন কোনো লেখার সন্ধান দিতে পারেন, তবে তা আমরা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করবো এবং পরবর্তী সংস্করণে বা খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করবো।

কবির কোনো কোনো কবিতার রচনা-কাল ও উপলক্ষ্য নিয়ে ইতোমধ্যেই বহু বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। আমরা গ্রন্থ-পরিচয়ে যেসব তথ্য দিয়েছি, তাতে সে-বিতর্কের নিরসনে কিছু সহায়তা হবে। কিন্তু আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় মাল-মশলা সব নেই ; সেজন্যই কবির অনেক রচনার প্রথম প্রকাশ-কাল নির্দেশ করা সম্ভবপর হলো না। আমাদের তরুণ গবেষকরা এ-বিষয়ে সন্ধান করে সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করবেন, এ আশাই আমরা করছি।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩

আবদুল কাদির

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের সুনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী নজরুল-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের রচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'-বিভাগের প্রথম তিনটি কবিতা তার সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে রচিত ; এগুলি রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে সংযোজিত হলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন'-এ বলা হয়েছিল যে, সে খণ্ডের 'সংযোজন'-বিভাগে যে সকল লেখা সংকলিত হয়েছে তাছাড়াও সে সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরও কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা গ্রন্থবদ্ধ হয়নি, এবং সেরূপ কোনো লেখা পাওয়া গেলে তা পরবর্তী খণ্ডে পরিবেশন করা হবে। বলাবাহুল্য যে, উক্ত তিনটি কবিতা রচনাবলী প্রথম খণ্ড প্রকাশের অব্যবহিত পরে আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে। 'প্রবন্ধ' বিভাগের শেষ দুটি নিবন্ধ কবির সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ অর্থাৎ শেষ যুগে রচিত। সে যুগে কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'-পত্রে তাঁর স্বাক্ষরিত এরূপ বহু সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সে-সকল দুর্লভ লেখা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের সূচনায় যে মতবাদের প্রবক্তা হন, তা প্রত্যক্ষতঃ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজ্ম)। তাঁর পরিচালিত 'লাঙলে' হয়েছিল তারই কালোপযোগী কর্ষণা। 'লাঙল' ছিল 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র' ; ১লা পৌষ ১৩৩২ মুতাবিক ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৫২ তারিখে তার প্রথম (বিশেষ) সংখ্যাতেই সে-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য' ও 'চরম দাবি' বিবৃত করে নজরুল এক ইশ্‌তেহারে বলেন :

'নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা-সূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য। * * *

আধুনিক কল-কারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টীমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকরী জিনিষ, লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া, দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মিগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিচালিত হইবে।

ভূমির চরম স্বত্ব আত্ম-অভাব-পূরণ-ক্ষম স্বায়ত্তশাসন-বিশিষ্ট পল্লী-তন্ত্রের উপর বর্তিবে—এই পল্লী-তন্ত্র ভদ্র শূদ্র সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।'

ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজ্‌মের প্রতি নজরুলের মনের প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁর 'সাম্যবাদী' 'সর্বহারা' ও 'ফণি-মনসা'র বহু কবিতা ও গানে সুপরিস্ফুট। তাঁর 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার'-চরিত্র এই আদর্শবাদের আলোকে বিকশিত।

কিন্তু সেদিন কবি প্রবল আবেগ নিয়ে দেশের গণ-আন্দোলনের পুরোযায়ী চারণ হয়েছিলেন, তাতে ভাটা পড়লো দুটি কারণে। প্রথম কারণ : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা এপ্রিল শুক্রবার থেকে কলকাতায় রাজবাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূত্রপাত। দ্বিতীয় কারণ : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে কংগ্রেস-কর্মী-সংঘের সদস্যদের উদ্যোগে 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' নাকচ করে প্রস্তাব গ্রহণ। নজরুল কৃষ্ণনগর সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' গেয়ে, কিন্তু কাণ্ডারিদের কানে তাঁর আবেদন পৌঁছলো না। অগত্যা নজরুল আত্মরতির সন্ধান করলেন 'মাধবী-প্রলাব' ও 'অনামিকা'র রোমান্টিক রূপ-জালে-ক্রমে আত্মমগ্ন হলেন 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতক'-এর সুর-লোকে। কিন্তু সেই রূপ ও সুরের মোহন মায়াজাল ভেদ করেও বারবার তাঁর কানে বেজেছে নিপীড়িত মানবতার কাতর আর্তনাদ ; তিনি নিরাসক্ত শিল্পীর আনন্দময় আসন ছেড়ে এসে রুদ্র কণ্ঠে গেয়েছেন 'সন্ধ্যা', 'প্রলয়-শিখা', 'চন্দ্রবিন্দু'র বেদনার্ত গাথা-গান।

'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার' একস্থানে বলেছেন, 'নীড়হারাদের সাথী আমি। ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে, পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই। ... আমার রাজনৈতিক মত বদলে গেছে।' এই আনসারের কণ্ঠে সেদিন পরোক্ষ ফুটেছে নজরুলেরই অন্তরের বাণী। বস্তুত তাঁর সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তরে যে তাঁর রাজনৈতিক মতামত পরিবর্তিত হয় এবং তাঁর সাহিত্যধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হয়, তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো একত্রে পড়ে নিঃসন্দেহে হৃদয়ঙ্গম হবে বলেই আমাদের নিশ্চিত ধারণা।

এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'সিন্ধু-হিন্দোল' ও 'জিঞ্জীর' বহুদিন বাজারে নাই। এ দুটি কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণও হয় নাই। ইতিমধ্যেই 'বুলবুল' হয়েছে দুর্লভ। 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা' ও 'চক্রবাক' নূতন সংস্করণে অনেক অদল-বদল হয়েছে। এই খণ্ডের জন্য 'বুলবুল'-এর গানগুলি আমাকে নকল করে পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'সিন্ধু-হিন্দোল' দেখতে দিয়েছেন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। 'চক্রবাক' প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করেছি 'আল ইসলাহ্' সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নূরুল হকের সৌজন্যে সীলহেট কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সংসদের পাঠাগার থেকে। 'গ্রন্থ-পরিচয়' লিখতে কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। এরাও নজরুল-সাহিত্যের প্রচারকামী ; অতএব আমার কাছে কৃতজ্ঞতা দাবি করেন না।

এ-খণ্ডেরও 'গ্রন্থ-পরিচয়' অসম্পূর্ণ ; তারও কারণ আমাদের হাতে মাল মশলার অভাব। তবে নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা ক্রমশ যেরূপ বিস্তারিত হচ্ছে তাতে খুবই আশা করা যায় যে, নবীন গবেষকদের কল্যাণে কবির সকল লেখারই প্রথম প্রকাশকাল ও উপলক্ষ সম্পর্কে আবশ্যক তথ্যাদি পাঠকদের পরিজ্ঞাত হতে বেশি বিলম্ব ঘটবে না।

ঢাকা
২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

আবদুল কাদির

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের সুবিবেচিত পরিকল্পনা অনুসারে নজরুল-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগের প্রায় সমুদয় রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'প্রবন্ধ' বিভাগে পরিবেশিত 'সত্যবাণী' তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে বিরচিত, অতএব রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে স্থান পেলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। কিন্তু ১৩২৮ ভাদ্রের 'সাধনা'য় প্রকাশিত এ-লেখাটি সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। এ-লেখাটিতে যে-সুর ধ্বনিত, নজরুলের সমগ্র গদ্য-রচনায় তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর নেই। তাই রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'পরবর্তী সংস্করণে'র অপেক্ষা না করে এই মহামূল্য লেখাটি এই খণ্ডেই অন্তর্ভুক্ত হলো।

দ্বিতীয় খণ্ডের 'প্রবন্ধ'-বিভাগের শেষ দুটি লেখা দৈনিক 'নবযুগ'-এ সম্পাদকীয় নিবন্ধ-রূপে পত্রস্থ হয়েছিল। এই খণ্ডের 'ধর্ম ও কর্ম' শীর্ষক লেখাটিও 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত কবির স্বাক্ষরিত এরূপ একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ। এ লেখাটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। দ্বিতীয় খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ আমরা বলেছিলাম যে, কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'-পত্রে প্রকাশিত তাঁর স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি 'সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।' কিন্তু 'সে-সকল দুর্লভ লেখা' সংগৃহীত হওয়ার আশা খুব উজ্জ্বল প্রতিভাত হচ্ছে না বলেই 'ধর্ম ও কর্ম' লেখাটি এই খণ্ডেই পরিবেশিত হলো।

[প্রথম খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ আমরা বলেছিলাম যে, নজরুল ইসলাম তাঁর 'সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে যে-সকল শিশু-পাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।' কিন্তু এই খণ্ডেরও কলেবর সীমিত ও সুমিত রাখা আবশ্যক বিধায় অবশেষে স্থির হয়েছে যে, নজরুলের 'ঝিঙে ফুল', 'পুতুলের বিয়ে', 'মক্তব-সাহিত্য', 'পিলে-পট্‌কা পুতুলের বিয়ে' (১৩৭০), 'ঘুম-জাগানো পাখি' (১৩৭১) প্রভৃতি শিশু-পাঠ্য]*

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগে প্রধানত গীতিকার ও সুরস্রষ্টা রূপেই প্রথিতকীর্তি ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। রোমান্টিক কবি-কৃতির সকল লক্ষণ তাঁর এ-যুগের সাহিত্য সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট। বঞ্চনাহত অরণ্যের আন্দোলক ও উন্মত্ত সমুদ্রের ঊর্মিলতা নজরুলের কাব্যে যেমন বাঙ্‌ময়, মিলনের উদ্দাম ও বিরহের ব্যাকুল বেদনা তাঁর প্রেমের

---

* -সম্পাদনা-পরিষদ বর্তমান সংস্করণে নজরুলের কালানুক্রমভাবে সংকলিত হওয়ার দরুন গ্রন্থসমূহ বন্ধনীর অংশটুকু বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থানুক্রমের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

গানে তেমনি ব্যঞ্জনাময়। তাঁর দেশাত্মবোধ ও ভক্তিভাবমূলক গানগুলিতেও প্রকৃতিপ্রেম ও প্রতীকপ্রীতি অভূতপূর্ব চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যময়। তাই অনবদ্য সৃষ্টির দিক দিয়ে নজরুলের শিল্পী-জীবনের দ্বিতীয় যুগকে যদি বলা হয় তাঁর কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ, তাহলে এই তৃতীয় যুগকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তাঁর সঙ্গীত সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ।

'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'-এর ১০টি রুবাইর নজরুলের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এই খণ্ডে পরিবেশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাবে যে, এগুলি গ্রন্থিত করার সময় কবি কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ পরিশোধিত করেছেন। কিন্তু 'কাব্য আমপারা'-র মূল পাণ্ডুলিপি তিনি মুদ্রণ-কালে পরিবর্তন করেন বিস্তর। মূল পাণ্ডুলিপিখানি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ; তা ছন্দের বিচারে ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত। কিন্তু পরে 'কোরআন-পাকের একটি শব্দও এধার-ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ণ' রাখতে গিয়েই তিনি অগত্যা অনুবাদের বাংলা ছন্দের প্রচলিত বিধান বহু স্থানে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হন। ফলে এই পদ্যানুবাদের অনেক চরণেই ছন্দসাম্যের ব্যতিক্রম কানে বাজে। মরহুম আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন এই গ্রন্থখানির 'প্রুফ দেখা, তাকিদ্ দিয়ে লেখানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ' শুধু সম্পন্ন করেননি, কবি-কর্তৃক পরিমার্জিত মূল পাণ্ডুলিপিখানিও সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। প্রায় ২৭ বৎসর পূর্বে সুহৃদ্বর আবদুল মজিদ অকালে ইন্তেকাল করেছেন, অতঃপর তাঁর সংরক্ষিত সেই অমূল্য সম্পদ কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কে জানে।

নজরুলের অনেক গান সাময়িকপত্রে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থে তার কোনো কোনো চরণ সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে,—এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত আমি 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' দিয়েছি। আমার ধারণা যে, ভাবের প্রেরণায় নজরুল সে-সকল গান প্রথমে যেরূপ লিপিবদ্ধ করেন সেরূপেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়, কিন্তু পরে সেগুলি রেকর্ড করার সময় সুরের প্ররোচনায় যেভাবে পরিবর্তন করেন সেভাবেই গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। অবশ্য এই জটিল বিষয়ে একমাত্র গীতি-বিশেষজ্ঞরাই সঠিক অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন।

আবদুল কাদির

চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

নজরুল-রচনাবলীর প্রথম খণ্ড ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের ৯ই পৌষ এবং তৃতীয় খণ্ড ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে চতুর্ত খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল ; কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বারংবার পরিবর্তনের দরুন তা প্রকাশিত হতে পাঁচ বছর সময় বেশি লেগে গেল। এই অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য আমাদেরও দুঃখের অন্ত নেই।

নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ যুগের প্রায় সমুদয় রচনা এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ['কুহেলিকা' উপন্যাসখানি তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগে বিরচিত,—যে যুগে তাঁর সচেতন মনে দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা (Socialistic Humanism) রাজনৈতিক চিন্তাদর্শরূপে প্রবলতম প্রেরণার সঞ্চার করেছে। এই 'কুহেলিকা' ছাড়া এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত আর কোন গ্রন্থই কবির সম্বিতহারা হওয়ার আগে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে কবির মস্তিষ্কের অবশীর্ণতা-রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রথম লক্ষণ আকস্মিকরূপে দেখা দেয় ; তারপর তাঁর যে-সকল রচনা গ্রন্থিত হয়েছে, তাদের সজ্জা ও বিন্যাস তিনি সুস্থ থাকলে নিজে কিভাবে করতেন তা অনুমান করা কঠিন। এই খণ্ডে 'কবিতা ও গান' অংশের শেষে ১১১টি গান 'সঙ্গীতাঞ্জলি' নামে সন্নিবেশিত হয়েছে ; এই নামকরণও তিনি অনুমোদন করতেন কি না তা কে বলতে পারেন ?

নজরুলের কবি-জীবনের চতুর্থ স্তরে ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা (metaphysical poetry) ও মরমীয়া গান (mystical songs) এক বিশেষ স্থান ও মহিমা লাভ করেছে। এই যুগের একটি কবিতায় তিনি বলেছেন :

আল্লা পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা তো দূরে নয় ;
নিত্য আমাকে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়। ...
দিনে ভয় লাগে, গভীর নিশীথে চলে যায় সব ভয় ;
কোন্ সে রসের বাসরে লইয়া কত কী যে কথা কয় !
কিছু বুঝি তার, কিছু বুঝি না ক, শুধু কাঁদি আর কাঁদি ;
কথা ভুলে যাই, শুধু সাধ যায় বুকে লয়ে তারে বাঁধি !
সে প্রেম কোথায় পাওয়া যায় তাহা আমি কি বলিতে পারি ?
চাতকী কি জানে কোথা হতে আসে তৃষ্ণার মেঘ-বারি ?

কোনো প্রেমিক ও প্রেয়সীর প্রেমে নাই সে প্রেমের স্বাদ ;
সে-প্রেমের স্বাদ জানে একা মোর আল্লার অহ্‌লাদ।

আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে নজরুল এ-সকল কথা বলেছেন, তার অন্তর্গূঢ় রস-রহস্য পৃথিবীর একমাত্র মর্মবাদী সূফি সাধকেরাই উপলব্ধি করতে পারেন,--সাধারণ মানুষেরা সেই বাণীর রসে আপ্লুত হলেও তার রহস্য অনুধাবন করতে অক্ষম। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে এই অন্তর্জ্যোতিদীপ্ত আধ্যাত্মিকতাই পেয়েছে প্রাধান্য অথবা বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত ধর্মের ও ধর্ম সংস্কারের নানা রূপ ও রীতির আশ্রয়ে এই আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি হয়েছে জনমন-রঞ্জনের পরম উপযোগী,—অথচ ধর্মীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে আহরিত উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের সুমিত ব্যবহারে সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত ও রসোত্তীর্ণ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তারিখে তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখেছিলেন : Poor Man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias'. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর প্রায় এক শতাব্দীকাল পরেও দেখা যাচ্ছে নজরুলেরও শ্রেষ্ঠ অনুরাগীদেরই কেউ কেউ তাঁর সাহিত্য-বিচারেও হয়েছেন ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব-দোষে দিশাহারা। নজরুলের 'দেবীস্তুতি' নামক রচনাটির রূপকাশ্রিত ভাবতত্ত্ব ব্যাখ্যাচ্ছলে তার 'ভূমিকা'য় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন : 'নজরুলের আসল পরিচয় : কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শাক্ত।'—এ-প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যক 'জয়তী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমি লিখেছিলাম : 'নজরুল ইসলাম বাঙলার মুসলিম রিনেসাঁসের প্রথম হুঙ্কারই শুধু নহেন, কাব্যচর্চায় ইসলামের নিয়ম-কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া ncopaganism-এর সাহায্য-গ্রহণ ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী।'—আমার সেই লেখাটি পড়ে নজরুল ইসলাম দৃঢ়স্বরে মন্তব্য করেন যে, তাঁর কবিতায় ও গানে বাহ্যত nco-paganism বলে যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে, তা প্রকৃতপক্ষে pseudopaganism। নজরুলের কোনো কোনো রচনায় বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ ও শৈবসুলভ শক্তি-আরাধনা দেখে যাঁরা তাঁকে স্থূল কথয়া প্রতীক-পূজারী বলতে চান, তাঁদের কাছে কবির বক্তব্য যে, তিনি কখনই প্যাগান বা নিউ-প্যাগান নন, তিনি কখনও কখনও কাব্য বিষয়ের অনুসরণে ও অন্তরের অনুপ্রাণিত ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনে পড়েছেন pseudo-pagan-এর (নকল প্যাগানের) সাময়িক কবি-বেশ।

আধুনিককালে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার অসামান্য জীবনবৃত্ত নিয়ে কাব্য বিরচনের চেষ্টা করেছিলেন মীর মোশাররফ হোসেন ও মোজাম্মেল হক ; কিন্তু সেই প্রয়াস সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। নজরুল ইসলাম পরিণত বয়সে এই বিষয় নিয়ে 'মরু-ভাস্কর' রচনা শুরু করেন ; কিন্তু ৪২ বছর বয়সে দুরন্ত ব্যাধির কালগ্রাসে পড়ে এই প্রদীপ্ত প্রতিভা-সূর্য অকালে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ায় এই কাব্যখানিও অসমাপ্ত

রয়ে গেছে। নজরুল তাঁর 'মরু-ভাস্কর' কাব্যে বাংলা ভাষার প্রথাবদ্ধ ছন্দগুলি ব্যবহারে যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, তা নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যাঁরা পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য লাভের আনন্দ-সংবাদ দিয়েছেন, সামাজিক ঐক্য ও আর্ত-মানবতার প্রতি সুগভীর সহানুভূতি তাঁদের অমূল্য শিক্ষার এক বড় অঙ্গ। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে স্বভাবতই তাঁর সৌন্দর্য-প্রিয়তা ও প্রেম-বিহ্বলতা পেয়েছে প্রগাঢ়তম রূপ ; কিন্তু উদাসীন শিল্পীর সেই প্রসন্ন ধ্যানের আসনে বসেই নিপীড়িত মানবতার জন্য তাঁর বেদনা বোধের প্রকাশ হয়েছে পূর্বের চেয়ে আরও তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ। নজরুল-রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ড এই বৈশিষ্ট্যেরই দাবীদার।

এই খণ্ডে সংকলিত 'অপরূপ রাস' এবং 'আবিরাবির্মএবি' শীর্ষক কবিতা দুটির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে কবির পরম ভক্ত শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' কাব্যানুবাদের কবি-লিখিত 'ভূমিকা' সংগ্রহ করে দিয়েছেন কল্যাণীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

দৈনিক 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত নজরুলের একটি মাত্র নিবন্ধ : 'বাঙালির বাঙলা' এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত পত্রিকায় কবির স্বাক্ষরযুক্ত আরও অনেক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ; কিন্তু সেগুলি সংগ্রহের উদ্যোগ নিবেন কে?

এই খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রস্তুত করেছেন স্নেহভাজন খোন্দকার গোলাম কিবরিয়া।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

আবদুল কাদির

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের প্রথমার্ধের সম্পাদকের নিবেদন

সাবেক কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড নজরুল-রচনাবলী কয়েক খণ্ডে প্রকাশের যে বিস্তারিত পরিকল্প গ্রহণ করেন, তদনুসারে ১৩৭৯ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে নজরুল-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রনীতিক পরিস্থিতিতে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের দরুন তা পাঁচ বৎসর বিলম্বিত হয়ে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে ১১ই জ্যৈষ্ঠ মুতাবিক ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে প্রকাশিত হয়। তার কয়েক মাস আগে, ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে, আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন উপদেষ্টা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মরহুম আবুল ফজল সাহেবের সমীপে পঞ্চম খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্প উপস্থাপন করেছিলাম এবং তিনি তা তখনই অনুমোদন করেন। তার প্রায় দু'বছর পরে ১২-২-১৯৭৯ তারিখে আমি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের কাছে উক্ত পরিকল্পের প্রতিলিপি-সহ একখানি পত্র প্রেরণ করি। সেই পত্রের উত্তরে একাডেমীর 'মহাপরিচালক সাহেবের আদেশ-ক্রমে' ৬-৩-১৯৭৯ তারিখে আমাকে জানানো হয় যে, ১৫-২-১৯৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের ৪৭-তম সংখ্যক মূলতবি অধিবেশনে' নজরুল-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৪-৫-১৯৭৯ ইং তারিখের ৭৭১৪-সংখ্যক পত্রে আমাকে পঞ্চম খণ্ডের 'সমগ্র পাণ্ডুলিপি' ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের 'জুন মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে' দাখিল করতে বলা হয়। তদনুসারে ১১ই জুন তারিখে আমি 'পঞ্চম খণ্ডের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি' একাডেমীর মহাপরিচালক সাহেবের হাতে অর্পণ করি।

এরূপ স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও সম্পাদনা করতে হয়েছিল বলে আমাকে নজরুলের কিছু সংখ্যক রচনা সংকলন করার ব্যাপারে স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শাহাবুদ্দীন আহমদ সাহেবের সহায়তা চাইতে হয়। তিনি সে-সময়ে আমার সহায়তা করতে সম্মত না হলে আমার ক্লেশ খুবই বৃদ্ধি পেতো। বলা বাহুল্য যে, তাঁকে তাঁর সেই অতি দ্রুততা-সহকারে সম্পন্ন কাজের জন্যে যথোপযুক্ত 'সম্মানী', পাণ্ডুলিপি একাডেমীতে দাখিল করার পূর্বেই, পরিশোধ করা হয়েছিল।

কিন্তু এই প্রায় পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে পঞ্চম খণ্ডের মাত্র পাঁচ শত পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রণ সম্ভবপর হয়েছে। পুস্তক প্রকাশের ব্যয় বর্তমানে যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তদনুপাতে পুস্তকের দাম বাড়াতে হয়েছে, তা বিবেচনা করে গ্রন্থমূল্য সহৃদয় পাঠকদের

ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে রাখবার উদ্দেশ্যে উক্ত পাঁচ শত পৃষ্ঠার মূল পাঠ দিয়েই পঞ্চম খণ্ডের 'প্রথমার্ধ' প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয়ার্ধে থাকবে : (ক) হাসির গান, (খ) নাট্যগীতি, (গ) নাটিকা ও প্রহসন, যথা—'ঈদ', 'গুল-বাগিচা', 'অতনুর দেশ', 'বিদ্যাপতি', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'বিজয়া', 'পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার' প্রভৃতি, (ঘ) প্রবন্ধ ও রস-রচনা, (ঙ) অভিভাষণ, (চ) চিঠিপত্র ও (ছ) গ্রন্থ-পরিচয়।

নজরুলের শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'ঝিঙে ফুল' ১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাসে এবং 'পুতুলের বিয়ে' ১৩৪০ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হয়। এই দু'টি গ্রন্থ ছাড়া নজরুল-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধে অন্তর্ভুক্ত আর কোনো গ্রন্থই কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি।

এই খণ্ডে কবির জাগরণধর্মী কবিতা ও কাব্যগীতিগুলি 'অগ্রনায়ক' অভিধায় পরিবেশিত হলো। এই জাগরণ হচ্ছে আত্মার জাগরণ, জনগণের, রাজনৈতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহ আদায়ের জন্যে চিত্তের জাগরণ। কবিতাগুলিতে পরমাত্মার সহিত কবি-প্রাণের সাযুজ্য, কবির উদার মানবিকতার আদর্শ ও গভীর স্বদেশপ্রীতি পরম হৃদয়স্পর্শী রসমূর্তি লাভ করেছে।

'মৃত তারা' বিভাগের কবিতা ও কাব্যগীতিগুলোতে কবির ব্যক্তি-স্বরূপের পরিচয় দেদীপ্যমান। কবির উপচেতন মনের নিগূঢ় স্বাক্ষর, মানুষের প্রতি অপরিমেয় প্রেম ও কল্যাণ-কামনা, এর রচনাগুলোকে করেছে তাৎপর্যপূর্ণ।

'ঝিঙে ফুল' ও 'পুতুলের বিয়ে' গ্রন্থদ্বয়ে অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলো ছাড়া, কবি যে-সকল কিশোর-পাঠ্য কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা ও নাটিকা লিখেছেন, সেগুলো এই খণ্ডে 'কিশোর' নামে সন্নিবেশিত হলো।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে 'হারামণি', 'গীতি-বিচিত্রা' ও 'নবরাগ-মালিকা' নামে তিনটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের মারফতে ক্লাসিক্যাল রাগ ও নবতর রাগের বহু সঙ্গীত প্রচার করে তাঁর আলোকসামান্য সৃষ্টিধর্মী শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই তিনটি অনুষ্ঠানে কবি বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর অনুমিশ্রণ ঘটিয়ে এবং নানা নতুন সুরের সৃষ্টি করে বহুসংখ্যক সঙ্গীত প্রচার করেন। তাদের কোন বিভাগে তিনি কোন কোন সঙ্গীত ও কতগুলি সঙ্গীত প্রচার করেছিলেন, তা বাংলা সঙ্গীত-সাহিত্যের গবেষকদের এক বড় গবেষণার বিষয়। আমি কবির দেওয়া উক্ত নামগুলির অনুসরণে এই খণ্ডের গানগুলিকে 'সন্ধ্যামণি', 'গীতি-বিচিত্রা' ও 'নবরাগমালিকা', এই তিন নামের অধীনে বিন্যস্ত করেছি। 'সন্ধ্যামণি' আখ্যায় কবির প্রেমমূলক গানগুলি সংকলিত হয়েছে। 'গীতি বিচিত্রা' আখ্যায় ভক্তিমূলক ও ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী সঙ্গীতগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'নবরাগ-মালিকা' শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে প্রধানত কবির উদ্ভাবিত নবরাগের গানগুলি। সেগুলিতে আছে রাগ-রাগিণীর সূক্ষ্মতম কারুকার্য ও বিস্ময়প্রদ সুরবৈচিত্র্য।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে প্রতি মাসে একবার 'হারামণি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপ্রচলিত ও লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণীর পুনঃ প্রচলনের জন্যে নূতন গান প্রচার করতেন। সে-সকল গানের অধিকাংশই আজ পাওয়া যায় না। একবার খবর বেরিয়েছিল যে, 'হারামণি' অনুষ্ঠানের জন্যে লেখা নজরুলের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের একটি

খাতা কবির অন্যমনস্কতাবশতঃ হারিয়ে গেছে। কিন্তু সেই হারানো সম্পদ উদ্ধারের কোনো চেষ্টা কি আজ অবধি কোথাও হয়েছে?

প্রতি মাসে দুইবার 'গীতি-বিচিত্রা' অনুষ্ঠানটি হতো। সেই পৌণে এক ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত হতো গীতি-আলেখ্য। কলিকাতা বেতারে নজরুলের রচিত প্রায় আশিটি গীতি-আলেখ্য প্রচারিত হয়েছে। প্রতিটি গীতি-আলেখ্যে একটি মূল বিষয়কে আশ্রয় করে ছয়টি করে গান পরিবেশিত হতো। নজরুলের 'শেষ সওগাত' কাব্যের 'কাবেরী-তীরে' সেই অনুষ্ঠানেই প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু 'কাফেলা', 'ছন্দসী' প্রভৃতি নামে যে-সকল গীতি-আলেখ্য প্রচারিত হয়েছিল, তাদের কোনও পাঠ অদ্যাবধি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। নজরুলের 'ছন্দিতা' নামক গীতিগুচ্ছের 'স্বাগতা', 'প্রিয়া', 'মধুমতী', 'রুচিরা', 'দীপক-মালা', 'মন্দাকিনী' ও 'মণিমালা' নামক গানগুলি সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে সংরচিত। বাঙলা ভাষায় প্রাকৃত মাত্রাচ্ছন্দে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান লিখেছেন ; কিন্তু নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কেউই সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে বাংলা গানের বাণী বিরচন করতে সক্ষম হননি ; এই রীতিতে বাঙলা সঙ্গীতে নজরুলের অচিন্তিতপূর্ব অবদান তাঁর অলৌকিক কবি-প্রতিভার বিস্ময়প্রদ পরিচয় বহন করে। তাঁর 'ছন্দসী' নামক সঙ্গীত-আলেখ্যের দুটি অনুষ্ঠানে সংস্কৃত 'মালিনী', 'বসন্ত তিলক', 'তনুমধ্যা', 'ইন্দ্রবজ্রা', 'মন্দাক্রান্তা', 'শার্দূলবিক্রীড়িত' প্রভৃতি বৃত্তচ্ছন্দে বিরচিত তাঁর ১২টি গান প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু সে-সকল মহামূল্যবান গানের বাণী কে সংগ্রহ করবেন? নজরুল ইসলামের এ-সকল অবলুপ্তিমুখীন বিচিত্র গীতাবলী ও কীর্তন-গান সংগৃহীত হলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হবে যে, নজরুল ইসলাম বাঙলা ভাষার সঙ্গীত-সম্রাট।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা', শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' ও 'অন্নপূর্ণা', শ্রীমন্মথ রায়ের 'মহুয়া' ও 'লায়লী-মজনু' প্রভৃতি নাটকের জন্যে নজরুল ইসলাম অনেক গান লিখে দিয়েছিলেন। 'চৌরঙ্গী, 'দিক্‌শূল', 'নন্দিনী', 'পাতালপুরী', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন' প্রভৃতি বাণীচিত্রের জন্যেও নজরুল বহু গান প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাদের সকল গান নজরুলের গীতিগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না, তা অনুসন্ধেয়।

নজরুল ইসলাম ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বিদ্যাপতি' ছায়াছবির কাহিনী এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 'সাপুড়ে' ছায়াছবির কাহিনী রচনা করেন। এ দুটি ছায়াচিত্রের রেকর্ডবদ্ধ বাণী লিপিবদ্ধ করবার কোনো উদ্যোগ অদ্যাবধি কেউ নিয়েছেন বলে শুনিনি। এ দুটি ছায়ানাট্যের সমগ্র পাঠ পাওয়া গেলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, সন্দেহ নেই।

১৩৯১ সনের ১৮-ই জ্যৈষ্ঠ আমার বয়স ৭৮-বৎসর পূর্ণ হয়ে ৭৯-বৎসর শুরু হবে। বর্তমানে আমি বহুব্যাধিগ্রস্ত জরাজীর্ণ ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ। প্রায় সতেরো বছর আগে আমার ডান চোখের ছানি কাটা হয়েছিল ; কিন্তু সেই চোখ এখনও কাজে লাগছে না। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর আমার বাম চোখের ছানি কাটা হয়েছে। এই অবস্থায় আমার

পক্ষে নজরুল ইসলামের অবলুপ্তিমুখীন রচনাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করা আর সম্ভবপর নয়। আমি আশা করব যে, নজরুল-রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং তা সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করতে আমাদের নবীন নজরুল-গবেষক ও নজরুল-অনুরাগীরা সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

—আবদুল কাদির

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয়ার্ধের
সম্পাদকের নিবেদন

যে-কোনো সমাজ-সচেতন সৃষ্টিশীল সাহিত্য-প্রতিভার মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাদর্শে মোড় পরিবর্তন দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম বাঙলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সচেতন কবি ; সুতরাং তাঁর রচনাবলীর কালানুক্রমিক বিচারে তাঁর চিন্তা-চেতনার ধারা-বদলের নিদর্শন পাওয়া যাবে এ খুবই স্বাভাবিক। নজরুল-রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত তাঁর মনন-ধারার অনুসরণ করে আমার মনে এই ধারণা হয়েছে যে, কবি শেষ পর্যন্ত যে-সামাজিক ভাবনার স্তরে পৌঁছেছেন তাকে বলা চলে Spiritual Communism—আধ্যাত্মিক ধন-সাম্যবাদ। নজরুলের অবশিষ্ট রচনাবলী সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থবদ্ধ হলে তাঁর ভাবাদর্শের সামগ্রিক স্বরূপ সম্বন্ধে হয়ত পাঠকদের মনে নূতনতর উপলব্ধি হতে পারে। অতএব তাঁর অবশিষ্ট রচনাসমূহ সংগ্রহ করে নজরুল-রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, এই-ই আমি আশা করছি।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৯৪তম জন্ম-বার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁর রচনাবলী একসঙ্গে প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ইতঃপূর্বে বাংলা একাডেমী থেকে কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় *নজরুল-রচনাবলী* পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব আবদুল কাদির যখন কবির রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন তখন নজরুলের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ ও ধারাবাহিকভাবে নজরুলের সমস্ত রচনা পাওয়া ছিল বেশ দুরূহ ব্যাপার। ফলে তাঁর সম্পাদিত রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু *নজরুল-রচনাবলী* সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও অগ্রযাত্রীর ভূমিকা আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

বর্তমান রচনাবলী বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত উক্ত *নজরুল-রচনাবলী*রই আরো সংহত, পূর্ণাঙ্গ, কালানুক্রমিক ও পরিমার্জিত রূপ। এই সংস্করণটির সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদ-মনোনীত দেশের বরেণ্য নজরুল-বিশেষজ্ঞগণ।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য এদেশের মানুষকে তাঁদের আন্দোলনে ও সংগ্রামে, কার্য ও ভাবনায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে আসছে, ভবিষ্যতেও করবে। নজরুল-সাহিত্য সুলভে এদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা আমাদের মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্য ব্যতীত এই প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব ছিল না। এ-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রণালয়ের— বিশেষভাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং আগ্রহের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই রচনাবলীর সংকলন, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমাদের এই প্রয়াস যদি নজরুল-অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং রচনাবলীর এই নতুন সংস্করণ আদৃত হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০॥ ২৫ মে ১৯৯৩

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নতুন সংস্করণের মুখবন্ধ

বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় পাঁচ খণ্ডে নজরুল-রচনাবলী প্রকাশিত হয় সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে। কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড থেকে এর প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশ লাভ করে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭০ সালে। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড একীভূত হয় বাংলা একাডেমীর সঙ্গে। তারপর বাংলা একাডেমী থেকে নজরুল-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৭৫ সালে, তৃতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৭৬ সালে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়।

নজরুল-রচনাবলী পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তার একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ সরকার এজন্যে বিশেষ অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করেন। অন্যদিকে একথাও উপলব্ধ হয় যে, আবদুল কাদিরের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল শ্রমের স্বাক্ষরবহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্পাদিত *নজরুল-রচনাবলীর* বিন্যাসে কিছু যৌক্তিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং এর পাঁচ খণ্ডে যেসব রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এখন তার সন্ধান পাওয়া যাওয়ায়, সেসবও এতে সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী নয় সদস্যবিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে *নজরুল-রচনাবলীর* সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পণ করেন।

এই নতুন সংস্করণে যে-সব পরিবর্তন করা হয়েছে, তা এই :

১. কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলি যথাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। যেমন আগে *অগ্নি-বীণার* পরে *বিষের বাঁশী* এবং তারপরে *দোলন-চাঁপা* বিন্যস্ত হয়েছিল। নতুন সংস্করণে ক্রম হয়েছে *অগ্নি-বীণা, দোলন-চাঁপা, বিষের বাঁশী*। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণের পাঠ তাঁর অভিপ্রেত পাঠ বলে গণ্য করে তা অনুসরণ করা হয়েছে।

২ কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলিও কালানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণের পাঠ যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

৩. গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা কোনো কোনো খণ্ডে 'সংযোজন' শিরোনামে *রচনাবলী*তে মুদ্রিত হয়। আবার পঞ্চম খণ্ডে এ ধরনের কিছু কিছু রচনা একেক নামের গ্রন্থরূপে সন্নিবেশিত হয়। যেমন, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, *সন্ধ্যামণি*, *নবরাগমালিকা*। কিন্তু ওসব নামে কোনো গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত না হওয়ায় অনুরূপ বিন্যাস আমরা সংগত বিবেচনা করিনি। ওসব শিরোনামের অন্তর্গত রচনা এবং সংযোজন পর্যায়ের রচনা 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা'র পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. নজরুল ইসলামের বিভিন্ন সংগীতগ্রন্থের গান বর্তমান সংস্করণে গৃহীত হয়েছে, তবে স্বরলিপি মুদ্রিত হয়নি। আমরা মুদ্রিত গানের পাঠ অনুসরণ করেছি, রেকর্ডে ধারণকৃত বা স্বরলিপিতে বিধৃত গানের পাঠে ভেদ থাকলে তা নির্দেশ করা হয়নি।

৫. নজরুল ইসলামের নামে প্রকাশিত যে-সব গ্রন্থের সন্ধান আগে পাওয়া যায়নি কিংবা যেসব গ্রন্থ *নজরুল-রচনাবলী* প্রকাশের পর বেরিয়েছে, সেগুলো বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ-ধরনের অনেক গ্রন্থে নজরুলের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের উপকরণ গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা একই রচনা দুবার মুদ্রণ না করে গ্রন্থপরিচয়ে তার উল্লেখ করেছি।

৬. আবদুল কাদির-প্রদত্ত গ্রন্থপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে 'পুনশ্চ' শিরোনামে গ্রন্থ-সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

৭. নজরুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থে বানানের সমতা নেই। সেজন্যে আমরা আধুনিক বানানপদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য বইয়ের নামের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যেমন *বিষের বাঁশী* কিংবা *পূবের হাওয়া*। তবে দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে, যেমন *সর্বহারা*। যে-সব ক্ষেত্রে বানানের কোনো বিশেষত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সংগত মনে হয়েছে, সেখানে আমরা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সংস্করণের বানান বজায় রেখেছি।

৮. পাঁচ খণ্ডের জায়গায় চার খণ্ডে এবারে *নজরুল-রচনাবলী* প্রকাশিত হলো বলে বিভিন্ন খণ্ডের বিন্যাসের বড় রকম পরিবর্তন ঘটেছে। আবদুল কাদির প্রত্যেক খণ্ডের একটা ভাবগত সামঞ্জস্যের কথা ভেবেছিলেন। তা যে সর্বত্র রক্ষা করা যায়নি, সেকথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। নতুন সংস্করণে প্রথম খণ্ডে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নজরুল ইসলামের সকল গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বাকি সব বই সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কাব্য ও গীতি-গ্রন্থ এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান। চতুর্থ খণ্ডে আছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গদ্য ও নাট্যগ্রন্থ, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গদ্য ও নাট্যরচনা এবং চিঠিপত্র। এই দুই খণ্ডের রচনাবিন্যাসে কালক্রম রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি।

৯. কবির নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ *সঞ্চিতা* এই রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তবে *সঞ্চিতার* প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও সূচি প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেওয়া হয়েছে।

১০. *মক্তব-সাহিত্য* বইটির একটি কীটদষ্ট কপি নজরুল ইন্সটিটিউটে রক্ষিত আছে। কীটদষ্ট অংশের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর না হওয়ায় *রচনাবলীর* দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে *মক্তব-সাহিত্যের* উদ্ধারযোগ্য অংশ সন্নিবিষ্ট হলো।

নজরুল-রচনাবলীর সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠ-নির্ধারণের বিষয়ে সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যেরা যে শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন, তার জন্যে আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এই কাজে কবির রচনার বিভিন্ন সংস্করণ দিয়ে সাহায্য করেছেন নজরুল ইন্সটিটিউট-কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ দেখার সুযোগ পেয়েছি। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত সংগ্রহও আমরা ব্যবহার করেছি। সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য-সচিব সেলিনা হোসেনের উদ্যম ও মোবারক হোসেনের পরিশ্রমের কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সকল পর্যায়ে আমাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

নজরুল-রচনাবলীর সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা একটি দুরূহ কর্ম। বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদির এই কাজে অগ্রসর হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নতুন সংস্করণে আমরা কিছু উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেছি। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে গবেষকরা *নজরুল-রচনাবলীর* আরো শুদ্ধ ও আরো সম্পূর্ণ সংস্করণ-প্রকাশে উদ্যোগী হবেন।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ ॥ ২৫শে মে ১৯৯৩

আনিসুজ্জামান
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

সূচিপত্র

অনুবাদ

গান

নাটিকা

পাঠ্যপুস্তক

কাজী নজরুল ইসলাম চুরুলিয়া গ্রামের এই গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে বাড়িটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত।

কল্পতরু সেনগুপ্তের 'জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম' গ্রন্থ থেকে

কুমিল্লা শহরের কান্দিরপারে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়ি। এ বাড়িতে নজরুলের সঙ্গে প্রমীলা সেনগুপ্তের পরিচয় ও প্রেম হয়েছিল এবং এ বাড়ি থেকেই নজরুল গ্রেফতার হয়েছিলেন ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে। বর্তমানে এ ঐতিহাসিক বাড়িটির অস্তিত্ব নেই। ঐ বাড়িটির স্থানে যে নতুন স্থাপনা সেখানে নজরুল বা প্রমীলার কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

কল্পতরু সেনগুপ্তের 'জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম' গ্রন্থ থেকে

গ্রামোফোন কোম্পানির স্টুডিওতে কাজী নজরুল ইসলাম ও কমল দাশগুপ্ত সঙ্গীতে সুর সংযোজন নিয়ে আলোচনা করছেন।

কল্পতরু সেনগুপ্তের 'জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম' গ্রন্থ থেকে
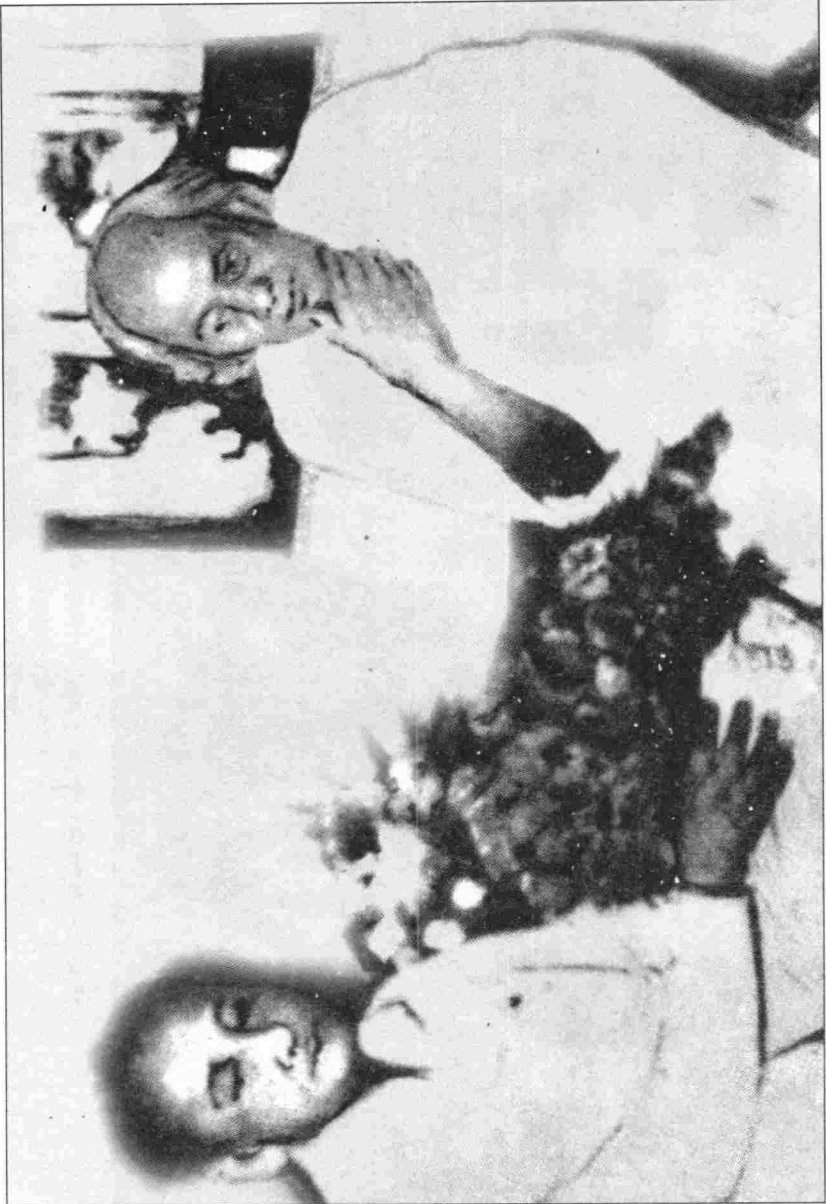
কলকাতা ক্রিস্টোফার রোডস্থ বাড়িতে কমরেড মুজফফর আহমদ ও কবি।

কল্পতরু সেনগুপ্তের 'জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম' গ্রন্থ থেকে
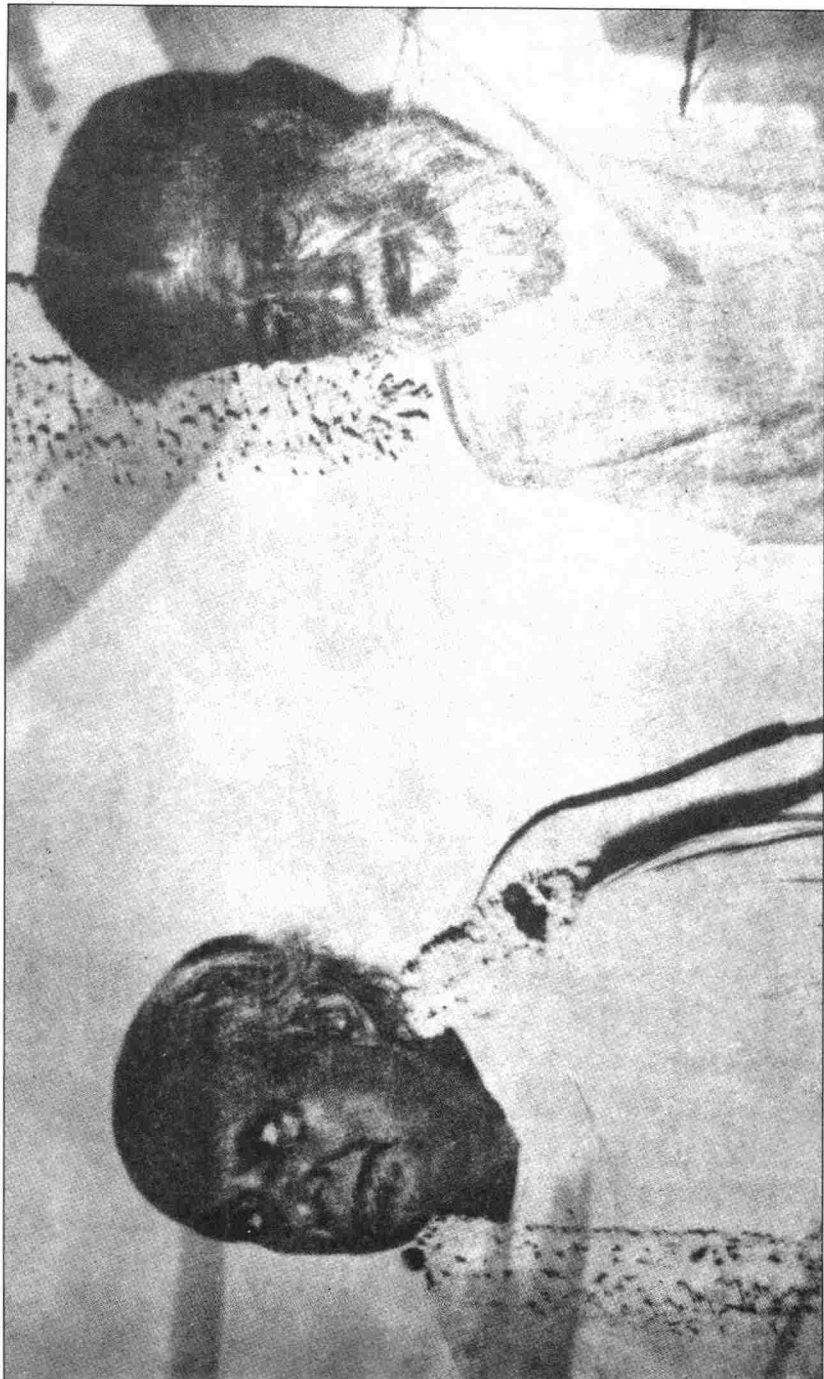
নজরুল ও তাঁর বন্ধু মইনুদ্দীন হোসায়েন

ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গে নজরুল

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন অঙ্কিত নজরুলের প্রতিকৃতি
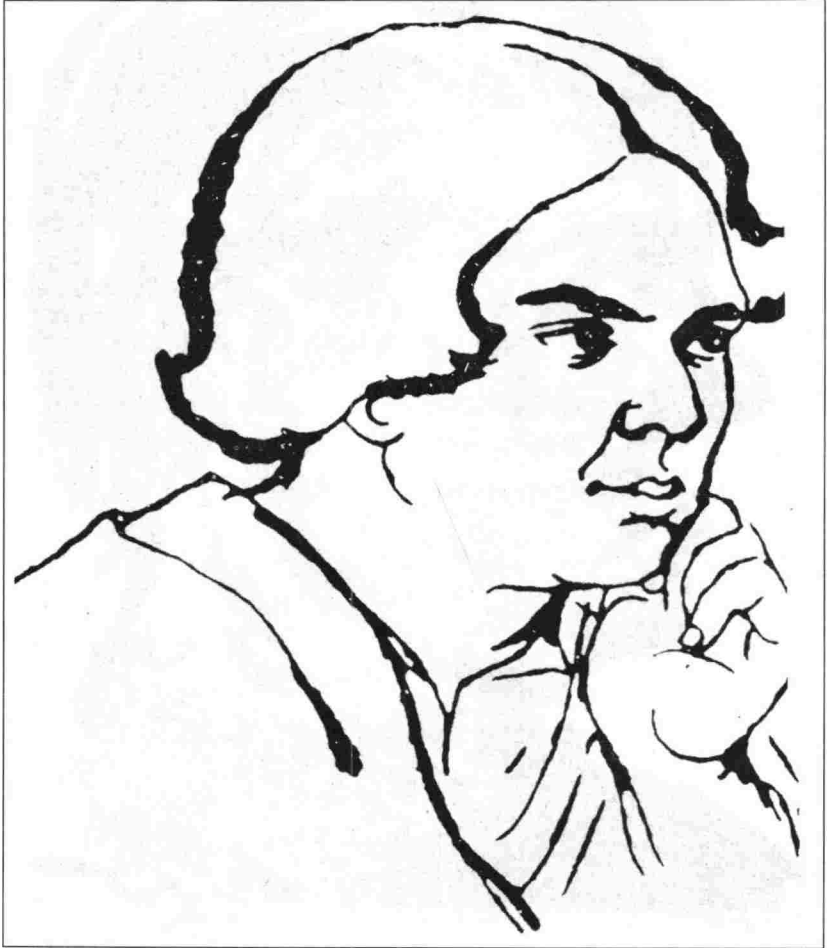
সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত নজরুলের প্রতিকৃতি

শিল্পী কামরুল হাসানের আঁকা 'নতুন চাঁদে'র প্রচ্ছদচিত্র (১৯৪৫)

(কবির হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি)

নজরুলের হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি (প্রথম খসড়া)

মোমতাজ! মোমতাজ! তোমার তাজমহল

(যেন) বৃন্দাবনের এক মুঠো প্রেম আজও করে ঝলমল ॥

কত সম্রাট হ'ল ধূলি স্মৃতির গোরস্থানে

পৃথিবী ভুলিতে নারে প্রেমিক শাহজাহানে।

শ্বেত-মর্মরে সেই বিরহীর ক্রন্দন-মর্মর-

গুমরে অবিরল ॥

কেমনে জানিল শাহজাহান? প্রেম পৃথিবীতে মরে যায়!

(তাই) পাষাণ-প্রেমের স্মৃতি রেখে গেল পাষাণে লিখিয়া হায়!

(যেন) তাজের পাষাণ-অঞ্জলি লয়ে নিঠুর বিধাতা পানে

অতৃপ্ত প্রেম, বিরহী-আত্মা আজও অভিযোগ হানে

(বুঝি) সেই লাজে কলঙ্কী চাঁদ ঘুম ঘুমাইতে চায়

শীর্ণ যমুনা-জল ॥

(কবির হাতের লেখা পান্ডুলিপি) নজরুলের

বাগেশ্রী – কার্ফা

চোখের নেশার ভালোবাসা সে কি কভু থাকে গো।
জাগিয়া স্বপনের স্মৃতি স্মরণে কে রাখে গো॥
তোমরা ভোলো গো যারে
চিরতরে ভোলো তারে,
মেঘ গেলে মেঘছায়া থাকে কি আকাশে গো॥
পুতুল লইয়া খেলা
খেলেছ ~~…~~ বালিকা-বেলা,
পুতুলের পরাণ নাই তেমনি পুতুল খেলা।
ভাঙিয়া গড়িয়া নিতি হৃদয়-দেবতাকে গো॥
চোখের ভালোবাসা গলে
শেষ হয় যায় চোখের জলে,
বুকের দুলাল সে কি ~~…~~ নয়ন-জলে ঢাকে গো॥

নজরুল ইসলাম

নজরুলের একটি গানের হস্তলিপি

মুলতান

প্রদীপ নিভায়ে দাও, উঠিয়াছে চাঁদ।
বাহু-বন্ধন আছে, মালায় কি সাধ॥

তুমি অভিমানী ওগো,
কেশের সুবাস তব ধরায় মনে,
হৃদয়ের আঁখি মোর হৃদয় কাঁদে —
চন্দন আনে বিষাদ॥

খোলো উত্তরী, ফেলে দাও আভরণ,
হাতে রাখ হাত, তোলো আঁখি নয়নে।

বাহিরে বহুক বাতাস,
বক্ষে আসুক মোর তব নিঃশ্বাস
~~[illegible]~~
চম্পার ডালে বসি মোদের দেখে
~~[illegible]~~ ।
হেসে যায় পাপিয়ায় ভেঙে বিবাদ॥

'বুলবুল' দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত একটি গানের হস্তলিপি

"সওগাত

সওগাত মেঘ-মেদুর-বর্ষী ইন্দিরা দেবী নৃত্যের ঝর্ণা।

মঞ্জুল বিজুরি নোতুন-ছন্দে মেঘ ও চপল-নূপুর-ছন্দে,

মন্দিরা মুরলি-মোহিত হাতে এস মোর বিরহ-নীরস-রাতে

এ তৃষ্ণা কবির প্রাণ সমর্পি॥

'শেষ সওগাত' গ্রন্থের উৎসর্গ কবিতা

নতুন চাঁদ

নতুন চাঁদ

দেখেছি তৃতীয় আসমানে চিদাকাশে
চির-পথ-চাওয়া মোর নতুন চাঁদ হাসে।
দেহ ও মনের রোজা আমার
'এফতার' করে গেরেফতার
করিব, তৃষিত বক্ষে মোর ঐ চাঁদে,
সহিতে পারি না বিরহ ওর, মন কাঁদে।
জুড়াব এবার জুড়াব গো,
খুশির পায়রা উড়াব গো
নামিবে ও চাঁদ মোর হৃদয়— আসমানে,
মত্ত হইব আনন্দের রস পানে।
বদলাবে তকদির আমার,
ঘুচিবে সর্ব অন্ধকার,
পরিব ললাটে, চুমু দেবো, বাঁধব তায়
আল্লাহ নামের রজ্জুতে দিল-কোঠায়।
সাম্যের রাহে আল্লাহের
মুয়াজ্জিনেরা ডাকিবে ফের,
পরমোৎসব হবে সেদিন ময়দানে
সাত আসমানে দোল্ খাবে জয়-গানে
এক আল্লাহর জয়-গানে,
মহামিলনের জয়-গানে
'শান্তি' 'শান্তি' জয়-গানে !
একঘরে হেথা দশ প্রাচীর,
হিংসা-ক্লৈব্য-বদ্ধ নীড়
ভেঙে যাবে, মন রেঙে যাবে এক রঙে।
এক আকাশের তলে রবো এক সঙে।
চাঁদ আসিছে রে, নতুন চাঁদ !
অপরূপ প্রেম-রসের ফাঁদ
বাঁধিবে সকলে এক সাথে গলে গলে
মিলিয়া চলিব তাঁর পথে দলে দলে।

রবে না ধর্ম জাতির ভেদ
রবে না আত্ম-কলহ-ক্লেদ,
রবে না লোভ, রবে না ক্ষোভ অহংকার,
প্রলয়-পয়োধি এক নায়ে হইব পার।
একের লীলা এ, দুজন নাই
তাঁহারি সৃষ্ট সবাই ভাই,
কত নামে ডাকি—সর্বনাম এক তিনি,
তাঁরে চিনি নাকো, নিজেরে তাই নাহি চিনি।
আলো ও বৃষ্টি তাঁহার দান
সব ঘরে ঝরে এক সমান
সকলের মাঠে শস্য দেয় ফুল ফোটায়,
সকল মানুষ তাঁর ক্ষমা করুণা পায়।
প্রলয়ের রূপ ধরে যবে
তাঁর ক্রোধ নেমে আসে ভবে,
সব ধর্মের সব মানব মরে তখন,
থাকে না হিন্দু-মুসলমানের আস্ফালন।
এককে মারিলে রহে না দুই,
এস সবে সেই এককে ছুঁই,
এক সে স্রষ্টা সব-কিছুর সব জাতির।
আসিছে তাহারি চন্দ্রালোক এক বাতির!
মরিছে যাহারা—তাহারা নয়,
আসিছে—যাহারা বাঁচিয়া রয়,
নিত্য অভেদ উদার-প্রাণ নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
আসমানে চাঁদ দেয় আজান নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
মৃত্যুকে তারা করে না ভয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
তাহারা বুদ্ধি-বদ্ধ নয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
কাপুরুষ তার্কিক যারা
কেবল বিচার করে তারা,
অগ্রে চলে না ক্লীব ভীরু, ভয় দেখায়,
যারা আগে চলে, পিছে তাদের টানিতে চায়!
প্রাণ-প্রবাহের শত্রু সব,
ধূর্ত যুক্তি-শৃগাল-রব
দুই কূলে করে, তবু চলে নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
মহাবন্যার তরঙ্গসম সম্মুখে দলে দলে
তবু চলে নৌজোয়ান নৌজোয়ান!

জাগাবে জোয়ার নতুন চাঁদ
এদের বক্ষে ; ভাঙিবে বাঁধ
জরায় জীর্ণ মরা ঘাটের বিলাসীদের
মানিবে না এরা হট্টগোল মণ্ডুকের।
সত্য বলিতে নিত্য ভয়
যুক্তি–গর্তে লুকায়ে রয়
ইহারা তাদের দলের নয়—নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !
এরা জীবন্ত মুক্ত–ভয় নৌজোয়ান !
ভীরু ইঁদুরের কিচি–মিচি
শোনে নাকো এরা মিছিমিছি,
এরা শুধু বলে, 'চল আগে নৌজোয়ান !'
অসম্ভবের অভিযানে এরা চলে,
না চলেই ভীরু ভয়ে লুকায় অচলে !
এরা অকারণ দুর্নিবার প্রাণের ঢেউ,
তবু ছুটে চলে যদিও দেখেনি সাগর কেউ।

জানে পারাবার, জানে অসীম,
এরাই শক্তি মহামহিম,
এরা উদ্দাম যৌবন–বেগ দুরন্ত
মুক্তপক্ষ নির্ভয় এরা উড়ন্ত।
নাই ইহাদের অবিশ্বাস
যা আনে জগতে সর্বনাশ
প্রতি নিশ্বাসে এরা কহে—'মোরা অমর !'
তনুমনে নাই সন্দেহের বিসর্গ অনুস্বর।
হাতের লাট্টু এদের প্রাণ
গুলতির গুলি এদের প্রাণ
বেপরোয়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে দিকে দিকে,
এদের বুদ্ধি চিকমিকায় না ঘেরা চিকে !
তিন্তিড়ি গাছে জোনাকি–দল
চাঁদের নিন্দা করে কেবল,
পুচ্ছের আলো উচ্ছের ঝোপে জ্বালায়ে কয়—
'মোরা আলো দেবো, চন্দ্রের দেশে ভীষণ ভয় !'
পাহাড়ে চড়িয়া নিচে পড়ে—নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !
অজগর খোঁজে গহ্বরে—নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !

চড়িয়া সিংহে ধরে কেশর—নৌজোয়ান !
বাহন তাহার তুফান ঝড়—নৌজোয়ান !
শির পেতে বলে—'বজ্র আয় !'
দৈত্য-চর্ম-পাদুকা পায়,
অগ্নি-গিরিরে ধরে নাড়ায়—নৌজোয়ান !
দলে দলে ওরা খুঁজে বেড়ায়
ভূমিকম্পের ঘর কোথায়—
নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !
বিলাস এদের দারিদ্র্য,
গতি ইহাদের বিচিত্র,
দেখনিকো জ্ঞান-বিলাসীরা এদের পথ,
শুনিলেও কাঁপে বলি-যূপের ছাগের বৎ !
এরাই দেখিবে নতুন চাঁদ জ্যোতিষ্মান,
ইহাদের নাই দেহ ও মন, কেবল প্রাণ !
নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !

এদেরই পথ দেখাতে ঐ
নতুন চাঁদের জ্যোৎস্না খই
আকাশ-খোলায় ফুটিছে ! ভীরুরা যাসনে কেউ,
যাদের পিছনে লেগেছে বুদ্ধি ভয়ের ফেউ !
মৃত্যুর ভয় প্রতি পদে ঐ পথে
লঙ্ঘিতে হবে কত সমুদ্র পর্বতে।
বিলাসীরা থাক চুপ করে,
রূপ দেখে খেয়ো টুপ্ করে
যাত্রী অরুণ-তীর্থের পথে নৌজোয়ান !
পথ দেখায় যে, সে শুধু কয়—'জীবন দান
জীবন দান, নৌজোয়ান !'
জীবনে না করে নিষ্ঠীবন,
মৃত্যুর বুকে সঞ্চরণ
করে যারা, তারা নবযুগের নৌজোয়ান !
তাহাদের পথে এস না কেউ ভীরু, আল্লার না-ফরমান।
ওরা দুর্জয় ভয়-হারা
ওদের ভ্রান্ত কয় কারা ?
এই মর্তের ভোগের গর্তে যারা মরে ?
অমৃত আনিতে যায়—তারে অনাদর করে ?

এক আল্লার সৃষ্টিতে
এক আল্লার দৃষ্টিতে
দেখিবে সবারে দুনিয়াতে নৌজোয়ান
তলোয়ার তার বক্ষে লুকানো
নববধূ সম শয্যাতে—
নৌজোয়ান!
নৌজোয়ান!

চির-জনমের প্রিয়া

আরো কতদিন বাকি?
বক্ষে পাওয়ার আগে বুঝি, হায়, নিভে যায় মোর আঁখি!
অনন্তলোকে অনন্তরূপে কেঁদেছি তোমার লাগি
সেই আঁখিগুলি তারা হয়ে আজো আকাশে রয়েছে জাগি।
চির-জনমের প্রিয়া মোর! চেয়ে দেখো নীলাকাশে
ভ্রমরের মতো ঝাঁক বেঁধে কোটি গ্রহ-তারা ছুটে আসে
তোমার শ্রীমুখ কমলের পানে! ওরা যে ভুলিতে নারে
আজিও খুঁজিয়া ফিরিছে তোমায় অসীম অন্ধকারে!
বারেবারে মোর জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে, প্রিয়া।
নেভেনি আমার নয়ন, তোমারে দেখিবার আশা নিয়া।
আমি মরিয়াছি, মরেনি নয়ন; দেখো প্রিয়তমা চাহি
তব নাম লয়ে ওরা কাঁদে আজো—ওদের নিদ্রা নাহি।
ওরা তারা নয়, অভিশপ্ত বিরহীর ওরা আঁখি,
মহাব্যোম জুড়ে উড়িয়া বেড়ায় আশ্রয়-হারা পাখি!
আঁখির আমার ভাগ্য ভালো গো, পেয়েছিল আঁখিজল,
তাই আজো তারা অমর হইয়া ভরে আছে নভোতল!
বাহু দিয়া মোর কণ্ঠ যদি গো জড়াইতে কোনোদিন,
আঁখির মতন এই দেহ মোর হইত মৃত্যুহীন!
তোমার অধর নিঙাড়িয়া মধু পান করিতাম যদি,
আমার কাব্যে, সংগীতে, সুরে বহিত অমৃত-নদী!

* * *

ফুল কেন এত ভালো লাগে তব, কারণ জানো কি তার?
ওরা যে আমার কোটি জনমের ছিন্ন অশ্রু-হার!

যত লোকে আমি তোমার বিরহে ফেলেছি অশ্রুজল,
ফুল হয়ে সেই অশ্রু—ছুঁইতে চাহে তব পদতল!
অশ্রুতে মোর গভীর গোপন অভিমান ছিল হায়,
তাই অভিমানে তোমারে ছুঁইয়া ফুল শুকাইয়া যায়!
ঝরা ফুল লয়ে বক্ষে জড়ায়ে ধরেছ কি কোনো দিন?
এত সুন্দর, তবু কেন ফুল এমন ব্যথা-মলিন?
তব মুখ পানে চেয়ে থাকে ফুল মোর অশ্রুর মতো;
তোমারে হেরিয়া উহাদের গত জনমের স্মৃতি যত
জেগে ওঠে প্রাণে! তাই অভিমানে ঝরে সে সন্ধ্যাবেলা,
ভুলিতে পারে না, যুগে যুগে তুমি হানিয়াছ যত হেলা!

* * *

পূর্ণিমা চাঁদ দেখেছ? দেখেছ তার বুকে কালো দাগ!
ওর বুকে ক্ষত-চিহ্ন এঁকেছে, জানো, কার অনুরাগ?
কোটি জনমের অপূর্ণ মোর সাধ আশা জমে জমে
চাঁদ হয়ে হায় ভাসিয়া বেড়ায় নিরাশার মহাব্যোমে!
কলঙ্ক হয়ে বুকে দোলে তার তোমার স্মৃতির ছায়া,
এত জ্যোৎস্নায় ঢাকিতে পারেনি তোমার মধুর মায়া!
কোন্ সে অতীতে মহাসিন্ধুর মন্থনশেষে, প্রিয়া,
বেদনা-সাগর চাঁদ হয়ে উঠে তোমারে বক্ষে নিয়া
পলাইতে ছিনু সুদূর শূন্যে। নিঠুর বিধাতা পথে
তোমারে ছিনিয়া লয়ে গেল হায় আমার বক্ষ হতে!
তুমি চলে গেলে, বুকে রয়ে গেল তব অঙ্গের ছাপ,
শূন্য বক্ষে শূন্যে ঘুরি গো, চাঁদ নই অভিশাপ!

* * *

প্রাণহীন দেহ আকাশে ফেলিয়া ধরণীতে আসি ফিরে,
তোমারে খুঁজিয়া বেড়াই গোমতী পদ্মা যমুনা-তীরে!
চিনি যবে হায় গোধূলিবেলায় শুভ লগ্নের ক্ষণে,
বাঁশি না বাজিতে লগ্ন ফুরায়, আঁধার ঘনায় বনে!
তুমি চলে যাও ভবনের বঁধু, আমি যাই বন-পথে,
মোর জীবনের মরা ফুল তুলে দিই মরণের রথে!

* * *

শ্রাবণ-নিশীথে ঝড়ের কাঁদন শুনেছ কি কোনোদিন?
কার অশান্ত অসহ রোদন আজিও শ্রান্তিহীন
দিগ্দিগন্তে দস্যুর মতো হানা দিয়ে ফেরে হায়!
ভবনে ভবনে কার বুক থেকে কাহারে ছিনিতে চায়?—

এমনি সেদিন উঠেছিল ঝড় মহাপ্রলয়ের বেশে
যেদিন আমারে পথে ফেলে গেলে চলিয়া নিরুদ্দেশে!
প্রবল হস্তে নাড়া দিয়া আমি অসীম শূন্য নভে
কৃষ্ণ মেঘের ঢেউ তুলেছিনু; গর্জ্জিয়া ভীম রবে
বিশ্বের ঘুম ভেঙে দিয়েছিনু! যেখানে যে ছিল সুখে
যেখানে প্রিয় ও প্রিয়া ছিল—সেথা বজ্র হেনেছি বুকে!
ঝড়ের বাতাসে আমার নিশাসে নড়িল না মহাকাল,
মোর ধূমায়িত অশ্রুবাষ্প রচিল জলদ-জাল।
অঝোর ধারায় ঝরিনু ধরায় খুঁজিলাম বনভূমি
ফুরাইল আয়ু, থির হল বায়ু, সাড়া দিলে নাকো তুমি!
আমার ক্ষুধিত সেই প্রেম আজো বিজলি-প্রদীপ জ্বেলে
অন্ধ আকাশ হাতড়িয়া ফেরে ঝঞ্ঝার পাখা মেলে!
তুমি বেঁচে গেছ, অতীতের স্মৃতি ভুলিয়াছ একেবারে,
নইলে ভুলিয়া ভয়—ছুটে যেতে মরণের অভিসারে!

* * *

শান্ত হইনু প্রলয়ের ঝড়, মলয়-সমীর-রূপে
যেখানে দেখেছি ফুল সেইখানে ছুটে গেছি চুপে চুপে।
পৃথিবীতে যত ফুটিয়াছে ফুল সকল ফুলের মুখে
তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরেছি—না পেয়ে উগ্র দুখে
ঝরায়েছি ফুল ধরার ধুলায়! ঝরা ফুল-রেণু মেখে
উদাসীন হাওয়া ফিরিয়াছি পথে তব প্রিয় নাম ডেকে!
সদ্যস্নাতা এল কুন্তল শুকাইতে যবে তুমি
সেই এলোকেশ বক্ষে জড়ায়ে গোপনে যেতাম চুমি!
তোমার কেশের সুরভি লইয়া দিয়াছি ফুলের বুকে
আঁচল ছুঁইয়া মূর্ছিত হয়ে পড়েছি পরম সুখে!
তোমার মুখের মদির সুরভি পিইয়া নেশায় মাতি
মহুয়া বকুল বনে কাটায়েছি চৈতী চাঁদিনী রাতি।
তব হাত দুটি লতায়ে রহিত পুষ্পিত লতা সম
কত সাধ যেত যদি গো জড়াত ও লতা কণ্ঠে মম।
তব কঙ্কণ চুড়ি লয়ে আমি খেলেছি, দেখোনি তুমি,
চলিতে মাথার কাঁটা পড়ে যেত, আমি তুলিতাম চুমি!
চোরের মতন চুরি করিয়াছি তব কবরীর ফুল!—
সেসব অতীত জনমের কথা—আজ মনে হয় ভুল!

* * *

আজ মুখ পানে চেয়ে দেখি, তব মুখে সেই মধু আছে,
আজো বিরহের ছায়া দোলে তব চোখের কোলের কাছে!

ডাগর নয়নে আজো পড়ে সেই সাগর জলের ছায়া,
তনুর অণুতে অণুতে আজিও সেই অপরূপ ছায়া !
আজো মোর পানে চাহ যবে, বুকে ঘন শিহরণ জাগে,
আমার হৃদয়ের কোটি শতদল ফুটে ওঠে অনুরাগে
আজো যবে চাও, আমার ভুবনে ওঠে রোদনের বাণী,
কানাকানি করে চাঁদে ও তারাতে—'জানি গো তোমারে জানি !'
রুধিরে আমার নূপুর বাজে গো, কহে—'প্রিয়া, চিনি, চিনি !'
একদিন ছিলে প্রেমের গোলোকে মোর প্রেম-গরবিনী।
ছিলে একদিন আমার সোহাগে গলিয়া যমুনা হতে
নিবেদিত নীল পদ্মের মতো ভাসিতে প্রেমের স্রোতে !
ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছ আজ এই পৃথিবীর ঘাটে,
(আমি) পুষ্পবিহীন শূন্য বৃন্ত কাঁটা লয়ে দিন কাটে !

* * *

মনে করো, যেন সে কোন্ জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা।
তুমি রয়ে গেলে এপারে, ভাসিল ওপারে আমার ভেলা !
সেই নদী জলে পড়ে গেলে তুমি ফুলের মতন ঝরে,
কেঁদে বলেছিলে যাবার বেলায়—'মনে কি পড়িবে মোরে,
জনমিবে যবে আর কি আঁকিবে হৃদয়ে আমার ছবি।'
আমি বলেছিনু, 'উত্তর দেবে আর জনমের কবি !'
সেই বিরহীর প্রতিশ্রুতি গো আসিয়াছি কবি হয়ে,
ছবি আঁকি তব আমার বুকের রক্ত ও আয়ু লয়ে !
ঝাঁকে ঝাঁকে মোর কথার কপোত দিকে দিকে যায় ছুটে,
হংস-দূতীর মতো মোর লিপি ধরিয়া চঞ্চুপুটে !
হারায়ে গিয়াছে শূন্যে তাহারা ফিরিয়া আসেনি আর,
তাই সুরে সুরে বিধূনিত করি অসীম অন্ধকার !
ভবনে ভবনে সেই সুর প্রতি কণ্ঠ জড়ায়ে কহে—
'যাহারে খুঁজিয়া কাঁদি নিশিদিন, জানো সে কোথায় রহে?'
তারা মরে, ফুল ঝরে সেই সুরে, তুমি শুধু কাঁদিলে না
আমার সুরের পলক কুড়ায়ে কবরীতে বাঁধিলে না !
আমার সুরের ইন্দ্রাণী ওগো ! ব্যথার সাগর-তলে—
দেখেছ কি কত না-বলা কথার মুক্তা মানিক জ্বলে?
তোমার কণ্ঠে মালা হয়ে তারা মুক্তি লভিতে চায়
গত জনমের অস্থি আমার নিদারুণ বেদনায়
মুক্তা হয়েছে ; অঞ্জলি দিতে তাই গাঁথি গানে গানে
চরণে দলিয়া ফেলে দিও পথে যদি তা বেদনা হানে

মনে ক'রো, দুঃস্বপ্নের মতো আমি এসেছিনু রাতে
বহুবার গেছ ভুলিয়া এবারো ভুলিয়া যাইও প্রাতে
কহিলাম যত কথা প্রিয়তমা মনে ক'রো সব মায়া,
সাহারা মরুর বুকে পড়ে না গো শীতল মেঘের ছায়া!
মরুভূর তৃষা মিটাইবে তুমি কোথা পাবে এত জল?
বাঁচিয়া থাকুক আমার রৌদ্র-দগ্ধ আকাশ-তল!

আমার কবিতা তুমি

প্রিয়া-রূপ ধরে এতদিনে এলে আমার কবিতা তুমি,
আঁখির পলকে মরুভূমি যেন হয়ে গেল বনভূমি!
জুড়ালো গো তার শত জনমের রৌদ্র-দগ্ধ-কায়া—
এতদিনে পেল তার স্বপনের স্নিগ্ধ মেঘের ছায়া।
চেয়ে দেখো প্রিয়া, তোমার পরশ পেয়ে
গোলাপ দ্রাক্ষা-কুঞ্জে মরুর বক্ষ গিয়াছে ছেয়ে!
গভীর নিশীথে, হে মোর মানসী, আমার কল্পলোকে
কবিতার রূপে চুপে চুপে তুমি বিরহ-করুণ চোখে
চাহিয়া থাকিতে মোর মুখ পানে; আসিয়া হিয়ার মাঝে
বলিতে যেন গো—'হে মোর বিরহী, কোথায় বেদনা বাজে?'
আমি ভাবিতাম, আকাশের চাঁদ বুকে বুঝি এল নেমে
মোর বেদনায় বুকে বুক রাখি কাঁদিতে গভীর প্রেমে!
তব চাঁদমুখ পানে চেয়ে আজ চমকিয়া উঠি আমি,
আমি চিনিয়াছি, সে চাঁদ এসেছে প্রিয়ারূপ ধরে নামি!

যত রসধারা নেমেছে আমার কবিতার সুরে গানে
তাহার উৎস কোথায়, হে প্রিয়া, তব শ্রীঅঙ্গ জানে।
তাই আজ তব যে অঙ্গে যবে আমার নয়ন পড়ে,
থির হয়ে যায় দৃষ্টি সেথাই, আঁখিপাতা নাহি নড়ে!
তোমার তনুর অণু-পরমাণু চির-চেনা মোর, রানি!
তুমি চেনোনাকো ওরা চেনে বলে, 'বন্ধু তোমারে জানি।'
অনন্ত শ্রীকান্তি লাবণি রূপ পড়ে ঝরে ঝরে
তোমার অঙ্গ বাহি, প্রিয়তমা, বিশ্ব ভুবন 'পরে!
মন্ত্র-মুগ্ধ সাপের মতন তোমার অঙ্গ পানে
তাই চেয়ে থাকি অপলক-আঁখি, লজ্জারে নাহি মানে!

তুমি যবে চলো, যবে কথা বলো, মুখ পানে চাও হেসে
মূর্তি ধরিয়া ওঠে যেন সেথা আমার ছন্দ ভেসে।
মনে মনে বলি, তুমি যে আমার ছন্দ-সরস্বতী,
ওগো চঞ্চলা, আমার জীবনে তুমি দুরন্ত গতি।
আমার রুদ্র নৃত্যে জেগেছে কঙ্কালে নবপ্রাণ,
ছন্দিতা ওগো, আমি জানি, তাহা তব অঙ্গের দান।
নাচো যবে তুমি আমার বক্ষে, রুধির নাচিয়া ওঠে
সেই নাচ মোর কবিতায় গানে ছন্দ হইয়া ফোটে।
মনে পড়ে যবে তোমার ডাগর সজল-কাজল আঁখি,
সে চোখের চাওয়া আমার গানের সুর দিয়ে বেঁধে রাখি।
প্রেম-ঢলঢল তোমার বিরহ-ছলছল মুখ হেরি
ভাবের ইন্দ্রধনু ওঠে মোর সপ্ত আকাশ ঘেরি।
আমার লেখার রেখায় রেখায় ইন্দ্রধনুর মায়া,
উহারা জানে না, এই রং তব তনুর প্রতিচ্ছায়া!
আমার লেখায় কী যেন গভীর রহস্য খোঁজে সবে
ভাবে, এ কবির প্রিয়তমা বুঝি আকাশ-কুসুম হবে!
উহারা জানে না, তুমি অসহায় কাঁদ পৃথিবীর পথে,
উহারা জানে না রহস্যময়ী তুমি মোর লেখা হতে।

আমিই ধরিতে পারি না তোমারে, উহারা ধরিতে চায়,
সাগরের স্মৃতি খুঁজে ফেরে ওরা মরুভূর বালুকায়!
তোমার অধরে আঁখি পড়ে যবে, অধীর তৃষ্ণা জাগে,
মোর কবিতায় রস হয়ে সেই তৃষ্ণার রঙ লাগে।
জাগে মদালস-অনুরাগ-ঘন নব যৌবন নেশা
এই পৃথিবীরে মনে হয় যেন, শিরাজি আঙুর-পেষা!
সুর হয়ে ওঠে সুরা যেন, আমি মদিরা-মত্ত হয়ে
যৌবন-বেগে তরুণেরে ডাকি খর তরবারি লয়ে।
জরাগ্রস্ত জাতিরে শুনাই নব জীবনের গান,
সেই যৌবন-উন্মাদ বেগ, হে প্রিয়া তোমার দান।
হে চির-কিশোরী, চির-যৌবনা! তোমার রূপের ধ্যানে
জাগে সুন্দর রূপের তৃষ্ণা নিত্য আমার প্রাণে।
আপনার রূপে আপনি মুগ্ধা দেখিতে পাও না তুমি
কত ফুল ফুটে ওঠে গো তোমার চরণ-মাধুরী চুমি!
কুড়ায়ে সে ফুল গাঁথি আমি মালা কাব্যে-ছন্দে-গানে,
মালা দেখে সবে, জানে না মালার ফুল ফোটে কোন্‌খানে!

হে প্রিয়া, তোমার চিরসুন্দর রূপ বারেবারে মোরে
অসুন্দরের পথ হতে টানি আনিয়াছে হাত ধরে।
ভিড় করে যবে ঘিরিত আমারে অসুন্দরের দল,
সহসা ঊর্ধ্বে ফুটিয়া উঠিত তব মুখ-শতদল।
মনে হতো, যেন তুমি অনন্ত শ্বেত শতদল-মাঝে,
মোর প্রতীক্ষা করিতেছ প্রিয়া চির-বিরহিণী সাজে।
সেই মুখখানি খুঁজিয়া ফিরেছি পৃথিবীর দেশে দেশে,
শ্রান্ত স্বপনে হৃদয়-গগনে ও-মুখ উঠিত ভেসে!
যেই ধরিয়াছি মনে হতো হায়, অমনি ভাঙিত ঘুম,
স্মৃতি রেখে যেত আমার আকাশে তব রূপ-কুঙ্কুম!
দেখি নাই, তবু কহিতাম গানে 'সাড়া দাও, সাড়া দাও,
যারা আসে পথে, তারা তুমি নহ, ওদের সরায়ে নাও!'
ভেবেছিনু, বুঝি পৃথিবীতে আর তব দেখা মিলিল না,
তুমি থাকো বুঝি সুদূর গগনে হয়ে কবি-কল্পনা।
সহসা একদা প্রভাতে যখন পাখিরা ছেড়েছে নীড়,
হারানো প্রিয়ারে খুঁজিছে আকাশে অরুণ-চন্দ্রাপীড়,
আমি পৃথিবীতে খুঁজিতেছিনু গো আমার প্রিয়ারে গানে,
থমকি দাঁড়ানু, চমকি উঠিনু কাহার বীণার তানে!
বেণু আর বীণা একসাথে বাজে কাহার কণ্ঠ-তটে,
কার ছবি যেন কাঁদিয়া উঠিল লুকানো হৃদয়-পটে।
হেরিনু আকাশে তরুণ সূর্য থির হয়ে যেন আছে,
কে যেন কী কথা কয়ে গেল হেসে আমার কানের কাছে।
আমার বুকের জমাট তুষার-সাগর সহসা গলে
আছাড়িয়া যেন পড়িতে চাহিল তোমার চরণ-তলে।
ওগো মেঘ-মায়া, বুঝিয়াছিলে কি তুমি?
দারুণ তৃষায় তব পানে ছিল চেয়ে কোনো মরুভূমি?
তুমি চলে গেলে ছায়ার মতন, আমি ভাবিলাম মায়া,
কল্প-লোকের প্রিয়া আসে না গো ধরণীতে ধরি কায়া!

ভেবেছিনু, আর জীবনে হবে না দেখা—
সহসা শ্রাবণ-মেঘ এল যেন হইয়া ব্রজের কেকা!
যমুনার তীরে বাজিয়া উঠিল আবার বিরহী বেণু,
আঁধার কদম-কুঞ্জে হেরিনু রাধার চরণ-রেণু।
যোগ-সমাধিতে মগ্ন আছিনু, ভগ্ন হইল ধ্যান,
আমার শূন্য আকাশে আসিল স্বর্ণ-জ্যোতির বান।

চির-চেনা তব মুখখানি সেই জ্যোতিতে উঠিল ভাসি
ইঙ্গিতে যেন কহিলে, 'বিরহী প্রিয়তম, ভালোবাসি!'
আমি ডাকিলাম, 'এস এস তবে কাছে।'
কাঁদিয়া কহিলে, 'হেরো গ্রহ তারা এখনো জাগিয়া আছে,
উহারা নিভুক, ঘুমাক পৃথিবী, ঘুমাক রবি ও শশী,
সে দিন আমারে পাবে গো, লাজের গুণ্ঠন যাবে খসি।
কেবল দুজন করিব কূজন, রহিবে না কোনো ভয়,
মোদের ভুবনে রহিবে কেবল প্রেম আর প্রেমময়।'

'আমি কি করিব?' কহিলাম আঁখি-নীরে
কহিলে, 'কাঁদিবে মোর নাম লয়ে বিরহ-যমুনা-তীরে!
যমুনা শুকায়ে গিয়াছে প্রেমের গোকুলে এ ধরা-তলে,
আবার সৃজন করো সে যমুনা তোমার অশ্রু-জলে!
তোমার আমার কাঁদন গলিয়া হইবে যমুনা-জল
সেই যমুনায় সিনান করিতে আসিবে গোপিনী-দল,
ওরা প্রেম পাবে, পাইবে শান্তি, পাবে তৃষ্ণার মধু,
তোমারে দিলাম চির-উপবাস, পরম বিরহ, বঁধু!'
'একি অভিশাপ দিলে তুমি' বলে যেমনি উঠি গো কাঁদি,
হেরি কাঁদিতেছ পাগলিনী মোর হাত দুটি বুকে বাঁধি!
আজ মোর গানে কবিতায়, সুরে তুমি ছাড়া নাই কেউ,
সেই অভিশাপ যমুনায় বুঝি তুলেছে বিপুল ঢেউ!
সবার তৃষ্ণা মিটাইতে আমি যমুনা হইয়া ঝরি,
জানে না পৃথিবী, কোন্ নিদারুণ তৃষ্ণা লইয়া মরি!
বড় জ্বালা বুকে, বলো বলো প্রিয়া—না-ই পাইলাম কাছে,
এই বিরহের পারে তব প্রেম আছে আজো জেগে আছে!
যদি অভিমান জাগে মোর বুকে না বুঝে তোমার খেলা,
দূরে থাকো বলে ভাবি যদি তারে অনাদর অবহেলা—
কেঁদে কেঁদে রাতে যদি মোর হাতে লেখনী যায় গো থামি,
বিরহ হইয়া বুকে এসে মোর কহিও—'এই তো আমি।'

নিরুক্ত

আর কতদিন রবে নিরুক্ত তোমার মনের কথা?
কথা কও প্রিয়া, সহিতে নারি এ নিদারুণ নীরবতা।

কেবলি আড়াল টানিতে চাহ গো তোমার আমার মাঝে
সে কি লজ্জায়? তবে কেন তাহা অবহেলা সম বাজে?
হেরো গো আমার তৃষিত আকাশ তব অধরের কাছে
যে কথা শোনার তরে শত যুগ আনত হইয়া আছে,
বলো বলো প্রিয়া, সে কথা বলিবে কবে।
যে কথা শুনিয়া মাতিয়া উঠিবে আকাশ মহোৎসবে!
যে কথা কারেও বলোনি জীবনে আমারেও নাহি বলো,
যে কথার ভারে অসহ্ ব্যথায় টলিতেছ টলমল,
তোমার অধর-পল্লব ফাঁকে সেই নিরুক্ত বাণী—
ফুলের মতন ফুটিয়া উঠিবে কোন্ শুভক্ষণে, রাণি?
না-বলা তোমার সে কথা শোনার লাগি
শত সে জনম কত গ্রহ-তারা আড়ি পেতে আছে জাগি!
সে কথা না শুনে তিথি গুনে গুনে চাঁদ হয়ে যায় ক্ষয়,
শুনিবে আশায় লয় হয়ে চাঁদ আবার জনম লয়।
আমার মনের আঁধার বনের মৌনা শকুন্তলা,
কোন্ লজ্জায় কোন্ শঙ্কায়, যায় না সে কথা বলা?
তুমি না কহিলে কথা
মনে হয়, তুমি পুষ্প-বিহীন কুণ্ঠিতা বনলতা!
সে কথা কহিতে পারো না বলিয়া বেদনায় অনুরাগে
তব অঙ্গের প্রতি পল্লবে ঘন শিহরণ জাগে।
তোমার তনুর শিরায় শিরায় সে-কথা কাঁদিয়া ফিরে,
না-বলা সে কথা ঝরে ঝরে পড়ে তোমার অশ্রু-নীরে!
হে আমার চির-লজ্জিত বধূ, হেরো গো বাসর-ঘরে
প্রতীক্ষারত নিশি জেগে আছি সে কথা শোনার তরে।
হাত ধরে মোর রাত কেটে যায়, চরণ ধরিয়া সাধি,
অভিমানে কভু চলে যাই দূরে, কভু কাছে এসে কাঁদি।
তোমার বুকের পিঞ্জরে কাঁদে যে কথার কুহু-কেকা,
অধর-দুয়ার খুলিয়া কি তারা বাহিরে দেবে না দেখা?
আমার ভুবনে যত ফুল ফোটে রেখে তব রাঙা পায়
ফাগুনের হাওয়া উত্তর নাহি পেয়ে কেঁদে চলে যায়।
হে প্রিয় মোর নয়নের জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে আসে,
ঘুম আসে না গো, বসে থাকি রাতে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে।
বুঝি বলিতে পারো না লাজে
মোর ভালোবাসা ভালো লাগে নাকো বেদনার মতো বাজে!

কহ সেই কথা কহ,
কেন বেদনার বোঝা বহ তুমি কেন আপনারে দহ?
আমি জানি মোর নিয়তির লেখা,—তবু সেই কথা বলো
'ভিখারি, ভিক্ষা পেয়েছ, তোমার যাবার সময় হলো!'

মুষ্টি-ভিক্ষা চাহিয়া ভিখারি দৃষ্টি-প্রসাদ পায়,
উৎপাত সম তবু আসে, তারে ক্ষমা করো করুণায়!
কেন অপমান সহি নেমে আসি বিরহ-যমুনা-তীরে।
—রাগ করিও না, হয়তো চিনিতে পারোনি এ ভিখারিরে!
কী চেয়েছিনু, হয়তো বুঝিতে পারোনিক তুমি হায়,
তোমারে চাহিতে আসিনি, আমারে দিতে এসেছিনু পায়!
আমি বলেছিনু, 'আমারে ভিক্ষা লইয়া বাঁচাও মোরে,
তুমি তা জানো না, কত কাল আছি ভিক্ষাপাত্র ধরে।'
আমি বলেছিনু, 'ধরায় যখন চলিবে যে পথ দিয়া,
চরণ রেখো গো, সেই পথে আমি বুক পেতে দেবো প্রিয়া!
তোমার চরণে দেখেছি যে বেদ-গানের নূপুর-পরা,
কত কাঁটা কত ধুলি ও পঙ্ক পৃথিবীর পথ ভরা
তাই শিব সম, হে শক্তি মম, তব পথে পড়ে থাকি,
তাই সাধ যায় গঙ্গার মতো জটায় লুকায়ে রাখি!'

চির-পবিত্র অমৃতময়ী, বলো কোন্ অভিমানে
তোমার পরম-সুন্দরে ফেলি যাও শ্মশানের পানে?
আপন মায়ায় পরম শ্রীমতী চেনো নাকো আপনারে,
কহিলে না কথা, নামায়ে আমায় প্রেম-যমুনার পারে।
আমি যা জানি না, তুমি তাহা জানো ভালো,
তুমি না কহিলে কথা, নিভে যায় বৃন্দাবনের আলো!
বক্ষ হইতে চরণ টানিয়া লইলে, ভিক্ষু শিব
মহারুদ্রের রূপে সংহার করিবে এ ত্রিদিব।

রহিবে না আর প্রিয়-ঘন মোর নওল কিশোর রূপ,
মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে দেখিবে শ্মশান-স্তূপ!
হে নিরুক্তা, সেদিন হয়তো শূন্য পরম ব্যোমে
শুনাতে চাহিবে তোমার না-বলা কথা তব প্রিয়তমে।
আসিবে কি তুমি বেণুকা হইয়া সেদিন অধরে মম?
এই বিরহের প্রলয়ের পারে।
কোন্ অনাগত আরেক দ্বাপরে
লজ্জা ভুলিয়া কণ্ঠ জড়ায়ে কহিবে কি—'প্রিয়তম!'

সে যে আমি

ওগো দুরন্ত সুন্দর মোর ! কার পরে রাগ করি
তারার মুক্তা-মালিকা ছিঁড়িয়া ছড়ালে গগন ভরি ?
কারে তুমি ভালোবাসো প্রিয়তম ? কার নাহি পেয়ে দেখা
চাঁদের কপোলে মাখাইয়া দিলে কালো কলঙ্ক-লেখা ?
কার অনুরাগ নাহি পেয়ে তুমি লাল হয়ে ওঠো রাগে ?
প্রভাত-সূর্যে, সৃষ্টিতে সেই রাগের বহ্নি লাগে।
কাহার বিরহ-জ্বালায় জ্বালাও বিশ্ব, পরম স্বামী ?
সে কি আমি ? সে কি আমি ?

বনে উপবনে কুঞ্জে ফোটাও চামেলি চম্পা হেনা,
ওগো সুন্দর, ফুল ফুটাইয়া মালা কেন গাঁথিলে না ?
শ্রাবণ-গগনে মেঘ-রূপে ওঠে তব রোদনের ঢেউ,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া ক্ষীণ হলো তনু, ভালোবাসিল না কেউ ?
ওগো অভিমানী ! বলো, কেন কোন নির্দয় অভিমানে
সৃষ্টিতে দিয়া জীবন, আবার টানিছ মৃত্যু-টানে ?
গড়িয়া নিমেষে ভেঙে ফেলো রূপ, যেন ভালো নাহি লাগে
রূপের এ খেলা। কোন্ অপরূপা স্মৃতিতে তোমার জাগে।
তাহারি লাগিয়া জাগিয়া রয়েছ উদাসীন দিবাযামী,
সে কি আমি ? সে কি আমি ?

ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমে বসালে ভূতের মেলা,
ভূত নিয়ে একি অদ্ভুত খেলা, কে হানিয়াছে হেলা ?
মাধবিলতার কাঁকন পরায়ে সহকার-তরু-শাখে
রুদ্র ঝড়ের রূপে এসে তুমি কেন ছিঁড়ে ফেল তাকে ?
তোমার প্রেমের রাখি কে নিল না, কে সেই গরবিনী ?
আজো সৃষ্টির পিত্রালয়ে কি কাঁদে সেই বিরহিণী ?
তাই কি যেখানে মিলন,সেখানে নিত্য বিরহ আনো ?
আপন প্রিয়ারে পেলে না বলিয়া সবার প্রিয়ারে টানো ?
কার কামনার সৃষ্টিতে তব রূপচঞ্চল কামী ?
সে কি আমি ? সে কি আমি ?

কাহারে ভুলাতে ঝরো অনন্ত পরম-শ্রীর রূপে,
তোমারি গুণের কথা কি ভ্রমর ফুলে কয় চুপে চুপে ?

মুহু মুহু উহু উহু উহু করে ওঠ কুহুর কণ্ঠস্বরে
তোমারি কাছে কি শিখিয়া পাপিয়া পিয়া পিয়া রব করে?
পদ্ম-পাতার থালায় তোমার নিবেদিত ফুলগুলি
ঝরে ঝরে পড়ে অশ্রু-সায়রে, কেহ লইল না তুলি!
যাহার লাগিয়া ফুলের বক্ষে সঞ্চিত করো মধু,
সকলে সে মধু লইল, নিল না তোমারই মালিনী বধূ?
যে অপরূপারে খোঁজ অনন্তকাল রূপে রূপে নামি—
সে কি আমি? সে কি আমি?

সংহারে খোঁজো, সৃষ্টিতে খোঁজো, খোঁজো নিত্য স্থিতিতে,
যাহারে খুঁজিছ পরম বিরহে, খুঁজিছ পরম প্রীতিতে,
যে অপরূপা পূর্ণা হইয়া আজিও এল না বাহিরে
পাইয়া যাহারে বলিছ, এ নয়, হেথা নয় সে তো নাহি রে!
সেই কুণ্ঠিতা গুণ্ঠিতা তব চির-সঙ্গিনী বালিকা
অনন্ত প্রেমরূপে অনন্ত ভুবনে গাঁথিছে মালিকা।
ভীরু সে কিশোরী তব অন্তরে অন্তরতম কোণে
হারাবার ভয়ে তোমারে, লুকায়ে রহে সদা নিরজনে।
সকলেরে দেখো, আপনারে শুধু দেখো না, পরম উদাসীন,
দেখিলে, দেখিতে যেখানে তুমি, সেইখানে সে যে আছে লীন!
যত কাঁদে, তত বুকে বাঁধে তোমারেই অন্তর্যামী!
সে কি আমি? সে কি আমি?

ওগো প্রিয়তম! যত ধরি আমি দুহাতে তোমারে জড়ায়ে
আমারে খুঁজিতে আমাদেরই তত সৃষ্টিতে দাও ছড়ায়ে।
আমারে যতই প্রকাশিতে চাহ বাহিরে ভুবনে আনিয়া,
ততই লুকাইতে চাহি; আজিও যে আমি অপূর্ণা জানিয়া।
হে মোর পরম মনোহর! তব প্রিয়া বলে দিতে পরিচয়,
ক্ষমা করো, যদি অপূর্ণা এই বালিকার মনে জাগে ভয়!
আমার কলহ মান-অভিমান তোমার সহিত গোপনে,
জাগ্রত দিনে আজো লাজ লাগে, তাই মিলি আমি স্বপনে।
ওগো ও পরম নিলাজ, পরম নিরাবরণ, হে চঞ্চল,
আমারে ধরিতে, টানিয়া চলেছ সৃষ্টিতে মোর অঞ্চল।
আমারে কাঁদাতে সকলের সাথে দেখাও মিলন-অভিনয়,
বাহিরে এনো না, কাঁদিব বক্ষে, রেখো এ মিনতি প্রেমময়।
যদি ভালো তুমি বাসো অপরেরে, পর-পুরুষ সুন্দর,
আমি আছি, আমি রবো চিরকাল জুড়িয়া তোমার অন্তর।

আমি যে তোমার শক্তি হে প্রিয়, প্রকাশ বহির্জগতে,
আমারে না পেয়ে দুঃখের রূপে কাঁদিছে স্বর্গে-মরতে।
কলঙ্ক দিয়া আমার ধর্মে কলঙ্কী নাম নিলে হে,
দুই হয়ে তব রটে অপযশ, একাকী তো বেশ ছিলে হে।
তব সুন্দর—ছায়া মায়া রচে, মায়াতীত হয়ে তাহাতে—
কেন আসক্ত হলে তুমি, তারে জড়ায়ে ধরিলে বাঁ হাতে?
রূপ নাই, তবু রূপের তৃষ্ণা কেন তব বুকে জাগে,
এত রূপ-রসে ঝরিয়া পড়িছ বলো কার অনুরাগে?
খেলা-শেষে মহা প্রলয়ের বেলা আমার দুয়ারে থামি
জানাবে পরম-পতি আমারে কি—
আমি, প্রিয়, সে যে আমি!

অভেদম্

দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে, গড়িছে যে এই রূপ?
রূপে রূপে হয় রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ!
কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কায়া
লুকাতে আপন মাধুরী যে-জন কেবলি রচিছে মায়া!
সেই বহুরূপী পরম একাকী এই সৃষ্টির মাঝে
নিষ্কাম হয়ে কিরূপে সতত রত অনন্ত কাজে।
পরম নিত্য হয়ে অনিত্য রূপ নিয়ে এই খেলা
বালুকার ঘর গড়িছে ভাঙিছে সকাল-সন্ধ্যাবেলা।
আমরা সকলে খেলি তারই সাথে, তারই সাথে হাসি কাঁদি
তারই ইঙ্গিতে 'পরম-আমি'রে শত বন্ধনে বাঁধি।
মোরে 'আমি' ভেবে তারে স্বামী বলি দিবাযামী নামি উঠি,
কভু দেখি—আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভু বলে ছুটি।

একাকী হইয়া একা একা খেলি, চুপ করে বসে থাকি।
ভালো নাহি লাগে, কেন সাধ জাগে খেলুড়িরে কাছে ডাকি!
সৃষ্টি-ঘুড়ির উড়াই শূন্যে, আনন্দে প্রাণ নাচে,
দেখি সে লাটাই লুটায়ে পড়েছে কখন পায়ের কাছে।
বীজ রূপে রই—নিজ রূপ কই? খুঁজিতে সহসা দেখি
সেই বীজ-আমি মহাতরু হয়ে ছড়ায়ে পড়েছি—এ কি!

শাখা-প্রশাখায় পল্লবে ফুলে ফলে মূলে কত রূপে
কখন আমারে বিকশিত করি খেলিতেছি চুপে চুপে!
কত সে বিহগ-বিহগী আসিয়া বেঁধেছে আমাতে নীড়,
ঊর্ধ্বে নিম্নে কত অনন্ত আলো আঁধারের ভিড়।
অনন্ত দিকে অনন্ত শাখা, অনন্ত রূপ ধরি
উদ্ভিদ জড় জীব হয়ে আমি ফিরিতেছি সঞ্চরি।

চির-আনমনা উদাসীন, তাই নিজ সৃষ্টিরই মাঝে
হেরি কত শত ছন্দপতন অপূর্ণতা বিরাজে।
চমকি উঠিয়া সংহার করি আপনার সেই ভুল,
সেই ভুল দিয়া নতুন করিয়া ফুটাই সৃষ্টি-ফুল।
মৃত্যু কেমন লাগে মোর কাছে, শোনো সে বাণী অভয়,
আঁখির পলক পড়িলে যেমন ক্ষণিক সৃষ্টি লয়,
একটি পলক আঁধার হেরিয়া আবার সৃষ্টি হেরি,
মৃত্যুর পরে জীবন আসিতে ততটুকু হয় দেরি!
মৃত্যুর ভয়ে ভীত যারা, হয় তাদেরই নরক ভোগ,
অমৃতে সেই ডুবে আছে, যার নিত্য আত্মা-যোগ!
মোরই আনন্দ সৃষ্টি করিছে স্ত্রী পুত্র আদি,
কেবলি মিলন লাগে নাকো ভালো, বিরহ রচিয়া কাঁদি।

কেবল শান্তি শ্রান্তি আনিলে নিজে অশান্তি আনি,
ভুলিয়া স্বরূপ ঠুলি পরে টানি শত কর্মের ঘানি।
রুদ্রের রূপে সংহার করি, প্রেমময় রূপে কাঁদি,
যারে 'তুমি' বলো, সেই 'আমি' খুঁজি নিজের অন্ত আদি।
সংসারে আসি সং সেজে আমি—শত প্রিয়জন লয়ে,
আপনারে ভোগ করিতে জন্মি বিপুল তৃষ্ণা হয়ে।
যত ভোগ করি তত আপনার তৃষ্ণার পিয়ালায়!
বন্ধু! কেমনে মিটিবে তৃষ্ণা পূর্ণেরে নাহি পেলে,
আমি যে নিজেই অপূর্ণ-রূপে এসেছি পূর্ণে ফেলে!
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার—এই তিন রূপই যাঁর লীলা,
সেই সাগরের আমি যে ঊর্মি, বিরহিণী ঊর্মিলা!

দুখ-শোক-ব্যাধি নিজে লই সাধি,—কখনো অত্যাচারী—
অসুর সাজিয়া কেড়ে খাই—পুন দেবতা সাজিয়া মারি!
বিদ্বেষ নাই, আসক্তিহীন শুধু সে খেলার ঝোঁকে।
অসাম্য করি সৃজন—আবার সংহার করি ওকে।

খেলিতে খেলিতে সহসা চকিতে দেখি আপনারই কায়া
শ্রী ও সামঞ্জস্য-বিহীন একি কুৎসিত ছায়া !
সেই কুৎসিত শ্রীহীন অসুরে তখনি বধিতে চাই,
মোর বিদ্রোহ সাম্য-সৃষ্টি—নাই সেথা ভেদ নাই।
নাই সেথা যশ তৃষ্ণার লোভ, নাই বিরোধের ক্লেদ,
নাই সেথা মোর হিংসার ভয়, নাই সেথা কোনো ভেদ,
নাই অহিংসা হিংসা সেখানে কেবল পরম শাম,
রাজনীতি নাই, কোনো ভীতি নাই, 'অভেদম্' তার নাম।

অভয়-সুন্দর

কুৎসিত যাহা, অসাম্য যাহা সুন্দর ধরণীতে—
হে পরম সুন্দরের পূজারী ! হবে তাহা বিনাশিতে।
তব প্রোজ্জ্বল প্রাণের বহ্নি-শিখায় দহিতে তারে
যৌবন ঐশ্বর্য শক্তি লয়ে আসে বারেবারে।
যৌবনের এ ধর্ম, বন্ধু, সংহার করি জরা
অজর অমর করিয়া রাখে এ প্রাচীনা বসুন্ধরা।
যৌবনের সে ধর্ম হারায়ে বিধর্মী তরুণেরা—
হেরিতেছি আজ ভারতে—রয়েছে জরার শকুনে ঘেরা।

যুগে যুগে জরাগ্রস্ত যযাতি তারি পুত্রের কাছে
আপন বিলাস ভোগের লাগিয়া যৌবন তার যাচে।
যৌবনে করি বাহন তাহার জরা চলে রাজ-পথে
হাসিছে বৃদ্ধ যুবক সাজিয়া যৌবন-শক্তি-রথে।
জ্ঞান-বৃদ্ধের দন্ত-বিহীন বৈদান্তিক হাসি
দেখিছ তোমরা পরমানন্দে—আমি আঁখি-জলে ভাসি।
মহাশক্তির প্রসাদ পাইয়া চিনিলে না হায় তারে
শিবের স্কন্ধে শব চড়াইয়া ফিরিতেছ দ্বারে দ্বারে।

এই কি তরুণ ? অরুণে ঢাকিবে বৃদ্ধের ছেঁড়া কাঁথা
এই তরুণের বুকে কি পরম-শক্তি-আসন পাতা ?
ধূর্ত বুদ্ধি-জীবীর কাছে কি শক্তি মানিবে হার ?
ক্ষুদ্র রুধিবে ভোলানাথ শিব মহারুদ্রের দ্বার ?

ঐরাবতেরে চালায় মাহুত শুধু বুদ্ধির ছলে—
হে তরুণ, তুমি জানো কী হস্তী-মুর্খ কাহারে বলে?
অপরিমাণ শক্তি লইয়া ভাবিছ শক্তি-হীন—
জরারে সেবিয়া লভিতেছ জরা, হইতেছ আয়ু-ক্ষীণ।

পেয়ে ভগবদ্-শক্তি যাহারা চিনিতে পারে না তারে
তাহাদের গতি চিরদিন ঐ তমসার কারাগারে।
কোন্ লোভে, কোন্ মোহে তোমাদের এই নিম্ন গতি?
চাকুরির মায়া হরিল কি তব এই ভগবদ-জ্যোতি?
সংসারে আজো প্রবেশ করোনি, তবু সংসার-মায়া
গ্রাস করিয়াছে তোমার শক্তি তোমার বিপুল কায়া।
শক্তি ভিক্ষা করিবে যাহারা ভোট-ভিক্ষুক তারা!
চেনো কি—সূর্য-জ্যোতিরে লইয়া উনুন করেছে যারা?

চাকুরি করিয়া পিতামাতাদের সুখী করিতে কি চাহ?
তাই হইয়াছে নুড়ো মুখ যত বুড়োর তলপি বাহ?
চাকর হইয়া বংশের তুমি করিবে মুখোজ্জ্বল?
অন্তরে পেয়ে অমৃত, অন্ধ, মাগিতেছ হলাহল!
হউক সে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কি মন্ত্রী কমিশনার—
স্বর্ণের গলা-বন্ধ পরুক—সারমেয় নাম তার!
দাস হইবার সাধনা যাহার নহে সে তরুণ নহে—
যৌবন শুধু মুখোশ তাহার—ভিতরে জরারে বহে।

'নাকের বদলে নরুন'-চাওয়া এ তরুণেরে নাহি চাই—
আজাদ মুক্ত-স্বাধীন চিত্ত যুবাদের গান গাই।
হোক সে পথের ভিখারি, সুবিধা-শিকারি নহে যে যুবা
তারি জয়-গাথা গেয়ে যায় চিরদিন মোর দিলরুবা।
তাহারি চরণ-ধূলিরে পরম প্রসাদ বলিয়া মানি
শক্তি-সাধক তাহারেই আমি বন্দি যুক্ত-পাণি।
মহা-ভিক্ষু তাহাদেরি লাগি তপস্যা করি আজো
তাদেরই লাগি হাঁকি নিশিদিন—'বাজো রে শিঙ্গা বাজো!'

সমাধির গিরি-গহ্বরে বসি তাহাদেরই পথ চাহি—
তাহাদেরই আভাস পেলে মনে হয় পাইলাম বাদশাহি!
মোর সমাধির পাশে এলে কেউ, ঢেউ ওঠে মোর বুকে—
'মোর চির-চাওয়া বন্ধু এলে কি' বলে চাহি তার মুখে।

জ্যোতি আছে, হায় গতি নাই হেরি তার মুখ পানে চেয়ে—
কবরে 'সবর' করিয়া আমার দিন যায় গান গেয়ে!
কারে চাই আমি কী যে চাই হায় বুঝে না উহারা কেহ।
দেহ দিতে চায় দেশের লাগিয়া, মন টানে তার গেহ।

কোথা গৃহ-হারা, স্নেহ-হারা ওরে ছন্নছাড়ার দল—
যাদের কাঁদনে খোদার আরশ কেঁপে ওঠে টলমল।
পিছন চাওয়ার নাহি যার কেউ, নাই পিতামাতা জ্ঞাতি
তারা তো আসে না জ্বালাইতে মোর আঁধার কবরে বাতি
আঁধারে থাকিয়া, বন্ধু, দিব্য দৃষ্টি গিয়াছে খুলে
আমি দেখিয়াছি তোমাদের বুকে ভয়ের যে ছায়া দুলে।
তোমরা ভাবিছ—আমি বাহিরিলে তোমরা ছুটিবে পিছে—
আপনাতে নাই বিশ্বাস যার—তাহার ভরসা মিছে!

আমি যদি মরি সুমুখ-সমরে—তবু যারা টলিবে না—
যুঝিবে আত্মশক্তির বলে তারাই অমর সেনা।
সেই সেনাদল সৃষ্টি যেদিন হইবে—সেদিন ভোরে
মোমের প্রদীপ নহে গো—অরুণ সূর্য দেখিব গোরে।
প্রতীক্ষা-রত শান্ত অটল ধৈর্য লইয়া আমি
সেই যে পরম ক্ষণের লাগিয়া জেগে আছি দিবা-যামী।
ভয়কে যাহারা ভুলিয়াছে—সেই অভয় তরুণ দল
আসিবে যেদিন—হাঁকিব সেদিন—'সময় হয়েছে, চল্!'

আমি গেলে যারা আমার পতাকা ধরিবে বিপুল বলে—
সেই সে অগ্র-পথিকের দল এস এস পথ-তলে!
সেদিন মৌন সমাধি-মগ্ন ইস্রাফিলের বাঁশি
বাজিয়া উঠিবে—টুটিবে দেশের তমসা সর্বনাশী!

অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি

চরণারবিন্দে লহ অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি,
হে রবীন্দ্র, তব দীন ভক্ত এ কবির।
অশীতি-বার্ষিকী তব জনম-উৎসবে
আসিয়াছি নিবেদিতে নীরব প্রণাম!

হে কবি-সম্রাট, ওগো সৃষ্টির বিস্ময়,
হয়তো হইনি আজো করুণা-বঞ্চিত!
সঞ্চিত যে আছে আজো স্মৃতির দেউলে
তব স্নেহ করুণা তোমার, মহাকবি!
ধ্যান-শান্ত মৌন তব কাব্য-রবিলোকে
সহসা আসিনু আমি ধূমকেতু সম
রুদ্রের দুরন্ত দূত, ছিন্ন হর-জটা,
কক্ষচ্যুত উপগ্রহ! বক্ষে ধরি তুমি
ললাট চুমিয়া মোর দানিলে আশিস!
দেখেছিল যারা শুধু মোর উগ্ররূপ,
অশান্ত রোদন সেথা দেখিছিলে তুমি!
হে সুন্দর, বহ্নি-দগ্ধ মোর বুকে তাই
দিয়াছিলে 'বসন্তের' পুষ্পিত মালিকা!
একা তুমি জানিতে হে কবি মহাঋষি,
তোমারি বিচ্যুত-ছটা আমি ধূমকেতু!
আগুনের ফুলকি হলো ফাগুনের ফুল,
অগ্নি-বীণা হলো ব্রজ-কিশোরের বেণু।
শিব-শিরে শশিলেখা হল ধূমকেতু,
দাহ তার ঝরিল গো অশ্রু-গঙ্গা হয়ে।

বিশ্ব-কাব্যলোকে কবি, তব মহাদান
কত যে বিপুল, কত যে অপরিমাণ
বিচার করিতে আমি যাব না তাহার,
মৃৎভাণ্ড মাপিবে কি সাগরের জল?
যতদিন রবে রবি, রবে সৌর-লোক,
হে সুন্দর, ততদিন তব রশ্মিলেখা
দিব্য-জ্যোতি-পুষ্প গ্রহ-তারকার মতো
অসীম গগনে রবে নিত্য সমুজ্জ্বল!
ছন্দায়িত হবে ছন্দে সৃষ্টি যতদিন,
ছন্দ-ভারতীর পায়ে বাণীর নূপুর
ঝংকারিবে যতদিন বৃষ্টিধারাসম
ততদিন মধুচ্ছন্দা কবি, ছন্দ তব
লীলায়িত হবে মধুবতী-স্রোত সম!
বিহগের কণ্ঠে গীতি রবে যতদিন,
যতদিন রবে সুর, দখিনা পবনে,
হিল্লোলিত সিন্ধু-জলে ঝর্না তটিনীতে

বহিবে বিরহী-বুকে রোদন-প্রবাহ—
ততদিন তব গান তব সুর কবি
মর্মরিবে মরমীর মরমে মরমে !
মৌনা যদি কোনোদিন হয় বীণাপাণি
তব বীণা কবি কভু হবে না নীরব।
যেমন ছড়ান রশ্মি সূর্য-নারায়ণ
সেই রশ্মি রূপ নেয় শত শত রঙে
পল্লবে ও ফুলে ফলে জলে স্থলে ব্যোমে,
তেমনি দেখেছি আমি বিমুগ্ধ নয়নে
অপরূপ রাগ-রেখা তোমার লেখায়,—
মুরছিত হইয়াছে আবেশে এ তনু।

দেখেছি তোমারে যবে হইয়াছে মনে
তুমি চিরসুন্দরের পরম বিলাস !
মানুষ এ পৃথিবীতে অন্তরে বাহিরে
কত সে উদার কত নির্মল মধুর
কত প্রিয়-ঘন প্রেম-রস-সিক্ত তনু
কত সে সুন্দর হতে পারে সর্বরূপে
তাই প্রকাশের তরে পরম সুন্দর
বিগ্রহ তোমার গড়েছিল ওগো কবি !
যখনি কবিতা তব পড়িয়াছি আমি
তার আস্বাদনে যেন হয়ে গেছি লয়,
রস পান করে আমি হয়ে গেছি রস,
বলিতে পারি না তাই সে রস কেমন।
তোমারে দেখিতে গিয়া দেখিয়াছি আমি
বক্ষে তব চির-রূপ-রস-বিলাসীরে !
হারায়ে ফেলেছি সেথা সত্তা আপনার
কাঁদিয়াছি রূপমুগ্ধা রাধিকার মতো।
হে কবি, আজিও শুনি সে চির-কিশোর
তোমার বেণুতে গাহে যৌবনের গান।
সেথা তুমি কবি নও, ঋষি নহ তুমি,
সেথা তুমি মোর প্রিয় পরম সুন্দর।

শুনি আজো কত শত পাথরের ঢেলা
তোমারে নিষ্ঠুর বলে, বলে—প্রেম নাই।
মেঘের হুংকার শুধু শুনিল তাহারা,
দেখিল না রসধারা, দেখিল বিদ্যুৎ !

এ বিশ্বে অনন্ত রস ঝরে অনুক্ষণ
কত জন পাইয়াছে সে রসের স্বাদ ?
সেই রসে তরুলতা হয় ফুলময়,
পাথরের নুড়ি বলে, পৃথিবী নীরস।

হে প্রেম সুন্দর মম, আমি নাহি জানি
কে কত পেয়েছে তব প্রেম-রস-ধারা।
আমি জানি, তব প্রেম আমার আগুন
নিভায়ে, দিয়াছে সেথা কান্তি অপরূপ !
মনে পড়ে ? বলেছিলে হেসে একদিন,
'তরবারি দিয়ে তুমি চাঁছিতেছ দাড়ি !
যে জ্যোতি করিতে পারে জ্যোতির্ময় ধরা
সে জ্যোতিরে অগ্নি করি হলে পুচ্ছ-কেতু ?'
হাসিয়া কহিলে পরে, 'এই যশ-খ্যাতি
মাতালের নিত্য সান্ধ্য নেশার মতন।
এ মজা না পেলে মন ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করে
মধু-র ভৃঙ্গারে কেন করো মদ্যপান ?'

যে বহ্নি-তরঙ্গ উঠেছিল মোর মাঝে
তোমার পরশে তাহা হলো চন্দ্র-জ্যোতি।
মনে হলো তুমি সেই নওলকিশোর
ঐশ্বর্য কাড়িয়া যিনি দেন শুধু রস।
যাঁহার বেণুর সুরে আঁখির পলকে
প্রেম বিগলিত হয় স্বর্ণ-বৃন্দাবন।

হে রস-শেখর কবি, তব জন্মদিনে
আমি কয়ে যাব মোর নব জন্ম-কথা !
আনন্দ-সুন্দর তব মধুর পরশে
অগ্নি-গিরি গিরি-মল্লিকার ফুলে ফুলে
ছেয়ে গেছে ! জুড়ায়েছে সব দাহজ্বালা !
আমার হাতের সেই খর তরবারি
হইয়াছে খরতর যমুনার বারি !
দ্রষ্টা তুমি দেখিতেছ আমাতে যে জ্যোতি
সে জ্যোতি হয়েছে লীন কৃষ্ণ-ঘন-রূপে !
অভিনন্দনের মদ চন্দনিত মধু।
হইয়াছে, হে সুন্দর, তব আশীর্বাদে !

আজ আমি ভুলে গেছি আমি ছিনু কবি,
ফুটেছি কমল হয়ে তব করে রবি!
প্রস্ফুটিত সে কমল তব জন্মদিনে
সমর্পিনু শ্রীচরণে, লহ কৃপা করি।
জানি না জীবনে মোর এই শুভদিন
আবার আসিবে ফিরে কবে কোন্ লোকে!
আমি জানি মোর আগে রবি নিভিবে না
তার আগে ঝরে যেন যাই শতদল!

কিশোর রবি

হে চির-কিশোর কবি রবীন্দ্র, কোন্ রসলোক হতে
আনন্দ-বেণু হাতে লয়ে এলে খেলিতে ধূলির পথে?
কোন্ সে রাখাল রাজার লক্ষ ধেনু তুমি চুরি করে
বিলাইয়া দিলে রস-তৃষাতুরা পৃথিবীর ঘরে ঘরে।
কত যে কথায় কাহিনীতে গানে সুরে কবিতায় তব
সেই আনন্দ-গোলোকের ধেনু রূপ নিল অভিনব।
ভুলাইলে জরা, ভুলালে মৃত্যু, অসুন্দরের ভয়
শিখালে পরম সুন্দর চির-কিশোর সে প্রেমময়।
নিত্য কিশোর আত্মার তুমি অন্ধ বিবর হতে
হে অভয়দাতা টানিয়া আনিলে দিব্য আলোর পথে।

তোমার এ রস পান করিবার অধিকার পেল যারা
তারাই কিশোর, তোমাতে দেখেছে নিত্য কিশোরে তারা
ওগো ও-পরম কিশোরের সখা, জানি তুমি দিতে পারো
নিত্য অভয়, অনন্ত শ্রী, দিব্য শক্তি আরো।
কোথা সে কৃপণ বিধাতার মধু-রস ভাণ্ডার আছে
তুমি জানো তাহা, তাহার গোপন চাবি আছে তব কাছে।
ওগো ও-পরম শক্তিমানের জ্যোতির্দীপ্ত রবি
সেই বিধাতার ভাণ্ডার লুটে দিয়ে যাও হেথা সবই।
যারা জড়, যারা নুড়ির মতো নিত্য রস-প্রবাহে
ডুবিয়া থেকেও পাইল না রস, তারা তব কৃপা চাহে।
এই ক্ষুধাতুর, উপবাসী চির-নিপীড়িত জনগণে
ক্লৈব্য ভীতির গুহা হতে আনো আনন্দ-নন্দনে।

ঊর্ধ্বের যারা তাহারা পাইল তোমার পরম দান
নিম্নের যারা, তাদের এবার করো গো পরিত্রাণ।
মরে আছে যারা তারা আজ তব অমৃত নাহি পায়।
তোমার রুদ্র আঘাতে এদের ঘুম যেন টুটে যায়।
শুধু বেণু আর বীণা লয়ে তুমি আসো নাই ধরা 'পরে
দেখেছি শঙ্খ চক্র বিষাণ বজ্র তোমার করে।

ওগো ও-পরম রুদ্র কিশোর! তোমার যাবার আগে
নির্জিত নিদ্রিত এ ভারত যেন গো বহ্নিরাগে
রঞ্জিত হয়ে ওঠে। অসুরের ভীতি যেন চলে যায়।
ওগো সংহার-সুন্দর, পরো প্রলয়-নূপুর পায়!
তোমার যে মহাশক্তি কেবল জ্ঞান-বিলাসীর ঘরে
অনন্ত রূপে রসে আনন্দে নিত্য পড়িছে ঝরে,
গৃহহীন অগণন ভিক্ষুক ক্ষুধাতুর তব দ্বারে
ভিক্ষা চাহিছে, দয়া করো দয়া করো বলি বারেবারে।
বিলাসীর তরে দিয়াছ অনেক, হে কিশোর-সুন্দর,
এবার পঙ্গু-অঙ্গে পরশ করুক তোমার কর।
জানি জানি তব দক্ষিণ করে অনন্ত শ্রী আছে,
দক্ষিণা দাও বলে তাই ওরা এসেছে তোমার কাছে।

হে রবি, তোমারে নারায়ণরূপে এ ভারত পূজা করে,
যাইবার আগে, জাগাইয়া তুমি যাও সেই রূপ ধরে।
দৈন্য-মুক্ত ব্রজের রাখাল কিশোরেরা ভয়হীন,
খেলুক সর্ব-অভাব-মুক্ত হয়ে ব্রজে নিশিদিন।
হউক শান্তিনিকেতন এই অশান্তিময় ধরা,
চিরতরে দূর হোক তব ঘরে নিরাশা-ক্লৈব্য-জরা।

কেন জাগাইলি তোরা

কেন ডাক দিলি আমারে অকালে কেন জাগাইলি তোরা?
এখনো অরুণ হয়নি উদয়, তিমিররাত্রি ঘোরা!
কেন জাগাইলি তোরা?

যে আশ্বাসের বাণী শুনাইয়া পড়েছিনু ঘুমাইয়া
বনস্পতি হইয়া সে বীজ পড়েনি কি ছড়াইয়া—
দিগ–দিগন্তে প্রসারিত শাখা ? বাঁধেনি সেথায় নীড়,
প্রাণচঞ্চল বিহগের দল করেনি সেথায় ভিড় ?
যেখানে ছিল রে যত বন্ধন যত বাধা ভয়–ভীতি
সেখানে তোদেরে লইয়া যে আমি আঘাত হেনেছি নিতি।
ভাঙিতে পারিনি, খুলিতে পারিনি দুয়ার, তবুও জানি—
সেই জড়ত্ব ভরা কারাগারে ভীষণ আঘাত হানি—
ভিত্তি তাহার টলায়ে দিয়েছি, —আশা ছিল মোর মনে
অনাগত তোরা ভাঙিবি তাহারে সে কোন্ শুভক্ষণে।

মহাসমাধির দিকহারা লোকে জানি না কোথায় ছিনু
আমারে খুঁজিতে সহসা কোন্ শক্তিরে পরশিনু—
সেই সে পরম শক্তিরে লয়ে আসিবার ছিল সাধ—
যে শক্তি লভি এল দুনিয়ার প্রথম ঈদের চাঁদ—
তারি মাঝে কেন ঢাক–ঢোল লয়ে এলি সমাধির পাশে
ভাঙাইলি ঘুম ? চাঁদ যে এখনো ওঠেনি নীল আকাশে।
ওরে তোরা থাম ! শক্তি কাহারো নহে রে ইচ্ছাধীন—
রাত না পোহাতে চিৎকার করি আনিবি কি তোরা দিন ?
এতদিন মার খেয়েছিস তোরা—তবুও আছিস বেঁচে,
মারের যাতনা ভুলিবি কি তায় ঢাক ঢোল নিয়ে নেচে ?

সূর্য–উদয় দেখেছিস কেউ—শান্ত প্রভাতবেলা ?
উদার নীরব উদয় তাহার—নাই মাতামাতি খেলা ;
তত শান্ত সে—যত সে তাহার বিপুল অভ্যুদয়,
তত সে পরম মৌনী যত সে পেয়েছে পরম অভয় !
দিকহারা ঐ আকাশের পানে দেখ দেখ তোরা চেয়ে,
কেমন শান্ত ধ্রুব হয়ে আছে কোটি গ্রহ তারা পেয়ে।
ঐ আকাশের প্রসাদে যে তোরা পাস বৃষ্টির জল
ঐ আকাশেই ওঠে ধ্রুবতারা ভাস্কর নির্মল।
ঐ আকাশেই ঝড় ওঠে—তবু শান্ত সে চিরদিন—
ঐ আকাশের বুক চিরে আসে—বজ্র কুণ্ঠাহীন !
ঐ আকাশেই তক্‌বির ওঠে—মহাআজানের ধ্বনি
ঐ আকাশের পারে বাজে চির অভয়ের খঞ্জনী।
জানি ওরে মোর প্রিয়তম সখা বন্ধু তরুণ দল
তোদেরই ডাকে যে আসন আমার টলিতেছে টলমল !

তোদেরই ডাকে যে নামিছে পরম শক্তি, পরম জ্যোতি,
পরমামৃতে পূর্ণ হইবে মহাশূন্যের ক্ষতি।

'মাহে রমজান' এসেছে যখন, আসিবে 'শবে কদর',
নামিবে তাঁহারা রহমত এই ধূলির ধরার 'পর।
এই উপবাসী আত্মা—এই যে উপবাসী জনগণ,
চিরকাল রোজা রাখিবে না—আসে শুভ 'এফতার' ক্ষণ!
আমি দেখিয়াছি—আসিছে তোদের উৎসব-ঈদ-চাঁদ,—
ওরে উপবাসী ডাক তাঁরে ডাক, তাঁর নাম লয়ে কাঁদ।
আমি নয় ওরে আমি নয়—'তিনি' যদি চান ওরে তবে
সূর্য উঠিবে, আমার সহিত সবার প্রভাত হবে।

দুর্বার যৌবন

ওরে অশান্ত দুর্বার যৌবন।
পরাল কে তোরে জ্ঞানের মুখোশ সংযম-আবরণ।
ভিতরের ভীতি ঢাকিতে রে যত নীতি-বিলাসীরা ছলে
উদ্ধত যৌবন-শক্তিরে সংযত হতে বলে।
ভাবে, ভাঙনের গদা লয়ে যদি যৌবন মাতে রণে,
গুড়ুক টানিতে পারিবে না বসে সোনার সিংহাসনে!
ওরে দুরন্ত! উড়ন্ত তোর পাখা কে বাঁধিল বল?
দীপ্ত জ্যোতির্শিখায় ঢাকিল শীর্ণ জরাঞ্চল?
ওরে নির্ভীক! ভিখ-মাগা যত পঙ্গুর দলে ভিড়ে—
আঁধার নিঙাড়ি আলো আনিত যে—সে রহিল বাঁধা নীড়ে!
যাহাদের মেরুদণ্ডে লেগেছে মেরুর হিমেল হাওয়া
যাহাদের প্রাণ শক্তি-বিহীন কঠিন তুহিনে ছাওয়া
তাদের হুকুমে প্রাণের বিপুল বন্যা রাখিলি রুখে?
মরুর সিংহ মার খায় সার্কাসি পিঞ্জরে ঢুকে।

সৃষ্টির কথা ভাবে যারা আগে সংহারে করে ভয়,
যুগে যুগে সংহারে আঘাতে তাদের হয়েছে লয়।
কাঠ না পুড়ায়ে আগুন জ্বালাবে বলে কোন্ অজ্ঞান?
বনস্পতির ছায়া পাবে বীজ নাহি দিলে তার প্রাণ?

তলোয়ার রেখে খাপে এরা, ঘোড়া রাখিয়া আস্তাবলে
রণ-জয়ী হবে দন্ত-বিহীন বৈদান্তিকী ছলে !
প্রাণ-প্রবাহের প্রবল-বন্যা বেগে খর-স্রোতা নদী
ভেঙেছ দুকূল, সাথে সাথে ফুল ফুটায়েছে নিরবধি।
জলধির মহা তৃষ্ণা জাগিছে যে বিপুল নদী-স্রোতে,
সে কি দেখে, তার স্রোতে কে ডুবিল, কে মরিল তার পথে ?
মানে না বারণ, ভরা যৌবন-শক্তি-প্রবাহ ধায়
আনন্দ তার মরণ-ছন্দে কূলে কূলে উথলায়।
জানে না সে ঘর আত্মীয় পর, চলাই ধর্ম তার
দেখে না তাহার প্রাণতরঙ্গে ডুবিল তরণী কার।
বণিকের দুটো জাহাজ ডুবিবে, তা বলে সিন্ধু-ঢেউ
শান্ত হইয়া ঘুমায়ে রহিবে—শুনিয়াছ কভু কেউ !
ঐরাবত কি চলিবে না, পথে পিপীলিকা মরে বলে ?
ঘর পুড়ে বলে প্রবল বহ্নি-শিখা উঠিবে না জ্বলে ?
অঙ্ক কষে না, হিসাব করে না, বেহিসাবি যৌবন,
ভাঙা চাল দেখে নামিবে না কি রে শ্রাবণের বর্ষণ ?
যৌবন কেনা-বেচা হবে কি রে বানিয়ার নিক্তিতে ?
মুক্ত-আত্মা আজাদে ভোলাবে প্যাক্টের চুক্তিতে ?
তরু ভেঙে পড়ে তাই বলে ঝড় আসিবে না বৈশাখী !
ভীরু মেঘ-শিশু ভয় পায় বলে রবে না ঈগল পাখি ?

জ্ঞান ও শান্তি সংযম—বহু উর্ধ্বের কথা দাদা,
কহে নির্মল শান্তির কথা যার সারা গায়ে কাদা !
যে মহাশান্তি উদার-মুক্ত আকাশের তলে রহে,
কাম-ক্রোধ-লোভ-মত্ত জীবেরা আজ তারি কথা কহে।
অনন্ত দিক আকাশ যাহার সীমা খুঁজে নাহি পায়
এমন মুক্ত মানব দেখিলে শান্ত কহিও তায় ;
ওঠে তরঙ্গ অতি-প্রবল যে বিরাট সাগর-জলে
সেই উদ্বেল শক্তিরে তার অসংযমী কে বলে ?
ডোবায় খানায় কূপে ঢেউ নাই, শান্ত তারাই বুঝি ?
সংযমী বলে প্রতারক মোরা শুধু জড়তারে পূজি।

জাগো দুর্মদ যৌবন ! এসো, তুফান যেমন আসে,
সুমুখে যা পাবে দলে চলে যাবে অকারণ উল্লাসে।
আনো অনন্ত-বিস্তৃত প্রাণ, বিপুল প্রবাহ, গতি,
কূলের আবর্জনা ভেসে গেলে হবে না কাহারো ক্ষতি।

বুক ফুলাইয়া দুখেরে জড়াও, হাসো প্রাণ-খোলা হাসি,
স্বাধীনতা পরে হবে—আগে গাও আজা-ব-আজা'র বাঁশি।
বসিয়াছে যৌবন-রাজপাটে শ্রীহীন অকাল জরা,
মৃত্যুর বহু পূর্বে এ-জাতি হয়ে আছে যেন মরা !
খোলো অর্গল পাষাণের, খুশি বহুক অনর্গল,
ঝাঁক বেঁধে নীল আকাশে যেমন ওড়ে পারাবত দল।
সাগরে ঝাঁপায়ে পড়ো অকারণে, ওঠো দূর গিরি-চূড়ে
বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলে মৃত্যুরে !
ভোলো বাহিরের ভিতরের যত বদ্ধ সংস্কার
মরিচা ধরিয়া পড়ে আছে সব আলির জুল্‌ফিকার !
জাগো উন্মদ আনন্দে দুর্মদ তরুণেরা সবে,
নাইবা স্বাধীন হলো দেশ, মানবাত্মা মুক্ত হবে।

আর কতদিন?

আমার দিলের নিদ-মহলায় আর কতদিন, সাকি,
শারাব পিয়ায়ে, জাগায়ে রাখিবে, প্রীতম্ আসিবে নাকি ?
অপলক চোখে চাহি আকাশের ফিরোজা পর্দা-পানে,
গ্রহতারা মোর সেহেলিরা নিশি জাগে তার সন্ধানে।
চাঁদের চেরাগ ক্ষয় হয়ে এল ভোরের দর-দালানে,
পাতার জাফরি খুলিয়া গোলাপ চাহিছে গুলিস্তানে।
রবাবের সুরে অভাব তাহার বৃথাই ভুলিতে চাই,
মন যত বলে আশা নাই, হৃদে তত জাগে 'আশ্‌নাই'।
শিরাজি পিয়ায়ে শিরায় শিরায় কেবলি জাগাও নেশা,
নেশা যত লাগে অনুরাগে, বুকে তত জাগে আন্দেশা।

আমি ছিনু পথ-ভিখারিনী, তুমি কেন পথ ভুলাইলে,
মুসাফির-খানা ভুলায়ে আনিলে কোন্ এই মঞ্জিলে ?
মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপ তস্‌বির,
'তসবি'তে জপি যত তার নাম তত ঝরে আঁখি-নীর !
'তশবিহি' রূপ এই যদি তাঁর, 'তন্‌জিহি' কিবা হয়,
নামে যাঁর এত মধু ঝরে, তাঁর রূপ কত মধুময়।
কোটি তারকার কীলক রুদ্ধ অম্বর-দ্বার খুলে
মনে হয় তাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি দুলে উঠে কৌতূহলে।

ঘুম-নাহি-আসা নিঝঝুম নিশি-পবনের নিশ্বাসে
ফিরদৌস-আলা হতে লালা ফুলের সুরভি আসে।
চামেলি জুঁই-এর পাখায় কে যেন শিয়রে বাতাস করে,
শ্রান্তি ভুলাতে কী যেন পিয়ায় চম্পা-পেয়ালা ভরে!

শিস দেয় দধিয়াল বুলবুলি, চমকিয়া উঠি আমি,
ইঙ্গিতে বুঝি কামিনী-কুঞ্জে ডাকিলেন মোর স্বামী।
নহরের পানি লোনা হয়ে যায় আমার অশ্রু-জলে,
তসবির তাঁর জড়াইয়া ধরি বক্ষের অঞ্চলে!
সাকি গো! শারাব দাও, যদি মোর খারাব করিলে দীন,
'আল-ওদুদের' পিয়ালার দৌর চলুক বিরাম-হীন।
গেল জাতি কুল শরম ভরম যদি এসে এই পথে
চালাও শিরাজি, যেন নাহি জাগি আর এ বে-খুদী হতে
দূর গিরি হতে কে ডাকে, ওকি মোর কোহ্-ই-তুর ধারী?
আমারি মতো কি ওরি ডাকে মুসা হলো মরু-পথচারী?
উহারি পরম রূপ দেখে ঈসা হলো না কি সংসারী?
মদিনা-মোহন আহমদ্ ওরি লাগি কি চির-ভিখারি?
লাখো আউলিয়া দেউলিয়া হলো যাহার কাবা দেউলে,
কত রূপবতী যুবতী যাহার লাগি কালি দিল কুলে,
কেন সেই বহু-বিলাসীর প্রেমে, সাকি, মোরে মজাইলি,
প্রেম-নহরের কওসর বলে আমারে জহর দিলি?
জানো সাকি, কাল মাটির পৃথিবী এসেছিল মোর কাছে,
আমি শুধালাম, মোর প্রিয়তম, সে কি পৃথিবীতে আছে?
'খাক' বলিল, না, জানি না তো আমি, 'আব' বুঝি তাহা জানে,
জলেরে পুছিনু, তুমি কি দেখেছ মোর বঁধু কোন্খানে?
আমার বুকের তস্বির দেখে জল করে টলমল,
জল বলে, আমি এরই লাগি কাঁদি গলিয়া হয়েছি জল।
আগুন হয়তো তেজ দিয়া এরে বক্ষে রেখেছে ঘিরে,
সূর্যের ঘরে প্রবেশিনু আমি তেজ আবরণ ছিঁড়ে।
হেরিনু সূর্য সাত-ঘোড়া নিয়ে সাত আসমানে ছুটে,
সহসা বঁধুর তস্বির হেরে আমার বক্ষ-পুটে।
বলিল, কোথায় দেখেছে ইহারে, হইয়াছে পরিচয়?
ইহারি প্রেমের আগুনে জ্বলিয়া তনু হলো মোর ক্ষয়।
যুগযুগান্ত গেল কত তবু মিটিল না এই জ্বালা।
ইহারি প্রেমের জ্বালা মোর বুকে জ্বলে হয়ে তেজোমালা।

যেতে যেতে পথে দেখিনু বাতাস দীরঘ নিশাস ফেলি
খুঁজিতেছে কারে আকাশ জুড়িয়া নীল অঞ্চল মেলি।
মোর বুকে দেখে তস্‌বির এল ছুটিয়া ঝড়ের বেগে,
বলে—অনন্ত কাল ছুটে ফিরি দিকে দিকে এরি লেগে।
খুঁজিয়া স্থুল সূক্ষ্ম জগতে পাইনি ইহার দিশা,
তুমি কোথা পেলে আমার প্রিয়ের এই তস্‌বির-শিশা?
হাসিয়া উঠিনু ব্যোম-পথে, সেথা কেবল শব্দ ওঠে
অলখ-বাণীর পারাবারে যেন শত শতদল ওঠে
আমি কহিলাম, দেখেছ ইহারে হে অলক্ষ্য বাণী?
বাণীর সাগর অত অনন্ত হলো যেন কানাকানি!
'নাহি জানি নাহি জানি' বলে ওঠে অনন্ত ক্রন্দন,
বলে, হে বন্ধু, জানিলে টুটিত বাণীর এ বন্ধন।...
জ্যোতির মোতির মালা গলে দিয়া সহসা স্বর্ণরথে
কে যেন হাসিয়া ছুঁইয়া আমারে পলাল অলখ-পথে।

'ও কি জৈতুনি রওগন, ওরই পারে জলপাই-বনে
আমার পরম-একাকী বন্ধু খেলে কি গো নিরজনে?'
শুধানু তাহারে; নিষ্ঠুর মোর দিল নাকো উত্তর।
জাগিয়া দেখিনু, অঙ্গ আবেশে কাঁপিতেছে থরথর।...

জোহরা সেতারা উঠেছে কি পুবে? জেগে উঠেছে কি পাখি?
সুরাব্ সুরাহি ভেঙে ফেলো সাকি, আর নিশি নাই বাকি।
আসিব এবার আমার পরম বন্ধুর বোর্‌রাক
ঐ শোনো পুব-তোরণে তাহার রঙিন নীরব ডাক!

ওঠ্ রে চাষী

চাষি রে! তোর মুখের হাসি কই?
তোর গো-রাখা রাখালের হাতে বাঁশের বাঁশি কই?
তোর খালের ঘাটে পাট পচে ভাই পাহাড়-প্রমাণ হয়ে,
তোর মাঠের ধানে সোনা রঙের বান যেন যায় বয়ে,
সে পাট ওঠে কোন্ লাটে?
সে ধান ওঠে কোন্ হাটে?

উঠানে তোর শূন্য মরাই মরার মতন পড়ে—
স্বামী-হারা কন্যা যেন কাঁদছে বাপের ঘরে।
তোর গাঁয়ের মাঠে রবি-ফসল ছবির মতন লাগে,
তোর ছাওয়াল কেন খাওয়ার বেলা নুন লঙ্কা মাগে?
তোর তরকারিতেও সরকারি কোন্ ট্যাক্স বুঝি বসে।
তোর ইক্ষু এত মিষ্টি কি হয় চক্ষু-জলের রসে?
তোর গাইগুলোকে নিঙড়ে কারা দুধ খেয়েছে ভাই?
তোর দুধের ভাঁড়ে ভাতের মাড়ের ফেন—হায়, তাও নাই!

তোর ছোট খোকার জুড়িতেছে জ্বর ঘুমিয়ে গোরস্তানে,
সে দিদির আঁচল ধরে বুঝি গোরের পানে টানে।
বিকার ঘোরে দিদি তাহার ডাকছে ছোট ভায়ে,
দুধের বদল ঝিনুক দিয়ে আমানি দেয় মায়ে।
কবর দিয়ে সবর করে লাঙল নিয়ে কাঁধে,
মাঠের কাদা-পথে যেতে আব্বা তাহার কাঁদে।
চারদিকে তার মাঠ-ভরা ধান আকাশ-ভরা খুশি,
লাল হয়েছে দিগন্ত আজ বাছার রক্ত শুষি!
মাঠে মাঠে ধান থৈ থৈ, পণ্যে ভরা হাট,
ঘাটে ঘাটে নৌকা-বোঝাই তারই মাঠের পাট।

কে খায় এই মাঠের ফসল, কোন্ সে পঙ্গপাল?
আনন্দের এই হাটে কেন তাহার হাঁড়ির হাল?
কেন তাহার ঘরের খোকা গোরের বুকে যায়?
গোঠে গোঠে চরে ধেনু, দুধ নাহি সে পায়।
ওরে চাষা! বাঁচার আশা গেছে অনেক আগে
গোরের পাশের ঘরে কাঁদা আজো ভাল লাগে?
জাগে না কি শুকনো হাড়ে বজ্র-জ্বালা তোর?
চোখ বুঁজে তুই দেখবি রে আর, করবে চুরি চোর?
বাঁশের লাঠি পাঁচনি তোর তাও কি হাতে নাই?
না থাকে তোর দেহে রক্ত, হাড়কটা তোর চাই।
তোর হাঁড়ির ভাতে দিনে রাতে যে দস্যু দেয় হাত,
তোর রক্ত শুষে হলো বণিক; হলো ধনীর জাত—
তাদের হাড়ে ঘুণ ধরাবে তোদেরই এই হাড়
তোর পাঁজরার ঐ হাড় হবে ভাই যুদ্ধের তলোয়ার!
তোরই মাঠে পানি দিতে আল্লাজী দেন মেঘ,

তোরই গাছে ফুল ফোটাতে দেন বাতাসের বেগ,
তোরই ফসল ফলাতে ভাই চন্দ্র সূর্য উঠে,
আল্লার সেই দান আজি কি দানব খাবে লুটে?
তেমনি আকাশ ফর্সা আছে, ভরসা শুধু নাই,
তেমনি খোদার রহম ঝরে, আমরা নাহি পাই।
হাত তুলে তুই চা দেখি ভাই, অমনি পাবি বল,
তোর ধানে তোর ভরবে খামার নড়বে খোদার কল!

মোবারকবাদ

মোরা ফোটা ফুল, তোমরা মুকুল এস গুল্-মজ্‌লিসে
ঝরিবার আগে হেসে চলে যাব—তোমাদের সাথে মিশে।
মোরা কীটে-খাওয়া ফুলদল, তবু সাধ ছিল মনে কত—
সাজাইতে ঐ মাটির দুনিয়া ফিরদৌসের মতো।
আমাদের সেই অপূর্ণ সাধ কিশোর-কিশোরী মিলে
পূর্ণ করিও, বেহেশ্‌ত এনো দুনিয়ার মহ্‌ফিলে।
মুসলিম হয়ে আল্লারে মোরা করিনিকো বিশ্বাস,
ঈমান মোদের নষ্ট করেছে শয়তানি নিশ্বাস!
ভায়ে ভায়ে হানাহানি করিয়াছি, করিনি কিছুই ত্যাগ,
জীবনে মোদের জাগেনি কখনো বৃহতের অনুরাগ!

শহিদি-দর্জা চাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি,
চেয়েছি গোলামি, জাবর কেটেছি গোলাম-খানায় বসি।
তোমরা মুকুল, এই প্রার্থনা করো ফুটিবার আগে,
তোমাদের গায়ে যেন গোলামের ছোঁওয়া জীবনে না লাগে?
গোলামির চেয়ে শহিদি-দর্জা অনেক উর্ধ্বে জেনো;
চাপ্‌রাশির ঐ তক্‌মার চেয়ে তলোয়ারে বড় মেনো!
আল্লার কাছে কখনো চেয়ো না ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,
আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে কভু শির করিও না নিচু!
এক আল্লাহ্ ছাড়া কাহারো বান্দা হবে না, বল,
দেখিবে তোমার প্রতাপে পৃথিবী করিতেছে টলমল।
আল্লারে বলো, 'দুনিয়ায় যারা বড়, তার মতো করো,
কাহাকেও হাত ধরিতে দিও না, তুমি শুধু হাত ধরো।'

এক আল্লারে ছাড়া পৃথিবীতে করো না কারেও ভয়
দেখিবে—অমনি প্রেমময় খোদা, ভয়ংকর সে নয় !
আল্লারে ভালোবাসিলে তিনিও ভালোবাসিবেন, দেখো !
দেখিবে সবাই তোমারে চাহিছে আল্লারে ধরে থেকো !
খোদার বাগিচা এই দুনিয়াতে তোমরা নব মুকুল,
একমাত্র সে আল্লাহ্ এই বাগিচার বুলবুল !
গোলামের ফুলদানিতে যদি এ মুকুলের ঠাঁই হয়,
আল্লার কৃপা-বঞ্চিত হব, পাব মোরা পরাজয় !
যে ছেলেমেয়ে এই দুনিয়ায় আজাদ মুক্ত রহে,
তাদেরি শুধু এক আল্লার বান্দা ও বাঁদি কহে !
তারাই আনিবে জগতে আবার নতুন ঈদের চাঁদ,
তারাই ঘুচাবে দুনিয়ার যত দ্বন্দ্ব ও অবসাদ !
শুধু আর্শের আতর-দানিতে যাহাদের হয় ঠাঁই,
তোমাদের মহফিলে আমি সেই মুকুলের চাই !

সেই মুকুলেরা এস মহ্ফিলে, বসাও ফুলের হাট,
এই বাংলায় তোমরা আনিও মুক্তির আর্‌ফাত্।*

কৃষকের ঈদ

বেলাল ! বেলাল ! হেলাল উঠেছে পশ্চিম আসমানে,
লুকাইয়া আছ লজ্জায় কোন্ মরুর গোরস্তানে !
হেরো ঈদগাহে চলিছে কৃষক যেন প্রেত-কঙ্কাল
কশাইখানায় যাইতে দেখেছ শীর্ণ গরুর পাল ?
রোজা এফতার করেছে কৃষক অশ্রু-সলিলে হায়,
বেলাল ! তোমার কণ্ঠে বুঝি গো আজান থামিয়া যায় !
থালা, ঘটি, বাটি বাঁধা দিয়ে হেরো চলিয়াছে ঈদগাহে,
তীর-খাওয়া বুক, ঋণে-বাঁধা-শির, লুটাতে খোদার রাহে।

জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসে না নিদ,
মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ ?

---

* মুকুলের মহফিলের মুকুলদের প্রতি।

একটি বিন্দু দুধ নাহি পেয়ে যে খোকা মরিল তার
উঠেছে ঈদের চাঁদ হয়ে কি সে শিশু-পাঁজরের হাড় ?
আসমান-জোড়া কালো কাফনের আবরণ যেন টুটে
এক ফালি চাঁদ ফুটে আছে, মৃত শিশুর অধর-পুটে।
কৃষকের ঈদ ! ঈদগাহে চলে জানাজা পড়িতে তার,
যত তকবির শোনে, বুকে তার তত উঠে হাহাকার !
মরিয়াছে খোকা, কন্যা মরিছে, মৃত্যু-বন্যা আসে
এজিদের সেনা ঘুরিছে মক্কা-মসজিদে আশেপাশে।
কোথায় ইমাম ? কোন্ সে খোৎবা পড়িবে আজিকে ঈদে ?
চারিদিকে তব মুর্দার লাশ, তারি মাঝে চোখে বিঁধে
জরির পোশাকে শরীর ঢাকিয়া ধনীরা এসেছে সেথা,
এই ঈদগাহে তুমি কি ইমাম, তুমি কি এদেরই নেতা ?
নিঙাড়ি কোরান হাদিস ও ফেকা, এই মৃতদের মুখে
অমৃত কখনো দিয়াছ কি তুমি ? হাত দিয়ে বলো বুকে।
নামাজ পড়েছ, পড়েছ কোরান, রোজাও রেখেছ জানি,
হায় তোতাপাখি ! শক্তি দিতে কি পেরেছ একটুখানি ?
ফল বহিয়াছ, পাওনিকো রস, হায় রে ফলের ঝুড়ি,
লক্ষ বছর ঝর্নায় ডুবে রস পায় নাকো নুড়ি !

আল্লা-তত্ত্ব জেনেছ কি, যিনি সর্বশক্তিমান ?
শক্তি পেল না জীবনে যে জন, সে নহে মুসলমান !
ঈমান ! ঈমান ! বলো রাতদিন, ঈমান কি এত সোজা ?
ঈমানদার হইয়া কি কেহ বহে শয়তানি বোঝা ?
শোনো মিথ্যুক ! এই দুনিয়ায় পূর্ণ যার ঈমান,
শক্তিধর সে টলাইতে পারে ইঙ্গিতে আসমান !
আল্লার নাম লইয়াছ শুধু, বোঝোনিকো আল্লারে।
নিজে যে অন্ধ সে কি অন্যেরে আলোকে লইতে পারে ?
নিজে যে স্বাধীন হইল না সে স্বাধীনতা দেবে কাকে ?
মধু দেবে সে কি মানুষে, যাহার মধু নাই মৌচাকে ?

কোথা সে শক্তি-সিদ্ধ ইমাম, প্রতি পদাঘাতে যার
আবে-জমজম শক্তি-উৎস বাহিরায় অনিবার ?
আপনি শক্তি লভেনি যে জন, হায় সে শক্তি-হীন
হয়েছে ইমাম, তাহারি খোৎবা শুনিতেছি নিশিদিন !
দীন কাঙালের ঘরে ঘরে আজ দেবে যে নব তাগিদ
কোথা সে মহান শক্তি-সাধক আনিবে যে পুন ঈদ ?

ছিনিয়া আনিবে আসমান থেকে ঈদের চাঁদের হাসি,
ফুরাবে না কভু যে হাসি জীবনে, কখনো হবে না বাসি !
সমাধির মাঝে গনিতেছি দিন, আসিবেন তিনি কবে ?
রোজা এফ্‌তার করিব সকলে, সেই দিন ঈদ হবে।

শিখা

যৌবনের রাগ-রক্ত লেলিহান শিখা
জ্বলিয়া উঠিবে কবে ভারতে আবার
জড়তার ধূমপুঞ্জ বিদারণ করি
উদ্ভাসিয়া তমসার তিমির শর্বরী ?
কোথা সে অনাগত সাগ্নিক পুরোধা
নির্বাপিত-প্রায় এই যজ্ঞ-হোমানলে
উচ্চারিয়া বেদ-মন্ত্র দানিবে আহুতি,
নব নব প্রাণের সমিধ কে যোগাবে সেথা ?

হায় রে ভারত, হায়, যৌবন তাহার
দাসত্ব করিতেছে অতীত জরার !
জরাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী বৃদ্ধ জরদ্গব
দেখায়ে গলিত মাংস চাকুরির মোহ
যৌবনের টীকা-পরা তরুণের দলে
আনিয়াছে একেবারে ভাগাড়ে শ্মশানে।
যৌবনে বাহন করি পঙ্গু জরা আজি
হইয়াছে ভারতে জন-গণ-পতি !
যে হাতে পাইত শোভা খর তরবারি
সেই তরুণের হাতে ভোট-ভিক্ষা-ঝুলি
বাঁধিয়া দিয়াছে হায় !—রাজনীতি ইহা !
পলায়ে এসেছি আমি লজ্জায় দু'হাতে
নয়ন ঢাকিয়া ! যৌবন এ লাঞ্ছনা
দেখিবার আগে কেন মৃত্যু হইল না ?

যৌবনের আবরণে ভারতে কি তবে
ফিরিতেছে দলে দলে বৃদ্ধ-প্রাণ জরা ?

নহিলে এ সিন্ধবাদ কেমন করিয়া
ফিরিতেছে যৌবনের স্কন্ধে চড়ি আজো?

অতীতের অর্থ ভূত, সেই অদ-ভুত
অতীত কি বর্তমানে এখনো শাসিবে?
এই ভূতগ্রস্ত জাতি জানি না কেমনে
স্বাধীন হইবে কভু, পাইবে স্বরাজ!

রে তরুণ, তোমারে হেরিয়া আমি কাঁদি!
অসম্ভবের পথে অভিযান যার
সুদূর ভবিষ্যতে দুর্মদ দুর্বার
সে আজি অতীত পানে মেলিয়া নয়ন
কেবলি পিছনে চলে, নেতার আদেশে!
তলোয়ার হইয়াছে লাঙলের ফলা!

তোমাদেরি মাঝে আছে নেতা তোমাদের,
তোমাদেরি বুকে জাগে নিত্য ভগবান,
ভয়-হীন, দ্বিধা-হীন, মৃত্যুহীন তিনি!
তোমারে আধার করি সেই মহাশক্তি
প্রকাশিতে চান নিত্য, চাহ আঁখি খুলি
আপনার মাঝে দেখ আপন স্বরূপ
অতীতের দাসত্ব ভোলো! বৃদ্ধ সাবধানী
হইতে পারে না কভু তোমাদের নেতা!
তোমাদেরি মাঝে আছে বীর সব্যসাচী
আমি শুনিয়াছি বন্ধু সেই ঐশীবাণী
উর্ধ্ব হতে রুদ্র মোর নিত্য কহে হাঁকি,
শোনাতে এ কথা, এই তাঁহার আদেশ।

তোমাদের প্রাণের এ অনির্বাণ-শিখা
যৌবনের হোম-কুণ্ড-পাশে বৃদ্ধ বসি,
আগুন পোহাবে, বন্ধু, এ দৃশ্য দেখিতে
যেন নাহি বাঁচি আর! সমাধি হইতে
আর যেন নাহি উঠি প্রলয়ের আগে!

আজাদ

কোথা সে আজাদ? কোথা সে পূর্ণ-মুক্ত মুসলমান?
আল্লাহ্ ছাড়া করে না কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ?
কোথা সে 'আরিফ', কোথা সে ইমাম, কোথা সে শক্তিধর?
মুক্ত যাহার বাণী শুনি কাঁদে ত্রিভুবন থরথর!
কে পিয়েছে সে তৌহিদ-সুধা পরমামৃত হায়?
যাহারে হেরিয়া পরান পরম শান্তিতে ডুবে যায়!
আছে সে কোরান-মজিদ আজিও পরম শক্তিভরা,
ওরে দুর্ভাগা, এককণা তার পেয়েছিস্ কেউ তোরা?
সেই যে নামাজ রোজা আছে আজো আজো সে কলমা আছে,
আজো উথলায় আব-জমজম কাবা-শরিফের কাছে।
নামাজ পড়িয়া, রোজা রেখে আর কলমা পড়িয়া সবে
কেন হতেছিস দলে দলে তোরা কতল্-গাহেতে জবেহ?
সব আছে, তবু শবের মতন ভাগাড়ে পড়িয়া কেন?
ভেবেছ কি কেউ কৌমের পীর, নেতা, কেন হয় হেন?
আজিও তেমনি জামায়েত হয় ঈদ্গাহে মস্জিদে,
ইমাম পড়েন খোৎবা, শ্রোতার আঁখি ঢুলে আসে নিদে!
যেন দলে দলে কলের পুতুল শক্তি শৌর্যহীন,
নাহিক ইমাম, বলিতে হইবে—ইহারা মুস্লেমিন!
পরম পূর্ণ শক্তি-উৎস হইতে জনম লয়ে
কেমন করিয়া শক্তি হারাল এ জাতি? কোন্ সে ভয়ে
তিলে তিলে মরে, মানুষের মতো মরিতে পারে না তবু?
আল্লাহ্ যার প্রভু ছিল, আজ শয়তান তার প্রভু!
খুঁজিয়া দেখিনু, মুসলিম নাই, কেবল কাফেরে ভরা,—
কাফের তারেই বলি, যারে ঢেকে আছে শত ভীতি জরা।
অজ্ঞান-অন্ধকার যাহারে রেখেছে আবৃত করি,
নিত্য সূর্য জ্বলে, তবু যার পোহাল না বিভাবরী!
আল্লাহ্ আর তাহার মাঝারে কোনো আবরণ নাই,
এই দুনিয়ায় মুসলিম সেই—দেখছ তাহারে ভাই?
আল্লার সাথে নিত্য-যুক্ত পরম শক্তিধর,
এই মুসলিম-কবরস্তানে পেয়েছ তার খবর?
চায় নাকো যশ, চায় নাকো মান, নিত্য নিরভিমান,
নিরহঙ্কার আসক্তি-হীন—সত্য যাহার প্রাণ;

জমায় না যে বিত্ত নিত্য মুসাফির গৃহহীন,
আসমান যার ছত্র ধরেছে, পাদুকা যার জমিন ;
দিনে আর রাতে চেরাগ যাহার চন্দ্র সূর্য তারা,
আহার যাহার আল্লার নাম—প্রেমের অশ্রু-ধারা ?

যার পানে চায়—সেই যেন পায় তখনি অমৃত বারি,
যারে ডাকে—সে অমনি তাহার সাথে চলে সব ছাড়ি ?
অনন্ত জনগণ মাঝে পারে শক্তি সঞ্চারিতে,
যারে স্পর্শ করে সে অমনি ভরে ওঠে অমৃতে।
সেই সে পূর্ণ মুসলমান সে পূর্ণ শক্তিধর,
'উম্মি' হয়েও জয় করিতে সে পারে এই চরাচর !
যেদিকে তাকাই দেখি যে কেবলি অন্ধ বদ্ধ জীব,
ভোগোন্মত্ত, পঙ্গু, খঞ্জ, আতুর, বদ্-নসিব।
কাগজে লিখিয়া, সভায় কাঁদিয়া গুম্ফ শ্মশ্রু ছিঁড়ে
আছে কেউ নেতা, লবে ইহুদের অমৃত সাগর-তীরে।
আসে অনন্ত শক্তি নিয়ত যে মূল-শক্তি হতে
সেখান হইতে শক্তি আনিয়া ভাসাতে শক্তি-স্রোতে—
কোন্ তপস্বী করিছে সাধনা ? বন্ধু, বৃথা এ শ্রম,
নিজে যার ভ্রম ভাঙেনি সেই কি ভাঙবে জাতির ভ্রম ?
দোজখের পথে, ধ্বংসের পথে চলিয়াছে সারা জাতি,
শূন্য দু'হাত 'পাইয়াছি' বলে তবু করে মাতামাতি !
সেদিন এমনি মাতালের সাথে পথে মোর হলো দেখা।
শুধানু, 'কি পেলে ?' সে বলে, 'দেখো না, কপালে রয়েছে লেখা ?'
কপালের পানে চাহিয়া আমার নয়নে আসিল বারি,
বাদশাহ হতে পারিত যে হায়, পেয়েছে সে জমিদারি !
দলে দলে আসে, কারো বুকে, কারো পেটে, কারো হাতে লেখা,
আজাদির চিন্—অর্থাৎ কিনা চাকুরির মসী-লেখা !
কাঁদিয়া কহিনু,—ওরে বে-নসিব, হতভাগ্যের দল,
মুসলিম হয়ে জনম লভিয়া এই কি লভিলি ফল ?
অন্যেরে দাস করিতে, কিংবা নিজে দাস হতে, ওরে
আসেনিকো দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন করে ?
ভাঙিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন ভয় লাজ
এল যে কোরান, এলেন যে নবী, ভুলিলি সে সব আজ ?
হায় গণ-নেতা ভোটের ভিখারি নিজের স্বার্থ তরে
জাতির যাহারা ভাবী আশা, তারে নিতেছ খরিদ করে।

সারাজাতি সারারাতি জেগে আছে যাহাদের পানে চেয়ে,
যে তরুণ দল আসিছে বাহিরে জ্ঞানের মানিক পেয়ে—
তাহাদের ধরে গোলাম করিয়া ভরিতেছ কার ঝুলি ?
চা-বাগানের আড়কাঠি যেন চালান করিছ কুলি !
উহারা তরুণ, জানে না উহারা ভারত-গোরস্তান !
ওদের আলোকে আলোকিত হবে অন্ধকার এ দেশ,
ওদেরই শৌর্যে ত্যাগে মহিমায় ঘুচিবে দীনের ক্লেশ।

তুমি চাকরির কশাই-খানায় ঘুরিছ তাদেরে লয়ে,
তুমি কি জানো না, ওখানে যে যায়—সে যায় জবেহ্ হয়ে ?
দেখিতেছ না কি শিক্ষিত এই বাঙালির দুর্দশা,
মানুষ যে হতো, চাকরি করিয়া হয়েছে সে আজ মশা।
ভিক্ষা করিয়া মরুক উহারা, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলে—
সমবেত হোক ধ্বংস-নেশায় মুক্ত আকাশ-তলে।
আগুন যে বুকে আছে—তাতে আরো দুখ-ঘৃতাহুতি দাও,
বিপুল শক্তি লয়ে ওরা হোক জালিম্ পানে উধাও
যে ইস্পাতে তরবারি হয়, আঁশ-বঁটি করো তারে।
অন্ধ, খঞ্জ, জরাগ্রস্ত নিজেরা অন্ধকারে
ঘুরিয়া মরিছ, তাই কি চাহিছ সবাই অন্ধ হোক ?
কৌম জাতির প্রাণ বেচে তুমি হইতেছ বড় লোক !...

আজাদ-আত্মা ! আজাদ-আত্মা ! সাড়া দাও, দাও সাড়া !
এই গোলামির জিঞ্জির ধরে ভীম বেগে দাও নাড়া।
হে চির-অরুণ তরুণ, তুমি কি বুঝিতে পারোনি আজো ?
ইঙ্গিতে তুমি বৃদ্ধ সিন্ধবাদের বাহন সাজো !
জরারে পৃষ্ঠে বহিয়া বহিয়া জীবন যাবে কি তব,
জীবন ভরিয়া রোজা রাখি ঈদ আনিবে না অভিনব ?
ঘরে ঘরে তব লাঞ্ছিতা মাতা ভগ্নিরা চেয়ে আছে,
ওদের লজ্জা-বারণ শক্তি আছে তোমাদেরই কাছে।
ঘরে ঘরে মরে কচি ছেলে মেয়ে দুধ নাহি পেয়ে, হায়,
তোমরা তাদেরে বাঁচাবে না আজ বিলাইয়া আপনায়।
আজ মুখ ফুটে, দল বেঁধে বল, বল ধনীদের কাছে,
ওদের বিত্তে এই দরিদ্র দীনের হিস্সা আছে।
ক্ষুধার অন্নে নাই অধিকার ; সঞ্চিত যার রয়,
সেই সম্পদে ক্ষুধিতের অধিকার আছে নিশ্চয়।

মানুষেরে দিতে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার
ইস্‌লাম এসেছিল দুনিয়ায়, যারা কোরবান তার—
তাহাদেরি আজ আসিয়াছে ডাক—বেহেশত্‌ পার হ'তে,
আনন্দ লুট হবে দুনিয়ায় মহা-ধ্বংসের পথে—
প্রস্তুত হও—আসিছেন তিনি অভয় শক্তি লয়ে—
আল্লাহ্‌ থেকে আবে-কওসর নবীন বার্তা বয়ে।
অন্তরে আর বাহিরে নিত্য আজাদ মুক্ত যারা—
নব-জেহাদের নির্ভীক দুর্বার সেনা হবে তারা,
আমাদেরি আনা নিয়ামত পেয়ে খাবে আর দেবে গালি,
জেহাদের রণে নওশা সাজিয়া মোরা দিব হাত-তালি।
বলিব বন্ধু, মিটেছে কি ক্ষুধা, পেয়েছ কি কওসর?
বেহেশ্‌তে হবে তকবির ধ্বনি, আল্লাহু আকবর।
জিন্নাৎ হতে দেখিব মোদের গোরস্তানের 'পর
প্রেমে আনন্দে পূর্ণ সেথায় উঠেছে নূতন ঘর।

ঈদের চাঁদ

সিঁড়ি-ওয়ালাদের দুয়ারে এসেছে আজ
চাষা মজুর ও বিড়ি-ওয়ালা;
মোদের হিস্‌সা আদায় করিতে ঈদে
দিল হুকুম আল্লাত‌'লা।
দ্বার খোলো সাততলা-বাড়ি-ওয়ালা, দেখো কারা দান চাহে,
মোদের প্রাপ্য নাহি দিলে যেতে নাহি দেবো ঈদ্‌গাহে।
আনিয়াছে নবযুগের বারতা নতুন ঈদের চাঁদ,
শুনেছি খোদার হুকুম, ভাঙিয়া গিয়াছে ভয়ের বাঁধ।
মৃত্যু মোদের ইমাম সারথি, নাই মরণের ভয়;
মৃত্যুর সাথে দোস্তি হয়েছে—অভিনব পরিচয়।
যে ইস্‌রাফিল প্রলয়-শিঙ্গা বাজাবেন কেয়ামতে—
তাঁরি ললাটের চাঁদ আসিয়াছে আলো দেখাইতে পথে।

মৃত্যু মোদের অগ্র-নায়ক, এসেছে নতুন ঈদ,
ফির্‌দৌসের দরজা খুলিব আমরা হয়ে শহীদ।

আমাদের ঘিরে চলে বাংলার সেনারা নৌ-জোয়ান,
জানি না, তাহারা হিন্দু কি খ্রিশ্চান কি মুসলমান।
নির্যাতিতের জাতি নাই, জানি মোরা মজলুম ভাই—
জুলুমের জিন্দানে জনগণে আজাদ করিতে চাই।
এক আল্লার সৃষ্ট সবাই, এক সেই বিচারক,
তাঁর সে লীলার বিচার করিবে কোন্ ধার্মিক বক?
বকিতে দিব না বকাসুরে আর, ঠাসিয়া ধরিব টুটি,
এই ভেদ-জ্ঞানে হারায়েছি মোরা ক্ষুধার অন্ন রুটি।
মোরা শুধু জানি, যার ঘরে ধন রত্ন জমানো আছে,

ঈদ আসিয়াছে, জাকাত আদায় করিব তাদের কাছে।
এসেছি ডাকাত জাকাত লইতে, পেয়েছি তাঁর হুকুম,
কেন মোরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরিব, সহিব এই জুলুম?
যক্ষের মতো লক্ষ লক্ষ টাকা জমাইয়া যারা
খোদার সৃষ্ট কাঙালে জাকাত দেয় না, মরিবে তারা।
ইহা আমাদের ক্রোধ নহে, ইহা আল্লার অভিশাপ,
অর্থের নামে জমেছে তোমার ব্যাঙ্কে বিপুল পাপ!
তাঁরি ইচ্ছায়—ব্যাঙ্কের দিকে চেয়ো না—উর্ধ্বে চাহ,
ধরার ললাটে ঘনায় ঘোলাটে প্রলয়ের বারিবাহ!
আল্লাব ঋণ শোধ করো, যদি বাঁচিবার থাকে সাধ;
আমাদের বাঁকা ছুরি আঁকা দেখো আকাশে ঈদের চাঁদ!
তোমারে নাশিতে চাষার কাস্তে কি রূপ ধরেছে, দেখো,
চাঁদ নয়, ও যে তোমার গলার ফাঁদ! দেখে মনে রেখো!

প্রজারাই রোজ রোজা রাখিয়াছে, আজীবন উপবাসী,
তাহাদেরি তরে এই রহমত, ঈদের চাঁদের হাসি।
শুধু প্রজাদের জমায়েত হবে আজিকার ঈদগাহে,
কাহার সাধ্য, কোন্ ভোগী রাক্ষস সেথা যেতে চাহে?
ভেবো না, ভিক্ষা চাহি মোরা, নহে শিক্ষা এ আল্লার,
মোরা প্রতিষ্ঠা করিতে এসেছি আল্লার অধিকার!
এসেছে ঈদের চাঁদ বরাভয় দিতে আমাদের ভয়ে,
আবার খালেদ এসেছে আকাশে বাঁকা তলোয়ার লয়ে!
কঙ্কালে আজ ঝল্‌কে বজ্র, পাষাণের জাগরণ,
লাশে উল্লাস জেগেছে রুদ্র উদ্ধত যৌবন!

দারিদ্র্য-কারবালা-প্রান্তরে মরিয়াছি নিরবধি,
একটুকু কৃপা করোনি, লইয়া টাকার ফোরাত নদী।
কত আসগর মরিয়াছে, জানো, এই বাপ মা'র বুকে?
সকিনা মরেছে, তোমরা দখিনা বাতাস খেয়েছ সুখে।
শহিদ হয়েছে হোসেন, কাসেম, আজগর, আব্বাস,
মানুষ হইয়া আসিয়াছি মোরা তাঁদের দীর্ঘশ্বাস!
তোমরাও ফিরে এসেছ এজিদ সাথে লয়ে প্রেত-সেনা,
সে-বারে ফিরিয়া গিয়াছিলে, জেনো, আজ আর ফিরিবে না।
এক আল্লার সৃষ্টিতে আর রহিবে না কোনো ভেদ,
তাঁর দান কৃপা কল্যাণে কেহ হবে না না-উম্মেদ!
ডাকাত এসেছে জাকাত লইতে, খোলো বাক্সের চাবি,
আমাদের নহে, আল্লার দেওয়া ইহা মানুষের দাবি!
বাঁচিবে না আর বেশি দিন রাক্ষস লোভী বর্বর,
টলেছে খোদার আসন টলেছে, আল্লাহু-আকবর!
সাত আসমান বিদারি আসিছে তাঁহার পূর্ণ ক্রোধ,
জালিমে মারিয়া করিবেন মজলুমের প্রাপ্য শোধ।

'স্বাগতা'

স্বাগতা কনক-চম্পক বর্ণা ছন্দিতা চপল নৃত্যের ঝর্না।
মঞ্জুলা বিধুর যৌবন-কুঞ্জে যেন ও চরণ-নূপুর গুঞ্জে।
মন্দিরা মুরলি-শোভিত হাতে এস গো বিরহ-নীরস-রাতে
হে প্রিয়া করিব প্রাণ অপর্ণা॥

ভূমিকা

বাইরের জগতে মাঝে মাঝে যেমন ঝড় ওঠে মানুষের মনের জগতেও তেমনি। এবং ওঠে একই কারণে।

কোথাও কোনো উত্তাপ যখন অস্বাভাবিক ও অসহ্য হয়ে উঠে তখন ঝটিকার প্রচণ্ডতার ভেতর দিয়েই অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতি তার স্বাভাবিক সামঞ্জস্য ফিরে পাবার প্রয়াস পায়।

বাংলাদেশের মনে বর্তমান খ্রিস্টীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এমনি অস্বাভাবিক উত্তাপই রাজনৈতিক সামাজিক ও আর্থিক কারণে জমে উঠেছিল। সেই উত্তাপ থেকে যে দুরন্ত বাষ্পবেগের সৃষ্টি হয়েছিল তার একদিকের প্রকাশ নজরুল ইসলামের মধ্যে মূর্ত।

নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের জগতে ছন্দোময় এক দুরন্ত ঝটিকা-বেগ।

ঝটিকার যা ধর্ম নজরুল ইসলামের কাব্য-প্রতিভার মধ্যে তার সব কিছুই বর্তমান।

উচ্ছৃঙ্খল বার্তার মতোই তা সাহিত্যের আকাশে দেখা দিয়েছে, যা নড়বড়ে তাকে নাড়া দিয়ে ভেঙেছে, যা জীর্ণ তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিগ্বিদিকে দিয়েছে উড়িয়ে আর যেখানে অন্যায় অসত্য শিকড় গেড়ে বসেছে সুস্থ বলিষ্ঠ জীবনের কণ্ঠরোধ করে, সেখানে আঘাতের পর আঘাতে মূল পর্যন্ত দিয়েছে টলিয়ে।

পূর্বের কিছু কিছু রচনা আকর্ষণ করলেও 'বিদ্রোহী' কবিতাতেই নজরুল ইসলাম সমস্ত সাহিত্য-জগতের কাছে সচকিত স্বীকৃতি যেন সবলে আদায় করে নেন।

কাব্য-বিচারে 'বিদ্রোহী'র মূল্য সকলের কাছে সমান না হতে পারে, কিন্তু তদানীন্তন যুগ-মানস যে প্রথম এই কবিতার মধ্যে-ই প্রতিবিম্বিত, এ কথা কেউ বোধহয় অস্বীকার করবেন না। এ কবিতার বিশৃঙ্খল ছন্দ ও উগ্র উৎকট উপমা উৎপ্রেক্ষাও যেন সে যুগের অন্তরলোকের নিরুদ্ধ বাষ্পবেগের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত।

'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্য দিয়েই নজরুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর সমস্ত জীবন ও কাব্য-সাধনার মধ্যে বিদ্রোহের প্রেরণাই প্রধান হলেও শুধু 'বিদ্রোহী', কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁকে চিনতে চাইলে তাঁর প্রতি একান্ত অবিচার করা হবে বলে মনে হয়। নজরুল ইসলাম চির-বিদ্রোহী সত্য কিন্তু সে বিদ্রোহের আসল পরিচয় উগ্রচ্ছোসে নয়। সমস্ত উদ্দাম তরঙ্গ-আন্দোলনের তলায় কোথায় সে বিদ্রোহ যেন গভীর সমুদ্রের মতো শান্ত, সমস্ত ঝটিকা-আন্দোলনের উর্ধ্বে তুষার শিখরের মতো স্থির।

সমস্ত উন্মত্ত বেগের পেছনে এই প্রসন্ন প্রশান্তি ও স্থৈর্য না থাকলে প্রাকৃতিক ঝটিকার মতোই নজরুল ইসলামের নাম বাংলা কাব্য-সাহিত্যের চিরন্তন গৌরব না হয়ে শুধু সাময়িক দুর্যোগের স্মৃতি হয়েই থাকত।

নজরুল ইসলামের পরিণত প্রতিভার দান বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত কবিতা 'শেষ সওগাত' রূপে এই সঙ্কলনে তাঁর অগণন অনুরাগীদের কাছে উপস্থিত করতে পেরে এ গ্রন্থের প্রকাশকের সঙ্গে আমিও অত্যন্ত আনন্দিত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

জাগো সৈনিক-আত্মা

জাগো সৈনিক-আত্মা ! জাগো রে দুর্মদ যৌবন !
আকাশ পৃথিবী আলোড়ি আসিছে ভয়াল প্রভঞ্জন
রক্ত রসনা বিস্ফারি আসে করাল ভয়ঙ্কর !
অগ্নি উগারি ওড়ে আগ্নেয়ী জুড়িয়া নীলাম্বর।
এখনো তন্দ্রা নিদ্রা জড়তা ক্লৈব্য গেল না তোর ?
বজ্র দমকে দামিনী চমকে, এলো ঘনঘটা ঘোর !
এখনো ঘুমাবে হে অমর মানবাত্মা অন্ধকারে
পরি দৈন্যের শৃঙ্খল হায় পাতালের কারাগারে !
গরজে কামান, তোপ, গোলাগুলি ছুটিছে দিগ্বিদিকে,
জড়াইয়া ধরে প্রিয়া-সম সৈনিক সেই বহ্নিকে।
গুলি ও গোলারে প্রিয়ার বুকের মালার ফুলের মতো
লইতেছে তুলি আজ জগতের বীর সৈনিক যত।
জাগো যত এদেশের দুর্বার-দুরন্ত যৌবন !
আগুনের ফুল-সুরভি এনেছে চৈতালি সমীরণ।
সেই সুরভির নেশায় জেগেছে অঙ্গে অঙ্গে তেজ,
রক্তের রঙে রাঙায় ভুবন ভৈরব রংরেজ !
জাগো অনিদ্র অভয় মুক্ত মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ,
তোমাদের পদধ্বনি শুনি হোক অভিনব উত্থান
পরাধীন শৃঙ্খল-কবলিত পতিত এ ভারতের !
এসো যৌবন রণ-রস-ঘন হাতে লয়ে শমশের !
মৃত্যুর নয়—অমৃতের উৎসবের আমন্ত্রণ
আসিতেছে ঐ রক্ত-রঙিন লিপি লয়ে যে মরণ—
বরণ করিয়া চলো সেই উৎসব-অভিযান পথে,
মহাশক্তির তুষার গলিয়া ছুটুক প্রবল স্রোতে।
দঙ্গল বাঁধি এসো ময়দানে করিয়া কুচকাওয়াজ,
গর্জি উঠুক বক্ষে রণোন্মত্ত গোলন্দাজ !
রক্তে রক্তে এ কোন্ রুদ্র নটরাজ নাচে নাচে রে !
মৃত্যুরে খুঁজি মধুমাছি, মৃত্যুর মধু কোথা আছে রে !

সাইক্লোন নাচে শিরায় শিরায় মন সেথা চলে ছুটে
কোথায় বোমার ধূপদানি হতে বারুদের ধোঁওয়া উঠে?
চলো জাগ্রত মানব-আত্মা সামরিক সেনাদল,
যথা প্রাণ ঝরে ঝরে পড়ে যেন বাদলের ফুলদল!
মাদল বাজিছে কামানের ঐ শোনো মহা-আহ্বান!
জীবনের পথে চলো আর চলো—'অভিযান, অভিযান'!

কেন আপনারে হানি হেলা?

বন্ধুরা কহে, 'হায় কবি, খেল এ কি নিষ্ঠুর খেলা,
কোন অকারণ অভিমানে আপনারে হানো অবহেলা?'
হাসিয়া কহিনু—'হয়েছে কি?' বন্ধুরা কহে—'চুলোর ছাই!
আপন সৃষ্টি করিছ যে নাশ, সেদিকে তোমার দৃষ্টি নাই?'
আমি কহিলাম—'জানি না তো সৃষ্টি করেছি কি কিছু আমি,
আমি শুধু জানি, নদীর মতন ছুটিয়া চলেছি দিবাযামী!
সাগরের তৃষা লয়ে নদী শুধু সম্মুখে ছুটিয়া যায়,
পথে পথে যেতে ঢেউ যে তাহার কত কথা বলে, কতো কি গায়!'

অকারণ কথাগুলিরে তাহার যদি কেহ বলে, 'চমৎকার
মধুচ্ছন্দা কাব্যশ্লোক, বাজে তরঙ্গে সুররাহার!'
কেউ বলে, 'পাগলের প্রলাপ, কোনো মানে নাই ওর কথার,
এ নয় গোলাপ, শিখি-কলাপ, এ শুধু প্রকাশ মূর্খতার!'
শোনে না স্তুতি, নিন্দাবাদ,— উন্মাদ বেগে প্রবল ঢেউ
আগে ছুটে চলে, কি গান গায় কি কথা কয় সে, বোঝে না কেউ।
জন্ম-শিখর হইতে মোর কোন সে অসীম মহাসাগর
টানিয়া আনিল, দিল সে ডাক, তারি পানে ছুটি ছাড়িয়া ঘর!

বন্ধু গো, সুর-স্রষ্টা নই, কবি নই, আমি সাগর-জল,
কভু মেঘ হয়ে ঝরে পড়ি, কভু নদী হয়ে বহি কেবল।
মৌন উদার হিমালয়ে কভু জমে হই হিম-তুষার,
সহসা সে ধ্যান ভাঙে আমার গাঢ় চুম্বনে রাঙা উষার!
কেন সারা রাত জেগে কাঁদি, দিনে কাজ করি, হেসে বেড়াই,
আমিই জানি না! জানি না কি লিখেছি; কি সুরে কি গান গাই!

পাগলের মতো বকি প্রলাপ,
হয়তো জানে পরমোন্মাদ
কেউ বলে, আমি নদীর ঢেউ
কেউ বলে, আমি কূল ভাঙি
যার যাহা সাধ বলিয়া যায়,
ওরা কূলে বসে আমারে কয়,
বুঝিতে পারি না, কেন আসি,
মনে হয়, বিনা প্রয়োজনের
আমি কহি, 'প্রিয় সাথীরা মোর,
যে তুলি আঁকিত রামধনু,
সে বাঁশি সে তুলি কোন সে চোর
আমার মনের ছন্দিতা

রস-প্রমত্ত অশান্ত
সম্মুখে এল ভিখারিনী
কহিল, 'বিলাসী ! পুত্র মোর,
শুকায়ে গিয়াছে অন্নহীন
মাতৃ-স্তন্য পায়নি সে, তাই
কাফন কেনার পয়সা নাই,

সাত আসমান যেন হঠাৎ
ঝরিতে লাগিল গ্রহ-তারা
কহিলাম—'মা গো, আমি কবি,
সে রসের কিছু পাওনি কি

কহে ভিখারিনী আঁখি জলে,
তেল মাখ তুমি তেলা মাথায়,
মরা খোকা লয়ে ভিখারিনী
জ্ঞান হলে আমি চেয়ে দেখি,
ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে
লাশের স্তূপের পাশে পড়ে
যেতে যেতে দেখি, মোটরকার
ছুটে চলে গেল চার চাকায়,

বন্ধু, বিলাস সৃষ্টি এই
অন্ধেরে আলো দিত যদি,

কেন যে ভিক্ষা চাই আমি,
পরম-ভিক্ষু মোর স্বামী।
দুকূলে ফুটাই ফুল-ফসল,
ধ্বংস-বিলাসী বন্যা-জল।
আমি মোর পথে তেমনি ধাই,
'কার সাথে কহ কি কথা ছাই?'
তোমারে কেন যে ভালোবাসি,
তব এ কান্না, তব হাসি।'
ছিনু রং-রেজ আসমানে,
বাঁশি বাজিত যে গুলিস্তানে,
লয়ে গেছে চুরি করিয়া, হায় !
আর সে নূপুর পরে না পায়।'

চলিতেছিলাম রাজ পথে,
মৃত ছেলে কোলে কোথা হতে।
দুধ পায় নাই এক ঝিনুক,
দেখো দেখো এই মায়ের বুক !
দিয়াছে মৃত্যু-স্তন্য তায়,
কি পরায়ে গোরে দিব বাছায়?'

দুলিতে লাগিল ঘোর বেগে,
টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে !
দেশে ফিরি না কি রস ঢেলে,
তুমি আর তব মৃত ছেলে?'

'রস পান? সে তো বিলাসীদের !
হায়, কেহ নাই ভিক্ষুকের !'
চলে গেল কোন পথে সুদূর,
বুকে জাগে ঘোর মরা শিশুর !
বিলাসের বেণু, রাঙা গেলাস,
আতর-দানি ও গোলাব-পাশ !
ধাক্কা মারিয়া অন্ধে হায় !
চার পায়া চড়ে অন্ধ যায় !

আমার কবিতা, আমার গান
অপঘাতে তার যেত না প্রাণ !

যেতে যেতে হেরি বস্তিতে—
গুদাম ঘরের বস্তা, এই
রূপ দেখিয়াছি কল্পনায়
দেখিনি শ্রীহীন এই মানুষ
নগ্ন ক্ষুধিত ছেলেমেয়ে
শুনিলাম আমি এই প্রথম
মোর বাণী ছিল রস-লোকের,
বিলাসের নেশা গেল টুটে,

শুয়ে আছে কারা ভাঙা কাঁচে?
বস্তির চেয়ে সুখে আছে!
এঁকেছি স্বপ্ন-গুলবাহার,
জীর্ণ হাড়ডি-চামড়া সার!
কাঁদায় কাঁদিয়া মায়ের প্রাণ,
শিশুর কাঁদনে আল-কোরান!
আল্লার বাণী শুনিনু এই,
জেগে দেখি আর সে আমি নেই!

গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরে দেখিয়াছি
বক্ষে লইয়া কাঁদিছে মা,
শিয়রের দীপে তৈল নাই,
'দেখিতে পাই না মা তোর মুখ,
মাঠের ফসল, কাজলা মেঘ
মর মর পুত্রেরে বাঁচায়
জমিদার মহাজন-পাড়ায়
ইহাদের ঘরে বার্লি নাই,

পায়ে-দলা কাদা-মাখা কুসুম,
চক্ষে পিতার নাহিকো ঘুম!
পীড়িত বালক কাঁদিয়া কয়,
বাবা কোথা, বড় লাগিছে ভয়!'
স্বপ্নে দেখিছে ঘুমায়ে বাপ,
মার মমতার উষ্ণ তাপ!
মেয়ের বিয়ের বাজে শানাই,
ওদের গোয়ালে দুধাল গাই।

আগুন লাগুক রসলোকে,
অভিশাপ দিনু—নামিবে সব
প্রায়শ্চিত্ত করি আমি—
বহু ভোগ বহু বিলাস পাপ,
এই ক্ষুধিত ও ভিক্ষুকের
প্রায়শ্চিত্ত মোর ভোগের
ওরা যদি আত্মীয় নহে
উহাদের তরে কেন এমন
মুক্তি চাহি না, চাহি না যশ,
এদেরই লাগিয়া মাগিব ভিখ

কত দূরে সেথা কারা থাকে?
এই দুখে শোকে, এই পাঁকে!
বন্ধু, আমারে করো ক্ষমা!
প্রভুজি জানেন, আছে জমা!
আজীবন পদ-সেবা করি'
পূর্ণ করিয়া যেন মরি!
কেন এ আত্মা কাঁদে আমার?
বুকে ওঠে রোদনের জোয়ার?
ভিক্ষার ঝুলি চাহি আমি,
দ্বারে দ্বারে কেঁদে দিবাযামী!

নবাগত উৎপাত

মনে পড়ে আজ পলাশির প্রান্তর—
আসুরিক লোভ কামানের গোলা বারুদ লইয়া যথা
আগুন জ্বালিল স্বাধীন এ বাংলায়।

সেই আগুনের লেলিহান শিখা শ্মশানের চিতা সম
আজো জ্বলিতেছে ভারতের বুকে নিষ্ঠুর আক্রোশে।
দুই শতাব্দী নিপীড়িত এই দেশের নর ও নারী
আঁখিজল ঢালি নিভাতে নারিল সেই আগুনের শিখা।
এ কোন করালি রাক্ষুসি তার রক্ত-রসনা মেলি
মজ্জা অস্থি রক্ত শুষিয়া শক্তি হরিয়া যেন
চল্লিশ কোটি শবের উপরে নাচিছে তাথৈ থৈ !
অক্ষমা অভিশপ্তা শক্তি তামসী ভয়ঙ্করী।

চল্লিশ কোটি নরকঙ্কাল লয়ে এই অকরুণা
যাদুকরী নিশিদিন খেলিতেছে যাদু ও ভেল্কি, হায় !
যত যন্ত্রণা পাইয়াছি তত তার ভূত-প্রেত সেনা
হাসিয়া অট্টহাসি বিদ্রূপ করেছে শক্তিহীনে !

এ কাহার অভিশাপ সর্পিণী হয়ে জড়াইয়া আছে,
সারা দেহ মন প্রাণ জরজর করি কালকূট বিষে
লয়ে যায় যমলোকে !—হায়, যথা গঙ্গা যমুনা বহে—
যথায় অমৃত-মধু-রস-ধারা বর্ষণ হত নিতি,
যে ভারতে ছিল নিত্য শান্তি সাম্য প্রেম ও প্রীতি,
যে ভারতের এ আকাশ হইতে ঝরিত স্নিগ্ধ জ্যোতি
সে আকাশ আজ মলিন হয়েছে বোমা বারুদের ধূমে।
যে দেশে জ্বলিত হোমাগ্নি, সেথা বোমার আগুন এল,
ক্ষুধিত দৈত্য-শক্তি শকুনি হয়ে আজ ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়িয়া বেড়ায় আমাদের পচা গলা মাংসের লোভে।

হে পরম পুরুষোত্তম ! বলো, বলো, আর কতদিন
উদাসীন হয়ে রহিবে ?—তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নর
নিদারুণ যাতনায় নিশিদিন করিছে আর্তনাদ !
নিরস্ত্র দেশে লয়ে তব জ্যোতি সুন্দর তরবারি
দুর্বল নিপীড়িতের বন্ধু হইয়া প্রকাশ হও !
বন্দি আত্মা কাঁদে কারাগারে, 'দ্বার খোলো, খোলো দ্বার !
পরাধীনতার এই শৃঙ্খল খুলে দাও, খুলে দাও !
নিপীড়িত যেন নতুন পীড়ার যন্ত্রণা নাহি পায়,
প্রভু হয়ে নয়, বন্ধু হইয়া এসো বন্দির দেশে।'

বন্ধুরা এসো ফিরে

বন্ধুর পথে চলিব আবার, বন্ধুরা এসো ফিরে
সেই আগেকার নিত্য শুদ্ধ প্রাণ-প্রবাহের তীরে।
প্রিয়ার চেয়েও প্রিয় ছিল মোর তোমাদের ভালোবাসা,
আমাদের মাঝে ছিল কত ভালো, কত আলো, কত আশা।
মৃত পুত্রেরে ভুলেছি, ভুলিনি তোমাদের সেই প্রাণ,
আজো মনে হলে বক্ষ বহিয়া নামে রোদনের বান।
তোমাদের কাছে থাকি না, একেলা রাতে মনে পড়ে সব,
নিথর শান্ত আনন্দ-বীণা করে ওঠে কলরব!
বহ্নিগিরির উৎপাত সম এসেছিনু আমি কবে,
আজ মনে হয় স্বপ্ন—সেসব কথা কয় কেহ যবে।
চাঁদের মতন স্নিগ্ধ তোমরা মোরে করনি কো ভয়,
প্রেম-চন্দনে করেছিলে মোর অগ্নির দাহ ক্ষয়।
মোদের স্মৃতিতে জাগেনি কখনো জাতি-ধর্মের ভেদ,
মানুষে সবার বড় বলিতাম, মানিনি কোরান বেদ।
সহসা নিভিল আগুন! অগ্নি-গিরির পাষাণ বুকে
ফাগুনের ফুল ফুটিতে চাহিল অহেতুক কৌতুকে।
ছিল ফাগুনের ফুল কি লুকায়ে আগুনের ফুলকিতে,
দগ্ধ ললাট স্নিগ্ধ হইল নদী জল্ল উচ্ছ্বিতে!
বহুদিন পরে পথে যেতে যেতে হয়তো হয়েছে দেখা,
মনে হত মোরা হইনু দুজন, আর নহি আমি একা!

ও কথা থাকুক! রাগ করিও না যদি এই কথা বলি—
আনারকলির বাগানে কচুরিপানার কুসুম-কলি
আসিবে ভাসিয়া। বলিতে পার কি, মোর মনে হয় যেন—
শতদল হয়েছিনু যেথা, সেথা আজ দলাদলি কেন।
কোন আনন্দ-মৃণালে বদ্ধ ছিনু রস-সরসীতে,
সেই আনন্দ হারায়ে ছড়ায়ে পড়েছি কি ধরণীতে?
যথা নির্মল মধু ছিল, সেথা বিষ ওঠে মাঝে মাঝে,
সেই বিষ লেখা পড়ি, আর বুকে কাঁটার মতন বাজে।
মানুষে মানুষে যে হিংসা আজ এনেছে অকল্যাণ,
অভাবে পড়িয়া স্বভাব ভুলিব? গাহিব কি তারই গান?
কবি ও শিল্পী হওয়া এই দেশে দুর্ভাগ্যের কথা,
বেনে মাড়োয়ারি-ভুক্ত এদেশে বাঁচে না মাধবিলতা।

জানি সংবাদপত্রের যাঁরা মালিক, তাঁহারা রেগে,
অর্থের লোভে তাঁরাই এ বিদ্বেষ আনিয়াছে টেনে!
তাঁদেরই মেনে চলতে হবে কি? ঐ রাক্ষুসে লোভে
দেশের জাতির অকল্যাণের কারণ হব কি সবে?
আছে দুর্দিন দুর্গতি ঋণ, ভবনে ব্যাধির বাসা,
তারি তরে মোরা ভাঙিয়া দেবো কি ভারতের সাধ আশা?
দশটি লোকের বেড়ে যাবে বাড়ি, ব্যাঙ্কে জমিবে টাকা,
ভারত-ললাটে তারি তরে রবে মসী-কলঙ্ক আঁকা
আমাদের লেখা হয়ে? বন্ধু গো, অবুঝ চোখের বারি
এ কথা ভাবিতে বহে স্রোত সম, কিছুতে রুধিতে নারি।

বন্ধুরা ফিরে এস, আজো দেশে মুষ্টিভিক্ষা মেলে,
এ পাপের ক্ষমা নাই, কোটি বার নরক ঘুরিয়া এলে!
দেশের জাতির ক্ষতি করে তবে অন্ন পড়িবে পাতে?
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা লিখিতে লেখনি কাঁপে না হাতে?
লইব মাথায়, তোমরা সে পথে চল সে পথের ধূলি,
ক্ষমা কর, এর চেয়ে হও গিয়া রিক্সাওয়ালা কি কুলি!
এই মহা-অপরাধ করিও না, আপনারে প্রতারণা
করিয়া, হে সখা, ক্ষুধার অশুচি কদন্ন আনিও না!
অভিশপ্ত এ চাকরির টাকা অভিশাপ আনে ঘরে,
এই অপরাধে শান্তি কখনো পাইবে না ঘরে-পরে।
এই সাত কোটি বাঙালির ঘরে ঈর্ষা-আগুন জ্বালি
ভরিবে ভাতের থালা, সভাতলে নেবে মালা করতালি?
হে সখা, তোমরা জান, এ জীবনে বহু যশ আর মালা
পেয়েছি,—এ বুকে বিষের মতন আজো করে তাহা জ্বালা!
কেবলি আত্মপ্রতিষ্ঠা চাহে ভারতের নেতা যত,
উহাদেরই লোভে হতেছে দেশের কল্যাণ অপগত!

ফিরে এসো সেই অতীত দিনের বন্ধুরা, পায়ে ধরি,
এর চেয়ে, এস সহজ মৃত্যু-পথ ধরে মোরা মরি!
পলাতক ছিনু, ধরিয়া এনেছে নবযুগ পুন মোরে,
তোমরা না এলে নবযুগ পুন আসিবে কেমন করে?
সখা, তোমাদের সখ্য সাক্ষী! নেতা হইবার নেশা
কোনোদিন জাগে নাই এ জীবনে, এ নহে আমার পেশা।

পূর্ণের তৃষা ছাড়া সব কিছু নিয়েছেন কেড়ে 'তিনি'
—যাঁর ইচ্ছায় আমারে তাঁহার 'ইচ্ছা' বলিয়া চিনি।
তবু আসিলাম তবু ভাসিলাম আবার কর্ম-পথে
পরম পূর্ণ তিনিই সারথি হউন আমার রথে !
একার মুক্তি চাহিতে আমারে দেয়নি ইচ্ছা তাঁর,
পরম শূন্য হইতে ধূলিতে নামি তাই বারবার।
কিছুতেই যেন ভুলিতে নারি এ মাটির মায়ের মায়া,
মোর ধ্যানে হেরি আল্লার পাশে এই বাঙলার ছায়া !

আনন্দধাম বাঙলায় কেন ভূত-প্রেত এসে নাচে ?
দেশি পরদেশি ভূতেরা ভেবেছে বাঙালি মরিয়া আছে !
এ ভূত তাড়াব ; পাষাণ নাড়াব, চেতনা জাগাব সেথা,
ভায়ের বক্ষে কাঁদিবে আবার এক জননীর ব্যথা।
তোমরা বন্ধু, কেহ অগ্রজ, অনুজ, সোদর সম,
প্রার্থনা করি, ভাঙিয়া দিও না মিলনের সেতু মম !
এই সেতু আমি বাঁধিব আমার সারা জীবনের সাধ,
বন্ধুরা এস, ভেঙে দিব যত বিদেশীর বাঁধা বাঁধ।

নারী

হায় ফিরদৌসের ফুল !
ফুটিতে আসিলে ধূলির ধরায় কেন ?
সে কি মায়া ? সে কি ভুল ?
কোন আনন্দ-ধামে
জড়াইয়া ছিলে কোন একাকীর বামে ?
তাঁহারি জ্যোতির্মণিকা-কণিকা এসেছ প্রকৃতি হয়ে
সপ্ত আকাশ রসে ডুবাইয়া প্রেম ও মাধুরি লয়ে।
পরম জ্যোতির্দীপ্তিরে নাহি ডরিলে
পরম রুদ্রে প্রেম-চন্দন মাখায়ে স্নিগ্ধ করিলে !
শুভ্র জ্যোতির্পুঞ্জ-ঘন অরূপে
গলাইলে তুমি ময়ুরকণ্ঠী নবীন নীরদ রূপে !
নীল মেঘ হলে শক্তি বিজলি-লেখা
শূন্যবিহারী একাকী পুরুষে রহিতে দিলে না একা।

স্রষ্টা হইল প্রিয়–সুন্দর সৃষ্টিরে প্রিয়া বলি
কল্পতরুতে ফুটিল প্রথম নারী আনন্দ–কলি!
নিজ ফুলশরে যেদিন পুরুষ বিঁধিল আপন হিয়া,
ফুটিল সেদিন শূন্য আকাশে আদিবাণী—'প্রিয়া, প্রিয়া'!
আকাশ ছাইল অনন্তদল শতদলে আর প্রেমে,
শান্ত মৌনী এল যৌবন–চঞ্চল হয়ে নেমে।

কে দেখিত সেই পরম শূন্য, অসীম পাষাণ–শিলা,
সীমায় যদি না বাঁধিতে তাহারে না দেখাতে রূপ–লীলা!
কোন সে গোপন পরমাশ্রী প্রকৃতি লুকায়ে ছিলে?
ভুবনে ভুবনে ভবন রচিয়া রস–দীপে জ্বালাইলে!
অনন্তশ্রী ঝরে পড়ে নিতি অনন্ত দিকে তব,
তুমি এলে, তাই সম্ভাবনায় আসিল অসম্ভব!
হে পবিত্রা চির–কল্যাণী, কে বলে তোমায় মায়া;
এই সুন্দর রবি শশী তারা
গিরি প্রান্তর নদী–জল–ধারা
অসীম আকাশ সাগর ধরিতে পারে না তোমার কায়া,
তব রূপে দেখি না–দেখা পরম সুন্দরের সে ছায়া,—
কে বলে তোমায় মায়া?

তুমি তাঁর তেজ, তব তেজে জ্বলে আমার এই জীবন,
সূর্যের মতো চাঁদ সম আকাশের কোলে অনুখন।
মাতা হয়ে তুমি দিয়াছ এ মুখে প্রথম–স্তন্য–রস,
স্নেহ–অঞ্চলে বাঁধিয়া এ ঘর ছাড়ায়ে করেছ বশ।
যখনি পালাতে চাহিয়াছি বনে, কে তুমি অশ্রুমতী,
কাঁদিয়াছ মোর হৃদয়ে বসিয়া, রোধ করিয়াছ গতি?
সুন্দর প্রকৃতিরে হেরি মোর তৃষ্ণা জাগিল প্রাণে,
এত সুন্দর সৃষ্টি করে যে, সে থাকে সে–কোনখানে!
আমার পূর্ণ সুন্দরের যে পথের দিশারি তুমি,
তুমি ছায়া হয়ে সাথে চল যবে পার হই মরুভূমি?
যতবার নিভে যায় আশা–দীপ, ততবার তুমি জ্বালো,
শূন্য আঁধারে সম্মুখে জ্বলে তোমার আঁধারি আলো!

অনন্ত–ধারা প্রেমের ঝর্না কোথা লুকাইয়া ছিলে?
উদাসীন গিরি–পাষাণের হিয়া রসে ভাসাইয়া দিলে!

পাথরের বিগ্রহ হয়েছিল নিস্তেজ আদি-নর,
তেজোময়ী আদি-নারী সে পাষাণে কাঁপাইলে থরথর।
নিষ্কাম ঘন অরণ্যে সেই প্রথম কামনা—জুঁই
আঁখি মেলি যেন দেখিল সৃষ্টি, হেসে এক হল দুই!
এই দুই হয়ে দ্বন্দ্ব আসিল, ছন্দ জাগিল পায়,
সোনাতে কাঁকরে দুজনে মিলিয়া নূপুর বাজায়ে যায়!
সালাম লহ গো প্রণাম লহ গো প্রকৃতি পুণ্যবতী,
তব প্রেম দেখায়েছে গো চির আনন্দ-ধামের জ্যোতি!
প্রেমের প্রবাহ লইয়া যখন আস হয়ে উপনদী—
মরুতে মরে না নরের তৃষ্ণানদী—
সাগরের পানে ছুটে চলে নিরবধি।
পুরুষের জ্ঞান রসায়িত হয় প্রকৃতির প্রেমরসে,
তরবারি ধরে উদাসীন নর রণ-ক্ষেত্রে পশে!
যে দেশে নারীরা বন্দিনী, আদরের নন্দিনী নয়,
সে দেশে পুরুষ ভীরু কাপুরুষ জড় অচেতন রয়!
অভিশপ্ত সে দেশ পরাধীন, শৌর্য-শক্তি-হীন,
শোধ করেনি যে দেশ কল্যাণী সেবিকা নারীর ঋণ!
নারী অমৃতময়ী, নারী কৃপা—করুণাময়ের দান,
কল্যাণ কৃপা পায় না, যে করে নারীর অসম্মান!
'বেহেশত' স্বর্গ শুকাইয়া যায় প্রকৃতি না থাকে যদি,
জ্বলে না আগুন, আসে না ফাগুন, বহে না বায়ু ও নদী!
আজো রবি শশী ওঠে ফুল ফোটে নারীদের কল্যাণে,
নামে সখ্য ও সাম্য শান্তি নারীর প্রেমের টানে।
নারী আজো পথে চলে
তাই ধূলি-পথ হয় বিধৌত শুদ্ধ মেঘের জলে!
নারীর পুণ্য প্রেম আনন্দ রূপ রস সৌরভ
আজো সুন্দর করিয়া রেখেছে বিধাতার গৌরব!

নিত্য প্রবল হও

অন্তরে আর বাহিরে সমান নিত্য প্রবল হও!
যত দুর্দিন ঘিরে আসে, তত অটল হইয়া রও!
যত পরাজয়-ভয় আসে, তত দুর্জয় হয়ে উঠ,
মৃত্যুর ভয়ে শিথিল যেন না হয় তলোয়ার-মুঠো।

সত্যের তরে দৈত্যের সাথে করে যাও সংগ্রাম,
রণক্ষেত্রে মরিলে অমর হইয়া রহিবে নাম।
এই আল্লার হুকুম—ধরায় নিত্য প্রবল রবে,
প্রবলেই যুগে যুগে সম্ভব করেছে অসম্ভবে।
ভালোবাসেন না আল্লা, অবিশ্বাসী ও দুর্বলেরে,
'শেরে-খোদা' সেই হয়, যে পেয়েছে অটল বিশ্বাসেরে!
ধৈর্য ও বিশ্বাস হারায়, সে মুসলিম নয় কভু,
বিশ্বে কারেও করে না কো ভয় আল্লাহ্ যার প্রভু!
নিন্দাবাদের মাঝে 'আল্লাহ্-জিন্দাবাদ'-এর ধ্বনি
বীর শুধু শোনে, কোনো নিন্দায় কোনো ভয় নাহি গণি।
আল্লা পরম সত্য, ভয় সে ভ্রান্তির কারসাজি,
প্রচণ্ড হয় তত পৌরুষ, যত দেখে দাগাবাজি!
ভুলে কি গিয়াছ অসম সাহস নির্ভীক আরবির?
পারস্য আর রোমক সম্রাটের কাটিয়াছে শির!
কতজন ছিল সেনা তাহাদের? অস্ত্র কি ছিল হাতে?
তাদের পরম নির্ভর ছিল শুধু এক আল্লাতে!
জয় পরাজয় সমান গণিয়া করেছিল শুধু রণ,
তাদের দাপটে কেঁপে উঠেছিল পৃথিবীর প্রাঙ্গণ!
তারা দুনিয়ার বাদশাহি করেছিল ভিক্ষুক হয়ে,
তারা পরাজিত হয়নি কখনো ক্ষণিকের পরাজয়ে।
হাসিয়া মরেছে, করেনি কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
ইসলাম মানে বুঝেছিল তারা অসত্য সাথে রণ।
তা'রা জেনেছিল, দুনিয়ায় তারা আল্লার সৈনিক,
অর্জন করেছিল স্বাধীনতা নেয়নি মাগিয়া ভিখ!
জয়ী হতে হলে মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষ হইতে হয়,
শত্রু-সৈন্য দেখে কাঁপে ভয়ে, সে তো সেনাপতি নয়!
শত্রু-সৈন্য যত দেখে তত রণতৃষ্ণা তার বাড়ে,
দাবানল-সম তেজ জ্বলে ওঠে শিরায় শিরায় হাড়ে!
তলোয়ারে তার তত তেজ ফোটে যত সে আঘাত খায়,
তত বধ করে শত্রুর সেনা, রসদ যত ফুরায়।
নিরাশ হয়ো না! নিরাশা ও অদৃষ্টবাদীরা যত
যুদ্ধ না করে হয়ে আছে কেউ আহত ও কেউ হত!
যে মাথা নোয়ায়ে সিজদা করেছ এক প্রভু আল্লারে,
নত করিও না সে মাথা কখনো কোনো ভয় কোনো মারে!
আল্লার নামে নিবেদিত শির নোয়ায় সাধ্য কার।

আল্লা সে শির বুকে তুলে নেন, কাটে যদি তলোয়ার !
ভীরু মানবেরে প্রবল করিতে চাহেন যে দুনিয়াতে
তারেই ইমাম নেতা বলি আমি, প্রেম মোর তারি সাথে।
আড়ষ্ট নরে বলিষ্ঠ করে যাঁর কথা যাঁর কাজ,
তারি তরে সেনা সংগ্রহ করি, গড়ি তারি শির-তাজ !
গরিবের ঈদ আসিবে বলিয়া যে আত্মা রোজা রাখে,
পরমাত্মার পরমাত্মীয় বলে আমি মানি তাঁকে।
অকল্যাণের দূত যারা, যারা মানুষের দুশমন,
তাদের সঙ্গে যে দুরন্তেরা করিবে ভীষণ রণ—
মোর আল্লার আদেশে তাদেরে ডাক দিই জমায়াতে,
অচেতন ছিল যারা, তারাও আসিছে সে তীর্থ-পথে।
আমি তকবির-ধ্বনি করি শুধু কর্ম-বধির কানে,
সত্যের যারা সৈনিক তারা জমা হবে ময়দানে !
অনাগত 'নবযুগ'—সূর্যের তূর্য বাজায়ে যাই,
মৃত্যু বা কারাগারের আমার কোন ভয় দ্বিধা নাই।
একা 'নবযুগ'—মিনারে দাঁড়ায়ে কাঁদিয়া সকলে ডাকি,
দর্মার হাঁস না আস, আসিবে মুক্ত-পক্ষ পাখি।
এ পথে ভীষণ বাজপাখি আর নিঠুর ব্যাধের ভীতি,
আলোক-পিয়াসী পাখিরা তবুও আসিছে গাহিয়া গীতি।

মৃত্যু-ভয়াক্রান্ত আজিকে বাঙলার নরনারী,
তাদের অভয় দিতেই আমরা ধরিয়াছি তরবারি।
আমরা শুনেছি ভীত আত্মার সকরুণ ফরিয়াদ,
আমরা তাদের রক্ষা করিব, এ যে আল্লার সাধ !
আমরা হুকুমবর্দার তাঁর পাইয়াছি ফরমান,
ভীত নর-নারী তরে অকাতরে দানিব মোদের প্রাণ।
বাজাই বিষাণ উড়াই নিশান ঈশান-কোণের মেঘে,
প্রেম-বৃষ্টি ও বজ্র-প্রহারে আত্মা উঠিবে জেগে !
রাজনীতি করে তৈরি মোদের কুচকাওয়াজের পথ,
এই পথ দিয়ে আসিবে দেখিও আবার বিজয়-রথ।
প্রবল হওয়ার সাধ ও সাধনা যাহাদের প্রাণে আছে,
তাদেরি দুয়ারে হানা দিই আমি, আসি তাহাদেরই কাছে।
সঙ্ঘবদ্ধ হতেছে তাহারা বঙ্গভূমির কোলে,
আমি দেখিয়াছি পূর্ণচন্দ্র তাদেরই ঊর্ধ্বে দোলে !

আগ্নেয়গিরি বাঙলার যৌবন

ঘুমাইয়া ছিল আগ্নেয়গিরি বাঙলার যৌবন,
বহু বৎসর মুখ চেপে ছিল পাষাণের আবরণ।
তার এ ঘুমের অবসরে যত ধনলোভী রাক্ষস
প্রলোভন দিয়ে করেছিল যত বুদ্ধিজীবীরে বশ।
অর্থের জাব খাওয়ায়ে তাদের বলদ করিয়ে শেষে
লুটতরাজের হাট ও বাজার বসাইল সারা দেশে।
সেই জাব খেয়ে বুদ্ধিওয়ালার হইল সর্বনাশ,
'শুদ্ধি স্বামী' ও 'বুদ্ধ মিঞা'-র হইল তাহারা দাস!
বুঝিল না, এই শুদ্ধি স্বামী ও বুদ্ধু মিঞারা কারা
খাওয়ায় কাগুজে পুরিয়ায় পুরে এরাই আফিম, পারা!
সাত কোটি এই বাঙালির সাত জনে শুধু টাকা দিয়ে
দাস করে, এরা হল কোটিপতি বাঙালি রক্ত পিয়ে।
কাগুজে মগুজে ধূর্ত বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিবলে,
ছুরি আর লাঠি ধরাইয়া দিল বাঙালির করতলে।
জানে এরা ভায়ে ভায়ে হেথা যদি নাহি করে লাঠালাঠি,
কেমন করিয়া শাঁস শুষে খাবে, ইহাদের দিয়া আঁটি?
আঁটি খেয়ে যবে ভরে না কো পেট, শূন্য বাটি ও থালা,
বাঙালি দেখিল, এত পাট, ধান, মেটে না ক্ষুধার জ্বালা!
তখন বিরাট আগ্নেয়গিরি বাঙলার যৌবনে
নাড়া দিয়া যেন জাগাইয়া দিল ঝঞ্ঝা প্রভঞ্জনে!
জেগে উঠে দেখে রক্তনয়নে আগ্নেয়গিরি একি!
ওরি ধান ওরি বুকে কুটিতেছে বিদেশি কল ও ঢেঁকি!
উহারি বিরাট অঙ্গে উঠেছে মিলের চিমনিরাশি,
উহারি ধোঁয়ায় ধোঁয়াটে হয়েছে আঁখির দৃষ্টি, হাসি।
এ কোন যন্ত্রদৈত্য আসিয়া যন্ত্রণা দেয় দেহে?
দাসদাসী হয়ে আছে নরনারী স্বীয় পৈতৃক গেহে।
একি কুৎসিত মূর্তিরা ফেরে আগুনের পর্বতে,
কাঙালির মতো, বাঙালি কি ওরা—লেজ ধরে চলে পথে?
ভুঁড়ি-দাস আর নুড়ি-দাস যত মুড়ি খায় আর চলে,
যে-কথা উহারা বলাইতে চায়, চিৎকার করে বলে!
বিদারিত হল বহ্নিগিরির মুখের পাষাণভার,
কাঁপিয়া উঠিল লোভীর প্রাসাদ ভীম কম্পনে তার!

ক্রোধ হুঙ্কার ওঠে ঘন ঘন প্রাণ-গহ্বর হতে,
'লাভা' ও অগ্নিশিখা উঠে ছুটে ঊর্ধ্বে আকাশপথে।

কে রে কে রে স্বৈরাচারীরা বৈরী এ বাঙলার ?
দৈন্য দেখেছ ক্ষুদ্রের, দেখনি কো প্রবলের মার !
দেখেছ বাঙালি দাস, দেখনি কো বাঙালির যৌবন,
অগ্নিগিরির বক্ষে বেঁধেছ যক্ষ তব ভবন !
হের, হের, কুণ্ডলি-পাক খুলি আগ্নেয় অজগর
বিশাল জিহ্বা মেলিয়া নামিছে ক্রোধ নেত্র প্রখর।
ঘুমাইয়া ছিল পাথর হইয়া তার বুকে যত প্রাণ,
অগ্নিগোলক হইয়া ছুটিছে তীরবেগে সে পাষাণ !
নিঃশেষ করে দেবে আপনারে আগ্নেয়গিরি আজি,
ফুলঝুরি-সম ঝরিবে এবার প্রাণের আতসবাজি !
ঊর্ধ্বে উঠেছে ক্রুদ্ধ হইয়া অদেখা আকাশ ঘেরি ;
তোমাদের শিরে পড়িবে আগুন, নাই বেশি আর দেরি !
তোমাদের যন্ত্রের এই যত যন্ত্রণা-কারাগার
এই যৌবনবহ্নি করিবে পুড়াইয়া ছারখার।
সুতি ধুতি পরা দেখেছ বিনয়-নম্র বাঙালি ছেলে,
ঢল ঢল চোখ জলে ছলছল একটু আদর পেলে !
দুধ পায় নাই, মানুষ হয়েছে শুধু শাকভাত খেয়ে,
তবুও কান্তি মাধুরি ঝরিছে কোমল অঙ্গ বেয়ে।
তোমাদের মত পালোয়ান নয়, নয় মাংসল ভারী,
ওরা কৃশ, তবু ঝকমক করে সুতীক্ষ্ণ তরবারি !
বঙ্গভূমির তারুণ্যের এ রঙ্গনাটের খেলা
বুঝেও বোঝেনি যক্ষ রক্ষ, বুঝিবে সে শেষ বেলা !

শাড়ি-মোড়া যেন আনন্দ-শ্রী দেখো বাঙলার নারী,
দেখনি এখনো, ওঁরাই হবেন অসি-লতা তরবারি !
ওরা বিদ্যুল্লতা-সম, তবু ওরাই বজ্র হানে,
ওরা কোথা থাকে, তোমরা জান না, সাগর ও মেঘ জানে।
যুগান্তরের সূর্য যখন উদয়-গগনে ওঠে,
সূর্যের টানে ছুটে আসে মেঘ ; তাহারি আড়ালে ছোটে
ওরা যেন ভীরু পর্দানশীন ! ওরাই সময় হলে
ঘন ঘন ছোঁড়ে অশনি অত্যাচারীর বক্ষতলে !
শ্যামবঙ্গের লীলা সে ভীষণ সুন্দর, রেখো জেনে,
বাঘের মতন নাগের মতন দেখে, যে বাঙালি চেনে !

তাদেরই জড়তা-পাষাণ টুটিয়া ঝরিছে অগ্নিশিখা,
কে জানে কাহার তকদিরে ভাই কি শাস্তি আছে লেখা!
ধোঁওয়া দেখে যদি না নোওয়াও মাথা, বছর খানিক বেঁচো!!
দেখিবে হয়েছি ফেরেশতা মোরা, তোমরা হয়েছ কেঁচো!

তুমি কি গিয়াছ ভুলে?

তুমি কি গিয়াছ ভুলে?
তোমার চরণ-স্মরণ-চিহ্ন আজো মোর নদীকূলে
মুছিল না প্রিয়, মুছিল না তার বুকে যে লিখিলে লেখা,
মাঝে বহে স্রোত, দুকূল জুড়িয়া চরণ-স্মরণ-রেখা!
বন্যার ঢল, জোয়ার, উজান আসে যায় ফিরে ফিরে,
ও চরণ রেখা মুছিল না মোর বালুচরে নদীতীরে!
ঊর্ধ্বে ধূসর সান্ধ্য আকাশে ক্ষীণ চন্দ্রের লেখা,
নিম্নে আমার শূন্য বালুচরে তোমার চরণরেখা।

কূলে আসি একা বসি
তব মুখ-মদ-গন্ধের মতো ফুলবন ওঠে শ্বসি।
কূলে একা বসি ঢেউ গণি আর চাহি ওপারের তীরে—
প্রভাতে যে পাখি উড়িল সে আর সাঁজে ফিরিল না নীড়ে।
এই বালুচর শূন্য ধূসর আমার এ মরুভূমি
কেন এ শূন্যে চরণচিহ্ন এঁকে দিয়ে গেলে তুমি?
হেরিনু, আকাশে ওঠেনি কো চাঁদ—শূন্য আকাশ কাঁদে,
ও বিরাট বুক ভরিয়া তোলে কি ঐটুকু ক্ষীণ চাঁদে?

চলে যাওয়া দিনগুলি
মনের মানিক-মঞ্জুষা হতে খুলে দেখি, রাখি তুলি।
কতবার আসি ফিরে যাই বেয়ে তোমার দেশের নদী,
কত বধূ আসে জল নিতে সেথা তুমি সেথা আস যদি।
তোমার কলসি-হিল্লোল যদি মোর নায়ে এসে লাগে
দুটি চেনা চোখ সন্ধ্যাদীপের মতো যদি সেথা জাগে...
কতদিন সাঁঝে হইয়াছে মনে, তোমারে বা দেখিয়াছি,
তরণীতে কার চেনা বাঁশি শুনে আসিয়াছ কাছাকাছি।

আঁচল ভরিয়া জলে-ভেজা রাঙা হিজলের ফুলগুলি
কুড়াতে তোমার ঘোমটা খসেছে, এলো খোঁপা গেছে খুলি !

সর্পিল বাঁকা বেণী
ওর সাথে ছিল মোর আঙুলের চিরদিন চেনাচেনি !
ঐ সে বেণীর বিনুনিতে মোর বাঁধা পড়েছিল হিয়া,
কতদিন তারে ছাড়াতে চেয়েছি আমার আঙুল দিয়া !
দাঁড়ায়েছ আসি, সোনা-গোধূলিতে আকাশ গিয়েছে ভরে,
পিছনের কালো-বেণীতে সন্ধ্যা বাঁধা পড়ে কেঁদে মরে।
বাঁশিতে কাঁদিয়া ফিরিয়া এসেছি তরণী বাহিয়া দূরে,
আমার নিশাসে নাহি নেভে যেন প্রদীপ তোমার পুরে !
ছল করে যবে জল নিতে যাও, নদী তরঙ্গে, হায় !
তরঙ্গ কি গো দুলে ওঠে মনে, কলসি ভাসিয়া যায় ?
নয়নের নীরে তুমি ডোবো, ডোবে কলসি নদীর জলে ?
অথবা কাঁখের কলসিই শুধু ডুবাতে শিখেছ ছলে ?

যত চাই সব ভুলি,
আঁধার ভরিয়া ডাকে আঙনের তব ঝাউগাছগুলি।
তব অঙ্গুলি-ইঙ্গিত যেন ওদের শীর্ণ শাখা
হাহাকার করে আকাশে চাহিয়া, বাতাসে ঝাপটে পাখা।
ভুলিবার কথা ভুলে যাই, হায়, বন্দিনী মোর পাখি,
পিঞ্জর-পাশে আসি যাই ফিরে, আকাশে থাকিয়া ডাকি।

ফিরে আসি একা নীড়ে,
ক্লান্তপক্ষ বসে বসে ভাবি ভাঙা মোর তরুশিরে।
দশদিক ভরে কলরব করে অচেনারা ছুটে আসে,
তুমি নাই তাই ঘিরিয়া সবাই বসে মোর আশেপাশে।
না চাহিতে কেহ পাখায় আমার বাঁধে অসহায় পাখা,
তৃষিত অধরে নিয়ে যায় ভরে বিষ মোর ঠোঁটে মাখা।

আজ আমি অপরাধী,
অভিমান-জ্বালা নিবারিতে নিতি অপরাধ করি—কাঁদি !
যে আসে এ বুকে তাহারি হৃদয়ে তোমার হৃদয় খুঁজি,
খুঁজিতে খুঁজিতে হারায়ে ফেলেছি মোর হৃদয়ের পুঁজি।
শূন্য আকাশে ওঠে না কো চাঁদ, উল্কারা আসে ছুটে,
আগুনের তৃষা মিটাই তাদের অগ্নি-অধর-পুটে !

তুমি কি গিয়াছ ভুলে?
মম পথ পানে চাহ কি আজিও সন্ধ্যা-প্রদীপ তুলে
নিবাও নিবাও ও-সন্ধ্যাদীপ, চাহিও না মোর পথে,
মরণের রথে উঠেছে, উঠিত যে তবে সোনার রথে।
কুসুমের মালা দুদিনে শুকায়, থাক অতীতের স্মৃতি—
শুকাবে না যাহা—আমার গাঁথা এ কাঁটার কথার গীতি!

চির-বিদ্রোহী

হার মেনেছ বিদ্রোহীকে বাঁধতে তুমি পারবে না!
তোমার সর্বশক্তি আমায়
বাঁধতে গিয়ে হার মেনে যায়!
হায়! হাসি পায়, হেরেও তুমি হারবে না?
হেরে গেলে! বিদ্রোহীকে বাঁধতে তুমি পারবে না।

অশান্ত এ ধূমকেতুকে ঘুম পাড়াবে কোন মায়া?
তোমার সর্বমায়ার কাঁদন,
মার মমতা প্রেমের বাঁধন
স্পর্শ করে বিদগ্ধ হয়, রুদ্রস্বরূপ মোর কায়া।
অশান্ত এ ধূমকেতুকে ঘুম পাড়াবে কোন মায়া?
ধরতে আমায় জাল পেতেছে জটিল তোমার সাত আকাশ!
সে জাল ছিড়ে এ ধূমকেতু
বিনাশ করে বাঁধার সেতু,
সপ্ত স্বর্গ পাতাল ঘিরে ভস্ম করে সকল বিঘ্ন সর্বনাশ।
এই ধূমকেতু ছিড়ে সে জাল
এই মহাকাল! রুদ্র দামাল
শূন্যে নাচে প্রলয়-নাচন সংহারিয়া সর্বনাশ।

শান্তি দিয়ে অশান্তকে ধরার ধুলায় আনতে চাও,
দুর্গে এনে দুরন্তকে—
অশ্রু চাহ রুক্ষ চোখে!
আমার আগুন নিভবে না কো যতই গলায় মালা দাও!
শান্তি দিয়ে অশান্তকে ধরার ধুলায় আনতে চাও!

সংহার মোর ধর্ম, আমি বিপ্লব ও ঝঞ্ঝা ঝড়,
স্বধর্মে নিধন ভালো—
কেন আনো প্রেমের আলো?
সতী–দেহত্যাগের পর শঙ্কর কি বাঁধে ঘর?
আনন্দ আর অমৃত রস কার আগুনে যায় জ্বলে?
শান্তি সমাহিতের মাঝে
কেন রুদ্র বিষাণ বাজে?
কোন যাতনায় শিশু কাঁদে, শান্তি পায় না মার কোলে?

লক্ষ্মীছাড়ার হাতে তুমি ঐশ্বর্য চাও দিতে?
লোভী ভোগীলক্ষ্মী লয়ে
রাক্ষস আর দৈত্য হয়ে
কি নির্যাতন করছে তোমার সৃষ্টিতে।
লক্ষ্মীছাড়ার হাতে তুমি ঐশ্বর্য চাও দিতে?

করব আমি ধ্বংস সর্ব বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বকে।
মিথ্যা হল কোরান ও বেদ
এই অসাম্য অশান্তি ভেদ
প্রলয়কে কি বাঁধতে পারে বলয়–পরা নর্তকী!
এখানে সিংহ থাকে!
অহিংস সব মহাত্মাকে
দাও গিয়ে ঐ হরিনামের হরতকি!
রুদ্রকে কে শূদ্র করে
ক্ষুদ্র ধরায় রাখবে ধরে।
অহম শিকল কে পরাবে সোহম স্বয়ম্ভূকে।

হে মৌনী, উত্তর দাও সামনে এসে রূপ ধরে,
পূজা করে ক্ষমা করে
তোমার মানুষ জনম ভরে,
কী দিয়েছ তাদের বলো, থেকো না কো চুপ করে!

কেন দুর্বলেরে করে প্রবল নির্যাতন?
এই সুন্দর বসুন্ধরা
রাক্ষস আর দৈত্য–ভরা
কেমন করে করব তোমায় অভেদ বলে সম্ভাষণ।

লজ্জা তোমার হয় না যখন তোমায় বলে কৃপাময় !
পুত্র মরে, মা তবু, হায় !
প্রেমভরে ডাকে তোমায় ;
ওগো কৃপণ ! বিশ্বে তোমার দাতা বলে পরিচয় !

কেন পাপ ও অপরাধের কথা তোমার শাস্ত্র কয় !
কে দিল মানবজন্ম,
কে দিল ধর্মাধর্ম,
মুক্ত তুমি, মানুষ কেন এ বন্ধন–জ্বালা সয় ?

তুমি বল, 'আমার একা তোমার উপর অধিকার।'
সেই অধিকার তোমার পরে
বলো কেন দাও না মোরে ?
তোমার মতো পূর্ণ হব, এই ছিল মোর অহঙ্কার !

মনের জ্বালা স্নিগ্ধ নাহি করে তোমার চন্দ্রালোক !
এত কুসুম এত বাতাস
কেন তবু এ হাহুতাশ,
কোন শোকে অশান্তিতে দেবতা হয় চণ্ডাশোক !

কেন সৃষ্টি করলে নরক জন্মায়নি যখন মানব !
কেন তাদের ভয় দেখাও ?
ভয় দেখিয়ে ভক্তি চাও ?
তোমার পরম ভক্তেরা তাই হয় শয়তান, হয় দানব।

বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান।
তোমার ধরার দুঃখ কেন
আমায় নিত্য কাঁদায় হেন ?
বিশৃঙ্খল সৃষ্টি তোমার, তাই তো কাঁদে আমার প্রাণ !
বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান !

বিদ্রোহ মোর থামবে কিসে, ভুবন–ভরা দুঃখশোক !
আমার কাছে শান্তি চায়
লুটিয়ে পড়ে আমার গায়—
শান্ত হব আগে তারা সর্বদুঃখ–মুক্ত হোক !

ভয় করিও না, হে মানবাত্মা

তখতে তখতে দুনিয়ায় আজি কমবখতের মেলা,
শক্তি-মাতাল দৈত্যেরা সেথা করে মাতলামি খেলা।
ভয় করিও না, হে মানবাত্মা, ভাঙিয়া পড়ো না দুখে,
পাতালের এই মাতাল রবে না আর পৃথিবীর বুকে।
তখতে তাহার কালি পড়িয়াছে অবিচারে আর পাপে,
তলোয়ারে তার মরিচা ধরেছে নির্যাতিতের শাপে।
ঘন গৈরিকে আকাশ রাঙায়ে বৈশাখী ঝড় আসে,
ভাবে লোভান্ধ মানব, তাহার গোধুলি-লগন হাসে !
যে আগুন ছড়ায়েছে এ বিশ্বে, তারি দাহ ফিরে এসে
ভীম দাবানল-রূপে জ্বলিতেছে তাহাদেরি দেশে দেশে।

সত্য পথের তীর্থ-পথিক ! ভয় নাই, নাহি ভয়,
শান্তি যাদের লক্ষ্য, তাদের নাই নাই পরাজয় !
অশান্তি-কামী ছলনার রূপে জয় পায় মাঝে মাঝে,
অবশেষে চির-লাঞ্ছিত হয় অপমানে আর লাজে !
পথের ঊর্ধ্বে ওঠে ঝোড়ো বায়ে পথের আবর্জনা
তাই বলে তারা ঊর্ধ্বে ওঠেছে—কেহ কভু ভাবিও না !
ঊর্ধ্বে যাদের গতি, তাহাদেরি পথে হয় ওরা বাধা ;
পিচ্ছিল করে পথ, তাই বলে জয়ী হয় না কো কাদা !
জয়ে পরাজয়ে সমান শান্ত রহিব আমরা সবে,
জয়ী যদি হই, এক আল্লার মহিমার জয় হবে !
লাঞ্ছিত হলে বাঞ্ছিত হব পরলোকে আল্লার,
রণভূমে যদি হত হই মোরা হব চির-প্রিয় তাঁর !
হয়তো কখনো জয়ী হবে ওরা, হটিব না মোরা তবু,
বুঝিব মোদের পরীক্ষা করে মোদের পরম প্রভু !

বিদ্বেষ লয়ে ডাকিলে কি কভু পথভ্রান্ত ফিরে ?
ভালোবাসা দিয়ে তাদেরে ডাকিতে হয় বক্ষের নীড়ে।
সজ্ঞানে যারা করে নিপীড়ন, মানুষের অধিকার
কেড়ে নিতে চায়, তাহাদেরি তরে আল্লার তলোয়ার।
অজ্ঞান যারা ভুল পথে চলে, মারিও না তাহাদেরে,
ভালোবাসা পেলে ভ্রান্ত মানুষ সত্যের পথে ফেরে।
সকল জাতির সকল মানুষে এক তাঁর নামে ডাকো,
বুকে রাখো তাঁর ভক্তি ও প্রেম, হাতে তলোয়ার রাখো।

সর্ববিশ্বে প্রসন্ন হয় তিনি প্রসন্ন হলে,
সত্য পথের সর্বশত্রু ছাই হয়ে যায় জ্বলে !
আমাদেরও মাঝে যার বুকে আছে লুকাইয়া প্রলোভন,
তারেও কঠিন সাজা দিতে হবে, আল্লার প্রয়োজন !

আগে চলো, আগে চলো দুর্জ্জয় নব অভিযান-সেনা,
আমাদের গতি-প্রবাহ কাহারো কোনো বাধা মানিবে না।
বিশ্বাস আর ধৈর্য হউক আমাদের চির-সাথী,
নিত্য জ্বলিবে আমাদের পথে সূর্য চাঁদের বাতি।
ভয় নাহি, নাহি ভয় !
মিথ্যা হইবে ক্ষয় !
সত্য লভিবে জয় !
ভক্তে দেখায় রক্তচক্ষু যারা তারা হবে লয় !
বলো, এ পৃথিবীতে মানুষের, ইহা কাহারো তখত নয় !

পুণ্য তখতে বসিয়া যে করে তখতের অপমান,
রাজার রাজা যে, তাঁর হুকুমেই যায় তার গর্দ্দান !
ভিস্তিওয়ালার রাজত্ব, ভাই, হয়ে এল ঐ শেষ ;
বিশ্বের যিনি সম্রাট তাঁরি হইবে সর্বদেশ !
রক্তচক্ষু রক্ষ যক্ষ, সাবধান ! সাবধান !
ভুল বুঝাইয়া, বুঝেছ ভুলাবে আল্লার ফরমান ?
এক আল্লারে ভয় করি মোরা, কারেও করি নাভয়,
মোদের পথের দিশারি এক সে সর্বশক্তিময়।
সাক্ষী থাকিবে আকাশ পৃথিবী, রবি শশী গ্রহ তারা,
কাহারা সত্যপথের পথিক, পথভ্রষ্ট কারা !
ভয় নাহি, নাহি ভয় !
মিথ্যা হইবে ক্ষয় !
সত্য লভিবে জয় !

সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি

রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসে তোমার আসিনি সজল মেঘের ছায়া,
তৃষ্ণা-আতুর হরিণীর চোখে কি হবে হানিয়া মরীচি-মায়া !

আমি কালো মেঘ—নামি যদি তব বাতায়ন-পাশে বৃষ্টিধারে,
বন্ধ করিয়া দিবে বাতায়ন, যদি ভিজে যাও নয়নাসারে !
সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি, বাদল রাতের পাপিয়া নহ,
তব তরে নয় বাদলের ব্যথা—নয়নের জল দুর্বিষহ।
ফাল্গুন-বনে মাধবী-বিতানে যে পিক নিয়ত ফুকারি ওঠে,
তুমি চাও সেই কোকিলের ভাষা তোমার রৌদ্রতপ্ত ঠোঁটে।
জানি না সে ভাষা, হয়তো বা জানি, ছল করে তাই হাসিতে চাহি,
সহসা নিরখি নেমেছে বাদল রৌদ্রজ্জ্বল গগন বাহি।
ইরানি-গোলাব-আভা আনিয়াছ চুরি করি ভরি ও রাঙা তনু,
আমি ভাবি বুঝি আমারি বাদল-মেঘ-শেষে এল ইন্দ্রধনু।
ফণীর ডেরায় কাঁটার কুঞ্জে ফোটে যে কেতকী, তাহার ব্যথা
বুঝিবে না তুমি, ধরণী তো তব ঘর নহে, এলে ভ্রমিতে হেথা।
ভ্রম করে তুমি ভ্রমিতে ধরায় এসেছ ফুলের দেশের পরি,
জানিতে না হেথা সুখদিন শেষে আসে দুখ-রাতি আঁধার করি।
রাঙা প্রজাপতি উড়িয়া এসেছ চপলতা-ভরা চিত্র-পাখা,
জানিতে না হেথা ফুল ফুটে, ফুল ঝরে যায়, কাঁদে কানন ফাঁকা।
যে লোনা জলের সাত সমুদ্র গ্রাস করিয়াছে বিপুল ধরা,
সেই সমুদ্রে জনম আমার, আমি সেই মেঘ সলিল ভরা।
ভাসিতে যে আসে আমার সলিলে তাহারে ভাসায়ে লইয়া চলি
সেই অশ্রুর সপ্ত পাথারে, পারায়ে ব্যথার শতেক গলি।
ভুল করে প্রিয়া এ ফুল-কাননে এসেছিলে, জানা ছিল না তব
এ বন-বেদনা অশ্রুমুখীরে ; এ নহে মাধবী কুঞ্জ নব।
মাটির করুণা-সিক্ত এ মন, হেথা নিশিদিন যে ফুল ঝরে
তারি বেদনায় ভরে আছে মন, হাসিতে তাদেরই অশ্রু ক্ষরে।
সেই বেদনায় এসেছিলে তুমি ক্ষণিক স্বপন, ভুলের মেলা,
জাগিয়া তাহারি স্মৃতি লয়ে কাটে আমার সকাল সন্ধ্যাবেলা।
এ মোর নিয়তি, অপরাধ নহে আমারও তোমারও—স্বপন রানি !
আমার বাণীতে তোমার মুরতি বীণাপাণি নয় বেদনা-পাণি।
তোমার নদীতে নিতি কত তরী এপার হইতে ওপারে চলে ;
কাণ্ডারীহীন ভাঙা তরী মোর ডুবে গেল তব অতল তলে।
ওরা শুধু তব মুখ চেয়ে যায়, সুখের আশার বণিক ওরা,
আমি ডুবে তব দেখিলাম তল জলশেষে চোরা বালুতে ভরা।
ভয় নাই প্রিয়, মগ্ন এ তরী তব বিস্মৃতি-বালুকাতলে
দুদিনে পড়িবে ঢাকা, উদাসিনী, তুমি বয়ে যাবে চলার ছলে।

কুড়াতে এসেছ দুখের ঝিনুক ব্যথার আকুল সিন্ধুকূলে,
আঁচল ভরিয়া কুড়ায়ে হয়তো ফেলে দেবে কোথা মনের ভুলে।
তোমাদের ব্যথা-কাঁদন যেটুকু সে শুধু বিলাস, পুতুল-খেলা,
পুতুল লইয়া কাটে চিরদিন, আদর করিয়া ভাঙিয়া ফেলা।
মোর দেহ-মনে নয়নে ও প্রেমে অশ্রুসজল নীরদ মাখা,
কী হবে ভিজিয়া এ বাদলে, রানি, তব ধ্যান ঐ চন্দ্র রাকা।
সে চাঁদ উঠেছে গগনে তোমার-আমরা সন্ধ্যা-তিমির শেষে,
আমি যাই সেই নিশীথিনী-পারে যেথায় সকল আঁধার মেশে।
আমার প্রেমের বরষায় ধুয়ে তব হৃদি হল সুনীলতর—
সে গগনে যবে উঠিবে গো চাঁদ উজ্জ্বলতর তাহারে করো।
যদি সে চন্দ্র-হসিত নিশীথে বিস্বাদ লাগে তোমার চোখে,
তোমার অতীত তোমারে খুঁজিও আমার বিধুর গানের লোকে।
সেথা ব্যথা রবে, রবে সান্ত্বনা, রবে চন্দন-সুশীতলতা,
যে ফুল জীবনে ঝরে না সে ফুল হইয়া ফুটিবে তোমার ব্যথা।
আমার গানের চির-দাহ যাহা সে আছে গো নীলকণ্ঠে মম,
চির-শেষে এল যে অমৃতবাণী, দিনু তা তোমারে, হে প্রিয়তম !
আমার শাখায় কণ্টক থাক, কাঁটার উর্ধ্বে তুমি যে ফুল—
আমি ফুটায়েছি তোমারে কুসুম করিয়া, হে মোর সুখ অতুল।
বিদায়-বেলায় এই শুধু চাই, হে মোর মানস-কানন-পরী !
তোমার চেয়েও তব বন্ধুরে ভালোবাসি যেন অধিক করি।

হুল ও ফুল

ওরা কয়, 'আগে ফুল ফুটাইতে,
এখন ফুটাও হুল।'
আমি কই 'যদি হুল না ফুটাই
ফুটিবে কি তবে ফুল?' ('ফুল'-ইং)
বন্ধু মিথ্যা অপত্য-স্নেহে
আপত্তি নাহি করি
ধর্ম লয়েছে অধর্ম নামে,
সত্য গিয়াছে মরি !
গায়ের বৌঝি জল নিতে যায়
মেছুড়ে বুঝিতে নারে,
গাল দেয় রেগে—ইহাদেরই দোষে
মাছ বসে না কো চারে !
ভোগী বলে, 'বাবা, কেন কাঁদো তুমি,
মামা নহে তব চাষা,
ধনীর দুঃখ দেখ না কো, এ কি
একঘেঁয়ে ভালোবাসা !'
'আল্লা বলান' বলি ! ওরা বলে—
'দালানে তা আসে কেন?
টাকাওয়ালাদের কি করে চিনিলে,
তুমি তো আল্লা চেন !'

ওরা বলে, 'মোরা টাকার পুকুর দুয়ারে খুঁড়িয়া রাখি,
উহারাই তার দু-এক কলসি জল ভরে নেয় নাকি?
আরো বলে, 'দিই কলসিতে জল দিই না তো সাথে দড়ি,
আমরা কী জানি, কেন এ পুকুরে ওরা ডুবে যায় মরি?'
ওরা বলে, 'চাষা খাইতে পায় না— আর জন্মের পাপ,
পাওনা সুদের নালিশ করিলে ওরা কেন দেয় শাপ?'
মোরা যত দিই উত্তর তার ওরা 'দুত্তোর' কহে,
বলে, 'জমিদারি স্বত্ব আমার, তোমার মামার নহে।'
মোরা বলি, 'কত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে তোমার টাকা!'
ওরা বলে, 'কোনো কাজে তা লাগে না, (বাবা) 'ফিকসড ডিপোজিটে' রাখা
মোরা বলি, 'মোরা যাব না, মোদের প্রাপ্য যা তা না পেলে!'
ওরা বলে, 'কেন জেলে যাবে, বাবা, ভদ্রলোকের ছেলে!'
আমি বলি, 'জাগ, দৈত্যরে মার, দা' নিয়ে দুয়ার খুল।'
ওরা বলে, 'বাঘ হলে কেন বন- বাগিচার বুলবুল?'
আমি বলি, 'কেন অসত্য বল, ভ্রান্ত পথ দেখাও?'
ওরা বলে, আহা, চুপ করো কবি, ফুল শোঁকো, মধু খাও!'
আমি বলি, 'চোর ঢুকিয়াছে ঘরে, মারো তারে পায়ে দলে!'
ওরা বলে, 'বাঁশুরিয়া! বাঁশি কেন বংশ-দণ্ড হলে!'
ওরা বলে, 'দাদা, এতদিন তুমি বেশ তো ঘুমায়ে ছিলে!
কখন হইল 'ইনসমনিয়া'? সারা দেশ জাগাইলে!'
আমি বলি, 'দেশ জাগে যদি, কেন তোমাদের ডর লাগে?'
ওরা বলে, 'আসে রাম-দা লইয়া। রামদা বলিত আগে!'
কে যে বলে ঠিক, কে বলে বেঠিক, ঠিকে ভুল হয় কার?
চাষা ও মজুর ঠকাইয়া খায় দুনিয়ার ঠিকাদার!
'ওরা তো বলে না, তুমি কেন বল, কেন তব মাথাব্যথা?'
জিজ্ঞাসা সাধু।—আমি বলি, 'কহে ওদেরি আত্মকথা!'
হায় রে দুনিয়া দেখি মৌলানা মৌলবিতে একাকার,
আমি একা হেথা কাফের রে দাদা আমি একা গুনাগার!
গুনাগারি দেয় বণিকেরা নাকি, চাষারাই করে লাভ,
ধনী যেন সদা তৃষিত, এবং চাষা সদা কচি ডাব!
শুনেছি সেদিন ধনিক-সভায়— নতুন আইন হবে,
চাষাদের দা, দাঁত আর নখ খেঁটে লাঠি নাহি রবে।
আমি বলি, 'হয়ে অভাবে স্বভাব নষ্ট, হয়েছে চোর!'
ওরা বলে, 'তাই বল তাই চুরি হয় না বাড়িতে তোর!'

আমি বলি, 'খেয়ো না এক কদন্ন, হালালি অন্ন খাও !'
ওরা বলে, 'তুমি এদেরি দালালী করে বুঝি টাকা পাও ?'
'যার যত তলা দালান, সে তত আল্লা-তালার প্রিয়—'
ওরা কয়। আমি বলি, 'বেশ করে সে তালায় তালা দিও !'
আমি ভিক্ষুক কাঙালের দলে— কে বলে ওদের নীচ ?
ভোগীরা স্বর্গে যাবে, যদি খায় ওদের পানের পিচ !
ওরা হাসে, 'এ কি কবিতার ভাষা ? বস্তিতে থাক বুঝি ?'
আমি কই, 'আজো পাইনি পুণ্য- বস্তির পথ খুঁজি !
দোওয়া করো, যে ঐ গরীবের কর্দমাক্ত পথে
যেতে পারি এই এই ভোগ-বিলাসীর পাপ-নর্দমা হতে !'

কোথা সে পূর্ণযোগী

কোথা সে পূর্ণ সিদ্ধ ও যোগী, দেখেছ কি কেউ তাঁরে,
দনুজ-দলনী শক্তিরে পুন ভারতে জাগাতে পারে ?
কোথা সে শ্রীরাম বশিষ্ঠ, কোথা তাপস কাত্যায়ন,
যাঁর সাধনায় হইবে কাত্যায়নীর অবতরণ !
ভারত জুড়িয়া শুধু সন্ন্যাসী সাধু ও গুরুর ভিড় ?
তবু এ ভারত হইয়াছে কেন ক্লীব মানুষের নীড় ?
'প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী নাহি বিশ্বম' বলি কেউ
আবার আনিতে পারে কি ভারতে মহাশক্তির ঢেউ ?
পাতাল ফুঁড়িয়া দানব দৈত্য উঠিয়াছে পৃথিবীতে,
এল না তো কেউ শক্তি সিদ্ধ তাদের সংহারিতে !
কোথা সেই মহাতান্ত্রিক, কোথা চিন্ময়ী মহাকালী ?
মন্দিরে মন্দিরে মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা খালি !
শক্তিরে খুঁজি পটুয়ার পটে, মাটির মুরতি মাঝে
চিন্ময়ী শ্রীচণ্ডিকা আই প্রকাশ হল না লাজে।
সেই দুর্গারে পূজিয়া শ্রীরাম হরিলেন দুর্গতি
কোন শ্রীদুর্গা কোথা আজ কেউ দেখেছ তাঁহার জ্যোতি ?
শুম্ভ নিশুম্ভেরে যে মারিল, সে চণ্ডী কি গেছে মরে ?
কুম্ভ-মেলায় শুধায়েছ কেউ সাধুদের জটা ধরে ?
জটা তাদের কটা হয়ে গেল, কটাহ হইল চোখ,
আনিতে পারিল তবু কি তাহারা একটি ফোঁটা আলোক ?

পরিশ্রমের ভয়ে আশ্রমে আশ্রমে ছেলেমেয়ে
আশ্রয় লয়ে বাঁচিয়াছে ! মেদ বাড়িতেছে খেয়ে দেয়ে !
মহাপ্রভুর নাম রাখিয়াছে ভিক্ষুক নেড়া নেড়ী,
এরা কি ভাঙিবে অসুরের কারা, পায়ের শিকল বেড়ি ?
ধর্মের নামে এই অধর্ম, তাই তো ধর্মরাজ
অভিশাপ দেন দারিদ্র ব্যাধি দুর্গতি–রূপে আজ।
গঙ্গায় নেয়ে তীর্থে গিয়ে কে শক্তি লভিয়া আসে ?
মাংসের স্তূপ বেড়ে বেড়ে শুধু যায় মৃত্যুর গ্রাসে।
কে ঘুচাবে এই লজ্জা ও ঘৃণা, কোথা সে যুগাবতার ?
জগন্নাথের রথ দেখিব না, পথ চেয়ে আছি তাঁর।

রবির জন্মতিথি

রবির জন্মতিথি কয়জন জানে ?
অঙ্ক কষিয়া পেয়েছ কি বিজ্ঞানে ?
ধ্যানী যোগী দেখেছে কি ? জ্ঞানী দেখিয়াছে ?
ঠিকুজি আছে কি কোনো জ্যোতিষীর কাছে ?
নাই—নাই ! কত কোটি যুগ মহাব্যোমে
আলো অমৃত দিয়ে ধ্রুব রবি ভ্রমে !
জানে না জানে না। উদয় অস্ত তাঁর
সে শুধু লীলাবিলাস, গোপন বিহার।
রবি কি অস্ত যায় ? অন্ধ মানব
রবি ডুবে গেল বলে করে কলরব।
রবি শাশ্বত, তার নিত্য প্রকাশ
রূপ ধরি পৃথিবীতে ক্ষণিক বিলাস
করিয়া চলিয়া যায় জ্যোতির্লোকে,
এখনো দ্রষ্টা নেহারে তাঁর চোখে।
এই সুরভির ফুল রস–ভরা ফল
রবির গলিত প্রেমবৃষ্টির জল
কবিতা ও গান সুর–নদী হয়ে বয়,
রবি যদি মরে যায় পৃথিবী কি রয় !
জন্ম হয়নি যাহার জ্যোতির্লোকে,
তন্দ্রা টুটেনি যাহার অন্ধ চোখে,

রবির জন্মতিথি দেখেনি সে-জন
আজো তার কাছে রবি অপ্রয়োজন।
কবি হয়ে এল রবি এই বাঙলায়
দেখিল বুঝিল বলো কতজন তাঁয়?
রবি দেখে পেয়েছে যে আলোক প্রথম
তাঁরি মাঝে লভে রবি প্রথম জনম।
নিরক্ষর ও নিস্তেজ বাঙলায়
অক্ষর-জ্ঞান যদি সকলেই পায়,
অ-ক্ষয় অব্যয় রবি সেই দিন
সহস্র করে বাজাবেন তাঁর বীণ।
সেদিন নিত্য রবির জন্মতিথি
হইবে। মানুষ দিবে তাঁরে প্রেমপ্রীতি।

বড়দিন

বড়লোকদের 'বড়দিন' গেল, আমাদের দিন ছোটো,
আমাদের রাত কাটিতে চায় না, ক্ষিদে বলে, 'নিধে! ওঠো!'
খেটে খুটে শুতে খাটিয়া পাই না, ঘরে নাই ছেঁড়া কাঁথা,
বড়দের ঘরে কত আসবাব, বালিশ বিছানা পাতা!
অর্দ্ধনগ্ন-নৃত্য করিয়া বড়দের রাত কাটে,
মোদের রক্ত খেয়ে মশা বাড়ে, গায়ে আরশুলা হাঁটে।
আঁচিলের মতো ছারপোকা লয়ে পাঁচিল ধরিয়া নাচি,
মাল খেয়ে ওরা বেসামাল হয়, মোরা কাশি আর হাঁচি!
নানা রূপ খানা খেতেছে, ষণ্ড অণ্ড ভেড়ার টোস্ট,
কুলকুল করে আমাদের পেট, যেন 'হনলুলু কোস্ট'।
চৌরঙ্গিতে বড়দিন হইয়াছে কী চমৎকার,
গৌরজাতির ক্ষৌরকর্ম করেছে! অমৎ কার?
মদ খেয়ে বদহজম হইয়া বাঙালির মেয়ে ধরে,
শিক্ষাও পায় শিখ-বাঙালির থাপপড় লাথি চড়ে!
এ কি সৈনিক-ধর্ম, এরাই রক্ষী কি এদেশের?
সর্বলোকের ঘৃণ্য ইহারা কলঙ্ক ব্রিটিশের।
যে সৈনিকের হাত চাহে অসহায় নারী পরশিতে,
চাহে নারীর ধর্ম নিতে,
বীর ব্রিটিশের কামান যে নাই সেই হাত উড়াইতে।

হায় রে বাঙালি, হায় রে বাঙলা ভাত–কাঙালের দেশ,
মারের বদলে মার দেয় না কো, তারা বলদ ও মেষ !
মান বাঁচাইতে প্রাণ দিতে নারে, পলাইয়া যায় ঘরে,
ঊর্ধ্বের মার আগুন আসিছে সেই ভিরুদের তরে !
পলাইয়া এরা বাঁচিবে না কেউ ! হাড় খাবে, মাস খাবে,
শেষে ইহাদের চামড়ায় দেখো ডুগডুগিও বাজাবে !
পথের মাতাল মাতা–ভগ্নীর সম্মান নেয় কেড়ে,
শাস্তি না দিয়ে মাতালের, এরা পলায় সে পথ ছেড়ে।
কোন ফিল্মের দর্শক ওরা, ঝোপের ইঁদুর বেজি,
ইহাদের চেয়ে ঘরের কুকুর, সেও কত বেশি তেজি !
মানব–জাতির ঘৃণ্য ভিরুরা কাঁপে মৃত্যুর ডরে,
প্রাণ লয়ে ঢুকে খোপের ভিতর, দিনে দশবার মরে !
বড়দিন দেখে ছোট মন হায় হতে চাহে না কো বড়,
হ্যাট কেটে দেখে পথ ছেড়ে দেয় ভয়ে হয়ে জড়সড় !
পচে মরে হায় মানুষ, হায় রে পঁচিশে ডিসেম্বর।
কত সম্মান দিতেছে প্রেমিক খ্রিস্টে ধরার নর !
ধরে ছিলে কোলে ভীরু মানুষের প্রতীক কি মেষশিশু ?
আজ মানুষের দুর্গতি দেখে কোথায় কাঁদিছ যিশু !

নবযুগ

–বিশ বৎসর আগে

তোমার স্বপ্ন অনাগত 'নবযুগ'-এর রক্তরাগে
রেঙে উঠেছিল। স্বপ্ন সেদিন অকালে ভাঙিয়া গেল,
দৈবের দোষে সাধের স্বপ্ন পূর্ণতা নাহি পেল !
যে দেখায়েছিল সে মহৎ স্বপ্ন, তাঁরি ইঙ্গিতে বুঝি
পথ হতে হাত ধরে এনেছিলে এই সৈনিকে খুঁজি' ?
কোথা হতে এল লেখার জোয়ার তরবারি–ধরা হাতে
কারার দুয়ার ভাঙিতে চাহিনু নিদারুণ সংঘাতে।—
হাতের লেখনি, কাগজের পাতা নহে ঢাল তলোয়ার,
তবুও প্রবল কেড়ে নিল দুর্বলের সে অধিকার।
মোর লেখনির বহ্নিস্রোত বাধা পেয়ে পথে তার
প্রলয়ঙ্কর ধূমকেতু হয়ে ফিরিয়া এল আবার !

ধূমকেতু–সমার্জনী মোর করে, নাই মার্জনা
কারও অপরাধ ; অসুরে নিত্য হানিয়াছে লাঞ্ছনা !
হারাইয়া গেনু ধূমকেতু আমি দুদিনের বিস্ময়,
মরা তারা সম ঘুরিয়া ফিরিনু শূন্য আকাশময়।

সে যুগের ওগো জগলুল ! আমি ভুলিনি তোমার স্নেহ,
স্মরণে আসিত তোমার বিরাট হৃদয়, বিশাল দেহ।
কত সে ভুলের কাঁটা দলি, কত ফুল ছড়াইয়া তুমি,
ঘুরিয়া ফিরেছ আকুল তৃষায় জীবনের মরুভূমি !
আমি দেখিতাম, আমার নিরালা নীল আসমান থেকে
চাঁদের মতন উঠিতেছে, কভু যাইতেছে মেঘে ঢেকে !
সুদূরে থাকিয়া হেরিতাম তব ভুলের ফুলের খেলা,
কে যেন বলিত, এ চাঁদ একদা হইবে পারের ভেলা।

সহসা দেখিনু, এই ভেলা যাহাদের পার করে দিল,
যে ভেলার দৌলত ও সওদা দশ হাতে লুটে নিল,
বিশ্বাসঘাতকতা ও আঘাত–জীর্ণ সেই ভেলায়
উপহাস করে তাহারাই আজ কঠোর অবহেলায় !
মানুষের এই অকৃতজ্ঞতা দেখি উঠি শিহরিয়া,
দানীরে কি ঋণী স্বীকার করিল এই সম্মান দিয়া ?
যত ভুল তুমি করিয়াছ, তার অনেক অধিক ফুল
দিয়াছ রিক্ত দেশের ডালায়, দেখিল না বুলবুল !
যে সূর্য আলো দেয়, যদি তার আঁচ একটুকু লাগে,
তাহারি আলোকে দাঁড়ায়ে অমনি গাল দেবে তারে রাগে ?
নিত্য চন্দ্র সূর্য ; তারাও গ্রহণে মলিন হয় ;
তাই বলে তার নিন্দা করা কি বুদ্ধির পরিচয় ?
এই কি বিচার লোভী মানুষের ? বক্ষে বেদনা বাজে,
অর্থের তরে অপমান করে আপনার শির–তাজে !
দুঃখ করো না, ক্ষমা করো, ওগো প্রবীণ বনস্পতি !
যার ছায়া পায় তারি ডাল কাটে অভাগা মন্দগতি।

আমি দেখিয়াছি দুঃখীর তরে তোমার চোখের পানি,
এক আল্লাহ জানেন তোমারে, দিয়াছ কি কোরবানি !
এরা অজ্ঞান, এরা লোভী, তবু ইহাদের কর ক্ষমা,
আবার এদের ডেকে আল্লার ঈদগাহে কর জমা।

শপথ করিয়া কহে এ বান্দা তার আল্লার নামে,
কোনো লোভ কোনো স্বার্থ লইয়া দাঁড়াইনি আমি বামে।
যে আল্লা মোরে রেখেছেন দূরে সব চাওয়া পাওয়া হতে,
চলিতে দেননি যিনি বিদ্বেষ গ্লানিময় রাজপথে,
যে পরম প্রভু মোর হাতে দিয়া তাঁহার নামের ঝুলি,
মসনদ হতে নামায়ে, দিলেন আমারে পথের ধূলি,
সেই আল্লার ইচ্ছায় তুমি ডেকেছ আমারে পাশে !—
অগ্নিগিরির আগুন আবার প্রলয়ের উল্লাসে
জাগিয়া উঠেছে, তাই অনন্ত লেলিহান শিখা মেলি,
আসিতে চাহিছে কে যেন বিরাট পাতাল-দুয়ার ঠেলি !
অনাগত ভূমিকম্পের ভয়ে দুনিয়ায় দোলা লাগে,
দেখো দেখো শহিদান ছুটে আসে মৃত্যুর গুলবাগে !
কে যেন কহিছে, 'বান্দা আর এক বান্দার হাত ধরো,
মোর ইচ্ছায় ওর ইচ্ছারে তুমি সাহায্য করো,'
তাই নবযুগ আসিল আবার। রুদ্ধ প্রাণের ধারা
নাচিছে মুক্ত গগনের তলে দুর্মদ মাতোয়ারা।
ভুলাইবে ভেদ, ভায়ে ভায়ে হানাহানি,
এই নবযুগ ফেলিবে ক্লৈব্য ভীরুতারে দূরে টানি।
এই নবযুগ আনিবে জরার বুকে নবযৌবন,
প্রাণের প্রবাহ ছুটিবে, টুটিবে জড়তার বন্ধন !
এই নবযুগ সকলের, ইহা শুধু আমাদের নহে,
সাথে এস নৌজোয়ান ! ভুলিয়া থেকো না মিথ্যা মোহে।
ইহা নহে কারও ব্যবসার, স্বদেশের স্বজাতির এ যে,
শোনো আসমানে এক আল্লার ডঙ্কা উঠিছে বেজে।

মোরা জনগণ, শতকরা মোরা নিরানবই জন,
মোরাই বৃহৎ, সেই বৃহতের আজ নবজাগরণ।
ক্ষুদ্রের দলে কে যাবে তোমরা ভোগবিলাসের লোভে?
আর দেরি নাই, ওদের কুঞ্জ ধূলি-লুণ্ঠিত হবে !
আছে যাহাদের বৃহতের তৃষা, নির্ভয় যার প্রাণ,
সেই বীরসেনা লয়ে জয়ী হবে নবযুগ-অভিযান।
আল্লার রাহে ভিক্ষা চাহিতে নবযুগ আসিয়াছে,
মহাভিক্ষুরে ফিরায়ো না, দাও যার যাহা কিছু আছে।
জাগিছে বিরাট দেহ লয়ে পুন সুপ্ত অগ্নিগিরি,
তারি ধোঁয়া আজ ধোঁয়ায়ে উঠেছে আকাশ-ভুবন ঘিরি।

একি এ নিবিড় বেদনা
একি এ বিরাট চেতনা
জাগে পাষাণের শিরায় শিরায়, সাথে জনগণ জাগে,
হুঙ্কারে আজ বিরাট : 'বক্ষে কার পার ছোঁওয়া লাগে !
কোন মায়া ঘুমে ঘুমায়েছিলাম, বুঝি সেই অবসরে
ক্ষুদ্রের দল বৃহতের বুকে বসে উৎপাত করে।
মোর অণুপরমাণু জনগণ জাগো, ভাঙো ভাঙো দ্বার,
রুদ্র এসেছে বিনাশিতে আজ ক্ষুদ্র অহংকার।'

শোধ করো ঋণ

আগুন জ্বলে না মাসে কতদিন হায় ক্ষুধিতের ঘরে,
ক্ষুধার আগুনে জ্বলে কত প্রাণ তিলে তিলে যায় মরে।
বোঝে না ধনিক, হোক সে হিন্দু হোক সে মুসলমান,
আল্লা যাদের নিয়ামত দেন, পাষাণ তাদের প্রাণ।

কত ক্ষুধাতুর শিশুর রসনা ক্ষুদ্রকণা নাহি পায়,
মার বুক ছেড়ে গোরস্থানের মাটিতে গিয়া ঘুমায়।
যত দৌলত হাশমত-ওয়ালা হেরে তাহা পাশে থেকে,
আতর মাখিয়া পাথরের দল যেন ছায়াছবি দেখে।

ভেবেছে এমনি নিজে খেয়ে দেয়ে হইয়া খোদার খাসি
দিন কেটে যাবে ! এ সুখের দিন কভু হবে না কো বাসি।
জগতের লোভী মরিতেছে আজ আল্লার অভিশাপে,
তবুও লোভের কাঁথা জড়াইয়া লোভী সব নিশি যাপে !
একটা খাসিরে ধরিয়া যখন জবাই করে কশাই,
আর একটা খাসি তখনও দিব্যি পাতা খায়, ভয় নাই।
ভেবেছে ওদেশে হতেছে শাস্তি, তোমাদের হইবে না,
তাই শোধ করিলে না আজো সেই পরম দানীর দেনা।

আর কটা দিন বেঁচে থাকো, যাঁর ঋণ করিয়াছ, তিনি
তোমাদের প্রাণ দৌলত নিয়ে খেলিবেন ছিনিমিনি।
কী ভীষণ মার খাইবে সেদিন, বোঝো না অন্ধ জীব,
তোমাদের হাড়ে ভেলকি খেলিবে সেদিন এই গরিব।

বেতন চাহিলে শুনিতে পায় না, মনিবের রাগ হয়,
'তিন দিন হাঁড়ি চড়েনি কো শুনে ভাবে, একি কথা কয় !
ঘরের পার্শ্বে লেগেছে আগুন, বোঝে না স্বার্থপর,
আর দেরি নাই, পুড়িয়া যাইবে তাহারও সোনার ঘর।

বঞ্চিত রেখে দরিদ্রে, যারা করিয়াছে সঞ্চয়,
দেখিবে এবার, তাঁর সঞ্চয় তার অধিকারে নয়।
অর্থের ফাঁদ পেতে দস্যুরে ডাকিয়া আনিছে যারা,
তাহারাই আগে মরিবে, ভীষণ শাস্তি পাইবে তারা।

উপবাস যার দিনের সাধনা নিশীথে শয়নসাথী,
যাহারা বাহিরে গাছতলে থেকে, ঘরে জ্বলে না কো বাতি,
তাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতা কি পাবে না পুরস্কার ?
তারা তিলে তিলে মরে আনিয়াছে এবার খোদার মার।

তাদেরই করুণ মৃত্যু এনেছে ভয়াল মৃত্যু ডাকি,
তাদের আত্মা শান্তি পাইবে ভোগীর রক্ত মাখি।
মানুষের মার নয় এ, রে দাদা, এ যে আল্লার মার,
এর ক্ষমা নাই, এ নয় ধরার ভাঁড়ামি রাজবিচার।

উৎপীড়ক আর ভোগীদের আসিয়াছে রোজ-কিয়ামত
ধূলি-রেণু হয়ে উড়ে যাবে সব ইহাদের নিয়ামত।
এদেরি হাতের অস্ত্র কাটিবে এদেরই স্কন্ধ, শির,
ইহারা মরিলে দুনিয়া হইবে স্নিগ্ধ, শান্ত, স্থির।

বাক্সের পানে চেয়ে চেয়ে চোখ ফ্যাকাশে হয়েছে বুঝি !
বাক্স ও চাবি নেবে না উহারা, কেড়ে নেবে শুধু পুঁজি।
খাবি খায় তবু চাবি ছাড়ে না কো ! উৎকট প্রলোভন
মরে না কিছুতে, আত্মঘাতী তা না হয় যতক্ষণ !

আমরা গরিব, শুকায়ে হয়েছি চামড়ার আমচুর
খামচে ধরেছে মাংসওয়ালদের ক্ষুধিত বুনো কুকুর।
কোন বন থেকে কে জানে এসেছে নেকড়ে বাঘের দল,
আমাদের ভয় নাই, আমাদের নাই কো গরু-ছাগল।

সামলাও মাল মালওয়ালা দেখো পয়মাল হবে সব,
উর্ধে নিত্য শুনিতেছ নাকি শকুনের কলরব?
ধূমকেতু নয়, কোন মেথরানী হাতে মুড়ো ঝাঁটা লয়ে
এসেছে আকাশে; পৃথিবী উঠেছে ভীষণ নোঙরা হয়ে।

নোঙরা, লোভী ও ভোগী রহিবে না শুদ্ধ এ পৃথিবীতে,
এ আবর্জনা পুড়ে ছাই হবে নরকের চুল্লিতে।
আসিছে ফিরিয়া এই বাঙলায় কাঙালের শুভদিন,
আজিও সময় আছে ধনী, শোধ করো তাহাদের ঋণ!

মোহর্রম

ওরে বাঙলার মুসলিম, তোরা কাঁদ।
এনেছে এজিদি বিদ্বেষ পুন মোহর্রমের চাঁদ।
এক ধর্ম ও এক জাতি তবু ক্ষুধিত সর্বনেশে।
তখতের লোভে এসেছে এজিদ কমবখতের বেশে!
এসেছে 'সিমার', এসেছে 'কুফা'র বিশ্বাসঘাতকতা,
ত্যাগের ধর্মে এসেছে লোভের প্রবল নির্মমতা!
মুসলিমে মুসলিমে আনিয়াছে বিদ্বেষের বিষাদ,
কাঁদে আসমান জমিন, কাঁদিছে মোহর্রমের চাঁদ।
একদিকে মাতা ফাতেমার বীর দুলাল হোসেনি সেনা,
আর দিকে যত তখত-বিলাসী লোভী এজিদের কেনা।
মাঝে বহিতেছে শান্তিপ্রবাহ পুণ্য ফোরাত নদী,
শান্তিবারির তৃষাতুর মোরা, ওরা থাকে তাহা রোধি।
একদিকে ইসলামি ইমামের সিপাহি শান্তিব্রতী,
আর একদিকে স্বার্থান্বেষী হিংসুক ক্রোধমতি!
এই দুনিয়ার মৃত্তিকা ছিল তখত যে খলিফার,
ভেঙে দিয়েছিল স্বর্ণ-সিংহাসনের যে অধিকার,
মদগর্বী ও ভোগী বর্বর এজিদি ধর্ম যত,
যুগে যুগে সেই সাম্য ধর্মে করিতে চেয়েছে হত।
এই ধূর্ত ও ভোগীরাই তলোয়ারে বেঁধে কোরআন,
'আলির' সেনারে করেছে সদাই বিব্রত পেরেশান!
এই এজিদের সেনাদল শয়তানের প্ররোচনায়
হাসান হোসেনে গালি দিতে যেত মক্কা ও মদিনায়।

এরাই আত্মপ্রতিষ্ঠা-লোভে মসজিদে মসজিদে
বক্তৃতা দিয়ে জাগাত ঈর্ষা হায় স্বজাতির হৃদে।
ঐক্য যে ইসলামের লক্ষ্য, এরা তাহা দেয় ভেঙে।
ফোরাত নদীর কূল যুগে যুগে রক্তে উঠেছে রেঙে
এই ভোগীদের জুলুমে ! ইহারা এজিদি মুসলমান,
এরা ইসলামি সাম্যবাদেরে করিয়াছে খান খান !
এক বিন্দুও প্রেম-অমৃত নাই ইহাদের বুকে,
শিশু আসগরে তীর হেনে হাসে পিশাচের মতো সুখে।
আপনার সুখ ভোগ ও বিলাস ছাড়া জানে না কো কিছু,
একজন বড় হতে চায়, করে লক্ষ জনেরে নিচু।

আজন্ম রহি শ্বেতমর্মর-প্রাসাদে মদবিলাসী,
তখত টলিলে বলে, 'দরিদ্রে মোরা বড় ভালোবাসি !'
দরিদ্রে ভালোবেসে যার ভুঁড়ি ফেঁপে হল ধামা ঝুড়ি,
শীতের দিনেও চর্বি গলিয়া পড়ে চাপকান ফুঁড়ি,
যাদের চরণ পরশ করেনি কখনো ধরার ধূলি,
যাহারা মানুষে করেছে ভৃত্য মুটে মজুর ও কুলি,
অকল্যাণের দূত তাঁরা আজ ভূত সেজে পথে পথে
মৃত্যুর ভয়ে ফিরিতেছে নেমে সোনার প্রাসাদ হতে।
সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, ইসলামের সাম্যবাদ
যুগে যুগে এই অসুর-সেনারা করিয়াছে বরবাদ।
ফোরাত নদীর স্রোতধারা সম ধনসম্পদ লয়ে
দেয় না কো পিয়াসের এক ফোঁটা পানি। নির্মম হয়ে
মারে কাটে এরা বে-রহম, এরা টলে না কো কোনোদিন,
এজিদি তখত টুটেছে বলিয়া ছুটিছে শ্রান্তিহীন।
আল্লা রসুল মুখে বলে, তাঁর ক্ষমা পায়নি ক এরা,
দেখেছে শুষ্ক দামেস্ক শুধু, দেখেনি কাবা ও হেরা।
শোনেনি ইহারা আল-আরবির সাম্য প্রেমের বাণী।

আল্লা ! এরাও মুসলিম, এরা রসুলের উমত,
কেন পায়নি কো প্রেম আর ক্ষমা শান্তি ও রহমত ?
ভুল পথে নিতে চায় অন্যেরে, ভুল পথে চলে, তবু
এরা মোরা ভাই, এদেরে জ্ঞান প্রেম ও ক্ষমা দাও প্রভু !
লোভ ও অহঙ্কার ইহাদেরে করিয়াছে অজ্ঞান,
সাম্য মৈত্রী মানে না, তবুও এরা যে মুসলমান !

এদের ভুলের, মিথ্যা মোহের করি শুধু প্রতিবাদ,
ইহাদেরই প্রেমে কাঁদি আমি, কেন এরা হল জল্লাদ?
আমাদের মাঝে যত দ্বন্দ্ব ও মন্দ হউক ভালো,
আল্লা! আবার জ্বালাও প্রেমের শান্ত মধুর আলো!
ভালোবাসাহীন এই পৃথিবীরে আর ভালো লাগে না কো,
আমার পরম প্রেমময় প্রভু, প্রেম দিয়ে বেঁধে রাখো!
খলিফা হইয়া মুসলিম দুনিয়ার বাদশাহি করে,
ভৃত্যে চড়ায়ে উটের পৃষ্ঠে নিজে চলে রশি ধরে!
খোদার সৃষ্ট মানুষের ভালোবাসিতে পারে না যারা,
জানি না কেমনে জন-গণ-নেতা হতে চায় হায় তারা!
ত্যাগ করে না কো ক্ষুধিতের তরে সঞ্চিত সম্পদ,
নওয়াব বাদশা জমিদার হয়ে চায় প্রতিষ্ঠা মদ।
ভোগের নওয়াব আমির ইহারা, ত্যাগের আমির কই?
মোহর্রমের বিষাদ-মলিন চাঁদ পানে চেয়ে রই!

মা ফাতেমা! কোন জান্নাতে আছ? দুনিয়ার পানে চাহ!
প্রার্থনা করো, দূর হোক ভায়ে ভায়ে বিদ্বেষ দাহ!
আমাদের মাঝে যার লোভ আছে, তাহা দূর হয়ে যাক,
যাহারা ভ্রান্ত, আসুক তাদের সত্যপথের ডাক।
ফোরাতের পানি ধরার মরুতে শান্তিধারার মতো
—না, না, তোমারি মাতৃস্নেহ-রূপে বহে অবিরত।
সেই পবিত্র স্নেহবন্যার দুই কূলে ভায়ে ভায়ে—
হানাহানি করে! তুমি কাঁদিতেছ কোন জান্নাত-ছায়ে?
ফোরাতের পানি রক্তিম হল, মা গো, বিদ্বেষ-বিষে,
কারা তীর হানে কাবার শান্তি মিনারের কার্নিশে?
তুমি দাও মা গো ফিরদৌস হতে দুটি ফোটা আঁখিবারি,
তব স্নেহবিগলিত অশ্রু, মা সর্বতৃষ্ণাহারী!
তুমি নবীজির নন্দিনী, নন্দন-আনন্দ দাও,
আল্লার কাছে ভায়ে ভায়ে পুন মিলন-ভিক্ষা চাও!
'সীমার' 'এজিদ' সকলের তরে কেয়ামতে ক্ষমা চাবে,
আজ দুনিয়ায় ভায়ে ভায়ে কি মা রবে দুশমনি ভাবে?
দূর হোক এই ভাবের অভাব, ভায়ে ভায়ে এই আড়ি,
সকলের ঘরে যাক আরবের খেজুর রসের হাঁড়ি!

অখণ্ড এক চাঁদ আজ বুঝি দুখণ্ড হয়ে যায়,
শরিকি আসিল হায় যারা মানে লা-শরিক আল্লায়!

কারবালা যেন নাহি আসে আর মোহর্‌রমের চাঁদে,
তাজিয়া মিছিলে একি কাজিয়ার খেলা, দেখে প্রাণ কাঁদে !
শান্তি, শান্তি, আল্লা শান্তি দাও !
সর্বদ্বন্দ্বাতীত তুমি, নাও তব প্রেমপথে নাও !

আর কত দিন?

প্রভু, আর কত দিন
তোমার প্রথম বেহেশত পৃথিবী রহিবে গ্লানি-মলিন ?
ধরার অঙ্ক পাপ-কলঙ্ক-পঙ্ক-লিপ্ত করি
বরাহ মহিষ অসুর দানব ফিরিতেছে সঞ্চরি !
অত্যাচারীর মার খেয়ে মরে তব দুর্বল জীব,
যত খুন খায় তত বেড়ে যায় লোভী ও ভোগীর জিভ !
তোমার সত্য-পথ-ভ্রষ্ট হয়েছে মানুষ ভয়ে,
আত্মা আত্মহত্যা করেছে অপমানে পরাজয়ে !
মনুষ্যত্ব মুমূর্ষু আজ, ক্লৈব্য কাপুরুষতা
পঙ্গু পাষাণ করেছে জীবন !—দৈন্য পরবশতা,
হীন প্রবৃত্তি, চামচিকা-সম জীবনের পোড়া ঘরে
বাঁধিয়াছে বাসা ! আশার আলোক জ্বলে না কো অন্তরে।
প্রভু, আলো দাও, আলো !
ঘুচুক ভয়ের ভ্রান্তি, জড়তা, ঘন নিরাশার কালো !

প্রভু আর কত দিন
ধূর্তের কাছে বিশ্বাস সরলতা রবে দীন হীন ?
স্বার্থান্বেষী চতুরের কাছে 'সবর' ধৈর্য আর,
ওগো কাঙালের পরম বন্ধু, কত দিন খাবে মার ?
যত মার খায় তত তারা জপে নিত্য তোমার নাম,
আশ্রয় শুধু যাচি প্রভু তব ? চায় না জপের দাম।
আশ্রয় দাও পূর্ণ পরম আশ্রয়দাতা স্বামী,
আশ্রয়-হীনে রক্ষিতে তব শক্তি আসুক নামি।
শুনিয়াছি, তুমি নহ জালিমের, উৎপীড়কের নহ,
নির্যাতিত ও অসহায় যথা, তার দ্বারে জাগি রহ ;
ডাকিনি বলিয়া অভিমানে বুঝি লও নাই প্রতিশোধ,
আপনার হাতে করেছি আপন ঘরের দুয়ার রোধ।

আর ভয় নাই, প্রভু, দ্বার খুলিয়াছি,
আঁধারে মরেছি তিলে তিলে, যদি আঁধারে আসিয়া বাঁচি !
তুমি কৃপা করো, ক্ষমা-সুন্দর, অপরাধ ক্ষমা করো,
আশ্রয় দাও দুর্বলে, উৎপীড়কেরে সংহারো !
অন্ধ বধির পথভ্রান্তে দেখাও তোমার পথ,
আমাদের ঘিরে থাকুক নিত্য তোমার অভয়-রথ !
পশ্চিমে তব শান্তি নেমেছে, পূর্বে নামিল কই?
হে চির-অভেদ ! আমরা কি তবে তোমার সৃষ্ট নই !
যে শান্তি দাও পশ্চিমে, পূর্বে সে ভয় দাওনি প্রভু;
বিশ্বাস আর তব নাম লয়ে বেঁচে' আছি মোরা তবু।
সব কেড়ে নিক অত্যাচারীরা, প্রভু গো দাও অভয়,
বিশ্বাস আর ধৈর্য ও তব নাম—যেন সাথী রয়।
এই বিশ্বাসে, তোমার নামের মহিমায়—ফিরে পাব
শান্তি, সাম্য। তব দাস মোরা তব কাছে ফিরে যাব !
প্রেম, আনন্দ, মাধুরী ও রস পাব এই দুনিয়াতে ;
তোমার বিরহে কাঁদিব আমরা জাগিয়া নিশীথ রাতে।
বলো প্রেমময়, বলো হে পরম সুন্দর, বলো প্রভু,
অন্ধ জীবের এই প্রার্থনা মিথ্যা হবে না কভু !

তুমি বল দাও, তুমি আশা দাও, পরম শক্তিমান !
বহু দুখ সহিয়াছি, এইবারে দাও চির-কল্যাণ।
সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মিটাও মিটাও সাধ,
তোমারি এ বাণী—দেখিব তোমার কৃপার পূর্ণ চাঁদ।
প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও নিত্য মোদের পর,
পূর্ণ হউক তোমার প্রসাদে আমাদের কুঁড়েঘর।
আমরা কাঙাল, আমরা গরিব, ভিক্ষুক, মিসকিন,
ভোগীদের দিন অস্ত হউক, আসুক মোদের দিন।
তুমিই শক্তি, ভক্তি ও প্রেম, জ্ঞান আনন্দ দাও,
কবুল কর এ প্রার্থনা, প্রভু, কৃপা কর, ফিরে চাও !
এক সে তোমারি ধ্যান তপস্যা আরাধনা হোক স্বামী,
নির্ভয় হোক মানুষ, গাহুক তব নাম দিবাযামী।
ঊর্ধ হইতে কে বলে 'আমিন', 'তথাস্তু' বলো, বলো,
চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়, দেহ কাঁপে টলমল !
সত্য হউক সত্য হউক ঊর্ধের এই বাণী,
দরিদ্রে দান করিতে করুণা আসিছেন মহাদানী।

বিশ্বাস ও আশা

বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেয়ো না তাহার কাছে
নড়াচড়া করে, তবুও সে মড়া, জ্যান্ত সে মরিয়াছে।
শয়তান তারে শেষ করিয়াছে, ঈমান লয়েছে কেড়ে,
পরান গিয়াছে মৃত্যুপুরীতে ভয়ে তার দেহ ছেড়ে !
থাকুক অভাব দারিদ্র্য ঋণ রোগ শোক লাঞ্ছনা,
যুদ্ধ না করে তাহাদের সাথে নিরাশায় মরিও না।
ভিতরে শত্রু ভয়ের ভ্রান্তি, মিথ্যা ও অহেতুক
নিরাশায় হয় পরাজয় যার, তাহার নিত্য দুখ।

'হয়তো কী হবে' এই ভেবে যারা ঘরে বসে কাঁপে ভয়ে,
জীবনের রণে নিত্য তারাই আছে পরাজিত হয়ে।
তারাই বন্দি হয়ে আছে গ্লানি অধীনতা কারাগারে ;
তারাই নিত্য জ্বালায় পিত্ত অসহায় অবিচারে !

এরা অকারণ ভয়ে ভীত, এরা দুর্বল নির্বোধ,
ইহাদের দেখে দুঃখের চেয়ে জাগে মনে বেশি ক্রোধ।
এরা নির্বোধ, না করে কিছুই জিভ মেলে পড়ে আছে,
গোরস্থানেও ফুল ফোটে, ফুল ফোটে না এ মরা গাছে !

এদের যুক্তি অদৃষ্টবাদ, বসে বসে ভাবে একা,
'এ মোর নিয়তি, বদলানো নাহি যায় কপালের লেখা !'
পৌরুষ এরা মানে না, নিজেরে দেয় শুধু ধিক্কার,
দুর্ভাগ্যের সাথে নাহি লড়ে মেনেছে ইহারা হার !

এরা জড়, এরা ব্যাধিগ্রস্ত, মিশো না এদের সাথে,
মৃত্যুর উচ্ছিষ্ট আবর্জনা এরা দুনিয়াতে।
এদের ভিতরে ব্যাধি, ইহাদের দশদিক তমোময়,
চোখ বুঁজে থাকে, আলো দেখিয়াও বলে, ইহা আলো নয়।

প্রবল অটল বিশ্বাস যার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে,
যৌবন আর জীবনের ঢেউ কল-তরঙ্গে আসে,
মরা মৃত্তিকা করে প্রাণায়িত শস্যে কুসুমে ফলে,
কোনো বাধা তার রুধে নাক পথ, কেবল সুমুখে চলে।

চির-নির্ভয়, পরাজয় তার জয়ের স্বর্গ-সিঁড়ি,
আশার আলোক দেখে তত, যত আসে দুর্দিন ঘিরি।
সেই পাইয়াছে পরম আশার আলো, যেয়ো তারি কাছে,
তাহারি নিকটে মৃত্যুঞ্জয়ী অভয়-কবচ আছে।

যারা বৃহতের কল্পনা করে, মহৎ স্বপ্ন দেখে,
তারাই মহৎ কল্যাণ এই ধরায় এনেছে ডেকে।
অসম্ভবের অভিযান-পথ তারাই দেখায় নরে,
সর্বসৃষ্টি ফেরেশতারেও তারা বশীভূত করে।

আত্মা থাকিতে দেহে যারা সহে আত্মনির্যাতন,
নির্যাতকেরে বধিতে যাহারা করে না পরান-পণ,
তাহারা বদ্ধ জীব, পশু সম, তাহারা মানুষ নয়,
তাদেরই নিরাশা মানুষের আশা ভরসা করিছে লয়।

হাত-পা পাইয়া কর্ম করে না কূর্ম-ধর্মী হয়ে,
রহে কাদা-জলে মুখ লুকাইয়া আঁধার বিবরে ভয়ে,
তাহারা মানব-ধর্ম ত্যাজিয়া জড়ের ধর্ম লয়,
তাহারা গোরস্থান, শ্মশানের, আমাদের কেহ নয়।

আমি বলি, শোনো মানুষ ! পূর্ণ হওয়ার সাধনা করো,
দেখিবে তাহারি প্রতাপে বিশ্ব কাঁপিতেছে থরথর।
ইহা আল্লার বাণী যে, মানুষ যাহা চায় তাহা পায়,
এই মানুষের হাত পা চক্ষু আল্লার হয়ে যায় !

চাওয়া যদি হয় বৃহৎ, বৃহৎ সাধনাও তার হয়,
তাহারি দুয়ারে প্রতীক্ষা করে নিত্য সর্বজয়।
অধৈর্য নাহি আসে কোনো মহাবিপদে সে সেনানির,
অটল শান্ত সমাহিত সেই অগ্রনায়ক বীর।

নিরানন্দের মাঝে আল্লার আনন্দ সেই আনে,
চাঁদের মতন তার প্রেম জনগণ সমুদ্রে টানে !
অসম সাহস আসে বুকে তার অভয় সঙ্ঘ করে,
নিত্য জয়ের পথে চলো সেই পথিকের হাত ধরে !

পূর্ণ পরম বিশ্বাসী হও, যাহা চাও পাবে তাই ;
তাহারে ছুঁয়ো না, সেই মরিয়াছে, বিশ্বাস যার নাই !

ডুবিবে না আশা-তরী

তুমি ভাসাইলে আশা-তরী, প্রভু, দুর্দিন ঘন ঝড়ে
ততবার ঝড় থেমে যায়, তরী যতবার টলে পড়ে।
তুমি যে তরীর কাণ্ডারী তার ডুবিবার ভয় নাই,
তোমার আদেশে সে তরীর দাঁড় বাহি, গুন টেনে যাই।
আসে বিরুদ্ধশক্তি ভীষণ প্রলয়-তুফান লয়ে,
কাঁপে তরণীর যাত্রীরা কেহ নিরাশায় কেহ ভয়ে।
নদীজল কাঁপে টলমল যেন আহত ফণীর ফণা,
দমকে অশনি চমকে দামিনী—ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনা।
অন্ধ যামিনী, দেখিতে পাই না কাণ্ডারী তুমি কোথা?
তোমার জ্যোতিতে অগ্রপথের দূর করো অন্ধতা!
তোমার আলোরে আবৃত করে ভয়াল তিমির রাতি,
দূর করো ভয়, হে চির-অভয়, জ্বালায়ে আশার বাতি!

হে নবযুগের নব অভিযান-সেনাদল, শোনো সবে,
তোমরা টলিলে তুফানে তরণী আরো চঞ্চল হবে।
এ তরীর কাণ্ডারী আল্লাহ সর্বশক্তিমান,
বিশ্বাস রাখো তাঁর শক্তিতে, এ তাঁহার অভিযান।
ভয় যার মনে যুদ্ধ না করে তার পরাজয় হয়,
ভয় যার নাই মরিয়াও সেই শহিদের হয় জয়।
অগ্রপথের সেনারা করে না পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
জয়ী হয় তারা জীবনে, অথবা মৃত্যু করে বরণ!
জীবন মৃত্যু সমান তাদের, ঘুম জাগরণ সম,
এক আল্লাহ ইহাদের প্রভু, বন্ধু ও প্রিয়তম।
আল্লার নামে অভিযান করি, আমাদের ভয় কোথা,
দুবার মরে না মানুষ, তবুও কেন এ দুর্বলতা।
ডোবে যদি তরী, বাঁচি কিবা মরি, আল্লা মোদের সাথী,
যেখানেই উঠি তাঁর আশ্রয় পাব মোরা দিবারাতি!
মোদের ভরসা, একমাত্র সে নিত্য পরম প্রভু,
দুলুক তরণী, আমাদের মন নাহি দোলে যেন কভু।
পাব কুল মোরা পাব আশ্রয়—রাখো বিশ্বাস রাখো,
তাঁর কাছে করো শক্তি ভিক্ষা, তাঁরে প্রাণ দিয়া ডাকো।
পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করিয়া থির করো প্রাণমন,
দূর হবে সব বাধা ও বিঘ্ন, আসিবে প্রভঞ্জন।

হয়তো প্রভুর পরীক্ষা ইহা, ভয় দেখাইয়া তিনি
ভয় করিবেন দূর আমাদের জ্ঞাতা একক যিনি !
পার হইতেছি মোরা নিরাশা ও অবিশ্বাসের নদী
ডুবিবে তরণী যদি ভয় পাই অধৈর্য আসে যদি।
হে নবযুগের নৌসেনা, রণতরীর নৌজোয়ান !
আল্লারে নিবেদন করে দাও আল্লার দেওয়া প্রাণ !
পলাইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না মৃত্যুর হাত হতে,
মরিতে হয় তো মরিব আমরা এক-আল্লার পথে।
পৃথিবীর চেয়ে সুন্দরতর কত যে জগৎ আছে,
সে জগৎ দেখে যাব আনন্দধামে আল্লার কাছে।
আমাদের কিবা ভয়—
আমাদের চির চাওয়া-পাওয়া এক আল্লাহ্ প্রেমময়।

তাঁর প্রেমে মোরা উন্মাদ, তাঁর তেজ হাতে তলোয়ার,
মোদের লক্ষ্য চির-পূর্ণতা নিত্য সঙ্গ তাঁর
দুলুক মোদের রণতরী, যেন মন-তরী নাহি দোলে,
যেখানেই যাই মোরা জানি ঠাঁই পাব পাব তাঁর কোলে।
থেমে যাবে এই দুর্যোগ-ঘন প্রলয়-তুফান ঝড়,
'কওসর-অমৃত পাব, কর আল্লাতে নির্ভর !
মোদের অপূর্ণতা ও অভাব পূরণ করিবে সে,
অসম্ভবের অভিযান-পথে সৈন্য করেছে যে !

তাঁরি নাম লয়ে বলি, বিশ্বের অবিশ্বাসীরা শোনো,
তাঁর সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোনো।
তাঁহারি কৃপায় তাঁরে ভালোবেসে, বলে আমি চলে যাই,
তাঁরে যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার কোনো চাওয়া-পাওয়া নাই।
আর বলিব না। তারে ভালোবেসে ফিরে এসে মোরে বলো,
কি হারাইয়া কি পাইয়াছ তুমি, কি দশা তোমার হলো।

সকল পথের বন্ধু

হে আনন্দ-প্রেম-রস ঘন, মধুরস, মনোহর !
একি মদিরার আবেশে নেশায় কাঁপে তনু থরথর।

হৃদি-পদ্মিনী নিঙাড়িয়া বঁধু—
আনিতে চাও কি অমৃতমধু,
উদাসীন মনে আন এ কী সুরভিত বন-মর্মর।
ঘন অরণ্য-আড়ালে কে হাস প্রিয় জ্যোতি-সুন্দর!
কৃষ্ণা তিথির আড়ালে আমার চাঁদ লুকাইয়াছিলে।
আমি ভেবেছিনু, আমি কালো, তুমি তাই প্রেম নাহি দিলে।
বুঝি নাই, রসময়, তব খেলা
ভয় হতো, যদি কর অবহেলা।
বেণুকা বাজায়ে পথে এনে হায় কোথা তুমি লুকাইলে?
দেখেছ কি দেহে কাদা, অন্তরে রাধারে নাহি দেখিলে?

তব অভিসার-পথ রুধিয়াছে কে যেন ভয়ঙ্কর।
দিগদিগন্তে অন্ধ করেছে বাধার তুফান ঝড়।
সীতার মতন কে যেন গো কেশ ধরে
আঁধার পাতালে লইয়া গিয়াছে মোরে।
জড়াইয়া যেন শত শত নাগ বিষাক্ত অজগর
দংশেছে মোরে, বিষে জরজর!—তবু, ওগো মনোহর—

ডাকিনি তোমায়, যদি এই বিষ তব শ্রীঅঙ্গে লাগে।
এই পঙ্ক, এ মালিন্য যদি বাধা আনে অনুরাগে।
বলেছি, 'বন্ধু, সরে যাও, সরে যাও,
আমার এ ক্লেশে আমারে কাঁদিতে দাও।'
আমার দুঃখ 'লু' হাওয়ার জ্বালা না আনে গোলাপ-বাগে।
ক্ষমা করো মোরে, ভুল বুঝিও না, যদি অভিমান জাগে।

জানি তুমি মোরে জড়ায়ে ধরেছ প্রকাশ-ব্রহ্মরূপে,
আমার বক্ষে চেতনানন্দ হয়ে কাঁদো চুপে চুপে!
হৃদি-শতদল কাঁপে মোর টলমল,
মোর চোখে ঝরে তোমার অশ্রুজল!
বক্ষে জড়ায়ে আন প্রেমলোকে, নামিয়া অন্ধকূপে,
অমৃত স্বরূপে হে প্রিয়তম আনন্দ-স্বরূপে!

আঁধারে আলোকে যখন যে পথ টানে, তুমি থাক কাছে।
অরণ্যপথে তব আনন্দ কুরঙ্গ হয়ে নাচে!
আমার তীর্থ-মরু-পথে ছায়া হয়ে
সাথে সাথে চল আঙুরের রস লয়ে,

পথে বালুকা পাখির পালক ফুল হয়ে ফুটিয়াছে।
চোখে জল, বুকে মধু বলে—'বঁধু আছে আছে, সাথে আছে !'

তোমারে ভিক্ষা দাও

বল হে পরম প্রিয়-ঘন মোর স্বামী !
আমাতে কাহারও অধিকার নাই, এক সে তোমার আমি।
ভালো ও মন্দে মধুর দ্বন্দ্বে কি খেলা আমারে লয়ে
খেলিতেছ তুমি, কেহ জানিবে না, থাকুক গোপন হয়ে !
আমারেও তাহা জানিতে দিও না, শুধু এই জানাইও,
আমার পূর্ণ পরম মধুর, মধুর তুমি হে প্রিয় !
আমার জানা ও না-জানা সর্ব অস্তিত্বের প্রভু
একা তুমি হও ! সেথা কারো ছায়া পড়ে না কো যেন কভু !
তোমার আমার পরমানন্দ ফোটে ছন্দ ও গানে,
তুমি শোনো তাহা, তুমি লঘু ; গুরুজন হাত দিক কানে !
লতার প্রলাপ গোলাপের মতো কথা মোর কেন ফোটে !
তুমি জান, কেন ঊষা আসে ভোরে, কেন শুকতারা ওঠে।
ঘুমে জাগরণে শয়নে স্বপনে সর্বকর্মে মম
তব স্মৃতি তব নাম যেন হয় সাথী মোর, প্রিয়তম !
নিবিড় বেদনা হইয়া আমার বক্ষে নিত্য থেকো,
ভুলিতে দিও না, আমি যদি ভুলি অমনি আমারে ডেকো।
তুমি যারে ভোলো, ভাগ্যহীন সে তোমারে ভুলিয়া যায়,
তুমি কৃপা করে চাহ যার পানে, সেই তব প্রেম পায়।
তুমি যারে ডাক, পাগল হইয়া সেই ধায় তব পথে,
বাঁশি না শুনিলে বন-হরিণী কি ছুটে আসে বন হতে?
চাঁদ ওঠে আগে, দেখে অনুরাগে চকোরি ব্যাকুলা হয়,
এত পাখি আছে, চাতকিরই কেন মেঘের সাথে প্রণয়?
কে দিলে তাহারে মেঘের তৃষ্ণা হে রস-মধুর, বলো !
তুমি রস দিলে আঁখির আকাশ হয় জল-ছলছল।
চাঁদ যবে ওঠে, চকোর তাহার চকোরিরে ভুলে যায়,
চকোরিও ভোলে চকোরে, যখন চাঁদের সে দেখা পায়।
চাঁদের স্বপন ভুলিয়া দুজন নীড়ে কেন ফিরে আসে?
তব লীলা ধরা পড়ে যায়, দেখে কেউ কাঁদে, কেউ হাসে।

তুমি নির্গুণ নকি ? আমি দেখি গুণের অন্ত নাই,
ভিক্ষা যাচ্না করিতে আসিয়া শুধু তব গুণ গাই !
ভুলে যাই আমি কি ভিক্ষা চাই, পরান কাহারে যাচে,
খুঁজিয়া পাই না ভিক্ষার ঝুলি, চোরে চুরি করিয়াছে !
মন হাসে, প্রাণ কাঁদে ! বলে, জানি চুরি করে কোন চোরে।
তোমারে যে চায় ভিক্ষা, তাহার ঝুলিটিও নাও হরে !
যে হাতে ভিক্ষা চায়, ভিখারির সে হাত কাড়িয়া লও,
হে মহামৌনী ! কাঁদো কেন এত ? কথা কও, কথা কও !
কত যুগ গেল, কত সে জনম শুনিনি তোমার কথা,
এত অনুরাগ দিয়ে, বৈরাগী, কেন দিলে বধিরতা ?
তোমারে দেখার দৃষ্টি দিলে না, দিলে শুধু আঁখি-জল,
অশ্রু তোমার কৃপা ; তবু আঁখি হল না কি নির্মল ?
দৃষ্টিরে কেন ফিরাইয়া দাও—তব সৃষ্টির পানে ?
বলো, বলো, কোথা লুকাইয়া আছ সৃষ্টির কোনখানে !
উর্ধে যাব না, লহ হাত ধরে তব সৃষ্টির কাছে,
কোথা তুমি, সেথা লয়ে যাও, এই অন্ধ ভিখারি যাচে !
কি ভিক্ষা চায় ভিখারি তোমার, আগে থেকে রাখো জেনে,
চাহিব যখন, হে চোর, তখন পলায়ো না হার মেনে।
আর কিছু নয়, চির প্রেমময়, তোমারে ভিক্ষা চাই,
এক তুমি ছাড়া এই ভিখারির কিছুই চাওয়ার নাই !
তব দেওয়া এই তনু মন প্রাণ মোর যাহা কিছু আছে,
তুমি জান, কেন নিবেদন করে দিয়াছি তোমার কাছে।
যা-কিছু পেয়েছি, পাইতেছি যাহা, পাইব যা কিছু পরে,
সে যে তব দান, তাই নিবেদিত থাক উহা তব তরে।
তোমার দানের সম্মান, প্রভু আমি কি রাখিতে পারি ?
তব দান দাও সকলে বিলায়ে, আমারে কর ভিখারি !
তব দান মোর কামনা ও লোভ সঞ্চিত করে রাখে,
বঞ্চিত করে তোমার মিলনে, ঐ সবই ঘিরে থাকে !
দান দিয়ে মোরে দিও না ফিরায়ে, হে দানী, তোমারে দাও,
তব দান নিয়ে তব ভিখারিরে চিরতরে চিনে নাও !
তোমারেই চাই জেনে, করিয়াছ চুরি ভিক্ষার ঝুলি,
ধরা পড়িয়াছ মনোচোর, দাও চোখের বাঁধন খুলি।

সব ভুলে যাই, কিছু মনে নাই, খেলাতেছিলে কি খেলা,
আমারি মতন ঘুমাইতে কারে দাওনি ?
তব নাম লয়ে সুদূর মিনারে কে ডাকিছে ভোরবেলা ?

বকরীদ

'শহিদান'দের ঈদ এল বকরীদ !
অন্তরে চির নৌ-জোয়ান যে, তারি তরে এই ঈদ।
আল্লার রাহে দিতে পারে যারা আপনারে কোরবান,
নির্লোভ নিরহঙ্কার যারা, যাহারা নিরভিমান,
দানব-দৈত্যে কতল করিতে আসে তলোয়ার লয়ে,
ফিরদৌস হতে এসেছে যাহারা ধরায় মানুষ হয়ে
অসুন্দর ও অত্যাচারীরে বিনাশ করিতে যারা
জন্ম লয়েছে চির-নির্ভীক যৌবন-মাতোয়ারা,—
তাহাদেরি শুধু আছে অধিকার ঈদগাহে ময়দানে,
তাহারাই শুধু বকরীদ করে জান মাল কোরবানে।
বিভূতি 'মাজেজা', যাহা পায় সব প্রভু আল্লার রাহে
কোরবানি দিয়ে নির্যাতিতেরে মুক্ত করিতে চাহে।
এরাই মানব-জাতির খাদেম, ইহারাই খাকসার,
এরাই লোভীর সাম্রাজ্যেরে করে দেয় মিস্মার !
ইহারাই ফিরদৌস-আল্লার প্রেম-ঘন অধিবাসী
তসবি ও তলোয়ার লয়ে আসি অসুরে যায় বিনাশি।
এরাই শহিদ, প্রাণ লয়ে এরা খেলে ছিনিমিনি খেলা,
ভীরুর বাজারে এরা আনে নিতি নব হওরোজ-মেলা !
প্রাণ-রঙ্গীলা করে ইহারাই ভীতি-ম্লান আত্মায়,
আপনার প্রাণ-প্রদীপ নিভায়ে সবার প্রাণ জাগায়।
কল্পবৃক্ষ পবিত্র 'জৈতুন' গাছ যথা থাকে,
এরা সেই আসমান থেকে এসে সদা তারি ধ্যান রাখে !
এরা আল্লার সৈনিক, এরা 'জবিহুল্লা'র সাথী,
এদেরি আত্মত্যাগ যুগে যুগে জ্বালায় আশার বাতি।
ইহারা সর্বত্যাগী বৈরাগী প্রভু আল্লার রাহে,
ভয় করে না কো কোনো দুনিয়ার কোনো সে শাহানশাহে।
এরাই কা'বার হজের যাত্রী, এদেরই দস্ত চুমি
কওসর আনে নিঙাড়িয়া রণক্ষেত্রের মরুভূমি !
'জবিহুল্লা'র দোস্ত ইহারা, এদেরি চরণাঘাতে
'আব-জমজম' প্রবাহিত হয় হৃদয়ের মক্কাতে।
ইবরাহিমের কাহিনী শুনেছ? ইসমাইলের ত্যাগ?
আল্লারে পাবে মনে করো কোরবানি দিয়ে গরু ছাগ?
আল্লার নামে, ধর্মের নামে, মানবজাতির লাগি
পুত্রেরে কোরবানি দিতে পারে, আছে কেউ হেন ত্যাগী?

সেই মুসলিম থাকে যদি কেউ, তসলিম করি তারে,
ঈদগাহে গিয়া তারি সার্থক হয় ডাকা আল্লারে।
অন্তরে ভোগী, বাইরে যে রোগী, মুসলমান সে নয়,
চোগা চাপকানে ঢাকা পড়িবে না সত্য যে পরিচয়!
লাখো 'বকরা'র বদলে সে পার হবে না পুলসেরাত,
সোনার বলদ ধনসম্পদ দিতে পার খুলে হাত?
কোরান মজিদে আল্লার এই ফরমান দেখো পড়ে
আল্লার রাহে কোরবানি দাও সোনার বলদ ধরে।
ইবরাহিমের মতো পুত্রেরে আল্লার রাহে দাও,
নৈলে কখনো মুসলিম নও, মিছে শাফায়ৎ চাও!
নির্যাতিতের লাগি পুত্রেরে দাও না শহিদ হতে,
চাকরিতে দিয়া মিছে কথা কও—'—যাও আল্লার পথে'।
বকরী'দি চাঁদ করে ফরয়্যাদ, দাও দাও কোরবানি,
আল্লারে পাওয়া যায় না, করিয়া তাঁহার না-ফরমানি!
পিছন হইতে বুকে ছুরি মেরে, গলায় গলায় মেলো,
করো না আত্মপ্রতারণা আর, খেলকা খুলিয়া ফেল!
উমরে, খালেদে, মুসা ও তারেকে বকরীদে মনে কর,
শুধু সালওয়ার পরিও না, ধর হাতে তলোয়ার ধর!
কোথায় আমার প্রিয় শহিদান মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ?
(এস) ঈদের নামাজ পড়িব, আলাদা আমাদের ময়দানে!

আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও

['ফি সাবিলিল্লাহ']

মোর পরম-ভিক্ষু আল্লার নামে চাই
ভিক্ষা দাও গো মাতা পিতা বোন ভাই,
দাও ভিখারিরে ভিক্ষা দাও।

মোর পরম-ডাকাত ঘরের দুয়ার খুলি
হরিয়া আমার সর্বস্ব সে দিয়াছে ভিক্ষাঝুলি,
তাঁর মহাদান সেই ঝুলি কাঁধে তুলি
এসেছি ভিখারি,. হে ধনী, ফিরিয়া চাও
আল্লার নামে ভিক্ষা দাও।

হে ধনিক, তাঁর পাইয়াছ বহু দান,
রত্ন মানিক ভোগ যশ সম্মান,
তব প্রাসাদের চারিদিকে ভিখারিরা
প্রসাদ মেগেছে ক্ষুধার অন্ন, চায়নি তোমার হীরা।
বলো, বলো, সেই নিরন্নদের মুখে
অন্ন দিয়াছ? কেঁদেছ তাদের দুখে?
লজ্জা ঢাকিয়া নগ্ন দেহের তার
মুক্তি, পেয়েছে তোমার মুক্তি–হার?

তব আত্মার আত্মীয় যার, তারা ক্ষুধা তৃষ্ণায়
কাঙালের বেশে কাঁদে তব দরজায়—
তাড়ায় তাদেরে, গাল দিয়ে দরওয়ান,
তুমিও মানুষ, কাঁদে না তোমার প্রাণ?
হীরা মানিকের পাষাণ পরিয়া তুমি কি পাষাণ হলে?
তোমার আত্মা কাঁদে না তোমার দুয়ারে মানুষ মলে?

পাওনি শান্তি, আনন্দ প্রেম—জানি আমি তাহা জানি,
তোমার অর্থ ঢাকিয়া রেখেছে তোমার চোখের পানি!
কাঙালিনী মার বুকে ক্ষুধাতুর শিশু
তোমার দুয়ারে কাঁদে শোনো, ঐ শোনো।
ভিক্ষা দাও না, রাশি রাশি হীরা মণি
তুলে রাখ আর গোণো।
এ টাকা তোমার রবে না, বন্ধু, জানি,
এ লোভ তোমারে নরকে লইবে টানি।
'আর্শ' আসন টলিয়াছে আল্লার
শুনি ক্ষুধিতের কাঙালের হাহাকার।
তাই সে পরম-ভিক্ষু ভিক্ষা চায়
ভিখারির মারফতে তব দরজায়।
ক্ষমা পাবে তুমি, আজিও সময় আছে,
ভিক্ষা না দিলে পুড়িবে অগ্নি-আঁচে।
মৃত্যুর আর দেরি নাই তব—ফিরে চাও ফিরে চাও,
পরম-ভিক্ষু মোর আল্লার নামে—
দরিদ্র উপবাসীরে ভিক্ষা দাও।

ওগো জ্ঞানী, ওগো শিল্পী, লেখক, কবি,
তোমরা দেখেছ ঊর্ধের শশী রবি।

তোমরা তাঁহার সুন্দর সৃষ্টিরে
রেখেছ ধরিয়া রসায়িত মন ঘিরে।
তোমাদের এই জ্ঞানের প্রদীপ-মালা
করে না কো কেন কাঙালের ঘর আলা?
এত জ্ঞান এত শক্তি, বিলাস সে কি?
আলো তার দূর কুটিরে যায় না কোন সে শিলায় ঠেকি?
যাহারা বুদ্ধিজীবী, সৈনিক হবে না তাহারা কভু,
তারা কল্যাণ আনেনি কখনো, তারা বুদ্ধির প্রভু।
তাহাদের রস দেবার তরে কি লেখনী করিছ ক্ষয়?
শতকরা নিরানব্বই জন তারা তব কেহ নয়?
এই দরিদ্র ভিখারিরা আজ অসহায় গৃহহারা
'আলো দাও' বলে কাঁদিছে দুয়ারে—ভিক্ষা পাবে না তারা?
অজ্ঞান-তিমিরান্ধকারের ইহারা বদ্ধ জীব,
উৎপীড়কের পীড়নে পীড়িত দলিত বদনসিব।
তোমাদের আছে বিপুল শক্তি, কৃপণ হইয়া তবে
কেন সহ মানুষের অপমান, মানুষ কি দাস রবে?
আমার পিছনে পীড়িত আত্মা অগণন জনগণ
অসহ জুলুম যন্ত্রণা পেয়ে করিতেছে ক্রন্দন।
পরম-ভিক্ষু আদেশ দিলেন, ভিক্ষা চাহিতে, তাই
এই অগণন জনগণ তরে আসিয়াছি দ্বারে, ভাই!
ভোলো ভয়, দূর করো কৃপণতা, পাষাণে প্রাণ জাগাও,
ভিখারির ঝুলি পূর্ণ হইবে, তোমরা ভিক্ষা দাও।

তোমরা কি দলপতি, তোমরা কি নেতা?
শুনেছি, তোমরা কল্যাণকামী মহান উদারচেতা।
তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিব চরম আত্মদান,
চাহিব তোমার অভিনন্দন-মালা, যশ, খ্যাতি, প্রাণ।
চাহিব তোমার গোপন ইচ্ছা আত্ম-প্রতিষ্ঠার,
চাহিব ভিক্ষা তোমার সর্ব লোভ ও অহঙ্কার
পরম ভিক্ষু পাঠায়েছে মোরে, দাও সে ভিক্ষা দাও!
আপনার সব লোভ ও তৃষ্ণা তাঁহারে বিলায়ে দাও!
তিনি নিরভাব, পূর্ণ! ভিক্ষা চাহেন, এ তাঁর সাধ,
শালুক ফুটায়ে যেমন তাহারি প্রেম-প্রীতি চায় চাঁদ।
যশ খ্যাতি আর অহঙ্কারের লোভ তাঁরে দিলে ভিখ,
ফিরে পাবে তাঁর মহাদান, হবে মহা-নেতা নির্ভীক!

নিজেরা আত্মত্যাগ করে মহাত্যাগের পথ দেখাও !
ভিক্ষা চাহে এ ভিখারি, ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও !

তুমি কে ? তুমি মদোন্মত্ত মানবের যৌবন,
তুমি বারিদের ধারাজল, মহাগিরির প্রস্রবণ।
তুমি প্রেম, তুমি আনন্দ, তুমি ছন্দ মূর্ত্তিমান,
তুমিই পূর্ণ প্রাণের প্রকাশ, রুদ্রের অভিযান !
যুগে যুগে তুমি অকল্যাণেরে করিয়াছ সংহার,
তুমি বৈরাগী, বক্ষের প্রিয়া ত্যজি ধর তলোয়ার !
জরাজীর্ণের যুক্তি শোন না, গতি শুধু সম্মুখে,
মৃত্যুরে প্রিয় বন্ধুর সম জড়াইয়া ধর বুকে।
তোমরাই বীর সন্তান যুগে যুগে এই পৃথিবীর,
হাসিয়া তোমরা ফুলের মতন লুটায়েছ নিজ শির।
দেহেরে ভেবেছ ঢেলার মতন, প্রাণ নিয়ে কর খেলা,
তোমারই রক্তে যুগে যুগে আসে অরুণ-উদয়-বেলা।
তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতে আঁখি ভরে ওঠে জলে,
তোমরা যে পথে চলো, কেঁদে আমি লুটাই সে পথতলে।
তোমাদেরই প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে এসেছি ভিখারি আমি,
ভিক্ষা চাহিতে পাঠাল সর্ব-জাতির পরম স্বামী।
তোমরা শহিদ, তোমরা অমর, নিতি আনন্দধামে
তোমরা খেলিবে, তোমাদের তরে তাঁর কৃপা নিতি নামে।
তোমরাই আশা-ভরসা জাতির, স্বদেশের সেনাদল,
তোমরা চলিলে, আনন্দে ধরা কেঁপে ওঠে টলমল।
তোমরা প্রবাহ, তোমরা শক্তি, তোমরা জীবনধারা,
তোমাদেরই স্রোত যুগে যুগে ভাঙে সব বন্ধন-কারা।

তুষার হইয়া কেন আছ আজও, আগুন ওঠেছে জ্বলে
দিক দিগন্ত কাঁপাইয়া, ছুটে এসো সবে দলে দলে।
তোমরা জাগিলে ঘুচে যাবে সব ক্লৈব্য ও অবসাদ,
পরম-ভিক্ষু এক আল্লার পুরিবে সেদিন সাধ।
আর কেহ ভিখ দিক বা না দিক তোমরা ভিক্ষা দাও,
সাম্য শান্তি আসিবে না, যদি তোমরা ফিরে না চাও।
নহি নেতা, রাজনৈতিক, প্রেম-ভিক্ষা আমার নীতি,
পৃথিবী স্বর্গ, পৃথিবীতে ফের জাগুক স্বর্গ-প্রীতি।
অসম্ভবেরে সম্ভব-করা জাগো নব-যৌবন !
ভিক্ষা দাও গো, এ ধরা হউক আল্লার গুলশন।

একি আল্লার কৃপা নয়?

একি আল্লার কৃপা নয়?
একি তাঁর সাহায্য নয়?
যেথা ছিল শুধু পরাজয় ভয়, সেখানে পাইলে জয়!
রক্তের স্রোত বহাতে যাহারা এসেছিল এই দেশে,
ধরেছে তাঁদের টুটি টিপে আজ তাঁর অভিশাপ এসে!
আল্লার আশ্রয় চেয়ে, আল্লার শক্তিতে আজ
তোমরা পেয়েছ আশ্রয় আর তারা পাইতেছে লাজ।
লোভ আর ভোগ চাহে যারা, নাই তাদের ধর্ম জাতি,
তাহাদের শুধু এক নাম আছে, রাক্ষস বলে খ্যাতি!
হউক হিন্দু, হোক খ্রিস্চান, হোক সে মুসলমান,
ক্ষমা নাই তার, যে আনে তাহার ধরায় অকল্যাণ!
জুলুম যে করে শক্তি পাইয়া, দানব সে, সে অসুর,
আল্লার মার পড়ে তারে করে দুনিয়া হইতে দূর।
তাহাদেরই তরে দোজখে নরকে ভীষণ অগ্নি জ্বলে,
দলিছে যাহারা তাঁহারা সৃষ্টি মানুষেরে পদতলে!
সকল জাতির সব মানুষের এক আল্লাহ সেই,
তাঁর সৃষ্টির বিচার করার কারো অধিকার নেই!
আমরা নিত্য চেষ্টা করিব চলিতে তাঁহারি পথে,
করিব না ভয়, আসুক আঘাত শত শত দিক হতে।

নির্যাতিতের আল্লাহ তিনি, কোনো জাতি নাই তাঁর,
যুগে যুগে মারে উৎপীড়কেরে তাঁহার প্রবল মার।
তাঁর সৃষ্টিরে ভালোবাসে যারা, তারাই মুসলমান,
মুসলিম সেই, যে মানে এক সে আল্লার ফরমান।
দূর করো লোভ, ক্ষুদ্র অহঙ্কার,
ফেলিয়া দিও না, পাইয়াছ হাতে আল্লার তলোয়ার।
দূর করে দাও সন্দেহ, দুর্বলের অবিশ্বাস,
সমুখে জাগুক পরম সত্য আল্লার উল্লাস!
খানিক পেয়েছ, মানিক পাওনি, দেরি নাই, তাও পাবে,
তাঁর জ্যোতি চির-অভয়ের পথে নিত্য লইয়া যাবে!
চারিদিক হতে ঘিরিয়া আসিছে হের অগ্নির ঢেউ,
যারা তাঁর পথে রহিবে, তাঁদের মারিবে না কভু কেউ!
শুধু তাহারাই রক্ষা পাইবে! সাবধান, সাবধান!

মহাযুদ্ধের রূপে আসিয়াছে তাঁর শেষ ফরমান !
তাঁর শক্তিতে জয়ী হবে, লয়ে আল্লার নাম, জাগো !
ঘুমায়ো না আর, যতটুকু পার শুধু তাঁর কাজে লাগো !
অন্তরে তব উঠুক ঝলসি আল্লার তলোয়ার,
ভিতরের ভয় ঘুচিলে আসিবে এই হাতে আরবার !
কোনো ব্যক্তির করিও না পূজা, এক তাঁর পূজা কর,
রাজনীতি নয় মুক্তির পথ, এক তাঁর পথ ধর !
মানুষের লোভ বাড়ায়ে দিও না, তার জয়ধ্বনি করে,
মানুষেরে ত্রাতা ভাবিলে অমনি আল্লাহ্ যান সরে !
তিনিই সর্বকল্যাণদাতা, সর্ব বিপদত্রাতা,
তিনি দিশা দেন সহজ পথের, তিনিই সর্বজ্ঞাতা !

তাঁর দেওয়া কৃপা-শক্তির চেয়ে, ভাই,
মানবের জ্ঞানে দানব মারার কোনো সে শক্তি নাই।
চুক্তিতে আর যুক্তিতে কভু মানুষ বন্ধ হয় ?
তিনি প্রেম দিলে ত্রিভুবন হয় সাম্য শান্তিময় !
আমি বুঝি না কো কোনো সে 'ইজম' কোনোরূপ রাজনীতি,
আমি শুধু জানি, আমি শুধু মানি, এক আল্লার প্রীতি !
ভেদ-বিভেদের কথা বলে যারা, তারা শয়তানি চেলা,
আর বেশি দিন নাই, শেষ হয়ে এসেছে তাদের খেলা !
থাকি কি না-থাকি এই দুনিয়ায়, তোমরা থাকিয়া দেখো,
সেদিন সত্য হয় যদি তাঁর এই বান্দার কথা,
ঘুচে যাবে মোর চিরজনমের সকল দুঃখ-ব্যথা।
মানুষ আবার তাঁর প্রেমে নেয়ে চিরপবিত্র হোক !
জিনের দুনিয়া লভুক আবার জান্নাতের আলোক !

মহাত্মা মোহসিন

সালাম লহ, হে মহাত্মা মোহসিন !
ইতিহাসে নয়, মানব-হৃদয়ে তব নাম চিরদিন
প্রেমাশ্রুজলে লেখা রবে প্রিয় আত্মীয় স্মৃতি-সম,
মানবাত্মার নিত্য বন্ধু, মহাত্মা নিরুপম !

সারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ধরায় মানব-জন্ম লয়ে
মানুষ যাহারা হলো না, বেড়ায় ভোগৈশ্বর্য বয়ে,
যাহারা রক্ত-মাংস মেদ ও মজ্জা বৃদ্ধি করে
পেল না শান্তি রস আনন্দ, পশু-সম গেল মরে,
সুন্দর সেই স্রষ্টার যারা ইঙ্গিত বুঝিল না,
বণিক-বুদ্ধি আত্মার বিনিময়ে নিল রূপা সোনা,
রূপ-ভোগী নর প্রেম চাহিল না, যে প্রেম রূপের প্রাণ,
আত্মা মলিন হয়ে গেল শোকে না পেয়ে আত্মদান।
মেঘবারি, নদীজল থাকিতেও, কাদা-জল যারা খায়,
মদপায়ী হয়, মৌচাকে এত মধু থাকিতেও, হায় !
পথভ্রষ্ট সেই মানুষেরে তুমি পথ দেখাইলে,
রাজৈশ্বর্য বিলায়ে, ভিক্ষু, ভিক্ষা-পাত্র নিলে !
ভিক্ষা-পাত্র প্রেম-অমৃত পূর্ণ করিয়া তুমি
সিক্ত করিলে আত্মার কা'বা, দারিদ্র্য-মরুভূমি।

কোন আনন্দ-প্রেয়সীরে পেয়ে; হে চির-ব্রহ্মচারী !
মিটিল তোমার তৃষ্ণা, করিয়া পান কোন রস-বারি ?
মোহম্মদের তত্ত্ব তুমিই শিখালে ভারতে আসি,
ষড়ৈশ্বর্য পেয়ে মুসলিম বৈরাগী সন্ন্যাসী।

অর্থ তখনি বাধা হয় শুভ পরমার্থের পথে,
সে অর্থ যদি বঞ্চিত হয় পরার্থে ব্যয় হতে।
তখনি অর্থ আনে অনর্থ সুন্দর পৃথিবীতে,
তখনি অসুর দানব-জন্ম লভে মানবের চিতে।
স্বর্ণ হীরক মানিক মুক্তা তখনি মুক্তি পায়
মানুষের লোভ-বাসনা যখন তাদেরে নাহি জড়ায়।
অলঙ্কারের রূপে যবে মণি-মুক্তা বন্দী হয়,
অহঙ্কারীর প্রাসাদে তখনি প্রবেশ করে প্রলয়।

রৌপ্য স্বর্ণ, কণ্ঠ বাহু ও চরণ জড়ায়ে কহে—
"কাঁদিতে আসি গো, বাঁধিতে আসা তো মোদের ধর্ম নহে ;
মোরা পৃথিবীর জমাট রক্ত, মোরা বিধাতার দান ;
মোদেরে গলায়ে বিলাইয়া দাও, মুমূর্ষু পাবে প্রাণ।"
হে দ্রষ্টা, তুমি অচেতন জড় ঐশ্বর্যের বুকে
দেখেছিলে কোন চৈতন্যের জ্যোতি যেন মহা দুখে

লোভীর পরশে গভীর বিষাদে পাষাণ হইয়া আছে ;
মুক্তি তাদেরে দিলে দান করি ক্ষুধিত জনের কাছে !

দশ লাখ টাকা থেকে দশ টাকা দিয়ে দাতা হয় যারা,
কারে বলে দান, তব দান দেখি শিখে যায় যেন তারা।
যারা দান করে, আপনারে তারা নিঃশেষে দিয়ে যায় ;
মেঘ ঝরে যায়, ভাবে না তাহার বিনিময়ে সে কি পায়।
প্রদীপ নিজেরে তিলে তিলে দাহ করে দেয় নিজ প্রাণ,
প্রদীপই জানে, কি আনন্দ দেয় তারে এই মহাদান।
যুগে যুগে এই পৃথিবী গেয়েছে সেই মানবের জয়,
বিলায়ে দিয়েছে মানুষেরে যারা স্বীয় সব সঞ্চয়।
তুমি আল্লার সৃষ্টিরে দিয়ে আল্লার নিয়ামত
তাহার দানের সম্মান রাখিয়াছ, ওগো হজরত !

পরমার্থের মধু-মাখা তব অর্থ যাহারা পায়,
জিজ্ঞাসা করি, তোরা কি তোমার মতো প্রেমে গলে যায় ?
ব্যর্থ হয়নি তব দান জানি, তোমার প্রেমের ঢেউ
এনেছে শক্তি-বন্যা বঙ্গে হয়তো, জানে না কেউ।
যারা জাগ্রত-আত্মা, তারাই করে যে আত্মদান,
তাহাতেই এই পৃথিবী পেয়েছে স্বর্গের সম্মান।
সৃষ্টির যারা সখা তাহারাই রাখে স্রষ্টার নাম,
সেই মহাত্মা তুমি মোহসিন, লহ আমার সালাম !

মোহসিন স্মরণে

[গান]

সকল জাতির সব মানুষের বন্ধু হে মোহসিন !
এ যুগে তুমিই শোধ করিয়াছ এক আল্লার ঋণ ॥

ভাগ করনি কো বিপুল বিত্ত পেয়ে,
ভিখারি হইলে শুধু আল্লারে চেয়ে,
মহাধনী হলে আল্লার কৃপা পেয়ে,
দুনিয়ায় তাই রহিলে কাঙাল দীন ॥

মানুষের ভালোবাসায় পাইলে আল্লার ভালোবাসা,
সৃষ্টির তরে কাঁদিয়া, পুরালে তব স্রষ্টার আশা।
তব দান তাই ফুরায়ে নাহি ফুরায়,
বিত্ত হইল নিত্য এ দুনিয়ায়,
শিখাইয়া গেলে, মুসলিম তারে কয়
অর্থ যাহারে কিনিতে পারে না, যে নহে লোভ-মলিন॥

এক আল্লাহ্ 'জিন্দাবাদ'

উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ ;
আমরা বলিব, 'সাম্য, শান্তি এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদ।'
উহারা চাহুক সঙ্কীর্ণতা, পায়রার খোপ, ডোবার ক্লেদ,
আমরা চাহিব উদার আকাশ, নিত্য আলোক, প্রেম অভেদ।

উহারা চাহুক দাসের জীবন, আমরা শহিদি দর্জা চাই ;
নিত্য মৃত্যু-ভীত ওরা, মোরা মৃত্যু কোথায় খুঁজে বেড়াই !
ওরা মরিবে না, যুদ্ধ বাঁধিলে লুকাইবে ওরা কচু-বনে,
দন্তনখরহীন ওরা তবু কোলাহল করে অঙ্গনে।

ওরা নির্জীব, জিব নাড়ে তবু শুধু স্বার্থ ও লোভবশে,
ওরা 'জিন' প্রেত, যক্ষ, উহারা লালসার পাঁকে মুখ ঘষে।
মোরা বাঙলার নবযৌবন, মৃত্যুর সাথে সঞ্চরি,
উহাদেরে ভাবি মাছি পিপীলিকা, মারি না কো তাই দয়া করি।

মানুষের অনাগত কল্যাণে উহারা চির-অবিশ্বাসী,
অবিশ্বাসীরাই শয়তানি-চেলা ভ্রান্ত-দ্রষ্টা ভুল-ভাষী।
ওরা বলে, হবে নাস্তিক সব মানুষ, করিবে হানাহানি।
মোরা বলি, হবে আস্তিক, হবে আল্লা-মানুষে জানাজানি !

উহারা চাহুক অশান্তি ; মোরা চাহিব ক্ষমা ও প্রেম তাঁহার,
ভূতেরা চাহুক গোর ও শ্মশান, আমরা চাহিব গুল-বাহার !
আজি পশ্চিম পৃথিবীতে তাঁর ভীষণ শাস্তি হেরি মানব
ফিরিবে ভোগের পথ হতে ভয়ে, চাহিবে শান্তি সাম্য সব।

হুতুমপ্যাঁচারা কহিছে কোটরে, হইবে না আর সূর্যোদয়,
কাকে তার টাকে ঠোকরাইবে না, হোক তার নখ চঞ্চু ক্ষয়।
বিশ্বাসী কভু বলে না এ কথা, তারা আলো চায়, চাহে জ্যোতি,
তারা চাহে না কো এই উৎপীড়ন এই অশান্তি দুর্গতি।

তারা বলে, যদি প্রার্থনা মোরা করি তাঁর কাছে একসাথে,
নিত্য ঈদের আনন্দ তিনি দিবেন ধূলির দুনিয়াতে।
সাত আসমান হতে তারা সাত-রঙা রামধনু আনিতে চায়,
আল্লা নিত্য মহাদানী প্রভু যে যাহা চায় সে তাহাই পায়।

যারা অশান্তি দুর্গতি চাহে, তারা তাই পাবে, দেখো রে ভাই,
উহারা চলুক উহাদের পথে, আমাদের পথে আমরা যাই !
ওরা চাহে রাক্ষসের রাজ্য, মোরা আল্লার রাজ্য চাই,
দ্বন্দ্ব-বিহীন আনন্দ-লীলা এই পৃথিবীতে হবে সদাই।

মোদের অভাব রবে না কিছুই, নিত্যপূর্ণ প্রভু মোদের,
শকুন শিবার মতো কাড়াকাড়ি করে শব লয়ে—শখ ওদের !
আল্লা রক্ষা করুন মোদেরে, ও পথে যেন না যাই কভু,
নিত্য পরম-সুন্দর এক আল্লাহ আমাদের প্রভু।

পৃথিবীতে যত মন্দ আছে, তা ভালো হোক, ভালো হোক ভালো ;
এই বিদ্বেষ-আঁধার দুনিয়া তাঁর প্রেমে আলো হোক, আলো !
সব মালিন্য দূর হয়ে যাক সব মানুষের মন হতে,
তাঁহার আলোক প্রতিভাত হোক এই ঘরে ঘরে পথে পথে।

দাঙ্গা বাঁধায়ে লুট করে যারা, তারা লোভী, তারা গুণ্ডাদল,
তারা দেখিবে না আল্লার পথ চিরনির্ভয় সুনির্মল।
ওরা নিশিদিন মন্দ চায়, ওরা নিশিদিন দ্বন্দ্ব চায়,
ভূতেরা শ্রীহীন ছন্দ চায়, গলিত শবের গন্ধ চায় !

তাড়াবে ওদের দেশ হতে মেরে আল্লার অনাগত সেনা,
এরাই বৈশ্য, ফসল শস্য লুটে খায়, এরা চির-চেনা।
ওরা মাকড়সা, ওদের ঘরের ঘেরোয়াতে কভু যেয়ো না কেউ,
পোড়ো ঘরে থাকে জাল পেতে, ওরা দেখেনি প্রাণের সাগর-ঢেউ।

বিশ্বাস কর এক আল্লাতে প্রতি নিঃশ্বাসে দিনে রাতে,
হবে 'দুলদুল'—আসওয়ার পাবে আল্লার তলোয়ার হাতে !
আলস্য আর জড়তায় যারা ঘুমাইতে চাহে রাত্রিদিন,
তারা চাহে না চাঁদ ও সূর্য, তারা জড় জীব গ্লানি-মলিন !

নিত্য সজীব যৌবন যার, এস এস সেই নৌ-জোয়ান,
সবক্লৈব্য করিয়াছে দূর তোমাদেরই চির-আত্মদান !
ওরা কাদা ছুঁড়ে বাধা দেবে ভাবে—ওদের অস্ত্র নিন্দাবাদ,
মোরা ফুল ছুঁড়ে মারিব ওদের, বলিব—'আল্লা জিন্দাবাদ !'

গোঁড়ামি ধর্ম নয়

শুধু গুণ্ডামি ভণ্ডামি আর গোঁড়ামি ধর্ম নয়,
এই গোঁড়াদেরে সর্বশাস্ত্রে শয়তানি চেলা কয়।
এক সে স্রষ্টা সব সৃষ্টির এক সে পরম প্রভু,
একের অধিক স্রষ্টা কোনো সে ধর্ম কহে না কভু।
তবু অজ্ঞানে যদি শয়তানে শরিকী স্বত্ব আনে,
তার বিচারক এক সে আল্লা—লিখিত আল-কোরানে।
মানুষ তাহার বিচার করিতে পারে না, নরকে তারে
অথবা স্বর্গে কোন মানুষের শক্তি পাঠাতে পারে ?
'উপদেশ শুধু দিবে অজ্ঞানে'—আল্লার সে হুকুম,
নিষেধ কোরানে—বিধর্মী পরে করিতে কোনো জুলুম।
কেন পাপ করে, ভুল পথে যায় মানবজন্ম লয়ে,
কেন আসে এই ধরাতে জন্ম-অন্ধ পঙ্গু হয়ে,
কেন কেহ হয় চিরদরিদ্র, কেহ চিরধনী হয়,
কেন কেউ অভিশপ্ত, কাহারো জীবন শান্তিময় ?

কোন শাস্ত্রী বা মৌলানা, বলো, জেনেছে তাহার ভেদ ?
গাধার মতন রয়েছে ইহারা শাস্ত্র কোরান বেদ !
জীবনে যে তাঁরে ডাকেনি কো, প্রভু ক্ষুধার অন্ন তার
কখনো বন্ধ করেননি কেন, কে করে তার বিচার ?
তাঁর সৃষ্টির উদার আকাশ সকলেরে থাকে ঘিরে,
তাঁর বায়ু মসজিদে মন্দিরে সকলের ঘরে ফিরে।

তাঁহার চন্দ্র সূর্যের আলো করে না ধর্মভেদ,
সর্বজাতির ঘরে আসে, কই আনে না তো বিচ্ছেদ !
তাঁর মেঘবারি সব ধর্মীয় মাঠে ঘাটে ঘরে ঝরে,
তাঁহার অগ্নি জল বায়ু বহে সকলেরে সেবা করে।
তাঁর মৃত্তিকা ফল ফুল দেয় সর্বজাতির মাঠে,
কে করে প্রচার বিদ্বেষ তবু তাঁর এ প্রেমের হাটে ?
কোনো 'ওলি' কোনো দরবেশ যোগী কোনো পয়গাম্বর,
অন্য ধর্মে, দেয়নি কো গালি,—কে রাখে তার খবর ?
যাহারা গুণ্ডা, ভণ্ড, তারাই ধর্মের আবরণে
স্বার্থের লোভে ক্ষ্যাপাইয়া তোলে অজ্ঞান জনগণে।
জাতিতে জাতিতে ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ এরা আনি
আপনার পেট ভরায়, তখত চায় এরা শয়তানী।
ধর্ম-আন্দোলনের ছদ্মবেশে এরা কুৎসিত,
বলে এরা, হয়ে মন্ত্রী, করিবে স্বধর্মীদের হিত।
এরা জমিদার মহাজন ধনী নওয়াবি খেতাব পায়,
কারো কল্যাণ চাহে না ইহারা, নিজ কল্যাণ চায়।
ধনসম্পদ এত ইহাদের, করেছে কি কভু দান ?
আশ্রয় দেয় গরিবে কি কভু এদের ঘর দালান ?
ধর্ম জাতির নাম লয়ে এরা বিষাক্ত করে দেশ,
এরা বিষাক্ত সাপ, ইহাদেরে মেরে কর সব শেষ।
নাই পরমত-সহিষ্ণুতা সে কভু নহে ধার্মিক,
এরা রাক্ষস-গোষ্ঠী ভীষণ অসুর-দৈত্যাধিক।
উৎপীড়ন যে করে, নাই তার কোনো ধর্ম ও জাতি,
জ্যোতির্ময়ের আড়াল করেছে, এরা আঁধারের সাথী !
মানবে মানবে আনে বিদ্বেষ কলহ ও হানাহানি,
ইহারা দানব, কেড়ে খায় সব মানবের দানাপানি।
এই আক্ষেপ জেনো তাহাদের মৃত্যুর যন্ত্রণা
মরণের আগে হতেছে তাদের দুর্গতি লাঞ্ছনা।
এক সে পরম বিচারক, তাঁর শরিক কেহই নাই,
কাহারে শাস্তি দেন তিনি, দেখো দুদিন পরে তা, ভাই !
মোরা দরিদ্র কাঙাল নির্যাতিত ও সর্বহারা,
মোদের ভ্রান্ত দ্বন্দ্বের পথে নিতে চায় আজ যারা
আনে অশান্তি উৎপাত আর খোঁজে স্বার্থের দাঁও,
কোরানে আল্লা এদেরই কন—'শাখা-মৃগ হয়ে যাও।'

জোর জমিয়াছে খেলা

জোর জমিয়াছে খেলা
ক্যালকাটা মাঠে সহসা বিকাল বেলা।
এই জনগণ-অরণ্যে যেন বহিত না প্রাণবায়ু,
শিথিল হইয়া ছিল যেন সব স্নায়ু !
সহসা মৌন অরণ্যে আজ উঠেছে প্রবল ঝড়,
ভিড় করে পাখি নীড় ছেড়ে করে কোলাহল-মর্মর।
জমাট হইয়া ছিল সাগরের জল,
সহসা গলিয়া ছুটিল স্রোতের ঢল।
ময়দানে জোর ভিড় জমিয়াছে বড় ছোট মাঝারির,
স্বদেশি বিদেশি লোভী নির্লোভ হেটো মেঠো বাজারীর।
এই দিকে 'রাজী' ও-দিকে 'নারাজী' দল,
সেন্টারে পড়ে আছে 'ভারতের স্বাধীনতা' ফুটবল !
'রাজী' জয়ী হবে বলে বাজি রাখে মজুর ও বিড়িওয়ালা,
কেল্লার ধারে জমায়েত হয়ে বাঁধা রেখে ঘটি থালা।
কাহার কেল্লা ফতে হবে সবে কয়,
'রাজী'রা খেলিতে জানে, উহারাই জয়ী হবে নিশ্চয়।
'গ্যালারি' ভর্তি মধ্যবিত্ত আধা-বড়লোক যত,
ছাতা উঁচাইয়া 'রাজী'দের জয়-ধ্বনি করে অবিরত।
'নারাজী' দলের 'সাপোর্টার যত কোট প্যান্ট চাপকান,
সংখ্যায় সাত কুড়ি, তবু তিন হাত তুড়ি লাফ খান !
এরা খায় বিড়ি, ওরা খায় সিগারেট,
এরা খায় চানাচুর ও বাদাম, ওরা চপ কাটলেট !

জোর জমিয়াছে খেলা,
বুট-পরা পায়ে ফুটবলে লাথি মারে, হুল্লোড় মেলা !
খাইয়া 'ফাউল-কারী' 'নারাজী'রা কেবল ফাউল করে,
রেফারিকে দেয় কাফেরি ফতোয়া যদি সে ফাউল ধরে !
'শেম' 'শেম' বলে জনগণ, হ্যাটুয়ারা দেয় হ্যাটে তালি,
খেলিতে পারে না, ফেলিতে পারে না ঠেলা দিয়ে, দেয় গালি।
কোন দল জেতে কোন দল হারে, উঠিয়াছে কোন্দল,
'নারাজী'র দিকে বুড়োরা, 'রাজী'র জোয়ান নতুন দল।
উঠেছে হট্টগোল
ঐ দিল—গোল, গোল !

মটরুর নানা দেড় চোখ কানা, ঝুড়ি তুলে মারে কিক,
লুঙ্গি ধরে চলে 'রাজী'রা এবার গোল দিল দেখো ঠিক!
'নারাজী'রা হল যেন আলু-ভাজি, করে শুধু হ্যান্ডবল,
যত গোল খায় তত গোলমাল করে তারা অবিরল!
কবুতর ওড়ে, মোগলী লম্ফ মারে বগলের ছাতা,
'জয় রাজী' বলে ওড়ায় রঙিন কুচি কাগজের পাতা।

খেলা জমিয়াছে জোর,
'নারাজী'রা রাগে, 'রাজী'রা ততই হাসিয়া করে স্কোর!
'নারাজী'র দলে বিদেশি খেলুড়ী, 'রাজী'র দেশের ছেলে,
'রাজী'রা পায়ের জোরে খেলে, 'নারাজী'রা গার জোরে ঠেলে।
আজও খেলা শেষ হয় নাই ময়দানে,
'হাফটাইমের' আগেই কে গোল খেয়েছে সবাই জানে।

এরি মাঝে আসিয়াছে ঘনঘটা রুক্ষ আকাশ ঘিরে,
কারা যেন ক্রোধে নীল আসমান্ বিজলী-নখরে চিরে!
বাজে বাদলের মাদল ঝাঁজর মৃদঙ্গ গুরুগুরু,
মাথার উপরে ছাতার তাম্বু, বৃষ্টি হয়েছে শুরু!
দর্শক দ্যাখে, এঁকেবেঁকে পড়ে মাঠে কারা পিছলায়ে,
'রাজী' দল ছোটে তীরের মতন চাকা-বাঁধা যেন পায়ে!

খেলা জোর জমিয়াছে;
দর্শক সব এবার এসেছে দড়ির কাছে।
বৃষ্টি নেমেছে, এবার দৃষ্টি প্রখর কর রে দাদা,
কার দিকে কত হয় সে ফাউল, কে ছিটায় কত কাদা।

খেলা দেখ, দেখ খেলা,
'রাজী' কি 'নারাজী' জয়ী হল, বলো তোমরাই সাঁঝ-বেলা!
কবুতরগুলি ফেরে নাই ঘরে, ঘুরিছে মাথার পর,
কাহারা জিতিল, দেশে দেশে গিয়া শুনাবে খোশখবর!

বোমার ভয়

বোমার ভয়ে বৌ, মা, বোন, নেড় রি গেঁড়রি লয়ে
দিগ্বিদিকে পালায় ভীরু মানুষ মৃত্যুভয়ে!

কোনখানে হায় পালায় মানুষ, মৃত্যু কোথায় নাই?
পলাতকের দল! বলে যাও সে দেশ কোথায় ভাই?
মানুষ মরে একবার, সে দুবার মরে না কো,
হায় রে মানুষ! তবু কেন মৃত্যুর ভয় রাখ!
আরেক দেশে পালিয়ে তোমার মৃত্যুভয় কি যাবে?
মৃত্যু-ভ্রান্তি দিবানিশি তোমায় ভয় দেখাবে!
না মরিয়া বীরের মতো মৃত্যু আলিঙ্গিয়া,
তিলে তিলে মরে ভীরু যে যন্ত্রণা নিয়া,
সে যাতনার চেয়ে বোমার আগুন স্নিগ্ধ আরো!
মরণ আসে বন্ধু হয়ে, মরতে যদি পারো
তেমন মরণ। দেখবে সেদিন সবে,
পৃথ্বী হবে নতুন আবার মৃত্যু-মহোৎসবে।

* * *

আল্লাহ্ ভগবানের আমরা যদি আশ্রয় পাই,
সেই সে পরম অভয়াশ্রমে মৃত্যুর ভয় নাই!
যেতে পার তাঁর কাছে ছুটে তুমি প্রবল তৃষ্ণা লয়ে?
তাঁহারে ছুঁইলে ছোঁবে না তোমারে কখনো মৃত্যুভয়ে!
সেখানে যাওয়ার ট্রেন কোন ইস্টিশনে সে পাওয়া যায়?
সে প্লাটফর্ম দেখেছ কি কভু? দেখনি কো তুমি, হায়।
যেখানেই তুমি পালাও, মৃত্যু সাথে সাথে দৌড়াবে!
জানিয়াও কেন অকারণে মৃত্যুর ভয়ে খাবি খাবে?
দেখেছি ভীষণ মানুষের স্রোত ভীষণ শাস্তি সয়ে,
চলেছে অজানা অরণ্যে যেন ভীতি-উন্মাদ হয়ে!
পুরুষের রূপে দেখেছি বৌমা করে কোণ ঠাসাঠাসি,
আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া বাক্স বোঁচকা পোঁটলা রাশি!
যাহারা যাইতে পারিল না, পড়ে রহিল অর্থাভাবে,
সঞ্চিত নাই অর্থ, কোথায় ক্ষুধার অন্ন পাবে?
তাহাদের কথা ভাবিল না কেউ, ধরিল না কেহ হাতে
কেহ বলিল না, 'মরিতে হয়তো এস মরি এক সাথে!'
কেহ বলিল না, 'কেন পলাইব, এস দল বেঁধে রই,
সংঘবদ্ধ হইয়া আমরা এস সৈনিক হই।'
ক্ষুদ্র অস্ত্র লয়ে কি করিয়া যুদ্ধ করিছে চীন?
অস্ত্র ধরিতে পারে না, যাহারা অন্তরে বলহীন।
যাহারা নির্যাতিত মানবেরে রক্ষা করিতে চায়,
আকাশ হইতে নেমে আসে, হাতে অস্ত্র তারাই পায়!

বোমার ভয় এ নহে, ইহা ক্লীব ভীরুর মৃত্যুভয়,
ইহারা ধরার বোঝা হয়ে আছে, ইহারা মানুষ নয়।
যে দেশে তাদের জন্ম সে দেশ ছেড়ে এরা পরদেশে
কেমন করিয়া খায় দায়, মুখ দেখায়, বেড়ায় হেসে?
অর্থের চাকচিক্য দেখায়, হায় রে লজ্জাহীন,
ইহাদেরই শিরে বোমা যেন পড়ে, ইহারা হোক বিলীন!
বোমা দেখেনি কো, শব্দ শোনেনি, শুধু তার নাম প্রেমে
এদের সর্ব অঙ্গ ব্যাকুল হইয়া উঠিছে ঘেমে!
জীবন আর যৌবন যার আছে, সেই সে মৃত্যুহীন,
গোরস্থানের শ্মশানের ভূত যারা ভীরু যারা দীন!
কেন বেঁচে আছে এরা পৃথিবীরে ভারাক্রান্ত করে?
ইহাদেরি শিরে পড়ে যেন যদি বোমা কোনদিন পড়ে!

নৌ-জোয়ানরা এস দলে দলে বীর শহিদান সেনা;
তোমরা লভিবে অমর-মৃত্যু, কোনো দিন মরিবে না!
ইতিহাসে আর মানবস্মৃতিতে আছে তাহাদেরি নাম,
যারা সৈনিক, দৈত্যের সাথে করেছিল সংগ্রাম!
যারা ভীরু, তারা কীটের মতন কখন গিয়েছে মরে,
তাদের কি কোনো স্মৃতি আছে, কেউ তাদের কি মনে করে?
ক্ষুদ্র-আত্মা নিষ্প্রাণ এরা, ইহারা গেলেই ভালো;
ভিড় করেছিল নিরাশা-আঁধার, এবার আসিবে আলো!
দেশের জাতির সৈনিক যদি কোনো দিন জয় আনে,
এই আঁধারের জীব যদি ফিরে আসে আলোকের পানে,
ইহাদের কাঁধে লাঙল বাঁধিয়া জমি করাইও চাষ
তবে যদি হয় চেতনা এদের, হয় যদি ভয় হ্রাস!
চল্লিশ কোটি মানুষ ভারতে এক কোটি হোক সেনা,
কোনো পরদেশি আসিবে না, কোনো বিদেশিরা রহিবে না!
বিরাট বিপুল দেশ আমাদের, কার এত সেনা আছে,
ভারত জুড়িয়া যুদ্ধ করিবে? পরাজয় লভিয়াছে,
এই মৃত্যুর ভয়ে শুধু, এরা রোগে ভুগে পচে মরে,
তবু লভিবে না অমৃত ইহারা মৃত্যুর হাত ধরে!
সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকা ভাই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ভবে,
এই অস্ত্রেই সর্ব অসুর দানব বিনাশ হবে।
চল্লিশ কোটি মানুষ মারিতে কোথা পাবে গোলাগুলি,
সর্বভয়ের রাক্ষস পশু পালাবে লাঙুল তুলি।

বোমা যদি আসে দেখে যাব মোরা বোমা সে কেমন চীজ,
তাহারি ধ্বনিতে ধ্বংস হইবে সর্ব ক্লৈব্য-বীজ !
যাহারা জন্ম-সৈনিক, তারা ছুটে এস দলে দলে,
শক্তি আসিবে, পৃথিবী কাঁপিবে আমাদের পদতলে।
আমরা যুঝিয়া মরি যদি সব ভীরুতা হইবে লয়,
পৃথিবীতে শুধু বীর-সেনাদের জয় হোক, হোক জয়।

কচুরিপানা

[গান]

ধ্বংস কর এই কচুরিপানা !
(এরা) লতা নয়, পরদেশি অসুর-ছানা ৷৷ (ধুয়া)
ইহাদের সবংশে কর কর নাশ,
এদের দগ্ধ করে কর ছাই পাঁশ,
(এরা) জীবনের দুশমন, গলার ফাঁস,
(এরা) দৈত্যের দাঁত, রাক্ষসের ডানা।—
ধ্বংস কর এই কচুরিপানা ৷৷ (ধুয়া)
(এরা) ম্যালেরিয়া আনে, আনে অভাব নরক,
(এরা) অমঙ্গলের দূত, ভীষণ মড়ক !
(এরা) একে একে গ্রাস করে নদী ও নালা।
(যত) বিল ঝিল মাঠ ঘাট ডোবা ও খনা ৷৷
ধ্বংস কর এই কচুরিপানা ৷৷ (ধুয়া)
(এরা) বাংলার অভিশাপ, বিষ, এরা পাপ,
(এস) সমূলে কচুরিপানা করে ফেলি সাফ।
(এরা) শ্যামল বাংলা দেশ করিল শ্মশান,
(এরা শয়তানি দূত দুর্ভিক্ষ-আনা।
ধ্বংস কর এই কচুরিপানা ৷৷ (ধুয়া)

(কাল) সাপের ফণা এর পাতায় পাতায়,
(এরা) রক্তবীজের ঝাড়, মরিতে না চায়,
(ভাই) এরা না মরিলে মোরা মরিব সবাই,
(এরে) নির্মূল করে ফেল, শুন না মানা।
ধ্বংস কর এই কচুরিপানা ৷৷ (ধুয়া)

টাকাওয়ালা

জলের সাগরে আসিনু বাহিতে তরী,
'জল দাও' বলে কাঁদে সর্বহারার দল—
চারিদিকে জল, জলের তৃষায় মরি !
টাকা নাই নাকি শুনি টাকশালে এসে,
টাকার সঙ্গে মাখামাখি, বলে—'টাকা থাকে কোন দেশে ?'
লক্ষ্মী-বাহন প্যাঁচারা আসিয়া সারা দেশ ভরিয়াছে,
বিধাতার-দেওয়া ঐশ্বর্যরে রক্ষিতা করিয়াছে !
টাকার সাকার আকার এসেই হয়ে যায় যেন পাখি,
এত টাকা আসে, উড়ে যায় সব, পাখা গজাইল নাকি !
কোথা বাসা বাঁধে এই যে টাকার ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গামি
কোথা ডিম পাড়ে, ছানা হয় তার কোন সে ব্যাঙ্কে জমি ?
মহাকাল-ব্যাধ দেখিতে পেয়েছে তাদের টাকার বাসা,
মৃত্যু-শায়ক লইয়া এসেছে-যত টাকা ট্যাকে ঠাসা !
এই চাকতির খাঁকতি ছিল না এ জীবনে কোনদিন,
টাকার মহিমা বুঝিনু, যেদিন আকণ্ঠ হল ঋণ।
যত শোধ করি, তত সুদ বাড়ে। ঋণ, না কচুরিপানা ?
শিলমোহরের ভয়ে চাইনি ক মোহরের মিহি-দানা !
ধন্না দিইনি টাকাওয়ালাদের পাকা ইমারতে কভু,
আল্লাহ ছাড়া কারেও কখনো বলিনি হুজুর, প্রভু !
টাকাওয়ালাদের দেখে এই জ্ঞান হইয়াছে সঞ্চয়,
টাকাওয়ালাদের চেয়ে ঝাঁকাওয়ালা অনেক মহৎ হয় !

সোনা যারা পায়, তাহারাই হয় সোনার পাথর-বাটি,
আশরফি পেয়ে আশরাফ হয় চালায়ে মদের ভাঁটি !
মানুষের রূপে এরা রাক্ষস-রাবণ-বংশধর,
পৃথিবীতে আজ বড় হইয়াছে যত ভোগী বর্বর !
এদের ব্যাঙ্ক 'রিভার-ব্যাঙ্ক' হইবে দুদিন পরে,
বোঝে না লোভীরা, ভীষণ মৃত্যু আসিছে এদেরি তরে !
জমানো অর্থ যত অনর্থ আনিয়াছে পৃথিবীতে,
পরমার্থের প্রভু আসিয়াছে তাহার হিসাব নিতে !
রবে না এ টাকা, বংশেও বাতি দিতে রহিবে না কেউ,
তবু কমিল না নিত্য লোভীর ভূঁড়ির ঢেঁকুর-ঢেউ !

ইহাদের লোভ নিরন্ন দেশবাসী করিবে না ক্ষমা,
বহু আক্রোশ বহু ক্রোধ বহু প্রহরণ আছে জমা।
রুটি কাগজের হয়ে যায়, তবু কাগজের টাকা লয়ে,
পাতালের জীব পৃথিবীতে আজো বেড়ায় মাতাল হয়ে!
কোন অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিনু কোথা?
অক্টোপাসের মতো কেন মোরে জড়াল স্বর্ণলতা?
ভিখারি হওয়ার ভিক্ষা চাহিয়াছিনু আল্লার কাছে,
আজ দেখি মোর চারপাশে যত ভূত প্রেত যেন নাচে!
আল্লাহ! মোরে এ শাস্তি হতে ফিরাইয়া লয়ে যাও!
টাকাওয়ালাদের কাছ থেকে ফাঁকা আকাশের তলে নাও!

কবির মুক্তি

[আধুনিকী]

মিলের খিল খুলে গেছে!
কিলবিল করছিল, কাঁচুমাচু হয়েছিল—
কেঁচোর মতন—
পেটের পাঁকে কথার কাতুকুতু!
কথা কি 'কথক' নাচ নাচবে
চৌতালে ধামারে?
তালতলা দিয়ে যেতে হলে
কথাকে যেতে হয় কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে
তালের বাধাকে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে!
এই যাঃ! মিল হয়ে গেল!
ও তাল-তলার কেরদানি—দুত্তোর!
মুর্গি-ছানায় চিলের মতন
টেকো মাথায় টিলের মতন
পড়বে এইবার কথার বান্ডিল।
ছন্দ এবার কন্ধ-কাটা পাঁঠার মতন ছটফটাবে।
লটপটাবে লুচির লেচির আটার মতন।
অক্ষর আর যক্ষর টাকা গোনার মতো
গুনতে হবে না—

অঙ্কলক্ষ্মীর ভয়ে কাব্যলক্ষ্মী থাকতেন
কুঁকড়োর মতন কুঁকড়ে!
ভাবতেন, মিলের চিল কখন দেবে ঠুকরে!
আবার মিল!—
গঙ্গার দু'ধারে অনেক মিল,
কটন মিল, জুট মিল, পেপার মিল—
মিলের অভাব কি?
কাব্যলোকে মিল থাকবে কেন?
ওকে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দাও!
ওখানেও যে মিল আছে!
ধূলো যদি কুলোয় যায় চুলোয় যায়,
হুলো ভুলোয় যদি ল্যাজে মাখে!
ল্যাজ কেটে বেঁড়ে করে দেবো।
এঁড়ে দামড়া আছে যে!
আবার মিল আসছে!—মুস্কিল আসান।
অঙ্কলক্ষ্মীকে মানা করেছিলাম
মিলের শাড়ি কিনতে।
অঙ্কলক্ষ্মীর জ্বালায় পঙ্কলক্ষ্মী পদ্ম
আর ফোটে না!
তা বলতে গেলে লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যাবে।
এ কবিতা যদি পড়ে
গায়ে ধানি লঙ্কা ঘষে দেবে!—
আজ যে বিনা প্রয়াসেই অনুপ্রাসের
পাল পেয়েছি দেখছি!
মিল আসছে-যেন মিলানের মেলায়
মেষের ভিড়!
নাঃ!—কবিতা লিখা।
তাকে দেখেছিলাম—আমার মানসীকে
ভেটকি মাছের মতো চেহারা!
আমাকে উড়ে বেহারা মনে করেছিল!
শাড়ির সঙ্গে যেন তার আড়ি।
কাঁখে হাঁড়ি—মাথায় ধামা।
জামা ব্লাউজ সেমিজ পরে না।

দরকারই বা কি?

তরকারি বেচে!

সরকারি ষাঁড়ের মতন নাদুস-নুদুস।

চিচিঙ্গের মতন বেণী দুলছিল।

সে যে-দেশের, সে-দেশে আঁচলের চল নাই!

চলেন গজ-গমনে।

পায়ে আলতা নাই, চালতার রং!

নাম বললে—'আজুলি',

আমি বললাম—'ধ্যেৎ, তুমি কাজলি।'

হাতে চুড়ি নাই,

তুড়ি দেয় আর মুড়ি খায়।

গলায় হার নাই, ব্যাগ আছে।

পায়ে গোদ,

আমি বলি 'প্যাগোডা' সুন্দরী!

গান গাই, 'ওগো মরমিয়া!'

ও ভুল শোনে! ও গায়—

'ওগো বড় মিয়া!'

থাকত হাতে 'এয়ার গান!—

ও গায় গেঁয়ো সুরে, চাঁপা ফুল কেয়ার গান।—

দাঁতে মিশি, মাঝে মাঝে পিসি বলতে ইচ্ছা করে।

ডাগর মেয়েরা আমাকে যে হাঙর ভাবে।

হৃদয়ে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ১

ভিক্ষা চাই না, শিক্ষা দিয়ে দেবে।

তাই ধরেছি রক্ষাকালীর চেড়িকে।

নেংটির আবার বকেয়া সেলাই!

কবিতা লেখার মসলা পেলেই হল

তা না-ই হল গরম মসলা।—

নাঃ, ঘুম আসছে,

রান্নাঘরের ধূম আসছে।

বৌ বলে, নাক ডাকছে,

না শাঁখ ডাকছে।

আবার মিল আসছে—

ঘুম আসছে—

দুম্বা ভেড়ার দুম আসছে!

ছন্দিতা

১। **'স্বাগতা '**—১৬ মাত্রা (তা—না তা—নাবাবা—তা—নানা—তা—তা—)

স্বাগতা কনক-চম্পক-বর্ণা ছন্দিতা চপল নৃত্যের ঝর্ণা।
মঞ্জুলা বিধুর যৌবন-কুঞ্জে যেন ও চরণ-নূপুর গুঞ্জে,
মন্দিরা মুরলি-শোভিত হাতে এস গো বিরহ-নীরস-রাতে
হে প্রিয়া করিব প্রাণ অর্পণ॥

২। **'প্রিয়া '**—৭ মাত্রা (নাবা তা—না তা—)

মহুয়া-বনে বন-পাপিয়া এখনো ঝুরে নিশি জাগিয়া।
ফিরিয়া কবে প্রিয় আসিবে ধরিয়া বুকে কহিবে প্রিয়া॥
শুনি, নীরবে গগনে বসি কহ যে-কথা বিরহী শশী,
তব রোদনে বঁধু এ মনে যমুনা বহে কূল প্লাবিয়া॥

৩। **'মধুমতী '**—৮ মাত্রা (নাবাবাবা নানা তা—দুবার)

বনকুসুম-তনু তুমি কি মধুমতী।
ঢলঢল নয়নে রস-ঘন মিনতি।
রুমুঝুমু ঘুমুরে ঘুমুঘুমু বিবশা,
নিথর বসুমতী, নিশিমদ-অলসা, মুরছিত চরণে শত মদন রতি॥
রস-ছলছল গো তব মধু-কলসে
ঝরঝর ঝরণা অনুখন বরষে,—অরুণিত-নয়না মধুর রসবতী॥

৪। **'মত্তময়ূর'**—২২ মাত্রা

মত্তময়ূরছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে।
রুম ঝুম ঝুম মঞ্জীর বাজে কঙ্কণ মণিবন্ধে॥
রিমঝিম রিমঝিম ঝিম কেকা-বর্ণ ঘন বরষে,
তৃষ্ণা-তৃপ্ত আত্মা নাচে নন্দলোকে হরষে,
ঝঞ্ঝার ঝাঁঝরতাল বাজে শূন্যে মেঘ-মন্দ্রে॥
পল্লব-ঘন-চক্ষে ঝরে অশ্রু-রসধারা
পুব-হাওয়াতে বংশী ডাকে আয় রে পথহারা।
বন্দে দামিনী-বর্ণা রাধা বৃন্দাবন-চন্দে॥

৫। **'রুচিরা'**—১৮ মাত্রা

ভ্রমর নূপুর-পরিহিতা কৃষ্ণা-কুন্তলা।
বলয়-কাঁকন ঝনকিতা ছন্দ-চঞ্চলা॥

মলয়-সমীর ঝিরিঝিরি অঙ্গে গুঞ্জরে
কদম কেশর ঝুরুঝুরু চম্পা মুঞ্জরে।
চটুলনয়ন চমকিতা জ্যোৎস্না-অঞ্চলা॥
বিধুর কোকিল-কুহরিত আম্রকুঞ্জে গো,
রূপের পরাগ ঝরে তব পুঞ্জে পুঞ্জে গো।
নিখিল-ভুবন তব রাস —নৃত্য হিন্দোলা॥

৬। **'দীপক-মালা'**—১৬ মাত্রা (তা-নানা-তা-তা, তা না তা নাতা)
দীপক-মালা গাঁথ গাঁথ গাঁথ সই।
মাধব আসে পারিজাত কই॥
আনত আঁখি তোল তোল গো!
বেদন-জ্বালা ভোলো ভোলো গো!
মান-ভুলানো এল রাত সই॥
কাজল আঁকো নীল আঁখিতে,
চেয়ো না লাজে আঁখি ঢাকিতে,
আসন প্রাণে পাত পাত সই॥

৭। **'মন্দাকিনী'**—১৬ মাত্রা (নানা নানা নানা তা না তা তা নাতা)
জল-ছলছল এস মন্দাকিনী।
রস-ঢলঢল বারি-সঞ্চারিণী॥
হৃদয়-গগন আজি তৃষ্ণা-ভরে
উতল হইল প্রেম-গঙ্গা তরে,
মুদিত নয়ন খোল বৈরাগিনী॥
বিরস ভুবন রাখ সঞ্জীবিতা,
সজল সলিল আনো হিল্লোলিতা।
ঝর-ঝর-ঝর স্রোত উন্মাদিনী॥

৮। **'মঞ্জুভাষিণী'**—১৮ মাত্রা (নানা তা—নাতা নানানা তানা তানাতা)
আজো ফাল্গুনে বকুল কিংশুকের বনে,
কহে কোন কথা নিশীথ স্বপনে আনমনে॥
মৃদুমর্মরে পথের পল্লবের সাথে
গাহে কোন গীতি নিশীথে পানসে জ্যোৎস্নাতে,
খোঁজে কার স্মৃতি নীরস শুভ্র চন্দনে॥
গ্রহচন্দ্রে কয়—সে কি গো মৃত্যু-দ্বার খুলে
হয় সৃষ্টিপার গিয়াছে অমৃতের কূলে,
কাঁদে কোন শোকে পরম সুন্দরের সনে॥

৯। **'মণিমালা'**—২০ মাত্রা

মঞ্জু মধু-ছন্দা নিত্যা, তব সঙ্গী
সিন্ধুর তরঙ্গ নৃত্যের কুরঙ্গী॥
গুঞ্জা বেলা পদ্ম পুঞ্জীভূত বক্ষে,
অশ্রু-লাজ কুণ্ঠা শঙ্কা-ঘন চক্ষে,
অঙ্গে শ্যামকান্তা মন্দাকিনী-ভঙ্গি॥
অঙ্গুলিতে বন্দি অঙ্কুরিত ছন্দ,
কণ্ঠে সুর-লক্ষ্মী বৃন্দাবনানন্দ,
গঙ্গা এলে বক্ষে সন্ধ্যারাগে রঙ্গি॥

১০। **'ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত'**—৪৮ মাত্রা

তারকা-নূপুর নীল নভে ছন্দ শোন ছন্দিতার।
সৃষ্টিময় বৃষ্টি হয় নৃত্য সেই নন্দিতার
সাগরে নদীতে ঢেউ তোলে সেই দেবীর মুক্তকেশ,
সঙ্গীতের হিন্দোলে তাঁর আঁখির প্রেম আবেশ,
পবনে পবনে হিল্লোলে নীল আঁচল চঞ্চলার
ছন্দোময় আনন্দময় চরণশ্রী বন্দি তাঁর॥

সৌরাষ্ট্র ভৈরব—তেতালা (বাদী মধ্যম)

মদালস ময়ূর-বীণা কার বাজে
অরুণ-বিভাসিত অম্বর-মাঝে॥
কোন মহা-মৌনীর ধ্যান হল ভঙ্গ?
নেচে ফেরে অশান্ত মায়া-কুরঙ্গ
তপোবনে রঙ্গে অনঙ্গ বিরাজে॥
নিদ্রিত রুদ্রের ললাট-বহ্নি
পাশে তার হেসে ফেরে বনবালা-তন্বী।
বিজড়িত জটাজুটে খেলে শিশু শশী
দেয় মালা চন্দন ভীরু উর্বশী
শঙ্কর সাজিল রে নটরাজ সাজে॥

পূরববঙ্গ

পদ্মা-মেঘনা-বুড়িগঙ্গা-বিধৌত পূর্ব-দিগন্তে
তরুণ অরুণ বীণা বাজে তিমির বিভাবরী-অন্তে।

ব্রাহ্ম মুহূর্তের সেই পুরবাণী
জাগায় সুপ্ত প্রাণ জাগায়—নব চেতনা দানি
সেই সঞ্জীবনী বাণী শক্তি তার ছড়ায়
পশ্চিমা সুদূর অনন্তে॥

উর্মিছন্দা শত-নদীস্রোত-ধারায় নিত্য পবিত্র—
সিনান-শুদ্ধ-পুরববঙ্গ
ঘন-বন-কুন্তলা প্রকৃতির বক্ষে সরল সৌম্য
শক্তি-প্রবুদ্ধ পুরববঙ্গ
আজি শুভলগ্নে তারি বাণীর বলাকা
অলখ ব্যোমে মেলিল পাখা
ঝঙ্কার হানি যায় তারি পুরবাণী
জীবন্ত হউক হিম-জর্জর ভারত
নবীন বসন্তে॥

আরতি

শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্মল
শান্ত অচঞ্চল ধ্রুব-জ্যোতি।
অশান্ত এ চিত কর হে সমাহিত
সদা আনন্দিত রাখ মতি॥
দুঃখ শোক সহি অসীম সাহসে
অটল রহি যেন সম্মানে যশে
তোমার ধ্যানের আনন্দ-রসে
নিমগ্ন রহি হে বিশ্বপতি॥

মন যেন না টলে খল কোলাহলে, হে রাজ-রাজ,
অন্তরে তুমি নাথ সতত বিরাজ।
বহে তব ত্রিলোক-ব্যাপিয়া, হে গুণী
ওঁঙ্কার-সঙ্গীত সুর-সুরধুনী,
হে মহামৌনী, যেন সদা শুনি
সে সুরে তোমার নীরব আরতি॥

পার্থ-সারথি

হে পার্থ-সারথি
বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য-শঙ্খ।
চিত্তের অবসাদ দূর কর, কর দূর
ভয়-ভীত জনে কর হে নিঃশঙ্ক॥
জড়তা ও দৈন্য হানো হানো
গীতার মন্ত্রে জীবন দানো
ভোলাও ভোলাও মৃত্যু-আতঙ্ক॥

মৃত্যু জীবনের শেষ নহে নহে,
শোনাও শোনাও, অনন্তকাল ধরি
অনন্ত জীবন-প্রবাহ বহে।
দুরন্ত দুর্মদ যৌবন-চঞ্চল
ছাড়িয়া আসুক মার স্নেহ-অঞ্চল
বীর সন্তান দল
করুক সুশোভিত মাতৃ-অঙ্ক॥

আত্মগত

আর জিজ্ঞাসা করিব না কোনো কথা
আপনার মনে কয়ে যাব আমি আপন মনের ব্যথা।
ভোরের প্রথম ফোটা ফুলগুলি গোপনে তুলিয়া আনি
অঞ্জলি দিতে তোমার দুয়ারে দাঁড়াই যুক্তপাণি।
আমার চেয়েও সকরুণ চোখে ফুলগুলি চেয়ে থাকে,
মোর সাথে ওরা তব পায়ে চাহে অর্পিতে আপনাকে,—
তব তনু হেরি ফুলগুলি যেন অধিক ফুল্ল হয়,
মনে ভাবে, ঐ অঙ্গের সাথে কবে হবে পরিচয়।
তুমি দ্বিধাভরে যেন ভয়ে ভয়ে আস উহাদের কাছে,
ভাব বুঝি ঐ ফুলের কাঁপিতে লোভের সাপিনী আছে!
মুখ ফুটে তাই বলিতে পার না, 'ঐ ফুলগুলি দাও!'
আমার গানের ফুলগুলি বোঝে, উহাদের ভয় পাও।
চেয়ে দেখি, হায়, বেদনায় মোর ফুল্ল ফুলের গুছি
সূর্যের নামে শপথ করিয়া কাঁদে—'শুচি মোরা শুচি!'

ছড়াইয়া দিই পথের ধুলাতে প্রেম-ফুল-অঞ্জলি,
'দেখ সাপ নাই, নাই কাঁটা—আমি ফিরে যেতে যেতে বলি।

অবুঝ ভিখারি মন যেতে যেতে পিছু ফিরে ফিরে চায়—
ছড়ানো একটি ফুল তুলে সে কি লুকালো এলো-খোঁপায়?
দূর হতে দেখে পাষাণ মূরতি তেমনি দাঁড়ায়ে আছে,
ফুল এড়াইয়া চলে গেলে তুমি কলঙ্ক লাগে পাছে!
তোমার চলার পথে পড়ে যত এই পৃথিবীর ধূলি
তারও চেয়ে কি গো মলিনতা-মাখা আমার কুসুমগুলি?
ধূলায় তোমা ভুলায় না পথ, পথ ভোলাবে কি ফুল?
ভয় পাও কি গো যদি শোনা পথে গাহে বন-বুলবুল?

মোর কবিতার কবুতরগুলি তোমার হৃদয়াকাশে
উড়িতে যখনি চায়, কেন সেথা মেঘ ঘনাইয়া আসে?
তুমি শুনিলে না তবু মোর কথা থামিতে চাহে না কেন?
তোমার ফুলের ফাল্গুন মাসে ঝোড়ো মেঘ আমি যেন!
তব ফুল-ভরা উৎসবে কেন জল ছিটিয়ে সে যায়
তব সাথে তার কোন সে জীবনে কোন যোগ ছিল, হায়!
ভয় করিও না, মেঘ আসে—মেঘ শেষ হয়ে যায় গলে,
আমার না-বলা কথা বলা হলে আমিও যাইব চলে!

আমি জানি, এই ফাগুন ফুরাবে, খর-বৈশাখ এসে
কি যেন দারুণ আগুন জ্বালাবে তোমাদের এই দেশে।
ভালো লাগিবে না কিছু সেই দিন উৎসব হাসি গান,
ফাগুনে যে মেঘ এসেছিল, তার তরে কাঁদিবে গো প্রাণ।
ডাকিবে, 'এস হে ঘনশ্যাম বারিবাহ,
জ্বলে গেল বুক, জুড়াও জুড়াও দাহ।'

অভিমানী মেঘ সেদিন যদি গো নাহি আসে আর ফিরে,
যে সাগর থেকে মেঘ এসেছিল—যেও সে সাগর তীরে।
তোমারে হেরিলে হয়তো আমার অভিমান যাব ভুলে,
তব কুন্তল-সুরভিতে সাড়া পড়িবে সাগর-কূলে।
আমি উত্তাল তরঙ্গ হয়ে আছাড়ি পড়িব পায়ে,
জলকণা হয়ে ছিটায়ে পড়িব তব অঞ্চলে, গায়ে।
এই ভিখারির কথা শুনি আজ হাসিবে হয়তো প্রিয়া,
তবু বলি, তুমি কাঁদিয়া উঠিবে সাগর দেখিতে গিয়া।

মনে পড়ে যাবে, তোমার আকাশে মেঘ হয়ে কোনোদিন
কেঁদেছিল এই সাগর তোমারে ঘিরিয়া বিরামহীন।

তোমারে না পেয়ে শত পথ ঘুরে কেঁদে শত নদীনীরে
—সাগরের জল সাগরে এসেছে ফিরে।
তোমারে সিনান করায়েছিল সে অমৃতধারা-রূপে,
ছেয়ে দিয়েছিল তোমার ভুবন ফুল হয়ে চুপে চুপে।

তব ফুলময় তনু লয়ে ওঠে কাব্যলোকে যে গীতি,
তোমারে যে আজ নিবেদন করে কত লোক কত প্রীতি,
মেঘ-ঘনশ্যাম কোনো বিরহীর স্মৃতি আছে তার সাথে,
মেঘ হয়ে দিনে এসেছিল, গেছে আঁধারে মিশায়ে রাতে।

সাগরে সেদিন ঝাঁপায়ে পড়িবে ; তোমার পরশ পেয়ে
প্রলয়-সলিলে রূপ ধরে আমি উঠিব গো গান গেয়ে !
আমার হৃদয় ছোঁয় যদি প্রিয়া তোমার তনুর মায়া,
পরম শূন্যে ভাসিয়া উঠিবে আবার আমার কায়া !...
আজ চলে যাই—এই পৃথিবীরে আর লাগে না কো ভালো।
হেথা মানুষের নিঃশ্বাসে নিভে যায় যে প্রেমের আলো।

যে নিরাধার শ্যাম শ্রীরাধার প্রেমে
রূপ ধরে আসে পৃথিবীতে নেমে,
যদি কোনো দিন দেখা পাও তার—মোর স্মৃতি থাকে মনে,
রোদনের বান আনে যদি তব আনন্দ-নিকেতনে,
'কোথায় হারায়ে গেছি আমি' তাঁরে শুধায়ো নিরালা ডাকি,
খুঁজিয়া আনিবে হয়তো আমারে তাঁহার পরম আঁখি॥
সেদিন যেন গো দ্বিধা নাহি আসে
কোনো লোক যেন নাহি থাকে পাশে,
যে নামে আমারে ডাকিলে না আজ, সে দিন ডেকো সে নামে ;
কি বলে ডাকিলে বেঁচে উঠি আমি, শুধাইও রাধা-শ্যাম।

কাবেরী-তীরে

কর্ণাটের গঙ্গা-পূত কাবেরীর নীরে
প্রভাতে সিনানে আসে শ্যামা বেণী-বর্ণা
কর্ণাটকুমারী এক, নাম মেঘমালা।

সিনানের আগে নিতি কাহার উদ্দেশে
চামেলি চম্পক ফুল তরঙ্গে ভাসায়।

ভিনদেশি বুঝি এক বণিক কুমার
হেরিয়া সে এণাক্ষীরে তরণী ভিড়ায়ে
রহে সেই ঘটে বসি, যেতে নাহি চায়।
স্নান-স্নিগ্ধা শ্যামলির স্নিগ্ধতর রূপে
ডুবে যায় আঁখি তার, কণ্ঠে ফোটে গান—

(কর্ণাটী সামন্ত—তেতালা)

কাবেরী নদীজলে কে গো বালিকা।
আনমনে ভাসাও চম্পা শেফালিকা॥
প্রভাত সিনানে আসি আলসে
কঙ্কন তাল হানো কলসে
খেলে সমীরণ লয়ে কবরীর মালিকা।
দিগন্তে অনুরাগে নবারুণ জাগে
তব জল ঢলঢল করুণা মাগে
ঝিলম রেবা নদী তীরে
মেঘদূত বুঝি খুঁজে ফিরে
তোমারেই তন্বী শ্যামা কর্ণাটিকা॥

দ্বিধা-হীনা মেঘমালা জানিত না লাজ
কুণ্ঠাহীন মুখে তার ছিল না গুণ্ঠন।
গান শুনি কুমারের কাছে আসি কহে—
কারে খোঁজে মেঘদূত? হে বিদেশি কহ!
কহিতে কহিতে চাহি কুমারের চোখে
কী যেন হেরিয়া মুখে বেঁধে যায় কথা।
সেদিন প্রথম যেন আপনারে হেরি,
আপনি সে ঠিল চমকি। দেহে তার
লজ্জা আসি টেনে দিল অরুণ আঙিয়া।
ভরা ঘট লয়ে ঘরে ফিরে! নিশি রাতে
সুরের সুতায় গাঁথে কথার মুকুল।—

(নাগ স্বরাবলী—তেতালা)

এস চিরজনমের সাথী।
তোমারে খুঁজেছি দূর আকাশে
জ্বালায়ে চাঁদের বাতি॥

খুঁজেছি প্রভাতে, গোধূলি-লগনে,
মেঘ হয়ে আমি খুঁজেছি গগনে,
ঢেকেছে ধরণী আমার কাঁদনে
অসীম তিমির রাতি॥
ফুল হয়ে আছে লতায় জড়ায়ে
মোর অশ্রুর স্মৃতি
বেণুবনে বাজে বাদল নিশীথে
আমারি করুণা-গীতি।
শত জনমের মুকুল ঝরায়ে
ধরা দিতে এলে আজি মধুবায়ে
বসে আছি আশা-বকুলের ছায়ে
বরণের মালা গাঁথি॥

গান গাহি চমকিয়া ওঠে মেঘমালা।
আপনারে ধিক্কারে সে মরিয়া মরমে—
যদি কেহ শুনে থাকে তাহার এ গান,
কি ভাবিবে যদি শোনে বিদেশি বণিক !
সেদিন কাবেরী-তীরে এল মেঘমালা
বেলা করি। গাঁয়ের বধূরা একে একে
সিনান সারিয়া ফিরে গেছে গৃহ-কাজে।
বণিককুমার খোঁজে কি যেন মানিক !
নীল শাড়ি পড়ি তন্বী মেঘমালা আসে
শ্লথগতি মদালসা, বিলম্বিতা বেণী।
বণিককুমার চাহি ওপারের পানে,
গাহে গান,—না দেখার ভান করি যেন।—

(নীলাম্বরী—তেতালা)

নীলাম্বরী শাড়ী পরি, নীল যমুনায়
কে যায়, কে যায়, কে যায়।
যেন জলে চলে থল-কমলিনী,
ভ্রমর নূপুর হয়ে বোলে পায় পায়॥
কলসে কঙ্কনে রিনিঠিনি ঝনকে
চমকায় উন্মন চম্পা-বনকে,
দলিত অঞ্জন নয়নে ঝমকে
পলকে খঞ্জন হরিণী লুকায়॥
অঙ্গের ছন্দে পলাশ মাধবী অশোক ফোটে,
নূপুর শুনি বন-তুলসীর মঞ্জুরী উলসিয়া ওঠে !

মেঘ-বিজড়িত রাঙা গোধূলি
নামিয়া এল বুঝি পথ ভুলি'
তাহারি অঙ্গ-তরঙ্গ-বিঙ্গে
কূলে কূলে নদী-জল উথলায়॥

মেঘমালা কুমারের আঁখি ফিরাইতে
কত রূপে শব্দ করে কলসে কঙ্কনে।
সাঁতারিয়া কাবেরীর শান্ত বক্ষ মাঝে
অশান্ত তরঙ্গ তোলে! বণিক কুমার
হাসি তীরে আসি কহে, 'অঞ্চলের ফুল
অকারণে নদী-জলে ভাসাও বালিকা।
ও ফুল আমারে দাও! দেবতা তোমার
প্রসন্ন হবেন, পাবে মনোমত বর।'
মেঘমালা আঁচলের ফুলগুলি লয়ে
নদীজলে ভাসাইয়া—ঘাট জল ভরি
চলে এল ঘরপানে, চাহিল না ফিরে—
দেখিল না কার দুটি আঁখি আঁখি-নীরে
ভরে গেছে কূলে কূলে, ঘরে ফিরে আসি
মেঘমালা আপনার মনে মনে কাঁদে—

(নারায়ণী-আদ্ধা-কাওয়ালি)

রহি রহি কেন সেই মুখ পড়ে মনে।
ফিরায়ে দিয়াছি যারে অনাদরে অকারণে॥
উদাস চৈতালি দুপুরে
মন উড়ে যেতে যায় সুদূরে
যে বন-পথে যে ভিখারি বেশে
করুণা জাগায়েছিল সকরুণ নয়নে
তার বুকে ছিল তৃষ্ণা, মোর ঘটে ছিল বারি।
পিয়াসী ফটিকজল জল পাইল না গো
ঢলিয়া পড়িল হায় জলদ নেহারি॥
তার অঞ্জলির ফুল পথ-ধূলিতে
ছড়ায়েছি সেই ব্যথা নারি ভুলিতে।
অন্তরালে যারে রাখিনু চিরদিন
অন্তর জুড়িয়া কেন কাঁদে সে গোপনে॥

জলে আর যায় না কো কর্ণাটি কুমারী
চলে গেল তরী বাহি বিদেশী কুমার
তরণী ভরিয়া তার নয়নের নীরে।

সেদিন নিশীথে ঝড় বাদলের খেলা,
মেঘমালা চেয়ে আছে বাতায়ন খুলি
কাবেরী-নদীর পানে ! ঘন অন্ধকারে
বিজলি-প্রদীপ জ্বালি কোন বিরহিণী
খুঁজে যেন তারি মত দয়িতে তাহার।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কবে পড়ে যে ঘুমায়ে,
ঘুমায়ে স্বপন দেখে গাহিছে বিদেশি—

(মিশ্র নারায়ণী—তেতালা)

নিশি রাতে রিম-ঝিম-ঝিম বাদল নূপুর
বাজিল ঘুমের মাঝে সজল মধুর॥
দেয়া গরজে বিজলি চমকে
জাগাইল ঘুমন্ত প্রিয়তমকে
আধ ঘুম-ঘোরে চিনিতে নারি ওরে
কে এল, কে এল বলে ডাকিছে ময়ূর॥
দ্বার খুলি পড়শী কৃষ্ণা মেয়ে
আছে চেয়ে মেঘের পানে আছে চেয়ে।
কারে দেখি আমি কারে দেখি,
মেঘলা আকাশ, না ওই মেঘলা-মেয়ে।
ধায় নদী-জল মহাসাগর পানে
বাহিরে ঝড় কেন আমায় টানে
জমাট হয়ে আছে বুকের কাছে
নিশির আকাশ যেন মেঘ-ভারাতুর॥

মেঘমালা চমকিয়া জাগি ছুটে যায়
পাগলিনী প্রায় নদী তীরে। ডাকি ফেরে
ঝড় বাদলের সাথে কণ্ঠ মিশাইয়া—
'কুমার ! কুমার ! কোথা প্রিয়তম মোর !
লয়ে যাও মোরে তব সোনার তরীতে !'
হারাইয়া গেল তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর
অনন্ত যুগের বিরহিণীর কাঁদন
যে পথে হারায়ে যায় ! আজো মোরা শুনি
কাবেরীর জল-ছলছল অশ্রু-মাখা
কর্ণাটিকা রাগিণীতে তাহারি বেদনা॥

(মনোরঞ্জনী—তেতালা-ঢিমা)

ওগো বৈশাখী ঝড়! লয়ে যাও অবেলায়
ঝরা এ মুকুলে।
লয়ে যাও আমার জীবন,—এই পায়ে দলা ফুল॥
ওগো নদীজল! লহো আমারে
বিরহের সেই মহা পাথারে
চাঁদের পানে চাহি যে পারাবার
অনন্তকাল কাঁদে বেদনা-ব্যাকুল॥
ওরে মেঘ! মোরে সেই দেশে রেখে আয়
যে দেশে যায় না শ্যাম মথুরায়
ভরে না বিষাদ-বিষে এ-জীবন
যে দেশের ক্ষণিকের ভুল॥

অমৃতের সন্তান

নীহারিকা-লোকে অনিমিখে চেয়ে আছেন বৈজ্ঞানিক,
কত শত নব সূর্য জনমি রাঙায় অজানা দিক।
আমি চেয়ে আছি তোদের পানে যে, ওরে ও শিশুর দল,
নূতন সূর্য আসিছে কোথায় বিদারিয়া নভোতল!
দিব্য জ্যোতিদীপ্ত কত সে রবি শশী গ্রহ তারা
তোদের মাঝারে লভিয়া জনম ঘুরিতেছে পথহারা।
আত্মা আমার জেগে আছে যেন মেলি অনন্ত আঁখি,
মাহেন্দ্রক্ষণ উদয়-উষার আরো কতদিন বাকি?
জাগে অমৃতের সন্তান, জাগে বেদ-ভাষিণীর দল!
বিশ্বে ভোগের মন্থনে আজ উঠিয়াছে হলাহল।
অসুর-শক্তি শ্রান্ত হইয়া আজিকে আপন বিষে
ঊর্ধ্বে চাহিছে দেবতার পানে, জ্বালা জুড়াইবে কিসে!
আমি দেখিয়াছি, তোমাদের শুচি ক্ষুদ্র তনুর মাঝে
সেই ঊর্ধ্বের দিব্য শক্তি শান্তি অমৃত রাজে।
খোলো গুণ্ঠন, ভোলো বন্ধন, ভাঙো ভবনের কারা,
বাহির ভুবনে আসিয়া দাঁড়াও বাধাহীন ভয়হারা।
শোন অমৃতের পুত্র। দুয়ারে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে
জরাগ্রস্ত ভিখারি যযাতি নব-যৌবন যাচে!

কুমারী উমার রূপে কতকাল অচল পিতার গেহে
হে মহাশক্তিরূপিনী শিবানী, বদ্ধ রহিবে স্নেহে?
হে মহাশক্তি, তোমারে হার[illegible] পুরুষোত্তম শিব
পথের ভিখারি, মৃতের শ্মশানে হয়েছে ঘৃণ্য জীব !
কে বলে তোমরা বালক বালিকা? তোমরা ঊর্ধ হতে
নামিয়া এসেছ শুদ্ধ শক্তি দিব্য জ্যোতির স্রোতে।
হৃদয় কমণ্ডলু হতে তব অমৃতধারা ছিটাও,
ঈর্ষা-ক্লান্ত জর্জরিত এ বিশ্বে শান্তি দাও।
বাঁচাতে এসেছ, বাঁচিতে আসনি হেথা শুধু পশু সম,
তপস্যা ত্যাগে পুরুষ হেথায় হয় পুরুষোত্তম ;
সংসারী হয়ে নারী এই দেশে হয় ঋষি বেদবতী,
আনো সেই আশা, শক্তি, ধরায় স্বর্গের সেই জ্যোতি।
দূর কর এই ভেদজ্ঞান, এই হানাহানি, মলিনতা,
আনো ধূর্জটী-জটা হতে তব জাহ্নবীর পবিত্রতা।
প্রণাম-পুষ্পাঞ্জলি লয়ে আছি পূজারী বসিয়া একা,
তোমাদের সেই দিব্য স্বরূপে কবে পাব হায় দেখা !

উঠিয়াছে ঝড়

উঠিয়াছে ঝড়, কড় কড় কড় ঈশানে নাকাড়া বাজিছে তার,
ওরে ভীরু, ওঠ, এখনি টুটিবে ধমকে তাহার রুদ্ধ দ্বার!
কৃষ্ণ মেঘের নিশান তাহার দোলে পশ্চিম-তোরণে ঐ,
ভ্রূকুটি-ভঙ্গে কোটি তরঙ্গে নাচে নদনদী তাথৈ থৈ।
তরবারি তার হানিছে ঝিলিক সর্পিল বিদ্যুল্লেখায়,
হানিবে আঘাত তোর স্বপ্নের শিশ-মহলের দরওয়াজায়;
কাঁদিবে পূর্ব পুবালী হাওয়ায়, ফোটাবে কদম জুঁই কুসুম;
বৃষ্টিধারায় ঝরিবে অশ্রু, ঘনালে প্রলয় রবে নিঝুম?

যে দেশে সূর্য ডোবে—সেই দেশে হইল নবীন সূর্যোদয়,
উদয়-অচলে টলমল করে অস্ত-রবির আঁধার ভয়!
যুগ যুগ ধরি, তপস্যা দিয়ে করেছি মহীরে মহামহান,
ফুটায়েছি ফুল কর্ষিয়া মরু, ধুলির ঊর্ধ্বে গেয়েছি গান।
আজি সেই ফুল-ফসল-মেলায় অধিকার নাই আমাদেরই,
আমাদের ধ্যান-সুন্দর ধরা আমাদের নয় আজি হেরি!
গীত-শেষে নীড়ে ফিরিবার বেলা হেরি নীড়ে বাসা বেঁধে শকুন,
মাংস-লোলুপ ফিরিতেছে ব্যাধ স্কন্ধে রক্ত-ধনুর্গুণ।
নীড়ে ফিরিবার পথ নাই তোর, নিম্নে নিষাদ, ঊর্ধ্বে বাজ,
তোর সে অতীত মহিমা আজিকে তোরে সব চেয়ে হানিছে লাজ!

উঠিয়াছে ঝড়—ঝড় উঠিয়াছে প্রলয়-রণের আমন্ত্রণ,
'আদাওতী'র এ দাওতে কে যাবি মৃত্যুতে প্রাণ করিয়া পণ?
ঝড়ে যা উড়িবে, পুড়িবে আগুনে, উড়ুক পুড়ুক সে সকল,
মৃত্যু যেখানে ধ্রুব তোর সেথা মৃত্যুরে হেসে বরিবি চল!
অপরিমাণ এ জীবনে করিবি জীবিতের মতো ব্যয় যদি,
ঊর্ধ্বে থাকুক ঝড়ের আশিস, চরণে মরণ-অম্ভূধি!

বিধাতার দান এই পবিত্র দেহের করিবি অসম্মান?
শকুন-শিবার খাদ্য হইবি, ফিরায়ে দিবি না খোদার দান?

এ-জীবন ফুল-অঞ্জলি সম নজরানা দিবি মৃত্যুরে,—
জীবিতের মতো ভুক্তি জীবন ব্যয় করে যা তা প্রাণ পুরে!
চরণে দলেছি বিপুলা পৃথ্বী কোটি গ্রহ তারা ধরি শিরে,
মোদের তীর্থ লাগি রবি শশী নিশিদিন আসে ফিরে ফিরে।
নিঃসীম নভ ছত্র ধরিয়া, বন্দনা-গান গাহে বিহগ,
বর্ষায় ঝরে রহমত-পানি-প্রতীক্ষমান সাত স্বরগ।
অপরিমাণ এ দানেরে কেমনে করিবি, রে ভীরু অস্বীকার?
মৃত্যুর মারফতে শোধ দিব বিধির এ মহাদানের ধার।
রোগ-পাণ্ডুর দেহ নয়—দিব সুন্দর তনু কোরবানি,
রোগ ও জরারে দিব না এ দেহ জীবন ফুলের ফুলদানি।
তাজা এ স্বাস্থ্য সুন্দর দেহ মৃত্যুরে দিবি অর্ঘ্যদান,
অতিথিরে দিবি কীটে-খাওয়া ফুল? লতা ছিঁড়ে তাজা কুসুম আন!

আসিয়াছে ঝড়, ঘরের ভিতর তাজিম করিয়া অতিথে ডাক,
বন্ধুর পথে এসেছে বন্ধু, হাসিয়া দস্তে দস্ত রাখ।
যৌবন-মদ পূর্ণ করিয়া জীবনেরে মৃৎপাত্র ভর,
তাই নিয়ে সব বেহুঁশ হইয়া ঝঞ্ঝার সাথে পাঞ্জা ধর।

ঝঞ্ঝার বেগ রুধিতে নারিবে পড়-পড় ঐ গৃহ রে তোর,
খুঁটি ধরে তার কেন বৃথা আর থাকিস বসিয়া, ভাঙ এ দোর!
রবির চুল্লি নিভিয়া গিয়াছে, ধুমায়মান নীল গগন,
ঝঞ্ঝা এসেছে ঝাপটিয়া পাখা, ধেয়ে আয় তুই ক্ষীণ পবন!

শাখ্-ই-নবাত্

['শাখ্-ই-নবাত' বুলবুল-ই-শিরাজ কবি হাফিজের মানসী প্রিয়া ছিলেন।
'শাখ-ই-নবাত'-এর অর্থ 'আখের শাখা'।]

শাখ্-ই-নবাত! শাখ্-ই-নবাত! মিষ্টি রসাল 'ইক্ষু-শাখা'।
বুলবুলিরে গান শেখাল তোমার আঁখি সুর্মা-মাখা।
বুলবুল-ই-শিরাজ হলো গো হাফিজ গেয়ে তোমার স্তুতি,
আদর করে 'শাখ-ই-নবাত' নাম দিল তাই তোমার তূতী।
তার আদরের নাম নিয়ে আজ তুমি নিখিল-গরবিনী,
তোমার কবির চেয়ে তোমায় কবির গানে অধিক চিনি।

মধুর চেয়ে মধুরতর হলো তোমার বঁধুর গীতি,
তোমার রস-সুধা পিয়ে, তাহার সে-গান তোমার স্মৃতি।
তোমার কবির—তোমার তূতীর ঠোঁট ভিজালে শহদ দিয়ে,
নিখিল হিয়া সরস হলো তোমার শিরীন সে রস পিয়ে।

... ...

কল্পনারই রঙিন পাখায় ইরান দেশে উড়ে চলি,
অনেক শত বছর পিছের আঁকাবাঁকা অনেক গলি—
তোমার সাথে প্রথম দেখা কবির যেদিন গোধূলিতে,
আঙুর-ক্ষেতে গান ধরেছে, কুলায়-ভোলা বুলবুলিতে।
দাঁড়িয়েছিলে একাকিনী 'রোকনাবাদের নহর'-তীরে,
আসমানি নীল ফিরোজা রং ছিল তোমার তনু ঘিরে।
রঙিন ছিল আকাশ যেন কুসুম-ভরা ডালিম-শাখা
তোমার চোখের কোনায় ছিল আকাশ-ছানা কাজল আঁকা।
সন্ধ্যা ছিল বন্দী তোমার খোঁপায়, বেণীর বন্ধনীতে ;
তরুণ হিয়ার শরম ছিল জমাট বেঁধে বুকের ভিতে।
সোনার কিরণ পড়েছিল তোমার দেহের দেউল চূড়ে,
ডাঁশা আঙুর ভেবে এল মৌ-পিয়াসী ভ্রমর উড়ে।
তিল হয়ে সে রইল বসে তোমার গালের গুলদানিতে,
লহর বয়ে গেল সুখে রোকনাবাদের নীল পানিতে।
চাঁদ তখনো লুকিয়ে ছিল তোমার চিবুক গালের টোলে,
অস্ত-রবির লাগল গো রঙ শূন্য তোমার সিঁথির কোলে।
ওপারেতে একলা তুমি নহর-তীরে লহর তোল,
এপারেতে বাজল বাঁশি, 'এসেছি গো নয়ন খোল !'

... ...

তুললে নয়ন এপার পানে—মেলল কি দল নার্গিস তার ?
দুটি কালো কাজল আখর—আকাশ ভুবন রঙিন বিথার !
কালো দুটি চোখের তারা, দুটি আখর, নয় কো বেশি ;
হয়তো 'প্রিয়', 'কিম্বা 'বঁধু'—তারও অধিক মেশামেশি !
কি জানি কি ছিল লেখা—তরুণ ইরান-কবিই জানে,
সাধা বাঁশি বেসুর বোলে সেদিন প্রথম কবির কানে।
কবির সুখের দিনের রবি অস্ত গেল সেদিন হতে,
ঘিরল চাঁদের স্বপন-মায়া মনের বনের কুঞ্জপথে।
হয়তো তুমি শোননি আর বাঁশুরিয়ার বংশীধ্বনী,
স্বপন সম বিদায় তাহার স্বপন সম আগমনী।

রোকনাবাদের নহর নীরের সকল লহর কবির বুকে,
ঢেউ তোলে গো সেদিন হতে রাত্রি দিবা গভীর দুখে।
সেই যে দুটি কাজল হরফ দুটি কালো আঁখির পাতে,
তাই নিয়ে সে গান রচে তার; সুরের নেশায় বিশ্ব মাতে!
অরুণ আঁখি তন্বী সাকি পাত্র এবং শারাব ভুলে,
চেয়ে থাকে কবির মুখে করুণ তাহার নয়ন তুলে;
শারাব হাতে সাকির কোলে শিরাজ কবির রঙিন নেশা
যায় গো টুটে ক্ষণে ক্ষণে—মদ মনে হয় অশ্রু মেশা।
অধর-কোণে হাসির ফালি ঈদের পহিল চাঁদের মতো—
উঠেই ডুবে যায় নিমেষে, সুর যেন তার হৃদয়-ক্ষত।
এপারে ঘুরে কবির সে গান ফুলের বাসে দখিন হাওয়ায়
কেঁদে ফিরেছিল কি গো তোমার কানন-কুঞ্জ ছায়ায়?
যার তরে সে গান রচিল, তারি শোনা রইল বাকি?
শুনল শুধু নিমেষ-সুখের শারাব-সাথী বে-দিল সাকি?

শাখ্-ই-নবাত্! শাখ্-ই-নবাত্! পায়নি তুতী তোমার শাখা,
উধাও হলো তাইতে গো তার উদাস বাণী হুতাশ-মাখা।
অনেক সাকির আঁখির লেখা, অনেক শারাব পাত্র-ভরা,
অনেক লালা নার্গিস গুল বুলবুলিস্তান গোলাব-ঝোরা—
ব্যর্থ হলো, মিটল না গো শিরাজ কবির বুকের তৃষা,
হয়তো আখের শাখায় ছিল সুধার সাথে বিষও মিশা!
নৈলে এ গান গাইত কে আর, বইত না এ সুরধুনী;
তোমার হয়ে আমরা নিখিল বিরহীরা সে গান শুনি।
আঙুর-লতায় গোটা আঙুর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবারি,
শিরাজ-কবির সাকির শারাব রঙিন হলো তাই নিঙাড়ি।
তোমায় আড়াল করার ছলে সাকির লাগি যে গান রচে,
তাতেই তোমায় পড়ায় মনে, শুনে সাকি অশ্রু মোছে!
তোমার চেয়ে মোদের অনেক নসিব ভালো, হায় ইরানি।
শুনলে না কো তোমায় নিয়ে রচা তোমার কবির বাণী।
তোমার কবির রচা গানে মোদের প্রিয়ার মান ভাঙাতে
তোমার কথা পড়ে মনে, অশ্রু ঘনায় নয়ন-পাতে!

ঘুমায় হাফিজ 'হাফেজিয়া'য়, ঘুমাও তুমি নহর-পারে;
দীওয়ানার সে দীওয়ান-গীতি একলা জাগে কবর-ধারে।

তেমনি আজো আঙুর ক্ষেতে গেয়ে বেড়ায় বুলবুলিরা,
তূতীর ঠোঁটে মিষ্টি ঠেকে তেমনি আজো চিনির সিরা।
তেমনি আজো জাগে সাকি পাত্র হাতে পানশালাতে—
তেমনি করে সূর্মা-লেখা লেখে ডাগর নয়ন-পাতে।
তেমনি যখন গুলজার হয় শারাব-খানা, 'মুশায়েরা',
মনে পড়ে রোকনাবাদের কুটির তোমার পাহাড়-ঘেরা'।
গোধূলি সে লগ্ন আসে, সন্ধ্যা আসে ডালিম-ফুলী,
ইরান মুলুক বিরান ঠেকে, নাই সেই তান, সেই বুলবুলি।
হাফেজিয়ায় কাঁদন ওঠে আজো যেন সন্ধ্যা প্রভাত—
'কোথায় আমার গোপন প্রিয়া কোথায় কোথায় শাখ্-ই-নবাত্ !'
দন্তে কেটে খেজুর-মেতী আপেল-শাখায় অঙ্গ রেখে
হয়তো আজো দাঁড়াও এসে পেশোয়াজে নীল আকাশ মেখে,
শারাব-খানায় গজল শোন তোমার কবির বন্দনা-গান ;
তেমনি করে সূর্য ডোবে, নহর-নীরে বহে তুফান।
অথবা তা শোনো না গো, শুনিবে না কোনো কালেই ;
জীবনে যে এল না তা কোনো লোকের কোথাও সে নেই !

অসীম যেন জিজ্ঞাসা ঐ ইরান-মরুর মরীচিকা,
জ্বালানি কি শিরাজ-কবির লোকে তোমার প্রদীপ-শিখা ?
বিদায় যেদিন নিল কবি শূন্য শারাব পাত্র করে,
নিঙড়ে অধর দাওনি সুধা তৃষিত কবির তৃষ্ণা হরে !
পাঁচ শো বছর খুঁজেছে গো, তেমনি আজো খুঁজে ফিরে
কবির গীতি তেমনি তোমায় রোকনাবাদের নহর-তীরে !

শহদ—মধু। মুশায়েরা—কবি-চক্র। হাফেজিয়া—কবি হাফিজের সমাধিস্থল। রোকনাবাদ—এরই নহর-তীরে কবির কুটির ছিল। বিরান—মরুভূমি।

গদাই-এর পদ বৃদ্ধি

দু-পেয়ে জীব ছিল গদাই বিবাহ না করে !
কুক্ষণে তার বিয়ে দিয়ে দিল সবাই ধরে॥
আইবুড়ো সে ছিল যখন, মনের সুখে উড়ত
হাল্কা দুখান পা দিয়ে সে নাচত, কুঁদত, ছুড়ত॥

ঝিয়ে করে গদাই
দেখলে সে আর উড়তে নারে, ভারি ঠেকে সদাই।
এ্যাডিশনাল দুখান ঠ্যাং বেড়ায় পিছে নড়ে।

তার পা দুখানা মোটা, বৌর দুখানা সরু,
ছোট বড় চারখানা পা, ঠিক যেন ক্যাঙ্গারু !
ঘরে এলে জরু
দেখলে গদাই, মানুষ সে নাই, হয়ে গেছে গরু !
দড়বড়াতো ‘রেসে’র ঘোড়া, এখন সে নড়বড়ে॥

অফিসে পদ বৃদ্ধি হয় না, ঘরে ফি বছরে
পা বেড়ে যায় গড়পড়তায় দুচারখান করে।
বৌ শোনে না মানা—
হন্যে হয়ে কন্যে আনে, মা ষষ্ঠীর ছানা।
মানুষ থেকে চার পেয়ে জীব, শেষ ছ পেয়ে মাছি,
তারপর আট পেয়ে পিঁপড়ে, গদাই বলে গেছি !
কেন্নোর প্রায় গদাই
ছুঁলেই এখন জড়সড়, জবড়জঙ্গ সদাই
বিয়ে করে মানুষ কি এই কেলেঙ্কারির তরে ?
দুপেয়ে জীব ছিল গদাই বিবাহ না করে॥

কর্থ্যভাষা

কর্থ্যভাষা কইতে নারি শুর্দ্ধ কথা ভিন্ন।
নেড়ায় আমি নিম্ন বলি (কারণ) ছেঁড়ায় বলি ছিন্ন॥

গোঁসাইকে কই গোস্বামী, তাই মশাইকে মোর্স্বামী।
বানকে বলি বন্যা, আর কানকে কন্যা কই আমি॥
চাষায় আমি চশশ বলি, আশায় বলি অশ্ব।
কোটকে বলি কোষ্ঠ, আর নাসায় বলি নস্য॥
শশারে কই শিষ্য আমি, ভাষারে কই ভীষ্ম।
পিসিরে কই পিষ্টক আর মাসিরে মাহিষ্য॥

পুকুরকে কই প্রুষ্করিণী, কুকুরকে কই কুক্কু।
বদনকে কই বদনা, আর গাড়ুকে গুড়ুক্কু॥
চাঁড়ালকে কই চণ্ডাল, তাই আড়ালকে কই অণ্ডাল।
শালারে কই শলাকা, আর কালায় বলি কঙ্কাল॥
শ্বশুরকে কই শ্মশ্রু, আর দাদাকে কই দদ্রু।
বামারে কই বম্বু, আর কাদারে কই কদ্রু॥
আরো অনেক বাত্রা জানি, বুঝলে ভায়া মিন্টু।
ভেবেছ সব শিখে নেবে, বলছি নে আর কিন্তু॥

দীওয়ান-ই-হাফিজ

ত্যাজি মসজিদ কাল মুর্শিদ মম আস্তানা নিল মদশালা,
নেবে কোন পথ এবে পথ-রথ ওগো সুহৃদ সখি
পথ-বালা !
আমি মুসাফির যত শারাবির ঐ খারাবির পথ-মঞ্জিলে,
সখি মাফ চাই, বিধি এই রায় ভালো লিখেছিলে
আমি জন্মিলে।
'কাবা শরিফের' পানে করি ফের মুখ কোন বলে আমি
কও সখি,
পীর শারাবের পথ-মদরত যবে, আন-পথে যাবে
শিষ্য কি ?
জ্ঞান বোঝে যদি কেন বাঁধি হৃদি প্রিয়া-কুন্তল-ফাঁদে
সেধে সেধে,
যত জ্ঞানী পীর ঐ জিঞ্জির লাগি, দিওয়ানা হবে গো
কেঁদে কেঁদে।
মম ঠোঁটে ও গো বধূ 'আয়েত'-মধু যে ঢালে তব মুখ
'কোর-আনে',
তাই সুধা আর সীধু ফেটে পড়ে শুধু কবিতাতে আর
মোর গানে।
মম অগ্নি-বর্ষী 'আহা' শ্বাস আর একা-রাতে জাগা
কাতরানি।
তব মর্মর-মোড়া মর্মে কি দিল ব্যথা আঁকি কোনো
রাত বাণী !

মম-ময়ূরী লাগি' 'বিরহ'-ভুজগী ফেঁসেছিল ভালো
কেশ-জালে
কেন খুলে দিয়ে বেণী 'বিচ্ছেদ'-ফণী ছেড়ে দিলে প্রিয়া
শেষকালে !
তব এলোচুলে বায়ু গেল বুলে মম আলো নিভে গেল
আঁধিয়ারে,
ঐ কালোকেশে আমি ভালোবেসে শেষে দেশে দেশে
ফিরি কাঁদিয়ারে ;
মোর বুক ফাটা 'উহু'-চিৎকার-বাণ চক্কর মারে নভ চিরে,
দেখো হুঁশিয়ার মম প্রিয়তম, তীর-বাজ পাখি উড়ে
তব শিরে !
মোর জ্ঞানী পীর আজ খারাবির পথে, এসো মোর সাথী
পথ-বালা,
ঐ হাফিজের মতো আমাদেরো পথ প্রেম-শিরাজীরই
মদশালা !

ক্ষমা করো হজরত ! !

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হজরত।
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ
ক্ষমা করো হজরত॥
বিলাস বিভব দলিয়াছ পায় ধূলিসম তুমি প্রভু
তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা নওয়াব কভু
এই ধরণীর ধন সম্ভার
সকলের তাহে সম অধিকার
তুমি বলেছিলে, ধরণীতে সবে সমান পুত্রবৎ॥
—ক্ষমা করো হজরত॥
তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি করে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাই দিয়ে নিজ ঘরে।
ভিন-ধর্মীর পূজা মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাওনি, হে বীর,
আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাকো পর-মত॥
—ক্ষমা করো হজরত॥

তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি,
তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী,
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা,
বেহেশত হতে ঝরে নাকো আর তাই তব রহমত॥
ক্ষমা করো হজরত॥

সাম্পানের গান

(পূর্ববঙ্গের ভাটিয়াল সুরে)

ওরে মাঝি ভাই!
ওরে সাম্পানওয়ালা ভাই!
তুই কি দুখ পাইয়া কূল হারাইলি অকূল দরিয়ায়॥
তোর ঘরের রশি ছিঁইরা রে গেল ঘাটের কড়ি নাই,
তুই মাঝ দরিয়ায় ভাইসা চলিস সাম্পান ভাসাই।
ও ভাই দরিয়ায় আয়ে জোয়ার ভাটিরে
তোর ঐ চক্ষের পানি চাই॥

তোর চোখের জল ভাই ছাপাইতে চাস নদীর জলে আইসা,
শেষে নদীই আইল চক্ষে রে তোর তুই চলিলি ভাইসা,
ও তুই কলস দেইখা নামলি জলে রে
এখন ডুইবা দেখিস কলস নাই॥

তুই কূলে যাহার কূল না পেলি তারে অগাধ জলে
কেন খুঁইজা মরিস ওরে পাগল সাম্পান বাওয়ার ছলে,
ও ভাই দুই ধারে এর চোরাবালু রে
তোর হেথায় মনের মানুষ নাই॥

২

কি হইব লাল বাওটা তুইল্যা সাম্পানর উপর।
তোর বাওটায় যত লাগব হাওয়া রে
ও ভাই ঘর হইব তোর ততই পর॥

তোর কি দুঃখ ভাই ছাপাইতে চাস বাওটারে রাঙ্গাইয়া,
এবার পরান ভইর‍্যা কাঁইদ্যা নে ভাই অগাধ জলে আইয়া,
ও ভাই তোর কাঁদনে উইঠা আসুক রে
ঐ নদীর থনে বালুর চর॥

তুই কিসের আশায় দিবিরে ভাই কূলের পানে পাড়ি ;
তোর দীয়া সেথা না জ্বলে ভাই আঁধার দে ঘরবাড়ি ;
তুই জীবন কূলে পেলিনা তায় রে
এবার মরণ জলে তালাস কর॥

বাওটা—পান। দীয়া—প্রদীপ।

৩

তোমায় কূলে তুইলা বন্ধু আমি নামছি জলে।
আমি কাঁটা হইয়া রই নাই বন্ধু তোমার পথের তলে॥
আমি তোমায় ফুল দিয়াছি কন্যা তোমার বন্ধুর লাগি'
যদি আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল তাই হইলাম বিবাগী।
আমি বুকের তলায় রাখছি তোমায় গো
পইর‍্যা শুকাইয়াছিনা গলে॥

যে দেশ তোমার ঘর রে বন্ধু সে দেশ থনে আইসা
আমার দুখের সাম্পান ছাইরা দিছি চলতেছে সে ভাইসা,
এখন যে দেশে নাই তুমি বন্ধু গো
আমি সেই দেশে যাই চলে।
আমি সেই দেশে যাই চলে॥

চট্টগ্রাম
জানুয়ারি ১৯২৯

অ-নামিকা

কোন নামে হায় ডাকব তোমায়
নাম-না-জানা অ-নামিকা।

জলে স্থলে গগন-তলে
তোমার মধুর নাম যে লিখা॥
গ্রীষ্মে কনক-চাঁপার ফুলে
তোমার নামের আভাস দুলে,
ছড়িয়ে আছে বকুল মূলে
তোমার নাম হে ক্ষণিকা॥

বর্ষা বলে অশ্রুজলের মানিনী সে বিরহিণী।
আকাশ বলে, তড়িত লতা, ধরিত্রী কয় চাতকিনী!'
আষাঢ় মেঘে রাখলো ঢাকি
নাম যে তোমার কাজল আঁখি,
শ্রাবণ বলে, জুঁই বেলা কি?
কেকা বলে মালবিকা॥

শারদ-প্রাতে কমলবনে তোমার নামের মধু পিয়ে
বাণীদেবীর বীণার সুরে ভ্রমর বেড়ায় গুণ গুনিয়ে!
তোমার নামের মিলমিলিয়ে
ঝিল ওঠে গো ঝিলমিলিয়ে
আশ্বিনে কয়, তার যে বিয়ে
গায়ে হলুদ শেফালিকা॥

নদীর তীরে বেণুর সুরে তোমার নামের মায়া ঘনায়,
করুণ আকাশ গলে তোমার নাম ঝরে নীহার কণায়॥
আমন ধানের মঞ্জরিতে
নাম গাঁথা যে ছন্দ গীতে
হৈমন্তী ঝিম নিশীথে
তারায় জ্বলে নামের শিখা॥

ছায়া পথের কুহেলিকায় তোমার নামের রেণু মাখা,
ম্লান মাধুরী ইন্দুলেখায় তোমার নামের তিলক আঁকা।
তোমার নামে হয়ে উদাস
ধুমল হোলো বিমল আকাশ
কাঁদে শীতের হিমেল বাতাস
কোথায় সুদূর নীহারিকা॥

তোমার নামের শত-নোরী বনভূমির গলায় দোলে
জপ শুনেছি তোমার নামের মুহুর্মুহু কুহুর বোলে।
দুলালচাঁপার পাতার কোলে
তোমার নামের মুকুল দোলে
কৃষ্ণচূড়া, হেনা বলে,
চির চেনা সে রাধিকা॥

বিশ্ব রমা সৃষ্টি জুড়ে তোমার নামের আরাধনা
জড়িয়ে তোমার নামাবলী হৃদয় করে যোগসাধনা।
তোমায় নামের আবেগ নিয়া
সিন্ধু ওঠে হিল্লোলীয়া
সমীরণের মর্মরিয়া
ফেরে তোমার নাম—গীতিকা॥

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

ভূমিকা

ওমরকে তাঁর কাব্য পড়ে যাঁরা Epicurean বলে অভিহিত করেন, তাঁরা পূর্ণ সত্য বলেন না। ওমরের কাব্য সাধারণত ছয় ভাগে বিভক্ত :

১। 'শিকায়াত্-ই-রোজগার', অর্থাৎ গ্রহের ফের বা অদৃষ্টের প্রতি অনুযোগ।

২। 'হজও', অর্থাৎ ভণ্ডদের, বকধার্মিকদের প্রতি শ্লেষ-বিদ্রূপ ও তথাকথিত আলেম বা জ্ঞানীদের দাম্ভিকতা ও মূর্খদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ।

৩। 'ফিরাফিয়া' ও 'ওসালিয়া', বা প্রিয়ার বিরহে ও মিলনে লিখিত কবিতা।

৪। 'বাহরিয়া'—বসন্ত, ফুল, বাগান, ফল, পাখি ইত্যাদির প্রশংসায় লিখিত কবিতা।

৫। 'কুফরিয়া'—ধর্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কবিতাসমূহ। এইগুলি ওমরের শ্রেষ্ঠ কবিতারূপে কবি-সমাজে আদৃত। স্বর্গ-নরকের অলীক কল্পনা, বাহ্যিক উপাসনার অসারতা, পাপ-পুণ্যের মিথ্যা ভয় ও লাভ ইত্যাদি নিয়ে লিখিত কবিতাগুলি এর অন্তর্গত।

৬। 'মুনাজাত' বা খোদার কাছে প্রার্থনা। এ প্রার্থনা অবশ্য সাধারণের মতো প্রার্থনা নয়, সূফীর প্রার্থনার মতো এ হাস্য-জড়িত।

ওমরকে Epicurean কতকটা বলা যায় শুধু তাঁর 'কুফরিয়া'-শ্রেণীর কবিতার জন্য। এ ছাড়া ওমর যা, তা ওমর ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই তুলনা হয় না।

ওমরের কাব্যে শারাব-সাকির ছড়াছড়ি থাকলেও তিনি জীবনে ছিলেন আশ্চর্য রকমের সংযমী। তাঁর কবিতায় যেমন ভাবের প্রগাঢ়তা, অথচ সংযমের আঁটসাঁট বাঁধুনি, তাঁর জীবনও ছিল তেমনি।

ফিট্‌জেরাল্ডের মুখে ঝাল খেয়ে অনেকেই বলে থাকেন, ওমর যে-শারাবের কথা বলেছেন তা দ্রাক্ষারস, তাঁর সাকিও রক্ত-মাংসের। ফিট্‌জেরাল্ড তাঁর মতের পরিপোষকতার জন্য কোনো প্রমাণ দেননি। তাঁর মতে মত দিয়েছেন যাঁরা, তাঁরাও কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। ওমর তাঁর 'রুবাই'তে অবশ্য শারাব বলতে আঙুরের ক্বাথ-এর উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু ওটা পারস্যের সকল কবিরই অন্তত 'বলার জন্য বলা'-র বিলাস। শারাব, সাকি, গোলাপ, বুলবুলকে বাদ দিয়ে যে কবিতা লেখা যায়, তা ইরানের কবিরা যেন ভাবতেই পারেন না।

ওমর হয়তো শারাব পান করতেন কিংবা করতেনও না। এর কোনোটাই প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। ওমরের রুবাইয়াতের মতবাদের জন্য তাঁর দেশের তৎকালীন ধর্মগোঁড়াদের অত্যন্ত আক্রোশ ছিল, তবু তাঁকে দেশের শ্রেষ্ঠ

জ্ঞানী বলে সম্রাট থেকে জনসাধারণ পর্যন্ত ভক্তির চোখে দেখত। সে-যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা ওমরের ছাত্র ছিলেন; কাজেই, মনে হয়, তিনি মদ্যপ লম্পটের জীবন (ইচ্ছা থাকলেও) যাপন করতে পারেননি। তাছাড়া, ও-ভাবে জীবন যাপন করলে গোঁড়ার দল তা লিখে রাখতেও ভুলে যেতেন না। অথচ, তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রুও তা লিখে যাননি। সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হওয়ার শাস্তি তাঁকে পেতে হয়েছিল হয়তো এই ভাবেই যে, তিনি নিজের স্বাধীন ইচ্ছামতো জীবন যাপন করতে পারেননি। শারাব-সাকির স্বপ্নই দেখেছেন— তাদের ভোগ করে যেতে পারেননি। ভোগ-তৃপ্ত মনে এমন আগুন জ্বলে না। এ যে মরুভূমি-নিম্নে হয়তো বহু নিম্নে কান্নার ফল্গুধারা, ঊর্ধ্বে রৌদ্র-দগ্ধ বালুকার জ্বালা, তীব্র দাহন। ওমর যেন মরুভূমির বুকের খর্জুর-তরু, মরুভূমির খেজুর-গাছকে দেখলে যেমন অবাক হতে হয়—ওমরকে দেখেও তেমনি বিস্মিত হই। সারা দেহে কণ্টকের জ্বালা, ঊর্ধ্বে রৌদ্রতপ্ত আকাশ, নিম্নে আতপ-তপ্ত বালুকা—তারি মাঝে এর রস সে পায় কেমন করে?

খেজুর-গাছের মতোই ওমর এ-রস দান করেছেন নিজের হৃৎপিণ্ডকে বিদারণ করে। এ রস মিষ্ট হলেও এ তো অশ্রুজলের লবণ মেশা। খেজুর-গাছের রস যেমন তার মাথা চেঁছে বের করতে হয়, ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতও তেমনি বেরিয়েছে তাঁর মস্তিষ্ক থেকে। প্রায় হাজার বছর আগে এত বড় জ্ঞানমার্গী কবি কি করে জন্মাল, বিশেষ করে ইরানের মতো অনুভূতিপ্রবণ দেশে—তা ভেবে অবাক হতে হয়। ওমরকে দেখে মনে হয়, কোনো বিংশ শতাব্দীর কবিও বুঝি এত মডার্ন হতে পারেন না। ওমরকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল, তা বুঝি তাঁর ঐ হাজার বছর আগে জন্মাবার জন্যই। আজকাল পৃথিবীর কোনো মডার্ন কবিই তাঁর মতো মডার্ন নন, তরুণও নন। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-প্রবুদ্ধ লোকও তাঁর সব মত বুঝি হজম করতে পারেন না। ওমর আজ জগতে অপরিমাণ শ্রদ্ধা পাচ্ছেন—তবু মনে হয়, আরো চার-পাঁচ শতাব্দী পরে তিনি আরো বেশি শ্রদ্ধা পাবেন—যা পেয়েছেন তার বহু সহস্র গুণ।

ওমর তাঁর অসময়ে আসা সম্বন্ধে যে অত্ত বেশি সচেতন ছিলেন, তা তাঁর লেখার দুঃসাহসিকতা, পৌরুষ ও গভীর আত্মবিশ্বাস দেখেই বুঝা যায়। তিনি যেন তাঁর কাছে আর-সব মানুষকে অতি ক্ষুদ্র pigmy করে দেখতেন।

তিনি নিজেকে এইসব ক্ষুদ্র-জ্ঞান মানুষের, এমনকি সে-যুগের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগণেরও—বহু বহু ঊর্ধ্বে মনে করতেন। তিনি যেন জানতেন—তাঁর জীবনে তাঁর লেখা বুঝবার মতো লোক কেউ জন্মায়নি, তিনি যা লিখেছেন তা অনাগত দিনের নূতন পৃথিবীর জন্য।

ওমর সুফী ছিলেন কিনা জানিনে। কিন্তু ঐ পথের পথিক যাঁরা, তাঁরা ওমরকে সুফী এবং খুব উঁচুদরের তাপস বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, সুফী জনপ্রিয়তার বা লোকের শ্রদ্ধার জুলুম এড়াবার জন্যই ঘোরতর পাপ পরিহার করেন। তাঁরা নিজেদের মদ্যপ লম্পট বলে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করে নিজেরা গুপ্ত সাধনায় মগ্ন থাকেন। তাছাড়া, ইরানে কবিরা শারাবকে সকলে সত্যিকার মদ বলে ধরে নেন না। তাঁরা শারাব বলতে

আনন্দ—ভূমানন্দকে বোঝেন—যে আনন্দ-রূপিণী সুরার নেশায় তাপস-ঋষি সংসারের সব ভুলে গিয়ে আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে থাকেন। সাকি বলতে বোঝেন মুর্শিদকে, গুরুকে, যিনি সেই আনন্দ-শারাব পরিবেশন করেন। যাক, ও-সব তত্ত্বকথা দিয়ে আমাদের প্রয়োজন নেই, কেননা আমরা তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, আমরা রস-পিপাসু। ওমর কবিতা লিখেছেন, এবং তা চমৎকার কবিতা হয়েছে, আমাদের পক্ষে এই যথেষ্ট। আমরা তা পড়ে অত্যন্ত আনন্দ পাই, আমাদের এতেই আনন্দ।

আমাদের কাছে, বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-পুষ্ট কারণ-জিজ্ঞাসু মনের কাছে, ওমরের কবিতা যেন আমাদেরই প্রশ্ন, আমাদেরই প্রাণের কথা। আমরা জিজ্ঞাসা করি-করি করেও যেন সাহস ও প্রকাশ-ক্ষমতার দৈন্যবশত তা জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না। বিগত মহাযুদ্ধের মতোই আমাদের আজকের জীবন-মহাযুদ্ধ-ক্লান্ত অবিশ্বাসী-মন জিজ্ঞাসা করে ওঠে—কেন এই জীবন, মৃত্যুই বা কেন? স্বর্গ, নরক, ভগবান বলে সত্যই কি কিছু আছে? আমরা মরে কোথায় যাই? কেন এই হানাহানি? এই অভাব, দুঃখ, শোক?—এমনিতর অগুনতি প্রশ্ন, যার উত্তর কেউ দিতে পারেনি। যে উত্তর দিয়েছে, সে তার উত্তরের প্রমাণে কিছুই দেখাতে পারেনি ; শুধু বলেছে ; বিশ্বাস করো ! তবু আমাদের মন বিশ্বাস করতে চায় না, সে তর্ক করতে শিখেছে। এই চিরন্তন প্রশ্ন ওমরের জ্ঞান-প্রশান্ত মনে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝড়ের মতোই দোল দিয়েছিল। সেই তরঙ্গ-সংঘাতের সংগীত, বিলাপ, গর্জন শুনতে পাই তাঁর রুবাইয়াতে। ওমরকে বিংশ শতাব্দীর মানুষের ভালো-লাগার কারণ এই।

ওমর বলতে চান, এই প্রশ্নের হাত এড়াবার জন্য কত অবতার পয়গম্বর এলেন, তবু যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নই রয়ে গেল ! মানুষের দুঃখ এক তিলও কমল না। ওমর তাই বললেন, এ-সব মিথ্যা, পৃথিবী মিথ্যা, স্বর্গ মিথ্যা, পাপ-পুণ্য মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, আমি মিথ্যা, সত্য মিথ্যা, মিথ্যা মিথ্যা। একমাত্র সত্য—যে মুহূর্ত তোমার হাতের মুঠোয় এলো তাকে চুটিয়ে ভোগ করে নাও। স্রষ্টা যদি কেউ থাকেনও, তিনি আমাদের দুঃখে-সুখে নির্বিকার—আমরা তাঁর হাতের খেলা-পুতুল। সৃষ্টি করছেন ভাঙছেন তাঁর খেয়াল-মতো, তুমি কাঁদলেও যা হবে, না কাঁদলেও তাই হবে, যা হবার তা হবেই। যে মরে গেল, সে একেবারেই মরে গেল ; সে আর আসবেও না বাঁচবেও না। তাঁর পাপ-পুণ্য স্রষ্টারই আদেশ—তাঁর খেলা জমাবার জন্য। মোট কথা, স্রষ্টা একটা বিরাট খেয়ালি শিশু বা ঐন্দ্রজালিক।

আমি ওমরের রুবাইয়াৎ বলে প্রচলিত প্রায় এক হাজার রুবাই থেকেই কিঞ্চিদধিক দুশো রুবাই বেছে নিয়েছি ; এবং তা ফারসি ভাষার রুবাইয়াৎ থেকে। কারণ, আমার বিবেচনায় এইগুলি ছাড়া বাকি রুবাই ওমরের প্রকাশভঙ্গি বা স্টাইলের সঙ্গে একেবারে মিশ খায় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাশে আমার মতো কবির কবিতার মতো তা একেবারে বাজে। বাকিগুলিতে ওমর খৈয়ামের ভাব নেই, ভাষা নেই, গতি ঋজুতা—এ কথায় স্টাইলের কোনো কিছু নেই। খুব সম্ভব ওগুলি অন্য-কোনো

পদ্য-লিখিয়ের লেখা। আর, তা যদি ওমরেরই হয়, তবে তা অনুবাদ করে পণ্ডশ্রম করার দরকার নেই। বাগানের গোলাপ তুলব ; তাই বলে বাগানের আগাছাও তুলে আনতে হবে এর কোনো মানে নেই।

আমি আমার ওস্তাদি দেখাবার জন্য ওমর খৈয়ামের ভাব ভাষা বা স্টাইলকে বিকৃত করিনি—অবশ্য আমার সাধ্যমতো। এর জন্য আমার অজস্র পরিশ্রম করতে হয়েছে, বেগ পেতে হয়েছে। কাগজ-পেন্সিলের, যাকে বলে আদ্যশ্রাদ্ধ, তা-ই করে ছেড়েছি। ওমরের রুবাইয়াতের সবচেয়ে বড় জিনিস ওর প্রকাশের ভঙ্গি বা ঢং। ওমর আগাগোড়া মাতালের 'পোজ' নিয়ে তাঁর রুবাইয়াৎ লিখে গেছেন—মাতালের মতোই ভাষা, ভাব, ভঙ্গি, শ্লেষ, রসিকতা, হাসি, কান্না—সব। কত বৎসর ধরে কত বিভিন্ন সময়ে তিনি এই কবিতাগুলি লিখেছেন, অথচ এর স্টাইল সম্বন্ধে কখনো এতটুকু চেতনা হারাননি। মনে হয় একদিনে বসে লেখা। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—ওমরের সেই ঢঙটির মর্যাদা রাখতে, তাঁর প্রকাশভঙ্গিকে যতটা পারি কায়দায় আনতে। কতদূর সফল হয়েছি, তা ফারসি-নবিশরাই বলবেন।

ওমর খৈয়ামের ভাবে অনুপ্রাণিত ফিট্‌জেরাল্ডের কবিতার যাঁরা অনুবাদ করেছেন, তাঁরা সকলেই আমার চেয়ে শক্তিশালী ও বড় কবি। কাজেই তাঁদের মতো মিষ্টি শোনাবে না হয়তো আমার এ অনুবাদ। যদি না শোনায়, সে আমার শক্তির অভাব—সাধনার অভাব, কেননা কাব্য-লোকের গুলিস্তান থেকে সংগীতলোকের রাগিণী-দ্বীপে আমার দ্বীপান্তর হয়ে গেছে। সংগীত-লক্ষ্মী কাব্য-লক্ষ্মী দুই বোন বলেই বুঝি ওদের মধ্যেই এত রেষারেষি। একজনকে পেয়ে গেলে আরেকজন বাপের বাড়ি চলে যান। দুইজনকে খুশি করে রাখার মতো শক্তি রবীন্দ্রনাথের মতো লোকেরই আছে। আমার সে সম্বলও নেই, শক্তিও নেই। কাজেই, আমার অক্ষমতার দরুন কেউ যেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ওমরের উপর চটে না যান।

ওমরের রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতা চতুষ্পদী হলেও তার চারটি পদই ছুটেছে আরবি ঘোড়ার মতো দৃপ্ত তেজে সম-তালে—ভণ্ডামি, মিথ্যা বিশ্বাস, সংস্কার, বিধি-নিষেধের পথে ধূলি উড়িয়ে তাদের বুক চূর্ণ করে। সেই উচ্চৈঃশ্রবা আমার হাতে পড়ে হয়তো বা বজদ্দি মোড়লের ঘোড়া-ই হয়ে উঠেছে—আমাদের গ্রামের কাছে এক জমিদার ছিলেন, তাঁর নাম বজদ্দি মোড়ল। তাঁর এক বাগ-না-মানা ঘোড়া ছিল, সে জাতে অশ্ব হলেও গুণে অশ্বতর ছিল। তিনি যদি মনে করতেন পশ্চিম দিকে যাবেন, ঘোড়া যেত পূর্ব দিকে। ঘোড়াকে কিছুতেই বাগ মানাতে না পেরে শেষে বলতেন—'আচ্ছা চল্, এদিকেও আমার জমিদারি আছে।'

ওমরের বোররাক বা উচ্চৈঃশ্রবাকে আমার মতো আনাড়ি সওয়ার যে বাগ মানাতে পারবে, সে ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে উক্ত বজদ্দি মোড়লের মতো সে ঘোড়াকে তার ইচ্ছামতো পথেও যেতে দিইনি। লাগাম কষে প্রাণপণ বাধা দিয়েছি, যাতে সে অন্যপথে না যায়। অবশ্য মাঝে মাঝে পড়ব-পড়ব অবস্থাও যে হয়েছে, তা স্বীকার করতে আমার

লজ্জা নেই। তবে এটুকু জোর করে বলতে পারি, তাঁর ঘোড়া আমার হাতে পড়ে চতুষ্পদী ভেড়াও হয়ে যায়নি—প্রাণহীন চার-পায়াও হয়নি। আমি ন্যাজ মলে মলে ওর অন্তত তেজটুকু নষ্ট করিনি। ওঁর মতো 'ছার্তক' (সার্থক?) না হতে পারলেও অন্তত 'কদমে' চালাবার কিছু চেষ্টা করেছি।

যাক, অনেক বকা গেল ; এর জন্য যাঁরা আমাকে দোষ দেবেন—তাঁরা যেন আমায় দোষ দেবার আগে খৈয়ামের শারাবকে দোষ দেন। এর নামেই এত নেশা, পান করলে না জানি কি হয়, হয়তো-বা ওমর খৈয়ামই হয়! অবশ্য আমরা খেলে এইরকম বখামি করি, ওমর খেলে রুবাইয়াৎ লেখেন।

এইবার কৃতজ্ঞতা নিবেদনের পালা। খাওয়ানোর শেষে, বিনয় প্রকাশের মতো। না করলেও হয়, তবু দেশের রেওয়াজ মেনে চলতেই হবে।

আমার বহুকালের পুরানো বন্ধু মৌলবি মঈনউদ্দীন হোসায়ন সাহেব এর সমস্ত কিছু সরবরাহ না করলে হয়তো আমি কোনোদিনই এ শেষ করতে পারতাম না। তাঁর কাছে আমি এজন্য চির-ঋণী। শ্রীমান আবদুল মজিদ সাহিত্য-রত্নও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন আমার প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য। এঁদের দু'জনারই নাম আছে সাহিত্যে, কাজেই কেবল আমার বই-এ নাম থাকার জন্য এঁরা পরিচিত হবেন না। আমার সাহায্য করার মতি এঁদের অটল থাক, এই-ই প্রার্থনা।

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

১

রাতের আঁচল দীর্ণ করে আসল শুভ ঐ প্রভাত,
জাগো সাকি ! সকালবেলার খোঁয়ারি ভাঙো আমার সাথ।
ভোলো ভোলো বিষাদ-স্মৃতি ! এমনি প্রভাত আসবে ঢের,
খুঁজতে মোদের এইখানে ফের, করবে করুণ নয়নপাত।

২

আঁধার অন্তরীক্ষ বুনে যখন রুপার পাড় প্রভাত,
পাখির বিলাপ-ধ্বনি কেন শুনি তখন অকস্মাৎ !
তারা যেন দেখতে বলে উজ্জ্বল প্রাতের আরশিতে—
ছন্নছাড়া তোর জীবনের কাটল কেমন একটি রাত।

৩

ঘুমিয়ে কেন জীবন কাটাস ? কইল ঋষি স্বপ্নে মোর,
আনন্দ-গুল প্রস্ফুটিত করতে পারে ঘুম কি তোর।
ঘুম মৃত্যুর যমজ ভ্রাতা, তার সাথে ভাব করিসনে,
ঘুম দিতে ঢের পাবি সময় কররে তোর জনম ভোর।

৪

আমার আজের রাতের খোরাক তোর টুকটুক শিরিন ঠোঁট,
গজল শোনাও, শিরাজি দাও, তন্বী সাকি জেগে ওঠ !
লাজ-রাঙা তোর গালের মতো দে গোলাপি রঙ শারাব,
মনে ব্যথার বিনুনি মোর খোঁপায় যেমন তোর চুনোট।

৫

প্রভাত হলো। শারাব দিয়ে করব সতেজ হৃদয়-পুর,
যশোখ্যাতির ঠুনকো এ কাচ করব ভেঙে চাখনাচুর।
অনেক দিনের সাধ ও আশা এক নিমিষে করব ত্যাগ,
পরব প্রিয়ার বেণী বাঁধন, ধরব বেণুর বিধুর সুর।

৬

ওঠো, নাচো! আমরা প্রচুর করব তারিফ মদ-অলস
ঐ নার্গিস-আঁখির তোমার, ঢালবে তুমি আঙুর-রস!
এমন কী আর—যদিই তাহা পান করি দশ বিশ গেলাশ,
ছয় দশে ষাট পাত্র পড়লে খানিকটা হয় দিল সরস।

৭

তোমার রাঙা ঠোঁটে আছে অমৃত-কূপ প্রাণ-সুধার,
ঐ পিয়ালার ঠোঁট যেন গো ছোঁয় না, প্রিয়া, ঠোঁট তোমার।
ঐ পিয়ালার রক্ত যদি পান না করি, শাপ দিও;
তোমার অধর স্পর্শ করে এত বড় স্পর্ধা তার!

৮

আজকে তোমার গোলাপ-বাগে ফুটল যখন রঙিন গুল
রেখো না পান-পাত্র বেকার, উপচে পড়ুক সুখ ফজুল।
পান করে নে, সময় ভীষণ অবিশ্বাসী, শত্রু ঘোর,
হয়তো এমন ফুল-মাখানো দিন পাবি না আজের তুল!

৯

শারাব আনো! বক্ষে আমার খুশির তুফান দেয় যে দোল।
স্বপ্ন চপল ভাগ্যলক্ষ্মী জাগল, জাগো ঘুম-বিভোল!
মোদের শুভদিন চলে যায় পারদ সম ব্যস্ত পায়
যৌবনের এই বহ্নি নিভে খোঁজে নদীর শীতল কোল!

১০

আমরা পথিক ধূলির পথের, ভ্রমি শুধু একটি দিন,
লাভের অঙ্ক হিসাব করে পাই শুধু দুখ, মুখ মলিন।
খুঁজতে গিয়ে এই জীবনের রহস্যেরই কূল বৃথাই
অপূর্ণ সাধ আশা লয়ে হবোই মৃত্যুর অঙ্কলীন।

১১

ধরায় প্রথম এলাম নিয়ে বিস্ময় আর কৌতূহল,
তারপর—এ জীবন দেখি কল্পনা, আঁধার অতল।
ইচ্ছা থাক কি না থাক, শেষে যেতেই হবে, তাই বলি—
এই যে জীবন আসা-যাওয়া আঁধার ধাঁধার জট কেবল!

১২

রহস্য শোন সেই সে লোকের আত্মা যথায় বিরাজে,
ওরে মানব ! নিখিল সৃষ্টি লুকিয়ে আছে তোর মাঝে।
তুই-ই মানুষ, তুই-ই পশু, দেবতা দানব স্বর্গদূত,
যখন হতে চাইবি রে যা হতে পারিস তুই তা যে।

১৩

স্রষ্টা যদি মত নিত মোর—আসতাম না প্রাণান্তেও
এই ধরাতে এসে আবার যাবার ইচ্ছা নেই মোটেও।
সংক্ষেপে কই, চিরতরে নাশ করতাম সমূলে
যাওয়া-আসা জন্ম আমার, সেও শূন্য শূন্য এও !

১৪

আত্মা আমার ! খুলতে যদি পারতিস এই অস্থিমাস
মুক্ত পাখার দেবতা সম পালিয়ে যেতিস দূর আকাশ।
লজ্জা কি তোর হলো না রে, ছেড়ে তোর ঐ জ্যোতির্লোক
ভিন-দেশি প্রায় বাস করতে এলি ধরার এই আবাস ?

১৫

সকল গোপন তত্ত্ব জেনেও পার্থিব এই আবহাওয়ার
মিথ্যা ভয়ের ভয় গেল না ? নিত্য ভয়ের হও শিকার ?
জানি স্বাধীন ইচ্ছামতো যায় না চলা এই ধরায়,
যতটুকু সময় তবু পাও হাতে, লও সুযোগ তায়।

১৬

ব্যথায় শান্তি লাভের তরে থাকত যদি কোথাও স্থান
শ্রান্ত পথের পথিক মোরা সেথায় জুড়াতাম এ প্রাণ।
শীত-জর্জর হাজার বছর পরে নবীন বসন্তে
ফুলের মতো উঠত ফুটে মোদের জীবন-মুকুল ম্লান।

১৭

বুলবুলি এক হালকা পাখায় উঠে যেতে গুলিস্তান,
দেখল হাসিখুশি ভরা গোলাপ লিলির ফুল-বাগান।
আনন্দে সে উঠল গাহি, 'মিটিয়ে নে সাধ এই বেলা,
ভোগ করতে এমন দিন আর পাবিনে তুই ফিরিয়ে প্রাণ !'

১৮

রূপ-মাধুরীর মায়ায় তোমার যেদিন পারো, লো প্রিয়া,
তোমার প্রেমিক বঁধুর ব্যথা হরণ করো প্রেম দিয়া!
রূপ-লাবণির সম্ভার এই রইবে না সে চিরকাল,
ফিরবে না আর তোমার কাছে যায় যদি বিদায় নিয়া।

১৯

সাকি! আনো আমার হাতে মদ-পেয়ালা, ধরতে দাও!
প্রিয়ার মতন ও মদ-মদির সুরত-ওয়ালি বরতে দাও!
জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীরে বেঁধে যা দেয় গাঁটছড়ায়,
সেই শারাবের শিকল, সাকি, আমায় খালি পরতে দাও!

২০

নীল আকাশের নয়ন ছেপে বাদল-অশ্রুজল ঝরে,
না পেলে আজ এই পানীয় ফুটত না ফুল বন ভরে।
চোখ জুড়াল আমার যেমন আজ এ ফোটা ফুলগুলি,
মোর কবরে ফুটবে যে ফুল—কে জানে হায় কার তরে!

২১

করব এতই শিরাজি পান পাত্র এবং পরান ভোর
তীব্র মিঠে খোশবো তাহার উঠবে আমার ছাপিয়ে গোর।
থমকে যাবে চলতে পথিক আমার গোরের পাশ দিয়ে,
ঝিমিয়ে শেষে পড়বে নেশায় মাতাল-করা গন্ধে ওর।

২২

দেখতে পাবে যেথায় তুমি গোলাপ লালা ফুলের ভিড়,
জেনো, সেথায় ঝরেছিল কোনো শাহানশার রুধির।
নার্গিস আর গুল-বনোসার দেখবে যেথায় সুনীল দল,
ঘুমিয়ে আছে সেথায়—গালে তিল ছিল সে সুন্দরীর।

২৩

নিদ্রা যেতে হবে গোরে অনন্তকাল, মদ পিও।
থাকবে নাকো সাথী সেথায় বন্ধু প্রিয় আত্মীয়।
আবার বলতে আসব না ভাই, বলছি যা তা রাখো শুনে—
ঝরেছে যে ফুলের মুকুল, ফুটতে পারে আর কি ও?

২৪

বিদায় নিয়ে আগে যারা গেছে চলে, হে সাকি !
চির-ঘুমে ঘুমায় তারা মাটির তলে, হে সাকি !
শারাব আনো, আসল সত্য আমার কাছে যাও শুনে,
তাদের যত তথ্য গেল হাওয়ায় গলে, হে সাকি !

২৫

তুমি আমি জন্মিনিকো—যখন শুধু বিরামহীন
নিশীথিনীর গলা ধরে ফিরত হেথায় উজল দিন,—
বন্ধু, ধীরে চরণ ফেলো ! কাজল-আঁখি সুন্দরীর
আঁখির তারা আছে হেথায় হয়তো ধূলির অঙ্কলীন !

২৬

প্রথম থেকেই আছে লেখা অদৃষ্টে তোর যা হবার,
তাঁর সে কলম দিয়ে—যিনি দুঃখে সুখে নির্বিকার।
স্রেফ বোকামি কান্নাকাটি, লড়তে যাওয়া তার সাথে,
বিধির লিখন ললাট-লিপি টলবে না যা জন্মে আর !

২৭

ভালো করেই জানি আমি, আছে এক রহস্য-লোক,
যায় না বলা সকলকে তা ভালোই হোক কি মন্দ হোক।
আমার কথা ধোঁয়ায় ভরা, ভাঙতে তবু পারব না—
থাকিস সে কোন গোপন-লোকে, দেখতে যাহা পায় না চোখ।

২৮

চলবে নাকো মেকি টাকার কারবার আর, মোল্লাজি !
মোদের আবাস সাফ করে নেয় শেয়ান-ঝাড়ুর কারসাজি।
বেরিয়ে ভাঁটিখানার থেকে বলল হেঁকে বৃদ্ধ পীর—
'অনন্ত ঘুম ঘুমাবি কাল, পান করে নে মদ আজি !'

২৯

সবকে পারি ফাঁকি দিতে মনকে পারি ঠারতে চোখ,
খোদার উপর খোদকারিতে ব্যর্থ হয় এ মিছে স্তোক।
তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে জাল বুনিলাম চাতুর্যের,
মুহূর্তে তা দিল ছিঁড়ে হিংস্র নিয়তির সে নোখ !

৩০

মৃত্তিকা-লীন হবার আগে নিয়তির নিঠুর করে
বেঁচে নে তুই, মৃত্যু-পাত্র আসছে রে ঐ তোর তরে !
হেথায় কিছু জোগাড় করে নে রে, হোথায় কেউ সে নাই
তাদের তরে—শূন্য হাতে যায় যাহারা সেই ঘরে।

৩১

বলতে পারে, অসার শূন্য ভবের হাটের এই ঘরে
জ্ঞান-বিলাসী সুধীজনের হৃদয় কেন রয় পড়ে ?
যেই তাহারা শ্রান্ত হয়ে এই সে ঘরের শান্তি চায়,
'সময় হলো, চল ওরে', কয় অমনি মরণ হাত ধরে !

৩২

খাজা ! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জি এই—
থামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই।
দৃষ্টি-দোষে দেখছ বাঁকা আমার সোজা সরল পথ,
আমায় ছেড়ে ভালো করো ঝাপসা তোমার চক্ষুকেই।

৩৩

কাল কি হবে কেউ জানে না, দেখছ তো, হায়, বন্ধু মোর !
নগদ মধু লুঠ করে লও, মোছো মোছো অশ্রুলোর।
চাঁদনি-তরল শরাব পিও, হায়, সুন্দর এই সে চাঁদ
দীপ জ্বালিয়ে খুঁজবে বৃথাই কাল এ শূন্য ধরার ক্রোড়।

৩৪

প্রেমিকরা সব আমার মতো মাতুক প্রেমের মত্ততায়,
দ্রাক্ষা-রসের দীক্ষা নিয়ে আচার-নীতি দলুক পায়।
থাকি যখন শাদা চোখে, সব কথাতে রুষ্ট হই ;
শারাব পিয়ে দিল-দরিয়া উড়িয়ে দি ভয়-ভাবনায়।

৩৫

মানব-দেহ—রঙে-রূপে এই অপরূপ ঘরখানি—
স্বর্গের সে শিল্পী কেন করল সৃজন কী জানি,
এই 'লালা-রুখ' বল্লী-তনু ফুল্ল-কপোল তন্বীদের
সাজাতে হায় ভঙ্গুর এই মাটির ধরার ফুলদানি।

৩৬

তিন ভাগ জল এক ভাগ থল, এই পৃথিবীর এও মায়া,
এই ধরাতে দেখছ যা তার সকল-কিছু সব মায়া,
এই যে তুমি বলছ যা সব, শুনছ কলরব মায়া।
গোপন প্রকাশ সত্য মিথ্যা এ সব অবাস্তব মায়া।

৩৭

দোষ দেয় আর ভর্ৎসে সবাই আমার পাপের নাম নিয়া,
আমার দেবী প্রতিমারে পূজি তবু প্রাণ দিয়া।
মরতে যদি হয় গো আমার শারাব পানের মজলিশে—
স্বর্গ-নরক সমান, পাশে থাকবে শারাব আর প্রিয়া।

৩৮

মুসাফিরের এক রাত্রির পান্থ-বাস এ পৃথ্বীতল—
রাত্রি-দিবার চিত্রলেখা চন্দ্রাতপ আঁধার-উজল।
বসল হাজার জামশেদ ঐ উৎসবেরই আঙ্গিনায়
লাখ বাহরাম এই আসনে বসে হলো বেদখল।

৩৯

কারুর প্রাণে দুখ দিও না, করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনের শান্তি নাশি বাড়িও না তার মনস্তাপ।
অমর আশিস লাভের আশা রয় যদি, হে বন্ধু মোর,
আপনি সয়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার ছাপ।

৪০

ছেড়ে দে তুই নীরস বাজে দর্শন শাস্ত্রপাঠ,
তার চেয়ে তুই দর্শন কর প্রিয়ার বিনোদ বেণীর ঠাট ;
ঐ সোরাহির হৃদয়-রুধির নিষ্কাশিয়া পাত্রে ঢাল,
কে জানে তোর রুধির পিয়ে কখন মৃত্যু হয় লোপাট।

৪১

অজ্ঞানেরই তিমির তলের মানুষ ওরে বে-খবর !
শূন্য তোরা, বুনিয়াদ তোর গাঁথা শূন্য হাওয়ার 'পর।
ঘুরিস তরল অগাধ খাদে, শূন্য মায়ার শূন্যতায়,
পশ্চাতে তোর অতল শূন্য, অগ্রে শূন্য অসীম চর।

৪২

লয়ে শারাব-পাত্র হাতে পিই যবে তা মস্ত্ হয়ে
জ্ঞানহারা হই সেই পুলকের তীব্র ঘোর বেদন সয়ে,
কি যেন এক মন্ত্র-বলে যায় ঘটে কি অলৌকিক,
প্রোজ্জ্বল মোর জ্ঞান গলে যায় ঝর্নাসম গান বয়ে।

৪৩

'শারাব ভীষণ খারাপ জিনিস, মদ্যপায়ীর নেইকো ত্রাণ।'
ডাইনে বাঁয়ে দোষদর্শী সমালোচক ভয় দেখান—
সত্য কথাই ! যে আঙুরে, নষ্ট করে ধর্মমত,
সবার উচিত—নিঙড়ে ওরে করে উহার রক্তপান।

৪৪

আমার কাছে শোন উপদেশ—কাউকে কভু বলিসনে—
মিথ্যা ধরায় কাউকে প্রাণের বন্ধু মেনে চলিসনে।
দুঃখ ব্যথায় টলিসনে তুই, খুঁজিসনে তার প্রতিষেধ,
চাসনে ব্যথার সমব্যথী, শির উঁচু রাখ ঢলিসনে।

৪৫

মউজ চলুক। লেখার যা তা লিখল ভাগ্য কালকে তোর,
ভুলেও কেহ পুঁছল না কি থাকতে পারে তোর ওজর।
ভদ্রতারও অনুমতি কেউ নিল না অমনি ব্যস
ঠিকঠাক সব হয়ে গেল ভুগবি কেমন জীবন-ভোর।

৪৬

আমি চাহি, স্রষ্টা আবার সৃজন করুন শ্রেষ্ঠতর
আকাশ ভুবন, এই এখনি এই সে আমার আঁখির 'পর ;
সেই সাথে চাই—সৃষ্টি-খাতায় দিক কেটে সে আমার নাম,
কিংবা আমার যা প্রয়োজন তা মিটাবার দিক সে বর।

৪৭

নাস্তিক আর কাফের বলো তোমরা লয়ে আমার নাম,
কুৎসা গ্লানির পঙ্কিল স্রোত বহাও হেথা অবিশ্রাম।
অস্বীকার তা করব না যা ভুল করে যাই, কিন্তু ভাই,
কুৎসিত এই গালি দিয়েই তোমরা যাবে স্বর্গধাম ?

৪৮

বদখশানি রক্ত চুনির মতন সুরা চুঁইয়ে আন
[illegible]প্ত হিয়ার আনন্দ যা, শান্ত যাহে দগ্ধ প্রাণ।
মুসলমানের তরে শারাব হারাম না কি, সবাই কয়,
বলতে পারে তাদের কেহ—আছে কি আর মুসলমান?

৪৯

মসজিদ মন্দির গির্জায় ইহুদ-খানায় মাদ্রাসায়
রাত্রি-দিবস নরক-ভীতি স্বর্গ-সুখের লোভ দেখায়।
ভেদ জানে আর খোঁজ রাখে ভাই খোদার যারা রহস্যের
ভোলে না এই খোশ গল্পের ঘুম-পাড়ানো কল্পনায়।

৫০

এক হাতে মোর তসবি খোদার, আর হাতে মোর লাল গেলাস,
অর্ধেক মোর পুণ্য-স্নাত, অর্ধেক পাপে করল গ্রাস।
পুরোপুরি কাফের নহি, নহি খাঁটি মুসলিমও—
করুণ চোখে হেরে আমায় তাই ফিরোজা নীল আকাশ।

৫১

একমণি ঐ মদের জালা গিলব, যদি পাই তাকে,
যে জালাতে প্রাণের জ্বালা নেভাবার ওষুধ থাকে!
পুরানো ঐ যুক্তি-তর্কে দিয়ে আমি তিন তালাক,
নতুন করে করব নিকাহ আঙুর-লতার কন্যাকে।

৫২

বিষাদের ঐ সওদা নিয়ে বেড়িয়ো না ভাই শিরোপরি,
আঙুর-কন্যা সুরার সাথে প্রেম করে যাও প্রাণ ভরি।
নিষিদ্ধা ঐ কন্যা, তবু হোক সে যতই অ-সতী,
তাহার সতী মায়ের চেয়ে ঢের বেশি সে সুন্দরী।

৫৩

স্বর্গে পাব শারাব সুধা, এ যে কড়ার খোদ খোদার,
ধরায় তাহা পান করলে পাপ হয় এ কোন বিচার?
হামজা সাথে বেয়াদবি করল মাতাল এক আরব,—
তুচ্ছ কারণ—শারাব হারাম তাই হুকুমে মোস্তফার।

৫৪

রজব শাবান পবিত্র মাস বলে গোঁড়া মুসলমান,
সাবধান, এই দু' মাস ভাই কেউ কোরো না শারাব পান।
খোদা এবং তার রসুলের রজব শাবান এই দু' মাস
পান পিয়াসার তরে তবে সৃষ্ট বুঝি এ রমজান।

৫৫

শুক্রবার আজ, বলে সবাই পবিত্র নাম জুম্মা যার,
হাত যেন ভাই খালি না যায়, শারাব চলুক আজ দেদার।
এক পেয়ালি শারাব যদি পান করো ভাই অন্য দিন,
দু পেয়ালি পান করো আজ বারের বাদশা জুম্মাবার।

৫৬

মসজিদের অযোগ্য আমি, গির্জার আমি শত্রু—প্রায়;
ওগো প্রভু, কোন মাটিতে করলে সৃজন এই আমায়?
সংশয়াত্মা সাধু কিংবা ঘৃণ্য নগর-নারীর তুল
নাই স্বর্গের আশা আমার, শান্তি নাহি এই ধরায়।

৫৭

মুগ্ধ করো নিখিল হৃদয় প্রেম নিবেদন কৌশলে,
হৃদয়-জয়ী হে বীর, উড়াও নিশান প্রিয়ার অঞ্চলে।
এক হৃদয়ের সমান নহে লক্ষ মসজিদ আর 'কাবা';
কি হবে তোর তীর্থে 'কাবা'র, শান্তি খোঁজ হৃদয়-তলে।

৫৮

বিধর্মীদের ধর্মপথে আসতে লাগে এক নিমেষ,
সন্দেহেরই বিপথ-ফেরত বিবেক জাগে এক নিমেষ।
দুর্লভ এই নিমেষটুকু ভোগ করে নাও প্রাণ ভরে,
এই ক্ষণিকের আয়েশ দিয়ে জীবন ভাসে এক নিমেষ।

৫৯

হৃদয় যাদের অমর প্রেমের জ্যোতির্ধারায় দীপ্তিমান,
মসজিদ মন্দির গির্জা, যথাই করুক অর্ঘ্য দান—
প্রেমের খাতায় থাকে লেখা অমর হয়ে তাদের নাম,
স্বর্গের লোভ ও নরক-ভীতির ঊর্ধ্বে তারা মুক্ত-প্রাণ।

৬০

মদ পিও আর ফূর্তি করো—আমার সত্য আইন এই !
পাপ পুণ্যের খোঁজ রাখি না—স্বতন্ত্র মোর ধর্ম সেই।
ভাগ্য সাথে বিয়ের দিনে কইনু, 'দিব কি যৌতুক ?'
কইল বধূ, 'খুশি থাকো, তার বড় যৌতুক সে নেই।'

৬১

এক সোরাহি সুরা দিও, একটু রুটির ছিলকে আর,
প্রিয় সাকি, তাহার সাথে একখানি বই কবিতার,
জীর্ণ আমার জীবন জুড়ে রইবে প্রিয়া আমার সাথ,
এই যদি পাই চাইব নাকো তখত আমি শাহানশার।

৬২

হুরি বলে থাকলে কিছু—একটি হুরি মদ খানিক
ঘাস-বিছানো ঝর্নাতীরে, অল্প-বয়েস বৈতালিক—
এই যদি পাস, স্বর্গ নামক পুরনো সেই নরকটায়
চাসনে যেতে, স্বর্গ ইহাই, স্বর্গ যদি থাকেই ঠিক।

৬৩

যতক্ষণ এ হাতের কাছে আছে অঢেল লাল শারাব
গেহুঁর রুটি, গরম কোর্মা, কালিয়া আর শিক-কাবাব,
আর লালা-রুখ, প্রিয়া আমার কুটির-শয়ন-সঙ্গিনী,—
কোথায় লাগে শাহানশাহের দৌলৎ ঐ বে-হিসাব।

৬৪

দোষ দিও না মদ্যপায়ীর তোমরা, যারা খাও না মদ ;
ভালো করার থাকলে কিছু, মদ খাওয়া মোর হতো রদ।
মদ না পিয়েও, হে নীতিবিদ, তোমরা যে-সব করো পাপ,
তাহার কাছে আমরাও শিশু, হই না যতই মাতাল-বদ !

৬৫

খুশি-মাখা পেয়ালাতে ঐ গোলাপ-রক্ত মদ-মধুর !
মধুরতর পাখির গীতি, বেণুর ধ্বনি, বীণার সুর।
কিন্তু ঐ যে ধর্মগোঁড়া—বুঝল না যে মদের স্বাদ,
মধুরতম—রয় সে যখন অন্তত পাঁচ যোজন দূর !

৬৬

চৈতী-রাতে খুঁজে নিলাম তৃণাস্তৃত ঝর্না-তীর,
সুন্দরী এক হুরি নিলাম, পেয়ালা নিলাম লাল পানির।
আমার নামে রইল হাজার কুৎসা গ্লানির ঝড়-তুফান,
ভুলেও মনে হলো না মোর স্বর্গ নরকের নজির।

৬৭

সাকি-হীন ও শারাব-হীনের জীবনে, হায়, সুখ কী বল?
নাই ইরাকি বেণুর ধ্বনির জমজমাটি সুর-উছল
সুখ নাই ভাই সেথায় থেকে ; এই জগতের তত্ত্ব শোন,
আনন্দহীন জীবন-বাগে ফলে শুধু তিক্ত ফল।

৬৮

মরুর বুকে বসাও মেলা, উপনিবেশ আনন্দের,
একটি হৃদয় খুশি করা তাহার চেয়ে মহৎ ঢের।
প্রেমের শিকল পরিয়ে যদি বাঁধতে পারো একটি প্রাণ—
হাজার বন্দি মুক্ত করার চেয়েও অধিক পুণ্য এর।

৬৯

শারাব এবং প্রিয়ায় নিয়ে, সাকি, হেথায় এলাম ফের!
তৌবা করেও পাইনে রেহাই হাত হতে ভাই এই পাপের।
'নূহ' আর তাঁর প্লাবন-কথা শুনিয়ো নাকো আর, সাকি,
তার চেয়ে মদ-প্লাবন এনে ডুবাও ব্যথা মোর বুকের!

৭০

নৃত্য-পাগল ঝর্নাতীরে সবুজ ঘাসের ঐ ঝালর
উন্মুখ কার চুমো যেন দেব-কুমারের ঠোঁটের 'পর—
হেলায় পায়ে দলো না কেউ—এই যে সবুজ তৃণের ভিড়
হয়তো কোনো গুল-বদনীর কবর-ঢাকা নীল চাদর।

৭১

আমার ক্ষণিক জীবন হেথায় যায় চলে ঐ ত্রস্ত পায়
খরস্রোতা স্রোতাস্বতী কিংবা মরু-ঝঞ্ঝা প্রায়।
তারি মাঝে এই দু'দিনের খোঁজ রাখি না—ভাবনা নাই,
যে গত-কাল গত, আর যে আগামী-কাল আসতে চায়।

৭২

আর কতদিন সাগর-বেলায় খামকা বসে তুলব ইট !
গড় করি পায়, ধিক লেগেছে গড়ে গড়ে মূর্তি পীঠ।
ভেবো নাকো—খৈয়াম ঐ জাহান্নামের বাসিন্দা,
ভিতরে সে স্বর্গ-চারী, বাহিরে সে নরক-কীট।

৭৩

মধুর, গোলাপ-বালার গালে দখিন হাওয়ার মদির শ্বাস,
মধুর, তোমার রূপের কুহক মাতায় যা এই পুষ্পবাস।
যে গেছে কাল গেছে চলে, এলোনা তার ম্লান স্মৃতি,
মধুর আজের কথা বলো, ভোগ করে নাও এই বিলাস।

৭৪

শীত ঋতু ঐ হলো গত, বইছে বায় বসন্তেরি,
জীবন-পুঁথির পাতাগুলি পড়বে ঝরে, নাই দেরি।
ঠিক বলেছেন দরবেশ এক, 'দূষিত বিষ এই জীবন,
দ্রাক্ষার রস বিনা ইহার প্রতিষেধক নাই, হেরি।'

৭৫

'সরো'র মতন সরল তনু টাটকা-তোলা গোলাপ-তুল,
কুমারীদের সঙ্গে নিয়ে আনন্দে তুই হ মশগুল।
মৃত্যুর ঝড় উঠবে কখন, আয়ুর পিরান ছিঁড়বে তোর—
পড়ে আছে ধুলায় যেমন ঐ বিদীর্ণ-দল মুকুল !

৭৬

পল্লবিত তরুলতা কতই আছে কাননময়,
দেওদার আর থলকমলে, জানো কেন মুক্ত কয় ?
দেবদারু তরুর শত কর, তবু কিছু চায় না সে ;
থলকমলীর দশ রসনা, তবু সদা নীরব রয়।

৭৭

আমার সাথী সাকি জানে মানুষ আমি কোন্ জাতের ;
চাবি আছে তার আঁচলে আমার বুকের সুখ-দুখের।
যেমনি মেজাজ মিইয়ে আসে গেলাশ ভরে দেয় সে মদ,
এক লহমায় বদলে গিয়ে দূত হয়ে যাই দেব-লোকের।

৭৮

আরাম করে ছিলাম শুয়ে নদীর তীরে কাল রাতে,
পার্শ্বে ছিল কুমারী এক, শারাব ছিল পিয়ালাতে ;
স্বচ্ছ তাহার দীপ্তি হেরি শুক্তি-বুকে মুক্তা-প্রায়
উঠল হেঁকে প্রাসাদ-রক্ষী, 'ভোর হলো কি আধ-রাতে ?'

৭৯

মন কহে, আজ ফুটল যখন এন্তার ঐ গোলাপ গুল
শরিয়তের আজ খেলাফ করে বেদম আমি করব ভুল।
গুল-লালা-রুখ কুমারীদের প্রস্ফুটিত যৌবনে
উঠল রেঙে কানন-ভূমি লালা ফুলের কেয়ারি-তুল।

৮০

হায় রে, আজি জীর্ণ আমার কাব্য পুঁথি যৌবনের !
ধুলায় লুটায় ছিন্ন ফুলের পাপড়িগুলি বসন্তের।
কখন এসে গেলি উড়ে, রে যৌবনের বিহঙ্গম !
জানতে পেরে কাঁদছি যখন হয়ে গেছে দেরি ঢের !

৮১

আজ আছে তোর হাতের কাছে, আগামীকাল হাতের বার,
কালের কথা হিসাব করে বাড়াসনে তুই দুঃখ আর।
স্বর্গ-ক্ষরা ক্ষণিক জীবন—করিসনে আর অপব্যয়,
বিশ্বাস কি—নিশ্বাস-ভর জীবন যে কাল পাবি ধার !

৮২

হায় রে হৃদয়, ব্যথায় যে তোর ঝরছে নিতুই রক্তধার,
অন্ত যে নেই তোর এ ভাগ্য-বিপর্যয়ের, যন্ত্রণার !
মায়ায় ভুলে এই সে কায়ায় আসলি কেন, রে অবোধ !
আখেরে যে ছেড়ে যেতে হবেই এ আশ্রয় আবার !

৮৩

অর্থ বিভব যায় উড়ে সব রিক্ত করে মোদের কর,
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে মোদের মৃত্যুর নিষ্ঠুর নখর ;—
মৃত্যু-লোকের চোখ এড়িয়ে ফেরত কেহ আসল না,
যে-সব পথিক গেল সেথায় নিয়ে তাদের খোশখবর।

৮৪

পান করে যাই মদিরা তাই, শুনছি প্রাণে বেণুর রব,
শুনছি আমার তনুর তীরে যৌবনেরই মদির স্তব,
তিক্ত স্বাদের তরে সুরার করো না কেউ তিরস্কার,
ত্যক্ত মানব-জীবন সাথে মানায় ভালো তিক্তাসব।

৮৫

ব্যথার দারুণ, শারাব পিও, ইহাই জীবন চিরন্তন ;
জরায় স্বর্গ-অমৃত এ, যৌবনের এ সুখ-স্বপন।
গোলাপ, শারাব, বন্ধু লাভের মরসুম এই আনন্দের—
য'দিন বাঁচো শারাব পিও, সত্যিকারের এই জীবন।

৮৬

সুরা দ্রবীভূত চুনি, সোরাহি সে খনি তার,
এই পিয়ালা কায়া যেন, প্রাণ তার এই দ্রাক্ষাসার।
বেলোয়ারির এই পিয়ালা-ভরা তরল হাসির রক্তিমা,
কিংবা ওরা ব্যথায়-ক্ষত হিয়ার যেন রক্তাধার।

৮৭

সুরার সোরাহি এই মানুষ, আত্মা শারাব তার ভিতর ;
দেহ তাহার বাঁশরি আর তেজ যেন সেই বাঁশির স্বর।
খৈয়াম ! তুই জানিস কি এই মাটির মানুষ কোন জিনিস ?
খেয়াল-খুশির ফানুস এ ভাই, ভিতরে তার প্রদীপ-কর।

৮৮

ব্যর্থ মোদের জীবন ঘেরা কুগ্রহ সব মেঘলা প্রায়,
'জিহুন' সম স্রোত বয়ে যায় অশ্রু-সিক্ত চক্ষে, হায় !
বুকের কুণ্ঠে দুখের দাহ—তারেই আমি নরক কই,
মুহূর্তের যে মনের শান্তি—আমি বলি স্বর্গ তায়।

৮৯

মদের নেশার গোলাম আমি সদাই থাকি নুইয়ে শির,
জীবন আমি পথ রাখি ভাই প্রাসাদ পেতে তার হাসির।
শারাব-ভরা কুঁজোর টুটি জাপটে সাকি হস্তে তার
পাত্রে ঢালে, নিঠুর হাতে নিঙড়ে তাহার লাল রুধির।

৯০

পেতে যে চায় সুন্দরীদের ফুল্ল-কপোল গোলাপ ফুল
কাঁটার সাথে সইতে হবে তায় নিয়তির তীক্ষ্ণ হুল।
নিঠুর করাত চিরুনিরে কেটে কেটে তুলল দাঁত
তাই সে ছুঁয়ে ধন্য হলো আমার প্রিয়ার কেশ আকুল।

৯১

শারাব নিয়ে বসো, ইহাই মহমুদেরই সুলতানৎ,
'দাউদ' নবির শিরিন-স্বর ঐ বেণু-বীণার মধুর গৎ।
লুট করে নে আজের মধু, পূর্ণ হবে মনস্কাম।
আজকে পেয়ে ভুলে যা তুই অতীত আর ভবিষ্যৎ।

৯২

ওগো সাকি! তত্ত্বকথা চার ও পাঁচের তর্ক থাক,
উত্তর ঐ সমস্যার গো এক হোক কি একশো লাখ!
আমরা মাটির, সত্য ইহাই, বেণু আনো, শোনাও সুর!
আমরা হাওয়া, শারাব আনো! বাকি যা সব চুলোয় যাক।

৯৩

এক নিশ্বাস প্রশ্বাসের এই দুনিয়া, রে ভাই, মদ চালাও!
কালকে তুমি দেখবে না আর আজ যে জীবন দেখতে পাও।
খামখেয়ালির সৃষ্টি এ ভাই, কালের হাতে লুঠের মাল,
তুমিও তোমার আপনাকে এই মদের নামে লুটিয়ে দাও!

৯৪

কায়কোবাদের সিংহাসন আর কায়কাউসের রাজমুকুট,
তুষের রাজ্য একছিটে এই মদের কাছে সব যে ঝুট!
ধর্ম-গোঁড়ার উপাসনার কর্কশ যে প্রভাত-স্তব
তাহার চেয়ে অনেক মধুর প্রেমিক-জনের শ্বাস অস্ফুট।

৯৫

এই সে প্রমোদ-ভবন যেথায় জলসা ছিল বাহরামের,
হরিণ সেথায় বিহার করে, আরাম করে ঘুমায় শের!
চির-জীবন করল শিকার রাজশিকারি যে বাহরাম,
মৃত্যু-শিকারির হাতে সে শিকার হলো হায় আখের।

৯৬

ঘরে যদি বসিস গিয়ে 'জমহুর' আর 'আরাস্তু'র,
কিংবা রুমের সিংহাসনে কায়সর হোস শক্তি-শূর—
জামশেদিয়া জামবাটি ঐ নে শুষে রে, সময় নাই,
বাহ্‌রামও তুই হোস যদি, তোর শেষ তো গোর আঁধারপুর !

৯৭

প্রেমের চোখে সুন্দর সেই হোক কালো কি গৌর-বরণ,
পরুক ওড়না রেশমি কিংবা পরুক জীর্ণ দীন বসন।
থাকুক শুয়ে ধুলোয় সে কি থাকুক সোনার পালঙ্কে,
নরকে সে গেলেও প্রেমিক করবে সেথায় অন্বেষণ।

৯৮

খৈয়াম—যে জ্ঞানের তাঁবু করল সেলাই আজীবন,
অগ্নিকুণ্ডে পড়ে সে আজ সইছে দহন অসহন।
তার জীবনের সূত্রগুলি মৃত্যু-কাঁচি কাটল, হায় !
ঘৃণার সাথে বিকায় তারে তাই নিয়তির দালালগণ।

৯৯

সাত-ভাঁজ ঐ আকাশ এবং চার উপাদান-সৃষ্ট জীবন !
ঐ এগারোর মারপ্যাঁচে সব ধোঁওয়াস, গলিস বদ-নসিব।
যে যায় সে যায় চিরতরে, ফেরত সে আর আসবে না,
পান করে নে বলব কত, বলে বলে ক্লান্ত জিভ !

১০০

খারাব হওয়ার শারাব-খানায় ছুটছি আমি আবার আজ,
রোজ পাঁচবার আজান শুনি, পড়তে নাহি যাই নামাজ !
যেমনি দেখি উদগীব ঐ মদের কুঁজো, অমনি ভাই—
কুঁজোর মতোই উদগ্রীব হই, কণ্ঠ সটান হয় দরাজ।

১০১

এক কুঁজো—যা আমার মতো ভোগ করেছে প্রেম-দাহন,
সুন্দরীদের মাথায় থাকি পেল খোঁপার পরশন।
এই সোরাহির পার্শ্বদেশে এই যে হাতল দেখতে পাও,
পেল কতই তন্বঙ্গীর ক্ষীণ কাঁকালের আলিঙ্গন।

১০২

দ্রাক্ষা সাথে ঢলাঢলির এই তো কাঁচা বয়স তোর,
বৎস, শারাব-পাত্র নিয়ে ঠাঁয় বসে দাও আড্ডা জোর।
একবার তো নূহের বন্যা ভাসিয়েছিল জগৎখান,
তুইও না হয় ভাসিয়ে দিলি মদের স্রোতে জীবনভোর !

১০৩

সাবধান ! তুই বসবি যখন শারাব পানের জলসাতে,
মদ খাসনে বদমেজাজি নীচ কুৎসিত লোক সাথে।
রাত্তির ভর করবে সে নীচ চিৎকার আর গণ্ডগোল,
ইতর সম চেঁচিয়ে কারণ দর্শাবে ফের সে প্রাতে।

১০৪

যদিও মদ নিষিদ্ধ ভাই, যত পারো মদ চালাও,
তিনটি কথা স্মরণ রেখে : কাহার সাথে মদ্য খাও ?
মদ-পানের কি যোগ্য তুমি ? কি মদই বা করছ পান ?—
জ্ঞান পেকে না ঝুনো হলে মদ খেয়ো না একফোঁটাও !

১০৫

তোমরা—যারা পান করো মদ আর সব দিন, কিন্তু যা
পান করো না শুক্রবারে, ছুঁয়ো না শারাবের কুঁজা—
তাদের বলি—আমার মতো সব বারকে সমান জানো,
খোদার তোরা পূজারী হ, করিস নাকো বার পূজা।

১০৬

করছে ওরা প্রচার—পাবি স্বর্গে গিয়ে হুরপরি,
আমার স্বর্গ এই মদিরা; হাতের কাছের সুন্দরী।
নগদা যা পাস তাই ধরে থাক, ধারের পণ্য করিসনে,
দূরের বাদ্য মধুর শোনায় শূন্য হাওয়ায় সঞ্চরি।

১০৭

এই সে আঁধার প্রহেলিকা পারবিনে তুই পড়তে মন !
তুই কি সফল হবি যেথায় হার মেনেছে বিজ্ঞজন ?
শারাব এবং পেয়ালা নিয়ে খুশির স্বর্গ রচো হেথাই—
পাবি কি না পাবি বেহেশ্‌ত, বলতে পারে কেউ কখন ?

১০৮

দোহাই ! ঘৃণায় ফিরিয়ো না মুখ দেখে শারাব-খোর গোঁয়ার,
যদিও সাধু সজ্জনেরই সঙ্গে কাটে কাল তোমার।
শারাব পিও, কারণ শারাব পান করো আর না-ই করো,
ভাগ্যে ধার্য থাকলে নরক যায় না পাওয়া স্বর্গ আর।

১০৯

জীবন যখন কণ্ঠাগত—সমান বলখ নিশাপুর,
পেয়ালা যখন পূর্ণ হলো—তিক্ত হোক কি হোক মধুর।
ফূর্তি চালাও, নিভে যাবে হাজার তপন লক্ষ চাঁদ,
আমরা ফিরে আসব না আর এই ধরণীর পথ সুদূর !

১১০

আয় ব্যয় তোর পরীক্ষা কর ঠিক সে হিসাব করতে পেশ,
আসার বেলায় আনলি কি আর নিয়েই বা কি যাস সে দেশ।
'আনব নাকো বিপদ ডেকে শারাব পিয়ে'—কস যে তুই,
মদ খাও আর না খাও তবু মরতে তোমায় হবেই শেষ।

১১১

হঠাৎ সেদিন দেখলাম, এক কর্মরত কুম্ভকার,
করছে চূর্ণ মাটির ঢেলা, ঘট তৈরির মাল দেদার।
দিব্য দৃষ্টি দিয়ে এ-সব যেই দেখলাম, কইল মন,
নূতন ঘট এ করছে সৃজন মাটিতে মোর বাপ দাদার।

১১২

একি আজব করছ সৃষ্টি, কুম্ভকার হে, হাত থামাও !
চূর্ণ নরের মাটি নিয়ে করছ কি তা দেখতে পাও ?
কায়খসরুর হৃদয় এবং ফরিদুনের অঙ্গুলি
বে-পরোয়া হয়ে তোমার নিঠুর চাকায় মিশিয়ে যাও !

১১৩

চূর্ণ করে তোমায় আমায় গড়বে কুঁজো কুম্ভকার,
ওগো প্রিয়া ! পার হবার সে আগেই মৃত্যু-খিড়কি-দ্বার—
পাত্রে ব্যথার শান্তি ঢালো—এই সোরাহির লাল সুরা,
এক পেয়ালা তুমি পিও, আমায় দিও পেয়ালা আর।

১১৪

এই যে রঙিন পেয়ালাগুলি নিজ হাতে যে গড়ল সে
ফেলবে ভেঙে খেয়ালখুশির লীলায় এদের বিন দোষে?
এতগুলি সুষ্ঠু শোভন চটুল আঁখি চন্দ্রমুখ
প্রীতির ভরে সৃষ্টি করে করবে ধ্বংস ক্রোধবশে।

১১৫

পেয়ালাগুলি তুলে ধরো চৈতী লালা ফুলের প্রায়
ফুরসুত তোর থাকলে, নিয়ে বস লালা-রুখদিল প্রিয়ায়।
মউজ করে শারাব পিও, গ্রহের ফেরে হয়তো ভাই
উলটে দেবে পেয়ালা সুখের হঠাৎ-আসা ঝঞ্ঝাবায়।

১১৬

মসজিদ আর নামাজ রোজার থামাও থামাও গুণ গাওয়া,
যাও গিয়ে খুব শারাব পিও, যেমন করেই যাক পাওয়া!
খৈয়াম, তুই পান করে যা, তোর ধূলিতে কোন একদিন
তৈরি হবে পেয়ালা, কুঁজো, গাগরি গেলাস মদ-খাওয়া!

১১৭

মৃত্যু যেদিন নিঠুর পায়ে দলবে আমার এই পরান,
আয়ুর পালক ছিন্ন করি করবে হৃদয়-রক্ত পান,
আমায় মাটির ছাঁচে ঢেলে পেয়ালা করে ঢালবে মদ,
হয়তো গন্ধে সেই শারাবের আবার হব আয়ুষ্মান!

১১৮

রে নির্বোধ! এ ছাঁচে-ঢালা মাটির ধরা শূন্য সব,
রঙ-বেরঙ-এর খিলান-করা এই যে আকাশ—অবাস্তব।
এই যে মোদের আসা-যাওয়া জীবন-মৃত্যু-পথ দিয়ে,
একটি নিশ্বাস ইহার আয়ু, আকাশ-কুসুমের এ টব।

১১৯

তিরস্কার আর করবে কত জ্ঞান-দাম্ভিক অর্বাচীন?
লম্পট নই, পান যদিও করি শারাব রাত্রিদিন!
তোমার কাছে তসবি দাড়ি, তাপস সাজার নানান মাল,
আমার পুঁজি দিল-প্রিয়া আর লাল পেয়ালি মদ-রঙিন!

১২০

মসজিদের এ পথে ছুটি প্রায়ই আমি ব্যাকুল প্রাণ,
নামাজ পড়তে নয় তা বলে, খোদার কসম ! সত্যি মান।
নামাজ পড়ার ভান করে যাই করতে চুরি জায়নামাজ,
যেই ছিঁড়ে যায় সেখানা, যাই করতে চুরি আরেকখান।

১২১

নিত্য দিনে শপথ করি—করব তৌবা আজ রাতে,
যাব না আর পানশালাতে, ছোঁব না আর মদ হাতে।
অমনি আঁখির আগে দাঁড়ায় গোলাপ ব্যাকুল বসন্ত
সকল শপথ ভুল হয়ে যায়, কুলোয় না আর তৌবাতে।

১২২

আগে যে সব সুখ ছিল, আজ শুনি তাদের নাম কেবল,
মদ ছাড়া সব গেছে ছেড়ে আগের ইয়ার বন্ধুদল।
কেমন করে ছাড়ব—যে মদ আমায় কভু ছাড়ল না,
এক পেয়ালা আনন্দ, তাও ছাড়লে কিসে বাঁচব বল !

১২৩

আমরা শারাব পান করি তাই শ্রীবৃদ্ধি ঐ পানশালার,
এই পাপীদের পিঠ আছে তাই স্থান হয়েছে পাপ রাখার।
আমরা যদি পাপ না করি ব্যর্থ হবে তাঁর দয়া,
পাপ করি তাই ক্ষমা করে করুণাময় নাম খোদার।

১২৪

তোমার দয়ার পেয়ালা প্রভু উপচে পড়ুক আমার 'পর,
নিত্য ক্ষুধার অন্ন পেতে না যেন হয় পাততে কর।
তোমার মদে মস্ত করো আমার 'আমি'র পাই সীমা,
দুঃখে যেন শির না দুখায় অতঃপর, হে দুঃখহর !

১২৫

আমায় সৃজন করার দিনে জানত খোদা বেশ করেই
ভাবীকালের কর্ম আমার, বলতে পারত মুহূর্তেই।
আমি যে সব পাপ করি—তা ললাট-লেখা, তাঁর নির্দেশ,
সেই সে পাপের শাস্তি নরক—কে বলবে ন্যায় বিচার এই !

১২৬

দুঃখে আমি মগ্ন প্রভু, দুয়ার খোলো করুণার !
আমায় করো তোমার জ্যোতি, অন্তর মোর অন্ধকার।
স্বর্গ যদি অর্জিতে হয় এতই পরিশ্রম করে—
সে তো আমার পারিশ্রমিক, নয় সে দয়ার দান তোমার।

১২৭

দয়ার তরেই দয়া যদি, করুণাময় স্রষ্টা হন,
আদমের স্বর্গ হতে দিলেন কেন নির্বাসন?
পাপীর তরে করুণা যে—করুণা সে-ই সত্যিকার,
তাদের আবার প্রসাদ কে কয় পুণ্য করে যা অর্জন !

১২৮

আড্ডা আমার এই সে গুহা, মদ চোলাই-এর এই দোকান,
বাঁধা রেখে আত্মা হৃদয় করি হেথায় শারাব পান।
আরাম-সুখের কাঙাল নহি, ভয় করি না দুর্দশায়,
এই ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুতের ঊর্ধ্বে ফিরি মুক্ত-প্রাণ।

১২৯

দেখে দেখে ভণ্ডামি সব হৃদয় বড় ক্লান্ত, ভাই !
তুরন্ত, শারাব আনো সাকি, ভণ্ডের মুখ ভুলতে চাই !
শারাব আনো বাঁধা রেখে এই টুপি এই জায়নামাজ,
হব বক-ধার্মিক কাল, আজ তো এখন মদ চালাই।

১৩০

স্যাঙাৎ ওগো, আজ যে হঠাৎ মোল্লা হয়ে সাজলে সং !
ছাড়ো কপট তপের এ ভান, সাধুর মুখোশ এই ভড়ং।
দেবেন 'আলি-মুর্তজা' যা সাকি হয়ে বেহেশতে
পান করো সে শারাব হেথাও হুরি নিয়ে রঙ-বেরঙ।

১৩১

পানোন্মত্ত বারাঙ্গনায় দেখে সে এক শেখজী কন—
'দুরাচার আর সুরার করো দাসীপনা সর্বক্ষণ !'
'আমায় দেখে যা মনে হয়, তাই আমি'—কয় বারনারী,
'কিন্তু শেখজী, তুমি কি তাই, তোমায় দেখে কয় যা মন?'

১৩২

হাতে নিয়ে পান-পিয়ালা নামাজ পড়ার মাদুরখান—
দেখতে পেলাম ভাঁটি-খানার পথ ধরে শেখ সাহেব যান!
কইনু দেখে, 'ব্যাপার কি এ, এ পথে যে শেখ সাহেব!'
কইলেন পীর, 'ফক্কিকার এ-দুনিয়া, করো শারাব পান!'

১৩৩

কালকে রাতে ফিরছি যখন ভাঁটি-খানার পাঁড় মাতাল,
পীর সাহেবে দেখতে পেলাম, হাতে বোতল-ভরা মাল।
কইনু, 'হে পীর, শরম তোমার নেই কি?' হেসে কইল পীর,
'খোদার দয়ার ভাণ্ডার সে অফুরন্ত রে বাচাল!'

১৩৪

হে শহরের মুফতি! তুমি বিপথ-গামী কম তো নও,
পানোন্মত্ত আমার চেয়ে তুমিই বেশি বেহুঁশ হও।
মানব-রক্ত শোষো তুমি, আমি শুষি আঙুর-খুন,
রক্ত-পিপাসু কে বেশি এই দু'জনের, তুমিই কও!

১৩৫

ভণ্ড যত ভড়ং করে দেখিয়ে বেড়ায় জায়নামাজ,
চায় না খোদায়—লোকের তারা প্রশংসা চায় ধাপ্পাবাজ!
দিব্যি আছে মুখোশ পরে সাধু ফকির ধার্মিকের,
ভিতরে সব কাফের ওরা, বাইরে মুসলমানের সাজ!

১৩৬

ধূলি-ম্লান এ উপত্যকায় এলি, এসেই হলি গুম,
করল তোরে জরদগব এই সে যাওয়া আসার ধূম।
নখগুলো তোর পুরু হয়ে হয়েছে আজ ঘোড়ার খুর,
দাড়ির বোঝা জড়িয়ে গিয়ে হলো যেন গাধার দুম।

১৩৭

সুন্দরীদের তনুর তীর্থে এই যে ভ্রমণ, শারাব পান,
ভণ্ডদের ঐ বুজরুকি কি হয় কখনো তার সমান?
প্রেমিক এবং পান-পিয়াসী এরাই যদি যায় নরক,
স্বর্গ হবে মোল্লা পাদরি আচার্যদের 'দাড়ি-স্থান'!

১৩৮

এই মূঢ়দল—স্থূল তাহাদের অজ্ঞানতার ঘোর মায়ায়,
ভাবে—মানবজাতির নেতা তারাই জ্ঞান ও গরিমায়।
ফতোয়া দিয়ে কাফের করে তাদের তারা এক কথায়
শুভ্র-মুক্তবুদ্ধি যারা, নয় গর্দভ তাদের ন্যায়।

১৩৯

মার্কা-মারা রইস যত—ঈষৎ দুখের বোঝার ভার
বইতে যাঁরা পড়েন ভেঙে, বিস্ময়ের নাই অন্ত আর,
তাঁরাই যখন দীন দরিদ্রে দেখেন দ্বারে পাততে হাত
তাদের তখন চিনতে নারেন মানুষ বলে এই ধরার।

১৪০

দরিদ্রেরে যদি তুমি প্রাপ্য তাহার অংশ দাও,
প্রাণে কারুর না দাও ব্যথা, মন্দ কারুর নাহি চাও,
তখন তুমি শাস্ত্র মেনে না-ই চললে তায় বা কি!
আমি তোমায় স্বর্গ দিব, আপাতত শারাব নাও!

১৪১

জ্ঞান যদি তোর থাকে কিছু—জ্ঞানহারা হ সত্যিকার,
পান করে নে শাশ্বতী সে সাকির পাত্রে সুরার সার!
সেয়ান-জ্ঞানী! তোর তরে নয় গভীর আত্মবিস্মৃতি,
সব বোকারা জ্ঞান লভে না সত্যিকারে জ্ঞানহারার।

১৪২

যার 'পরে তোর আস্থা গভীর, এই যে বুকের বন্ধু তোর
মার্জিত জ্ঞান-চক্ষু নিয়ে দেখো এই তোর শত্রু ঘোর।
বন্ধু বেছে নিসনে রে তোর অমার্জিতের ভিড় থেকে,
ভেজিয়ে দে ভাই অন্তর-হীন অন্তরঙ্গতার এ দোর।

১৪৩

দাস হয়ো না মাৎসর্যের, হয়ো নাকো অর্থ-যখ,
ঘাড়ে যেন ভর করে না ঠুনকো যশোখ্যাতির শখ,
অগ্নি-সম প্রদীপ্ত হও, বন্যা-সম প্রাণোদ্বেল,
হয়ো নাকো পথের ধূলি, হাওয়ার হাতের ক্রীড়নক!

১৪৪

যোগ্য হাতে জ্ঞানীর কাছে ন্যস্ত করো এই জীবন,
নির্বোধদের কাছ থেকে ভাই থাকবে তফাত দশ যোজন!
জ্ঞানী হাকিম বিষ যদি দেয় বরং তাহাই করবে পান,
সুধাও যদি দেয় আনাড়ি—করবে তাহা বিসর্জন!

১৪৫

সেরেফ খেয়াল-খুশির বশে আপনজনের বক্ষে তুই
এই যে তীব্র যন্ত্রণারই ক্ষত এঁকে দিস নিতুই—
শোক কর, কাঁদ, অশান্ত তোর মনও মৃত বীর তরে,
আপন হাতে বধ করেছিস, রে অবোধ, এ শক্তি দুই।

১৪৬

ধীর চিত্তে সহ্য কর, দুঃখ-সুখের এই দাওয়াই
দুঃখ পেয়ে রুক্ষ-মেজাজ হসনে, দেখবি দুঃখ নাই!
অভাবে ক্ষয় হয় না যেন তোর স্বভাবের প্রশান্তি,
ষড়ৈশ্বর্য লাভের উপায়, আমার মতে এই সে ভাই।

১৪৭

আকাশ পানে হতাশ আঁখি চেয়ে থাকি নির্নিমিখ
'লওহ' কলম বেহেশত-দোজখ কোথায় থাকে কোন সে দিক;
অন্ধকারে পেলাম আলো, দরবেশ এক কইল শেষ—
'লওহ' কলম বেহেশত-দোজখ তোরি মাঝে—নয় অলীক।

১৪৮

দশ বিদ্যা, আট স্বর্গ, সাত গ্রহ আর নয় গগন
করল স্রষ্টা সৃষ্টি রে ভাই, দেখছে যাহা জ্ঞান-নয়ন!
চার উপাদান, ইন্দ্রিয় পাঁচ, আত্মা তিন ও দুই জগৎ—
পারল না সে সৃষ্টি করতে আরেকটি লোক মোর মতন।

১৪৯

কি হই আর কি নই আমি—মোর চেয়ে তা কে জানে?
ঊর্ধ্বে নিম্নে যাহা কিছু ভেদ আছে তার মোর প্রাণে।
একদিনে মোর এসব বিদ্যা করব জলে বিসর্জন,
শারাব পানের অধিক মহৎ—কেউ যদি তার খোঁজ আনে!

১৫০

একদা মোর ছিল যখন যৌবনেরই অহংকার
ভেবেছিলাম—গিঠ খুলেছি জীবনের সব সমস্যার।
আজকে হয়ে বৃদ্ধ জ্ঞানী বুঝেছি ঢের বিলম্বে
শূন্য হাতড়ে শূন্য পেলাম—যে আঁধারকে সে আঁধার!

১৫১

আসিনি তো হেথায় আমি আপন স্বাধীন ইচ্ছাতে,
যাবও না নিজ ইচ্ছামতো, খেলার পুতুল তাঁর হাতে।
ক্ষীণ কাঁকালে জড়িয়ে আঁচল, ঢালো সাকি বিলাও মদ,
পিয়ালাভর সেই পানিতে—ধরার কালি ধোয় যাতে।

১৫২

ঘেরা-টোপের পর্দা-ঘেরা দৃষ্টি-সীমা মোদের ভাই,
বাইরে ইহার দেখতে গেলে শূন্য শুধু দেখতে পাই।
এই পৃথিবীর আঁধার বুকে মোদের সবার শেষ আবাস—
বলতে গেলে ফুরোয় না আর বিষাদ-করুণ সেই কথাই।

১৫৩

আমার রোগের এলাজ কর পিইয়ে দাওয়াই লাল সুরা,
পাংশু মুখে ফুটবে আমার চুনির লালি, বন্ধুরা!
মরব যেদিন—লাল পানিতে ধুয়ো সেদিন লাশ আমার,
আঙুর-কাঠের 'তাবুত' করো, কবর দ্রাক্ষাদল-ঝুরা।

১৫৪

পেয়ালার প্রেম যাচঞা করো, থেমো না এক মুহূর্তও,
থাকবে হৃদয় মগজ তাজা মদ দিয়ে তায় ভিজিয়ে থোও!
আদমেরে করত প্রণাম শয়তান দু'হাজার বার—
হায় যদি সে গিলতে পেত বিন্দু-প্রণাম আঙুর-মউ।

১৫৫

অঙ্গে রক্তমাংসের এই পোশাক আছে যতক্ষণ
তকদিরের এই সীমার বাইরে করিসনে তুই পদার্পণ।
নোয়াসনে শির, 'রুস্তম' 'জাল' শত্রু যদি হয় রে তোর,
দোস্ত যদি হয় 'হাতেম-তাই' তাহারও দান নিসনে শোন।

১৫৬

কইল গোলাপ, 'মুখে আমার 'ইয়াকুত' মণি, রঙ সোনার,
গুলবাগিচার মিশর দেশে য়ুসোফ আমি রূপকুমার।'
কইনু, 'প্রমাণ আর কিছু কি দিতে পারো?' কইল সে,
'রক্ত-মাখা এই যে পিরান পরে আছি প্রমাণ তার!'

১৫৭

হৃদয় ছিল পূর্ণ প্রেমে, পেয়েছিলাম তায় একাও,
বক্ষে ছিল কথার সাগর, একটি কথা কইনি তাও।
দাঁড়িয়ে ভরা নদীর তীরে মরলাম আমি তৃষ্ণাতুর,
বিস্ময়কর এমন শহীদ দেখেছ আর কেউ কোথাও?

১৫৮

'ইয়াছিন', আর 'বয়াত' নিয়ে, সাকি রে, রাখ, তর্ক তোর!
আমায় সুরার হাত-চিঠে দাও, সেই সে সুরা 'বরাত' মোর।
যে রাতে মোর শ্রান্তি ব্যথা ডুবিয়ে দেবে মদের স্রোত,—
সেই সে 'শবে-বরাত' আমার, সেই তো আমার বরাত জোর।

১৫৯

ভূলোক আর দ্যুলোকেরই মন্দ-ভালোর ভাবনাতে,
বে-পরোয়া ঘুরে বেড়াই ভাটি-খানার আড্ডাতে।
গোলোক হয়ে পড়ত যদি মোর ঘরে ঐ যুগল লোক,
মদের নেশায় বিকিয়ে দিতাম ওদের একটা আধলাতে।

১৬০

এই নেহারি—নিবিড় মেঘে মগ্ন আছে মুখ তোমার,
একটু পরেই ঠিকরে পড়ে ভুবন-মোহন দীপ্তি তার।
মহলা দাও নিজ মহিমার নিজের কাছেই, হে বিরাট,
দ্রষ্টা তুমি, দৃশ্য তুমি তোমার অভিনয়-লীলার!

১৬১

আমরা দাবা খেলার ঘুঁটি, নাই রে এতে সন্দ নাই।
আসমানি সেই রাজ-দাবাড়ে চালায় যেমন চলছি তাই।
এই জীবনের দাবার ছকে সামনে পিছে ছুটছি সব,
খেলার শেষে তুলে মোদের রাখবে মৃত্যু-বাক্সে ভাই!

১৬২

আসমানি হাত হতে যেমন পড়বে ঘুঁটি ভাগ্যে তোর
পণ্ডশ্রম করিসনে তুই হাতড়ে ফিরে সকল দোর !
এই জীবনের জুয়াখেলায় হবেই হবে খেলতে ভাই
সৌভাগ্যের সাথে বরণ করে নে দুর্ভাগ্য তোর।

১৬৩

চাল ভুলিয়ে দেয় রানি মোর, খঞ্জন ঐ চোখ খর,
বোড়ে দিয়ে বন্দি করে আমার ঘোড়া গজ হর !
তোমার সকল বল আগিয়ে কিস্তির পর কিস্তি দাও,
শেষে লালা-রুখ দেখিয়ে 'রুখ' নিয়ে মোর, মাত করো !

১৬৪

আসমানে এক বলিবর্দ রয় 'পর্বিন' নাম তাহার
আছে আরেক বৃষভ নিচে বইতে মোদের ধরার ভার।
কাজেই, এই যে মানবজাতি—জ্ঞানীর চক্ষে হয় মালুম—
ঐ সে ভীষণ ষাঁড় যুগলের মধ্যে যেন ঝাঁক গাধার।

১৬৫

শ্রেষ্ঠ শারাব পান করে নেয় বদরসিকে, হায় রে হায় !
স্থূল-আত্মা মূর্খ ধনিক শ্রেষ্ঠ বিলাস বিভব পায়।
হায় রে যত চিত্তহারী রূপকুমারী জর্জিয়ার
শুকায় কিনা গুম্ফ-বিহীন বালক-সাথে মাদ্রাসায় !

১৬৬

রূপ লোপ এর হয় অরূপে, অস্থি ইহার হয় না নাশ।
এই মদিরা—হাজার রূপে অরূপে এর হয় প্রকাশ,
ভেবো না কেউ সুরার সাথে সুরার সারও যায় উবে,
কভু এ হয় প্রাণী কভু তরু-লতা, ফুল-সুবাস।

১৬৭

লাল গোলাপে কিস্তি দিয়ে তোমার ও গাল করে মাত,
খেলতে গিয়ে চীন-কুমারী হারে প্রিয়া তোমার সাথ।
খেলতে বাবিল-রাজার সাথে হানলে চাউনি একটিবার
মন্ত্রী ঘোড়া গজ নিলে তার হেনে ঐ এক নয়ন-পাত ?

১৬৮

তোমার-আমার কি হবে ভাই তাই ভেবে মোর ব্যাকুল মন !
মীন-কুমারী হংসীরে কয়, 'শুকাবে এই বিল যখন !'
মরালী কয়, 'কাবাব যদি হই দু'জনাই তুই আমি,
ভাসলে এ বিল মদের স্রোতে মোদের কি তায় লাভ তখন !'

১৬৯

ঘূর্ণায়মান ঐ কুগ্রহ-দল—সদাই যারা ভয় দেখায়—
ঘুরছে ওরা ভোজবাজির ঐ লণ্ঠনেরই ছায়ার প্রায়।
সূর্য যেন মোমবাতি আর ছায়া যেন পৃথ্বী এই,
কাঁপছি মোরা মানুষ যেন প্রতিকৃতি আঁকা তায় !

১৭০

ফিরনু পথিক সাগর মরু ঘোর বনে পর্বত-শিরে
এই পৃথিবীর সকল দেশে গুহায় ঘরে মন্দিরে,
শুনলাম না—ফিরছে কেউ তীর্থ-পথিক এই পথের,
আজ এ পথে যাত্রা যাহার, আসল না সে কাল ফিরে !

১৭১

দুই জনাতেই সইছি সাকি নিয়তির ভ্রূভঙ্গি ঢের,
এই ধরাতে তোমার আমার নাই অবসর আনন্দের।
তবুও মোদের মাঝে আছে মদ-পিয়ালা যতক্ষণ
সেই তো ধ্রুব সত্য, সখি, পথ দেখাবে সেই মোদের !

১৭২

স্রষ্টা মোরে করল সৃজন জাহান্নামে জ্বলতে সে,
কিংবা স্বর্গে করবে চালান—তাই বা পারে বলতে কে !
করব না ত্যাগ সেই লোভে এই শারাব সাকি দিলরুবা,
নগদার এ ব্যবসা খুইয়ে ধারে স্বর্গ কিনবে কে ?

১৭৩

দুর্ভাগ্যের বিরক্তি পান করতে যেন না হয় আর,
পানই যদি করি, পানি পান করব পান-শালার।
এই সংসারে হত্যাকারী, রক্ত তাহার লাল শারাব,
আমাদের যে খুন করে, কি ? করব না পান খুন তাহার ?

১৭৪

ওমর রে, তোর জ্বলছে হৃদয় হয়তো নরকেই জ্বলি,
তাহার বহ্নি-মহোৎসবে হয়তো হবি অঞ্জলি।
খোদায় দয়া শিখাতে যাস সেই যে তুই, কি দুঃসাহস!
তুই শিখাবার কে, তাঁহারে শিখাতে যাস কি বলি?

১৭৫

কুগ্রহ মোর! বলতে পারিস, করেছি তোর ক্ষতি কোন
সত্যি বলিস, মোর পরে তুই বিরূপ এত কি কারণ।
একটু মদের তরে এত উঞ্ছবৃত্তি তোষামোদ
এক টুকরো রুটির তরে, ভিক্ষা করাস অনুক্ষণ।

১৭৬

জল্লাদিনী ভাগ্যলক্ষ্মী, ওরফে ওগো গ্রহের ফের!
স্বভাব-দোষে চিরটা কাল নিষ্ঠুরতার টানছ জের।
বক্ষ তোমার বিদারিয়া দেখতে যদি এই ধরা
খুঁজে পেত ঐ বুকে তার হারা-মণি-মানিক ঢের।

১৭৭

ভাগ্যদেবী! তোমার যত লীলাখেলায় সুপ্রকাশ
অত্যাচারী উৎপীড়কের দাসী তুমি বারো মাস।
মন্দকে দাও লাখ নিয়ামত ভালোকে দাও দুঃখ-শোক,
বাহাত্তুরে ধরল শেষে? না এ বুদ্ধিভ্রম বিলাস?

১৭৮

সইতে জুলুম খল নিয়তির চাও বা না চাও শির নোওয়াও!
বাঁচতে হলে হাত হতে তার প্রচুরভাবে মদ্য খাও।
তোমার আদি অন্ত উভয় এই সে ধুলা-মাটির কোল,
নিম্নে নয় আর এখন তুমি ধরার ধূলির ঊর্ধ্বে ধাও।

১৭৯

মোক্ষম বাঁধ বেঁধেছে যে মোদের স্বভাব-শৃঙ্খলে,
স্বভাব-জয়ী হতে আবার আমাদেরে সেই বলে!
দাঁড়িয়ে আছি বুদ্ধি-হত তাই এ দু'য়ের মাঝখানে—
উলটে ধরবে কুঁজো কিন্তু জল যেন তার না টলে!

১৮০

মানুষ খেলার গোলক প্রায় ফিরছে ছুটে ডাইনে বাঁয়,
যেদিক পানে চলতে বলে ক্রূর নিয়ন্ত্রির হাতা তায়।
কেন হলি ভাগ্যদেবীর নিঠুর খেলার পুতুল তুই,
সেই জানে—এক সেই জানে রে, আমরা পুতুল অসহায়।

১৮১

খামকা ব্যথার বিষ খাসনে, মুষড়ে যাসনে নিরাশায়,
ফেরেব-বাজির এই দুনিয়ায় তুই ধরে থাক সত্য ন্যায়
আখেরে তো দেখলি শূন্য ফাঁস ফক্কিকার,
তুইও মায়ার পুতুল যখন—ভয় ভাবনা যাক চুলায় !

১৮২

সিন্ধু হতে বিচ্ছেদেরই দুঃখে কাঁদে বিন্দুজল,
'পূর্ণ আমি', কইল হেসে বিন্দুরে সিন্ধু অতল।
সত্য শুধু পূর্ণ, বাকি অন্য যা তা নাস্তি সব,
ঘূর্ণমান ঐ এক সে বিন্দু বহুর রূপে করছে ছল।

১৮৩

আমার রানি (দীর্ঘায়ু হন দপ্তে মারতে দাসকে তাঁর !)
হঠাৎ খেয়াল হলো, দিলেন সস্নেহ এক উপহার।
গেলেন চলে অনুগ্রহের চাউনি হেনে ! তার মানে—
'তার চেয়ে ঐ নালার জলে দাও ভাসিয়ে প্রেম তোমার।'

১৮৪

তোমার আদরিণী বধূ ছিল, প্রভু আত্মা মোর,
কাজ হতে তায় তাড়িয়ে দিলে কোন দোষে, হায় মনোচোর
পূর্বে কভু ছিলে না তো এমন কঠোর, হে স্বামী !
বিরহিনী বাস করিব প্রবাসে কি জীবনভর ?

১৮৫

যেমনি পাবি মণ দুই মদ—যেখানে হোক যদিই পাস—
অমনি পনোন্মত্ত ওরে, সে মদ-স্রোতে ডুবে যাস।
যেমনি খাওয়া অমনি হবি আমার মতো মুক্ত-প্রাণ
ভেসে যাবে রাশ-ভারি তোর ঋষির মতো দাড়ির রাশ !

১৮৬

মানব-স্বভাব জড়িয়ে বহে মন্দ-ভালোর দুই ধারা,
শুভাশুভ দুঃখ ও সুখ দান নিয়তির—কয় যারা,
তাদের বলি—অপরাধী করছে খামকা কুগ্রহে,
তোমার চেয়ে হাজার গুণ যে অসহায় সে বেচারা !

১৮৭

তোমার নিন্দা করতে সাহস করবে না আর কেউ কোথাও !
এক সে উপায় আছে যদি বিশ্বে খুশি করতে চাও
এন্তার সব শ্রদ্ধা পাবে বড় ছোট সকলকার
মুসলিম খ্রিস্টান ইহুদি সবার যশো-গাথা গাও।

১৮৮

বলতে পারো ! টক সে কেন আঙুর যখন কাঁচা রয় ?
পাকলে তার মিষ্টি রসে, তারই শারাব তিক্ত হয়।
কাঠকে কুঁদে কুঁদে যখন শিল্পী গড়ে রবাব বীণ
সেই কাঠে সেই শিল্পী বেণু গড়তে পারে ? নয় গো নয় !

১৮৯

খ্যাতির মুকুট পরলে হেথায় নিন্দা-গ্লানির পাঁক হানে,
বলবে ষড়যন্ত্রকারী বোস যদি গোরস্থানে।
'খিজির' হও আর 'ইলিয়াস' হও ; সব সে-আচ্ছা এই ধারায়
জানতে চাসনে কারেও আর তোরেও কেহ না জানে।

১৯০

খৈয়াম ! তুই কাঁদিস কেন পাপের ভয়ে অযথা ?
দুঃখ করে কেঁদে কি তোর ভরবে প্রাণের শূন্যতা ?
জীবনে যে করল না পাপ নাই দাবি তার তাঁর দয়ায়
পাপীর তরেই দয়ার সৃষ্টি, আনন্দ কর ভোল ব্যথা।

১৯১

আবার যখন মিলবে হেথায় শারাব সাকির আঞ্জামে,
হে বন্ধুদল, একটি ফোঁটা অশ্রু ফেলো মোর নামে !
চক্রাকারে পাত্র ঘুরে আসবে যখন সাকির পাশ,
পেয়ালা একটি উল্টে দিয়ো স্মরণ করে খৈয়ামে !

১৯২

বিশ্ব-দেখা জামশেদিয়া পেয়ালা খুঁজি জীবন-ভর
ফিরনু বৃথাই সাগর গিরি কান্তার বন আকাশ-ক্রোড়।
জানলাম শেষ জিজ্ঞাসিয়া দরবেশ এক মুর্শিদে—
জামশেদের সে জাম-বাটি এই আমার দেহ আত্মা মোর !

১৯৩

আকাশ যেদিন দীর্ণ হবে, আসবে যেদিন ভীম প্রলয়,
অন্ধকারে বিলীন হবে গ্রহ তারা জ্যোতির্ময়,
প্রভু আমার দামন ধরে বলব কেঁদে, 'হে নিঠুর,
নিরপরাধ মোদের কেন জন্মে আবার মরতে হয় ?'

১৯৪

হৃদয় যদি জীবনে হয় জীবনের রহস্যজয়ী,
খোদা কি, তা জানতে পারে মৃত্যুতে সে অবশ্যই।
কিন্তু তুমি থেকেই যদি শূন্য ঠেকে সব কিছুই,
তুমি যখন রইবে না কাল জানবে কি আর শূন্য বই ?

১৯৫

খৈয়াম ! তোর দিন দুয়েকের এই যে দেহের শামিয়ানা—
আত্মা নামক শাহানশাহের হেথায় ক্ষণিক আস্তানা।
তাম্বুওয়ালা মৃত্যু আসে আত্মা যখন লন বিদায়,
উঠিয়ে তাঁবু অগ্রে চলে ; কোথায় সে যায় অ-জানা।

১৯৬

পৌছে দিও হজরতেরে খৈয়ামের হাজার সালাম,
শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসিও তাঁরে লয়ে আমার নাম—
'বাদশা নবী। কাঁজি খেতে নাই তো নিষেধ শরিয়তে,
কি দোষ করল আঙুর-পানি ? করলে কেন তায় হারাম ?'

১৯৭

তত্ত্ব-গুরু খৈয়ামেরে পৌছে দিও মোর আশিস
ওর মতো লোক বুঝল কিনা উল্টো করে মোর হদিস !
কোথায় আমি বলেছি, যে, সবার তরেই মদ হারাম ?
জ্ঞানীর তরে অমৃত এ, বোকার তরে উহাই বিষ !

গানের মালা

উৎসর্গ

পরম স্নেহভাজন
শ্রীমান অনিলকুমার দাস
কল্যানীয়েষু—

শীত-জর্জর মনে এলে তুমি
নব ফাগুনের পাগল হাওয়া,
পাতা-ঝরা বন হল উন্মন
পেল যেন বহু দিনের চাওয়া।
ঘুমাত শুষ্ক শাখে শঙ্কিত
নীরব ভিরু যে গানের পাখি
তোমারে হেরিয়া পাখা ঝাপটিয়া
চমকি জাগিয়া উঠিল ডাকি।
ঝরে ঝর্ঝর মর্মর-বাণী
মুক্ত-বন্ধ ঝর্না-তীরে,
তুমি ফিরাইতে এলে সুর-পুরে
শাপ-ভ্রষ্টা উর্বশীরে।
অজ্ঞাতবাসে ছিল ফাল্গুনী,
তুমি সহদেব অনুজ সম
হাতে দিলে পুন গাণ্ডীব-ধনু
স্মরণ করালে অতীত মম !
তোমার আদরে যে ফুলগুলিরে
ফুটাইয়া তুলেছিনু নিরালা,
তাই দিয়া গাঁথি দিলাম তোমারে
আশিস আমার 'গানের মালা'।

শুভার্থী
নজরুল ইস্‌লাম

১

বেহাগ—দাদ্‌রা

আমি সুন্দর নহি, জানি হে বন্ধু জানি।
তুমি সুন্দর, তব গান গেয়ে
নিজেরে ধন্য মানি॥

আসিয়াছি সুন্দর ধরণীতে
সুন্দর যারা তাঁদেরে দেখিতে,
রূপ-সুন্দর দেবতার পায়ে
অঞ্জলি দিই বাণী॥

রূপের তীর্থে তীর্থ-পথিক
যুগে যুগে আমি আসি
ওগো সুন্দর, বাজাইয়া যাই
তোমার নামের বাঁশি॥

পরিয়া তোমার রূপ-অঞ্জন
ভুলেছে নয়ন, রাঙিয়াছে মন,
উছলি উঠুক মোর সঙ্গীতে
সেই আনন্দখানি॥

২

ভৈরবী-পিলু—কার্ফা

আধো-আধো বোল
লাজে-বাধো-বাধো বোল
বলো কানে কানে।
যে কথাটি আধো রাতে
মনে লাগায় দোল—
বলো কানে কানে॥

যে কথার কলি সখি আজও ফুটিল না
শরমে মরম-পাতে দোলে আনমনা,
যে কথাটি ঢেকে রাখে বুকের আঁচল—
বলো কানে কানে॥

যে কথা লুকায়ে থাকে লাজনত চোখে
না বলিতে যে কথাটি জানাজানি লোকে,
যে কথাটি ধরে রাখে অধরের কোল—
বলো কানে কানে॥

যে কথা বলিতে চাহ বেশভূষার ছলে,
যে কথা দেয় বলে তব তনু পলে পলে,
যে কথাটি বলিতে সই গালে পড়ে টোল—
বলো কানে কানে॥

৩

বেহাগ-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

না-ই পরিলে নোটন-খোঁপায়
ঝুমকো-জবার ফুল।
এমনি এসো লুটিয়ে পিঠে
আকুল এলোচুল॥

সজ্জা-বিহীন লজ্জা নিয়ে,
এমনি তুমি এসো প্রিয়ে,
গোলাপ ফুলে রং মাখাতে
হয় যদি হোক ভুল॥

গৌর দেহে না-ই জড়ালে
গৌরী-চাঁপা শাড়ি,
ভূষণ পরে না-ই বা দিলে
রূপের সাথে আড়ি।
যেমন আছ এমনি এসো,
নয়ন তুলে ঈষৎ হেসো,
সেই খুশিতে উঠবে দুলে
আমার হৃদয়-কূল॥

৪

সাহানা-বাহার—কাওয়ালি

অয়ি চঞ্চল-লীলায়িত-দেহা, চির-চেনা!
ফোটাও মনের বনে তুমি বকুল হেনা
চির-চেনা॥

যৌবন-মদ-গর্বিতা তন্বী
আননে জ্যোৎস্না, নয়নে বহ্নি,
তব চরণের পরশ বিনা
অশোক তরু মুঞ্জরেনা, চির-চেনা॥

নন্দন-নন্দিনী তুমি দয়িতা চির-আনন্দিতা,
প্রথম কবির প্রথম লেখা তুমি কবিতা।
নৃত্য-শেষের তব নূপুরগুলি হায়
রয়েছে ছড়ানো আকাশে তারকায়,
সুর-লোকে-উর্বশী হে বসন্ত-সেনা! চির-চেনা॥

৫

দরবারি-কানাড়া—মিশ্র একতালা

ভুল করে যদি ভালোবেসে থাকি
ক্ষমিও সে অপরাধ।
অসহায় মনে কেন জেগেছিল
ভালোবাসিবার সাধ॥
কতজন আসে তব ফুলবন—
মলয়, ভ্রমর, চাঁদের কিরণ,
তেমনি আমিও আসি অকারণ
অপরূপ উন্মাদ॥

তোমার হৃদয়-শূন্যে জ্বলিছে
কত রবি শশী তারা,
তারি মাঝে আমি ধূমকেতু-সম
এসেছিনু পথ-হারা।

তবু জানি প্রিয়, একদা নিশীথে
মনে পড়ে যাবে আমারে চকিতে,
সহসা জাগিবে উৎসব-গীতে
সকরুণ অবসাদ॥

৬

পিলু—লাউনী

ঝরাফুল-বিছানো পথে
এসো বিজন-বাসিনী।
জ্যোৎস্নায় ছড়ায়ে হাসি
এস সুচারু-হাসিনী॥

এসো জড়ায়ে তব তনুতে,
গোধূলি রামধনুতে,
পাপিয়া-পিক-কূজনে
গাহিয়া মধু-ভাষিণী॥

ছন্দ-দোদুল গতি
এস নোটন কপোতী,
বহায়ে মনের মরুতে
আনন্দ-মন্দাকিনী॥

৭

ভৈরবী—কার্ফা

প্রিয় এমন রাত যেন যায় না বৃথাই॥

পরি চাঁপা রঙের শাড়ি, খয়েরি টিপ,
জাগি বাতায়নে, জ্বালি আঁখি-প্রদীপ
মালা চন্দন দিয়ে মোর থালা সাজাই॥

তুমি আসিবে বলে সুদূর অতিথি
জাগি চাঁদের তৃষ্ণা লয়ে কৃষ্ণা-তিথি
কভু ঘরে আসি কভু বাহিরে চাই॥

আজি আকাশে বাতাসে কানাকানি,
জাগে বনে বনে নব ফুলের বাণী,
আজি আমার কথা যেন বলিতে পাই॥

৮

পিলু-খাম্বাজ—কার্ফা

আজ নিশীথে অভিসার তোমার পথে,
প্রিয়তম !
বনের পারে নিরালায় দিও হে দেখা,
নিরুপম॥
সুদূর নদীর ধারে জনহীন বালুচরে—
চখার তরে যথা একা চখী কেঁদে মরে,
সেথা সহসা আসিও গোপন প্রিয়
স্বপন সম॥
তোমার আশায় ঘুরি শত গ্রহে শত লোকে,
আমার বিরহ জাগে বিরহী চাঁদের চোখে,
অকূল পাথার নিরাশার পারায়ে এসো
প্রাণে মম॥

৯

সিন্ধুড়া—কাওয়ালি

কার মঞ্জীর রিনিঝিনি বাজে,—চিনি চিনি।
প্রাণের মাঝে সদা শুনি তারি রাগিণী—
চিনি চিনি॥
বন-শিরীষের ঝিরিঝিরি পাতায়
ধীরে ধীরে ঝিরিঝিরি নূপুর বাজায়,
তমাল-ছায়ায় বেড়ায় ঘুরে মায়া-হরিণী !
চিনি চিনি॥

আমার গানে তারি চরণের অনুরণনে
ছন্দ জাগে রসে গন্ধে রূপে বরণে।
কান পেতে রই দুয়ার-পাশে
তারি আসার আভাস আসে,
ঝঙ্কার তোলে মনের বীণায় বীণ-বাদিনী—
চিনি চিনি॥

১০

কানাড়া-একতালা

নিরুদ্দেশের পথে আমি হারিয়ে যদি যাই
(হে প্রিয়তম)
নিত্য নূতন রূপে আবার আসব এই হেথাই॥

চাঁদনি রাতের বাতায়নে রইবে চেয়ে উদাস মনে,
বলব আমি, 'হারাইনি গো, নাই ভাবনা নাই;
আকাশ-লোকে তারার চোখে তোমার প্যানে চাই।'
সাঁঝ সকালে জল নিতে যাও যে বনপথ বেয়ে—
ঝরা মুকুল হয়ে আমি সে-পথ দেবো ছেয়ে।

বাতাস হয়ে লহরে তুলে ঘোমটা মুখের দেবো খুলে,
বলবে হেসে, 'হায় কালা-মুখ, তোমার মরণ নাই?'

সত্যি আমার নাই তো মরণ তোমায় ভালোবেসে,
তোমায় আরো পাবার আশায় এলাম নিরুদ্দেশে।
কাছে কাছে ছিলাম বলে
ভুলতে আমায় পলে পলে,
শয়ন-সাথে নাই বলে আজ নয়ন-পাতে পাই।
বাহির ছেড়ে আজ পেয়েছি অন্তরেতে ঠাঁই॥

১১

খাম্বাজ-দাদরা

বল রে তোরা বল ওরে ও আকাশ-ভরা তারা!
আমার নয়ন-তারা কোথায়, কোথায় হল হারা?

দৃষ্টিতে তার বৃষ্টি হতো তোদের অধিক আলো,
আঁধার করে আমার ভুবন কোথায় সে লুকালো?
হাতড়ে ফিরি আকাশ-ভুবন পাইনে তাহার সাড়া॥

খানিক আগে মানিক আমার ছিল রে এই চোখে,
আলোর কুঁড়ি পড়ল ঝরে কোন সে গহন-লোকে।

বলিস তোরা আলোর রাজায়
তাঁহার অসীম আলোক-সভায়
কম হত কি আলো, আমার আঁখির আলো ছাড়া॥

১২

পিলু খাম্বাজ—কার্ফা

বল সখি বল ওরে সরে যেতে বল।
মোর মুখে কেন চায় আঁখি-ছলছল
ওরে সরে যেতে বল॥

পথে যেতে কাঁপে গা
শরমে জড়ায় পা,
মনে হয় সারা পথ হয়েছে পিছল।
ওরে সরে যেতে বল॥

জল নিতে গিয়ে সই
ওর চোখে চেয়ে রই,
সান-বাঁধা ঘাট যেন কাঁপে টলমল্।
ওরে সরে যেতে বল॥

প্রথম বিরহ মোর
চায় কি ও চিত-চোর?
চাঁদনি চৈতী রাতে আনে সে বাদল।
ওরে সরে যেতে বল॥

১৩

ভৈরবী—দাদ্‌রা

নিশি না পোহাতে যেয়ো না যেয়ো না
দীপ নিভিতে দাও।
নিবু নিবু প্রদীপ নিবুক হে পথিক
ক্ষণিক থাকিয়া যাও।
দীপ নিভিতে দাও॥

আজও শুকায়নি মালার গোলাপ,
আশা-ময়ূরী মেলেনি কলাপ,
বাতাসে এখনও জড়ানো প্রলাপ,
বারেক ফিরিয়া চাও।
দীপ নিভিতে দাও॥

ঢুলিয়া পড়িতে দাও ঘুমে অলস আঁখি
ক্লান্ত করুণ কায়,
সুদূর নহবতে বাঁশরি বাজিতে দাও
উদাস যোগিয়ায়।

হে প্রিয়, প্রভাতে তব রাঙা পায়
বকুল ঝরিয়া মরিতে চায়,
তব হাসির আভায় তরুণ অরুণ প্রায়
দিক রাঙিয়ে যাও।
দীপ নিভিতে দাও॥

১৪

কালাংড়া—খেমটা

চম্পা পারুল যুথী টগর চামেলা॥
আর সই সইতে নারি ফুল-ঝামেলা॥

সাজায়ে বন-ডালি
বসে রই বন-মালি
যারে জিই এ ফুল সেই হানে হেলাফেলা॥

কে তুমি মায়া-মৃগ
রতির সঙ্গিনী গো?
ফুল নিতে আসিলে এ-বনে অবেলা ॥

ফুলের সাথে প্রিয়
ফুল-মালিরে নিও,
তুমিও একা সই আমিও একেলা ॥

১৫

'কিউবান ডান্সের' সুর

দূর দ্বীপ-বাসিনী,
চিনি তোমারে চিনি।
দারুচিনির দেশের তুমি বিদেশিনী গো,
সুমন্দভাষিণী ॥

প্রশান্ত সাগরে
তুফানে ও ঝড়ে
শুনেছি তোমারি অশান্ত রাগিণী ॥

বাজাও কি বুনো সুর
পাহাড়ী বাঁশিতে?
বনান্ত ছেয়ে যায়
বাসন্তী হাসিতে ॥
তব কবরী-মূলে
নব এলাচির ফুল
দুলে কুসুম-বিলাসিনী ॥

১৬

'ইজিপসিয়ান ডান্সের' সুর

মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে
নেচে যায়।
বিহবল চঞ্চল পায় ॥

সাহারা মরুর পারে
খর্জুর-বীথির ধারে
বাজায় ঘুমুর ঝুমুর মধুর ঝঙ্কারে।
উড়িয়ে ওড়না 'লু' হাওয়ায়
পরি-নটিনী নেচে যায়
দুলে দুলে দূরে সুদূর॥

সুর্মা-পরা আঁখি হানে আসমানে,
জ্যোৎস্না আসে নীল আকাশে তার টানে।
ঢেউ তুলে নীল দরিয়ায়
দিল-দরদি নেচে যায়
দুলে দুলে দূরে সুদূর॥

দোলে রে গলে দোলে তার
খেজুর-মেতীর সোনার হার
ছন্দ-দোদুল॥
মিসরের আনন্দ সে
চপল 'রমল' ছন্দ সে,
জিয়ানো মিছরি-রসে তার হাসি অতুল॥
নারঙ্গি-আঙ্গুর-বাগে তার
গান গাহে বুলবুল॥

মরীচিকা-মায়া সে
দেয় না ধরা, ছায়া সে,
পালিয়ে সে যায় সুদূর।
যায় নেচে সে নটিনী
নীল দরিয়ার সতিনী
দুলে দুলে দূরে সুদূর॥

১৭

খাম্বাজ মিশ্র—ঠুমরী

বকুল-বনের পাখি
ডাকিয়া আর ভেঙো না ঘুম।

বকুল—বাগানে মম
ফুরায়েছে ফুলের মরসুম॥

চাঁদের নয়নে চাহি
জাগে না আর সে নেশা,
চাঁপার সুরভি-সুরায়
বিরস বিরহ-মেশা।
আজি মোর জাগার সাথী
একাকিনী নিশীথ নিঝুম॥
পিয়া মোর দূর বিদেশে,—
কারে আর ডাকিছ পাখি
শুকায়ে গিয়াছে হাতে
মালতী-মালার রাখি।
নিভিয়া গিয়াছে প্রদীপ
রেখে গেছে মলিন ধূম॥

১৮
চৈতী—কার্ফা

মনের রঙ লেগেছে
বনের পলাশ জবা অশোকে।
রঙের ঘোর জেগেছে
পারুল কনক-চাঁপার চোখে॥

মুহুমুহু বোলে কুহুকুহু কোয়েলা
মুকুলিত আমের ডালে, গাল রেখে ফুলের গালে।
দোয়েলা দোল দিয়ে যায়
ডালিম ফুলের নব কোরকে॥

ফুলের পরাগ-ফাগের রেণু
ঝুরুঝুরু ঝরিছে গায়ে ঝিরিঝিরি চৈতী বায়ে।
বকুল-বনে ঝিমায়
মধুপ মদির নেশার ঝোঁকে॥

হরিত বনে হরষিত মনে
হোরির হর্‌রা জাগে রঙ্গিলা অনুরাগে।
নূতন প্রণয় সাধ
জাগে চাঁদের রাঙা আলোকে॥

১৯

বেহাগ মিশ্র—দাদ্‌রা

আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে,
আধখানা চাঁদ নিচে
প্রিয় তব মুখে ঝলকিছে।
গগনে জ্বলিছে অগণন তারা
দুটি তারা ধরণীতে
প্রিয় তব চোখে চমকিছে॥

তড়িৎ-লতার ছিঁড়িয়া আধেকখানি
জড়িত তোমার জরির ফিতায়, রানি!
অঝোরে ঝরিছে নীল নভে বারি,
দুইটি বিন্দু তারি
প্রিয়া তব আঁখি বরষিছে॥

কত ফুল ফোটে ঝরে উপবনে,
তারি মাঝে আছে ফুটি
তোমার অধরে গোলাপ-পাপড়ি দুটি।
মধুর কণ্ঠে বিহগ বিলাপ গাহে,
গান ভুলি' তারা তব অঙ্গনে চাহে
তাহারও অধিক সুমধুর সুর তব
চুড়ি কঙ্কণে ঝনকিছে॥

২০

ইমন মিশ্র—কার্ফা

যবে সন্ধ্যা-বেলায় প্রিয় তুলসী-তলায়
তুমি করিবে প্রণাম।

তব দেবতার নাম নিতে ভুলিয়া বারেক
প্রিয় নিও মোরও নাম ॥
একদা এমনি এক গোধূলি-বেলা
একেলা ছিলাম আমি, তুমি একেলা,
জানি না কাহার ভুল, তোমার পূজার ফুল
আমি লইলাম।
সেই দেউলের পথ সেই ফুলের শপথ
প্রিয়া তুমি ভুলিলে, হায় আমি ভুলিলাম ॥

দুধারে পথের সেই কুসুম ফোটে
হায় এরা ভোলেনি,
বেঁধেছিল তরু-শাখে লতার যে ডোর
হের আজও খোলেনি।
একদা যে নীল নভে উঠেছিল চাঁদ
আজি অশ্রুবাদল সেথা ঝরে অবিরাম ॥

২১

ভৈরবী—কার্ফা

আঁখি তোলো দানো করুণা
ওগো অরুণা !
মেলি নয়ন জীর্ণ কানন
কর তরুণা ॥

আঁখি যে তোমার বনের পাখি
ঘুম সে ভাঙায় আঁধারে ডাকি
আলোক-সাগর জাগাও, বরুণা ॥

তব আনত আঁখির পাতার কোলে
তরুণ আলোর মুকুল দোলে।
রঙের কুমার দুয়ারে জাগে
তোমার আঁখির প্রসাদ মাগে,
পাণ্ডুর ভোর হোক তরুণারুণা ॥

২২

পিলু মিশ্র-কার্ফা

মদির স্বপনে মম বন-ভবনে
জাগো চঞ্চলা বাসন্তিকা, ওগো ক্ষণিকা।
মোর গগনে উল্কার প্রায়
চমকি ক্ষণেক চকিতে মিলায়
তোমার হাসির যুঁই-কণিকা।
ওগো ক্ষণিকা॥
পুষ্প-ধনু তব মন-রাঙানো
বঙ্কিম ভুরু হানো হানো।
তোমার উতল উত্তরীয়
আমার চোখে ছুঁইয়ে দিও,
মম কণ্ঠ-হারে তুমি মণিকা
ওগো ক্ষণিকা॥

২৩

চৈতী—খেমটা

মুঠি মুঠি আবীর ও কে কাননে ছড়ায়।
রাঙা হাসির পরাগ ফুল-আসনে ঝরায়॥

তার রঙের আবেশ লাগে চাঁদের চোখে,
তা'র লালসার রঙ জাগে রাঙা অশোকে।
তা'র রঙিন নিশান দুলে কৃষ্ণ-চূড়ায়॥

তা'র পুষ্পধনু দোলে শিমুল-শাখায়,
তা'র কামনা কাঁপে গো ভোমরা-পাখায়,
সে খোঁপাতে বেল ফুলের মালা জড়ায়॥

সে কুসমী শাড়ি পরায় নীল-বসনায়,
সে আঁধার মনে জ্বালে লাল রোশনাই।
সে শুকনো বুকে ফাগুন-আগুন ধরায়॥

২৪

ভৈরবী—কাওয়ালি

বল্লরী-ভুজ-বন্ধন খোলো !
অভিসার-নিশি অবসান হলো ॥

পাণ্ডুর চাঁদ হের অস্তাচলে
জাগিয়া শ্রান্ত-তনু পড়েছে ঢলে,
মিলনের মালা ম্লান বক্ষতলে,
অভিমান-অবনত আঁখি তোলো ॥

উতল সমীর আমি ক্ষণিকের ভুল,
কুসুম ঝরাই আমি ফোটাই মুকুল !

আলোকে শুকায় মোর প্রেমের শিশির,
দিনের বিরহ আমি মিলন নিশির,
হে প্রিয় ভীরু এ স্বপন-বিলাসীর
অকরুণ প্রণয় ভোলো ভোলো ॥

২৫

বারোয়াঁ—লাউনী

তব যাবার বেলা বলে যাও মনের কথা।
কেন কহিতে এসে চলে যাও চাপিয়া ব্যথা ॥

কেন এনেছিলে ফুল আঁচলে দিতে কাহারে,
কেন মলিন ধূলায় ছড়ালে সে ফুল অযথা ॥
পরি গেরুয়া শাড়ি আসিলে সাঁঝের আঁধারে
ও কি ভুল সবই ভুল, নয়নের ও বিহ্বলতা ॥

তুমি পুতুল লয়ে খেলেছ বালিকা-বেলা,
বুঝি আমারে লয়ে তেমনি খেলিলে খেলা।
তব নয়নের জল সে কি ছল, জানাইয়া যাও,
এই ভুল ভেঙে দাও সহে না এ নীরবতা ॥

২৬

চাঁচনী কেদারা—ত্রিতালী

তরুণ অশান্ত কে বিরহী।
নিবিড় তমসায় ঘন ঘোর বরষায়
দ্বারে হানিছ কর রহি রহি॥

ছিন্ন-পাখা কাঁদে মেঘ-বলাকা,
কাঁদে ঘোর অরণ্য আহত-শাখা।
চোখে আশা-বিদ্যুৎ এলে কোন্ মেঘ-দূত,
বিধুর বঁধুর মোর বারতা বহি॥

নয়নের জলে হেরিতে না পারি
বাহিরে গগনে ঝরে কত বারি।
বন্ধ কুটিরে অন্ধ তিমিরে
চেয়ে আছি কাহার পথ চাহি।

বন্ধু গো, ওগো ঝড়, ভাঙো ভাঙো দ্বার,
তব সাথে আজি নব অভিসার,
ঝরা-পল্লব-প্রায় তুলিয়া লহ আমায়
অশান্ত ও-বক্ষে হে বিদ্রোহী॥

২৭

মেঘ-মল্লার—ত্রিতালী

বরষা ঐ এল বরষা।
অঝোর ধারায় ঝরঝরি অবিরল
ধূসর নীরস ধরা হল সরসা॥

ঘন দেয়া দমকে দামিনী চমকে
ঝঞ্ঝার ঝাঁঝর ঝমঝম ঝমকে,
মনে পড়ে সুদূর মোর প্রিয়তমকে
মরাল মরালীরে হেরি সহসা॥

বেণু-বনে মৃদু মিঠে আওয়াজে
টাপুর টাপুর জল-নূপুর বাজে।
শূন্য শয্যাতলে আনমনে শুনি
সেই নূপুরের ধ্বনি অন্তর-মাঝে।

শ্যাম-সখারে মেঘ-মল্লারে
ডাকি বারেবারে তন্দ্রালসা॥

২৮

দেশ—তেতালা

ঝরে বারি গগনে ঝুরুঝুরু।
জাগি একা ভয়ে ভয়ে
নিদ নাহি আসে,
ভীরু হিয়া কাঁপে দুরু দুরু॥

দামিনী ঝলকে, ঝনকে ঘোর পবন
ঝরে ঝরঝর নীল ঘন।
রহি রহি' দূরে কে যেন কৃষ্ণা মেয়ে
মেঘ পানে ঘন হানে ভুরু॥

অতল তিমিরে বাদলের বায়ে
জীর্ণ কুটিরে জাগি দীপ নিভায়ে!
ঘন দেয়া ডাকে গুরু গুরু॥

২৯

ভাটিয়ালি—কার্ফা

আমি ময়নামতীর শাড়ি দেবো।
চলো আমার বাড়ি
ওগো ভিনগেরামের নারী॥
সোনার ফুলের বাজু দেবো চুড়ি বেলোয়ারী।
ওগো ভিনগেরামের নারী॥

বৈঁচি ফলের পৈঁচি দেবো, কলমিলতার বালা,
গলায় দেবো টাটকা-তোলা ভাঁট ফুলেরই মালা।
রক্ত-শালুক দিব পায়ে পরবে আলতা তারি।
ওগো ভিনগেরামের নারী॥

হলুদ-চাঁপার বরণ কন্যা! এস আমার নায়
সর্ষে ফুলের সোনার রেণু মাখাব ঐ গায়।
ঠোঁটে দিব রাঙা পলাশ মহুয়া ফুলের মউ,
বকুল-ডালে ডাকবে পাখি, 'বউ গো কথা কও!'
আমি সব দিব গো, যা পারি আর যা দিতে না পারি।
ওগো ভিনগেরামের নারী॥

৩০

মিয়াকি মল্লার—তেতালা

স্নিগ্ধ-শ্যাম-বেণী-বর্ণা এস মালবিকা!
অর্জুন-মঞ্জরী-কর্ণে গলে নীপ-মালিকা,—
মালবিকা॥

ক্ষীণা তন্বী জল-ভার-নমিতা,
শ্যাম জম্বু-বনে এস অমিতা!
আনো কুন্দ মালতী জুঁই ভরি থালিকা,—
মালবিকা॥

ঘন নীল বাসে অঙ্গ ঘিরে
এস অঞ্জনা রেবা-নদীর তীরে!

পরি হংস-মিথুন-আঁকা শাড়ি ঝিলিমিলি,
এস ডাগর চোখে মাখি সাগরের নীল।
ডাকে বিদ্যুৎ-ইঙ্গিতে দিগ্-বালিকা,—
মালবিকা॥

৩১

পিলু-বারোয়াঁ—কার্ফা

মেঘ-মেদুর কাঁদে হুতাশ পবন,
কে বিরহী রহি রহি দ্বারে আঘাত হানো।
শাওন ঘন ঘোর   ঝরিছে ধারা অঝোর
কাঁপিছে কুটির   মোর দীপ-নেভানো॥

বজ্রে বাজিয়া ওঠে তব সংগীত,
বিদ্যুতে ঝলকিছে আঁকি ইঙ্গিত,
চাঁচর চিকুরে তব ঝড় দুলানো॥
এক হাতে, সুন্দর, কুসুম ফোটাও!
আর হাতে, নিষ্ঠুর, মুকুল ঝরাও!

হে পথিক, তব সুর অশান্ত বায়
জন্মান্তর হতে যেন ভেসে আসে, হায়!
বিজড়িত তব স্মৃতি চেনা অচেনায়
প্রাণ-কাঁদানো॥

৩২

মিশ্র মালবশ্রী—দাদ্‌রা

আমি   অলস উদাস আনমনা।
আমি   সাঁঝ-আকাশের শান্ত নিথর
রঙিন মেঘের আলপনা॥

অলস যেমন বনের ছায়া,
নীড়ের পাখি শ্রান্ত-কায়া,
যেমন অলস তৃণের মুখে
ভোরের শিশির হিম-কণা॥

নদীর তীরে অলস রাখাল
একলা বসে রয় যেমন,
তেমনি অলস উদাস আমি
রই বসে রই অকারণ॥

যেমন অলস দিঘির জলে
থির হয়ে রয় কমল-দলে,
নিতল ঘুমে স্বপন সম
অলস আমি কল্পনা॥

৩৩

খাম্বাজ—ঠুমরী

কোয়েলা কুহু কুহু ডাকে।
নব মুকুলিত আমের শাখে॥

যাহার দরশ লাগি
একেলা কুটিরে জাগি,
মোর সাথে পাখিও কি
ডাকিছে তাহাকে॥

চাঁদিনি নিভে যায় আমার চোখে,
চাঁদে মনে পড়ে চাঁদের আলোকে॥

কুহু স্বর প্রাণে মম
বাজিতেছে তার সম,
চাঁদিনি নিশীথ মোর
বিষাদ-মেঘে ঢাকে॥

৩৪

ভৈরবী—কার্ফা

তোমার হাতের সোনার রাখি
আমার হাতে পরালে।
আমরা বিফল বনের কুসুম
তোমার পায়ে ঝরালে॥

খুঁজেছি তোমায় তারার চোখে
কত সে গ্রহে কত সে লোকে,
আজ এ তৃষিত মরুর আকাশ
বাদল-মেঘে ভরালে॥

দূর অভিমানের স্মৃতি
কাঁদায় কেন আজি গো।
মিলন-বাঁশি সহসা ওঠে
ভৈরবীতে বাজি গো।

হেনেছ হেলা দিয়েছ ব্যথা
মনে কেন আজ পড়ে সে কথা
মরণ-বেলায় কেন এ গলায়
মালার মতন জড়ালে।

৩৫

সারং মিশ্র—কাওয়ালি

বাদল-মেঘের মাদল-তালে
ময়ূর নাচে দুলে দুলে।
আকাশে নাচে মেঘের পরি
বিজলি-জরিন ফিতা পড়ে খুলে॥

কদম্ব-ডালে ঝুলনিয়া ঝুলায়ে,
বনের বেণী কেয়াফুল দুলায়ে,
তালতমাল-বনে কাজল বুলায়ে,
বর্ষারানি নাচে এলোচুলে॥

তরঙ্গ-রঙ্গে নাচে নটিনী
ভরা-যৌবন ভাদর-তটিনী,
পরি ফুলমালা নাচে বনবালা
সবুজ সুধার লহর তুলে॥

৩৬

হিন্দোল মিশ্র—তেওড়া

কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের ব্যাকুল বাঁশি।
আকাশ কাঁপে সে সুর শুনে সর্বনাশী॥

বন ঢেলে দেয় উজাড় করে
ফুলের ডালা চরণ 'পরে,
নীল গগনে আসে ছুটে মেঘের রাশি॥

বিপুল ঢেউ-এর নাগর-দোলায় সাগর দুলে,
বান ডেকে যায় শীর্ণা নদীর কূলে কূলে।

তোমার প্রলয়-মহোৎসবে
বন্ধু ওগো, ডাক্‌বে কবে?
ভাঙবে আমার ঘরের বাঁধন কাঁদন হাসি॥

৩৭

বেহাগ মিশ্র—কাওয়ালি

একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লি-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবণি॥

রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল,
আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল।
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেলো লয়ে অশনি॥

কেতকী কদম যূথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথো মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেলো চঞ্চলা বালিকা।
তড়াগে পুকুরে থইথই করে শ্যামল শোভার নবনী॥

শাপলা শালুকে সাজাইয়া সাজি শরতে শিশিরে নাহিয়া,
শিউলি-ছোপানো শাড়ি পরে ফের আগমনী-গীতি গাহিয়া।
অঘ্রানে মা গো আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরে অবনী॥

শীতের শূন্য মাঠে তুমি ফেরো উদাসী বাউল সাথে মা,
ভাটিয়ালি গাও মাঝিদের সাথে, কীর্তন শোনো রাতে মা,
ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবিরে রাঙাও নিখিল ধরণী॥

৩৮

যোগিয়া—আদ্ধা কাওয়ালি

দূর প্রবাসে প্রাণ কাঁদে
আজ শরতের ভোর হাওয়ায়।
শিশির-ভেজা শিউলি ফুলের
গন্ধে কেন কান্না পায়?

সন্ধ্যাবেলার পাখির সম
মন উড়ে যায় নীড়-পানে।
নয়ন-জলের মালা গাঁথে
বিরহিনী একলা, হায়।

কোন সুদূরে নওবতে কার
বাজে সানাই যোগিয়ায়,
টলমল টলিছে মন
কমল-পাতে শিশির-প্রায়।

ফেরেনি আজ ঘরে কে হায়
ঘরে যে তার ফিরবে না,
কেঁদে কেঁদে তারেই যেন
ডাকে বাঁশি, 'ফিরে আয়!'

৩৯

লাচ্ছাশাখ—ত্রিতালী

শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির-নির্মল
শান্ত অচঞ্চল ধ্রুব-জ্যোতি।
অশান্ত এ চিত করো হে সমাহিত
সদা আনন্দিত রাখো মতি॥

দুঃখ শোক সহি অসীম সাহসে
অটল রহি যেন সম্মানে যশে,
তোমার ধ্যানের আনন্দ-রসে
নিমগ্ন রহি হে বিশ্বপতি॥

মন যেন না টলে খল কোলাহলে
হে রাজ-রাজ !

অন্তরে তুমি নাথ সতত বিরাজো।
বহে তব ত্রিলোক ব্যাপিয়া, হে গুণী,
ওঙ্কার-সংগীত-সুর-সুরধুনী,
হে মহামৌনী, যেন সদা শুনি
সে সুরে তোমার নীরব আরতি॥

৪০

ভূপালী মিশ্র—কার্ফা

দোলে প্রাণের কোলে প্রভুর নামের মালা।
সকাল সাঁঝে সকল কাজে জপি সে নাম নিরালা॥

সেই নাম বসন ভূষণ আমারি,
সেই নামে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারি,
সেই নাম লয়ে বেড়াই কেঁদে
সেই নামে আবার জুড়াই জ্বালা॥

সেই নামেরই নামাবলি গ্রহ তারা রবি শশী
দোলে গগন-কোলে।
মধুর সেই নাম প্রাণে সদা বাজে,
মন লাগে না সংসার-কাজে,
সে নামে সদা মন মাতোয়ালা॥

আদর সোহাগ মান অভিমান আপন মনে
তার সাথে,
কাঁদায়ে কাঁদি, পায়ে ধরে সাধি,
কভু করি পূজা, কভু বুকে বাঁধি,
আমার স্বামী সে ভুবন-উজালা॥

৪১

মার্চের সুর

শঙ্কাশূন্য লক্ষকণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ।
পুণ্য-চিত্ত মৃত্যু-তীর্থ-পথের যাত্রী কই॥

আগে জাগে বাধা ও ভয়,
ও ভয়ে ভীত নয় হৃদয়
জানি মোরা হবই হব জয়ী॥

জাগায়ে প্রাণে প্রাণে নব আশা,
ভাষাহীন মুখে ভাষা,
রে নবীন, আন নব পথের দিশা,
নিশিশেষের ঊষা,
কেহ নাই দেশে মানুষ তোমরা বই॥

স্বর্গ রচিয়া মৃত্যুহীন—
চল ওরে কাঁচা চল নবীন,
দৃপ্ত চরণে নৃত্য দোল জাগায়ে মরুতে রে বেদুঈন!
'নাই নিশি নাই' ডাকে শুভ্র দীপ্ত দিন।
নাই ওরে ভয় নাই,
জাগে ঊর্ধ্বে দেবী জননী শক্তিময়ী॥

৪২

মার্চের সুর

চল রে চপল তরুণ-দল বাঁধন-হারা।
চল অমর সমরে, চল্ ভাঙি কারা
জাগায়ে কাননে নব পথের ইশারা॥

প্রাণ-স্রোতের ত্রিধারা বহায়ে তোরা
ওরে চল।

জোয়ার আনি মরা নদীতে
পাহাড় টলায়ে মাতোয়ারা॥

ডাকে তোরে মায়ার ঘোরে জননী তোর,
'ওরে ফিরে আয় ফিরে ঘরে !'
তারে ভোল ওরে ভোল
তোরা যে ঘর-ছাড়া ॥

তাজা প্রাণের মঞ্জরী ফুটায়ে পথে
তোরা চল,
রহে কে ভুলি ছেঁড়া পুঁথিতে
তাদের পরানে জাগা সাড়া ॥

রণ-মাদল মন মাতায় ঘন বাজে গুরু গুরু।
আঁধার ঘরে কে আছে পড়ে
তাদের দুয়ারে দে রে নাড়া ॥

৪৩

মার্চের সুর

বীরদল আগে চল
কাঁপাইয়া পদভারে ধরণী টলমল।
যৌবন-সুন্দর চিরচঞ্চল ॥

আয় ওরে আয় তালে তালে পায়ে পায়ে
আশা জাগায়ে নিরাশায়।
আয় ওরে আয় প্রাণহীন মরুভূমে
আয় নেমে বন্যার ঢল ॥

ঝঞ্ঝায় বাজে রণ-মাদল
চল চল
ভোল ভোল জননীর স্নেহ-অঞ্চল ॥

ডাকে বিধুর প্রিয়া সুদুর
ভোল তারে ডাকে তোরে তূর্য-সুর।
দল দল পায় ভয় ভাবনায়
শ্মশানে জাগা প্রাণ
আপন-ভোলা পাগল ॥

৪৪

মিশ্র সুর—একতালা

জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারত-মাতা॥

তোমার স্নেহ যায় বয়ে মা শত ধারায় নদীর স্রোতে,
ঘরে ঘরে সোনার ফসল ছড়িয়ে পড়ে আঁচল হতে,
স্নিগ্ধ-ছায়া মাটির বুকে তোমার শীতল-পাটি পাতা॥

স্বর্গের ঐশ্বর্য লুটায় তোমার ধূলি-মাখা পথে,
তোমার ঘরে নাই যাহা মা, নাই কো তাহা ভূ-ভারতে।
ঊর্ধ্বে আকাশ নিম্নে সাগর গাহে তোমার বিজয়-গাথা॥

আদি জগদ্ধাত্রী তুমি জগতেরে প্রথম প্রাতে
শিক্ষা দিলে দীক্ষা দিলে, করলে মানুষ আপন হাতে।
তোমার কোলের লোভে মাগো রূপ ধরে আসেন বিধাতা॥

ছেলের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়ালি মা যাদের ডেকে,
তারাই দিল তোর ললাটে চির-দাসীর তিলক এঁকে,
দেখে-শুনে হয় মা মনে, নেই কো বিচার, নেই বিধাতা॥

৪৫

ভূপালী—দাদরা

কে পরাল মুণ্ডমালা
আমার শ্যামা মায়ের গলে।
সহস্র-দল জীবন-কমল
দোলে রে যাঁর চরণ-তলে॥

কে বলে মোর মা-কে কালো,
মায়ের হাসি দিনের আলো,
মায়ের আমার গায়ের জ্যোতি
গগন-পবন-জলে-স্থলে॥

শিবের বুকে চরণ যাঁহার
কেশব যাঁরে পায় না ধ্যানে,
শব নিয়ে সে রয় শ্মশানে
কে জানে কোন অভিমানে।

সৃষ্টিরে মা রয় আবরি,
সেই মা নাকি দিগম্বরী?
(তাঁরে) অসুরে কয় ভয়ঙ্করী
ভক্ত তাঁয় অভয় বলে॥

৪৬

নটনারায়ণ—কেওড়া

নাচে রে মোর কালো মেয়ে
নৃত্য-কালি শ্যামা নাচে।
নাচ হেরে তার নটরাজও
পড়ে আছে পায়ের কাছে॥

মুক্তকেশী আদুল্ গায়ে
নেচে বেড়ায় চপল পায়ে,
মার চরণে গ্রহতারা নূপুর হয়ে জড়িয়ে আছে॥

ছন্দ-সরস্বতী দোলে পুতুল হয়ে মায়ের কোলে;
সৃষ্টি নাচে, নাচে প্রলয়, মায়ের আমার পায়ের তলে।

আকাশ কাঁপে নাচের ঘোরে,
ঢেউ খেলে যায় সাত সাগরে,
সেই নাচনের পুলক দোলে ফুল হয়ে রে লতায় গাছে॥

৪৭

দরবারি-কানাড়া-মিশ্র—রূপক

মাতল গগন-অঙ্গনে ঐ
আমার রণ-রঙ্গিণী মা।

সেই মাতনে উঠল দুলে
ভূলোক দ্যুলোক গগন-সীমা॥

আঁধার-অসুর-বক্ষপানে
অরুণ আলোর খড়গ হানে,
মহাকালের ডম্বরুতে
উঠল বেজে মার মহিমা॥

সৃষ্টি প্রলয় যুগল নূপুর
বাজে শ্যামার যুগল পায়ে,
গড়িয়ে পড়ে তারার মালা
উল্কা হয়ে গগন-গায়ে।

লক্ষ গ্রহের মুণ্ডমালা দোলে গলে দোলে ঐ,
বজ্র-ভেরীর ছন্দ-তালে নাচে শ্যামা তাথৈ থৈ!
অগ্নি-শিখায় ঝলকে ওঠে
খড়্গ-ঝরা লাল শোণিমা॥

৪৮

আনন্দ-ভৈরবী—দাদ্‌রা

দেখে যা রে রুদ্রাণী মা
হয়েছে আজ ভদ্রকালি।
শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে
শ্মশান-মাঝে শিব-দুলালী॥

আজ প্রশান্ত সিন্ধুতে রে
অশান্ত ঝড় থেমেছে রে,
মা'র কালো রূপ উপচে পড়ে
ছাপিয়ে গগন-ডালি॥

আজ অভয়ার ওষ্ঠে জাগে
শুভ্র করুণ শান্ত হাসি,
আনন্দে তাই বিষাণ ফেলে
মহেন্দ্র ঐ বাজায় বাঁশি।

ঘুমিয়ে আছে বিশ্ব-ভুবন
মায়ের কোলে শিশুর মতন,
(মায়ের) পায়ের লোভে মনের বনে
ফুল ফুটেছে পাঁচ-মিশালি ॥

৪৯

দুর্গা—গীতাঙ্গী

মহাকালের কোলে এসে গৌরী আমার হলো কালী ॥
মুখে তাহার পড়ুক কালি
(মাকে) কালো বলে যে দেয় গালি ॥

মায়ের অমন রূপ কি হারায়?
(সে যে) ছড়িয়ে আছে চন্দ্র-তারায়;
মায়ের রূপের আরতি হয়
নিত্য সূর্য-প্রদীপ জ্বালি ॥

ভৈরবেরে বরণ করে উমা হলো ভৈরবী,
মা অভিমানে শ্মশানবাসী শিবের জটায় জাহ্নবী!

পার্বতী মোর পাগলি মেয়ে
চণ্ডী সেজে বেড়ায় খেয়ে,
শ্মশান-চিতার ভস্ম মেখে
ম্লান হলো মা'র রূপের ডালি ॥

৫০

বারোয়াঁ—দাদরা

শ্মশান-কালীর নাম শুনে রে ভয় কে পায়?
মা যে আমার শবের মাঝে শিব জাগায় ॥

আনন্দেরই নন্দিনী সে,
অমৃত নীল-কণ্ঠ-বিষে,
চরণ শোভে অরুণ আলোর লাল জবায় ॥

চার হাতে তার চার যুগেরই খঞ্জনী
নৃত্য-তালে নিত্য ওঠে রণ্‌ঝনি।

অন্নদা মোর নিল তুলি
সাধ করে রে ভিক্ষা-ঝুলি,
পায় না ধ্যানে যোগীন্দ্র সেই যোগ-মায়ায়॥

৫১

ভৈরোঁ—দাদ্‌রা

জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী।
জাগো শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণা-তিথির তিমির অপসারি॥

ডাকে বসুদেব দেবকী ডাকে
ঘরে ঘরে, নারায়ণ, তোমাকে!
ডাকে বলরাম শ্রীদাম সুদাম
ডাকিছে যমুনা-বারি॥

হরি হে, তোমায় সজল নেত্রে
ডাকে পাণ্ডব কুরুক্ষেত্রে।
দুঃশাসন-সভায় দ্রৌপদী
ডাকিছে লজ্জাহারী॥

মহাভারতের হে মহাদেবতা,
জাগো জাগো, আনো আলোক-বারতা!
ডাকিছে গীতার শ্লোক অনাগতা
বিশ্বের নর-নারী॥

৫২

ধানী মিশ্র—কাওয়ালি

লুকোচুরি খেলতে হরি হার মেনেছে আমার সনে।
লুকাতে চাও বৃথাই হে শ্যাম, ধরা পড়ো ক্ষণে ক্ষণে॥

গহন মেঘে লুকাতে চাও, অমনি চরণ-ছোঁওয়া লেগে
যে পথে ধাও সে পথ ওঠে ইন্দ্রধনুর রঙে রেঙে,
চপল হাসি চমকে বেড়ায় বিজলিতে নীল গগনে॥

রবি-শশী-গ্রহ-তারা তোমার কথা দেয় প্রকাশি,
ঐ আলোতে হেরি তোমার তনুর জ্যোতি মুখের হাসি।
হাজার কুসুম ফুটে ওঠে যেমনি লুকাও শ্যামল বনে॥

মনের মাঝে যেমনি লুকাও, মন হয়ে যায় অমনি মুনি,
ব্যথায় তোমার পরশ যে পাই, ঝড়ের রাতে বংশী শুনি,
দুষ্টু তুমি দৃষ্টি হয়ে থাক আমার এই নয়নে॥

৫৩
(গ্রীষ্ম)
কামোদ-শ্রী—দাদরা

খর রৌদ্রের হোমানল জ্বালি
তপ্ত গগনে জাগি।
রুদ্র তাপস সন্ন্যাসী বৈরাগী॥

সহসা কখন বৈকালী ঝড়ে
পিঙ্গল মম জটা খুলে পড়ে,
যোগী শঙ্কর প্রলয়ঙ্কর
জাগে চিত্তে ধেয়ান ভাঙি॥

শুষ্ক কণ্ঠে শ্রান্ত ফটিকজল,
ক্লান্ত কপোত কাঁদায় কানন-তল,
চরণে লুটায় তৃষিতা ধরণী
আমার শরণ মাগি॥

৫৪
(বর্ষা)
মেঘ-ত্রিতালী

শ্যামা তন্বী আমি মেঘ-বরণা।
মোর দৃষ্টিতে বৃষ্টির ঝরে ঝরনা॥

অম্বরে জলদ–মৃদঙ্গ বাজাই,
কদম–কেয়ায় বন–ডালা সাজাই,
হাসে শস্যে কুসুমে ধরা নিরাভরণা॥

পূবালি হাওয়ায় ওড়ে কালো কুন্তল,
বিজলি ও মেঘ–মুখে হাসি, চোখে জল।
রিমিঝিমি নেচে যাই চল–চরণা॥

৫৫

(শরৎ)

রামকেলি—কার্ফা

মম আগমনে বাজে আগমনীর সানাই।
সহসা প্রভাতে 'আমি এসেছি' জানাই॥

আমি আনি দেশে দশ–ভুজার পূজা,
কোজাগরী নিশি জাগি আমি অনুজা।

বুকে শাপলা কমল—
মালা দোলে টলমল
আমি পরদেশী বন্ধুরে স্বদেশে আনাই॥

৫৬

হৈমন্তী—তেওড়া

উত্তরীয় লুটায় আমার
ধানের ক্ষেতে হিমলে্ হাওয়ায়।
আমার চাওয়া জড়িয়ে আছে
নীল আকাশের সুনীল চাওয়ায়॥

ভাঁটির শীর্ণ নদীর কূলে
আমার রবি–ফসল দুলে,
নবান্নেরই সুঘ্রাণে মোর
চাষির মুখে টপ্পা গাওয়ায়॥

৫৭

যোগিয়া—একতালা

ওরে ও স্রোতের ফুল !
ভেসে ভেসে হায় এলি অসহায়
কোথায় পথ-বেভুল ॥

কোল খালি করে কোন লতিকার
নিভাইয়া নয়নের জ্যোতি কার,
বনের কুসুম অকূল পাথারে
খুঁজিয়া ফিরিস কূল ॥

ভবনের স্নেহ নারিল রাখিতে
ঠেলে ফেলে দিল যারে,
সারা ভুবনের স্নেহ কি কখনো
তাহারে ধরিতে পারে ?

জল নয়, তোর জননী যে ভুঁই,
অভিমানী ! সেথা চল ফিরে তুই,
ধূলিতেও যদি ঝরিস্ সেথায়
স্বর্গ সেই অতুল ॥

৫৮

জয়জয়ন্তী—একতালা

বুনো ফুলের করুণ সুবাস ঝুরে
নাম-না-জানা গানের পাখি, তোমার গানের সুরে ॥

জানাতে হায় এলে কোথা
বনের ছায়ার মনের ব্যথা,
তরুর স্নেহ ফেলে এলে মরুর বুকে উঠে ॥

এলে চাঁদের তৃষ্ণা নিয়ে কৃষ্ণা তিথির রাতে,
পাতার বাসা ফেলে এসে সজল নয়ন-পাতে।

ওরে পাখি, তোর সাথে হায়
উড়তে নারি দূর অলকায়,
বন্ধনে যে বাঁধা মলিন মাটি পুরে॥

৫৯

কাজরী—লাউনী

এল শ্যামল কিশোর,
তমাল-ডালে বাঁধো ঝুলনা।
সুনীল শাড়ি পরো ব্রজ-নারী
পরো নব নীপ-মালা অতুলনা।
তমাল-ডালে বাঁধো ঝুলনা॥

ডাগর চোখে কাজল দিও,
আকাশি-রঙ পরো উত্তরীয়,
নব-ঘন-শ্যামের বসিয়া বামে
দুলে দুলে বলিব, 'বঁধু, ভুলো না!'
তমাল-ডালে বাঁধো ঝুলনা॥

নৃত্য-মুখর আজি মেঘলা দুপুর,
বৃষ্টির নূপুর বাজে টুপুর টুপুর।

বাদল-মেঘের তালে বাজিছে বেণু,
পাণ্ডুর হল শ্যাম মাখি কেয়া-রেণু
বাহুতে দোলনায় বাঁধিবে শ্যামরায়
বলিব, 'হে শ্যাম, এ বাঁধন খুলো না!'
তমাল-ডালে বাঁধো ঝুলনা॥

৬০

ইমন মিশ্র—কাহারবা

এল এল রে বৈশাখী ঝড়।
ঐ বৈশাখী ঝড় এল এল মহীয়ান সুন্দর।
পাংশু মলিন ভীত কাঁপে অম্বর, চরাচর, থরথর॥

ঘন বন-কুন্তলা বসুমতী
সভয়ে করে প্রণতি,
(সভয়ে) নত চরণে ভীতা বসুমতী।
সাগর-তরঙ্গ-মাঝে
তারি মঞ্জীর যেন বাজে,
বাজে রে পায়ে গিরি-নির্ঝর—
ঝরঝর ঝরঝর॥

ধূলি-গৈরিক নিশান দোলে
ঈশান-গগন-চুম্বী,
ডম্বরু ঝল্লরী ঝনঝন বাজে,
এল ছন্দ বন্ধ-হারা
এল মরু-সঞ্চয়,
বিজয়ী বীরবর॥

৬১

যোগিয় মিশ্র—দাদ্‌রা

ঘুমাও, ঘুমাও! দেখিতে এসেছি,
ভাঙিতে আসিনি ঘুম।
কেউ জেগে কাঁদে, কারো চোখে নামে
নিঁদালির মরসুম॥

দেখিতে এলাম হয়ে কুতূহলি
চাঁপা ফুল দিয়ে তৈরি পুতলি,
দেখি, শয্যায় স্তূপ হয়ে আছে
জ্যোৎস্নার কুঙ্কুম।
আমি নয়, ঐ কলঙ্কী চাঁদ
নয়নে হেনেছে চুম॥

রাগ করিয়ো না, অনুরাগ হতে
রাগ আরো ভালো লাগে,
তৃষ্ণাতুরের কেউ জল চায়
কেউ বা শিরাজি মাগে!

মনে করো, আমি ফুলের সুবাস,
চোর জ্যোৎস্না, লোলুপ বাতাস,
ইহাদের সাথে চলে যাব প্রাতে
অগোচর নিঝঝুম॥

৬২

বেহাগ মিশ্র—দাদ্‌রা

কলঙ্ক আর জ্যোৎস্নায়-মেশা
তুমি সুন্দর চাঁদ।
জাগালে জোয়ার ভাঙিলে আমার
সাগর-কূলের বাঁধ॥

তিথিতে তিথিতে সুদূর অতিথি
ভোলাও জাগাও ভুলে-যাওয়া স্মৃতি,
এড়াইতে গিয়ে পরানে জড়াই
তোমার রূপের ফাঁদ॥

চাহি না তোমায়, তবু তোমারেই
ভাবি বাতায়নে বসি,
আমার নিশীথে তুমিই এনেছ
শুক্লা চতুর্দশী।

সুন্দর তুমি, তবু ভয় মনে
আছে কলঙ্ক জ্যোৎস্নার সনে,
মুখোমুখি বসি কাঁদে তাই বুকে
সাধ আর অবসাদ॥

৬৩

ছায়ানট—একতালা

শূন্য এ বুকে পাখি মোর
আয় ফিরে আয় ফিরে আয়।

তোরে না হেরিয়া সকালের ফুল
অকালে ঝরিয়া যায়॥

তুই নাই বলে ওরে উন্মাদ
পাণ্ডুর হলো আকাশের চাঁদ,
কেঁদে নদী-জল করুণ বিষাদ
ডাকে, 'আয় তীরে আয় !'

আকাশে মেলিয়া শত শত কর
খোঁজে তোরে তরু, ওরে সুন্দর।
তোর তরে বনে উঠিয়াছে ঝড়
লুটায় লতা ধুলায়॥

তুই ফিরে এলে, ওরে চঞ্চল,
আবার ফুটিয়া বনে ফুল-দল,
ধূসর আকাশ হইয়া সুনীল
তোর চোখের চাওয়ায়॥

৬৪

ভৈরবী—দাদরা

তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন-পাতে।
তুমি কান্না পাওয়াও কাননকে গো
ফুল-ঝরা প্রভাতে॥

তুমি ভৈরবী সুর উদাস বিধুর
অতীত দিনের স্মৃতি সুদূর,
তুমি ফোটার আগের ঝরা মুকুল
বৈশাখী হাওয়াতে॥

তুমি কাশের ফুলের করুণ হাসি
মরা নদীর চরে,
তুমি শ্বেত-বসনা অশ্রুমতী
উৎসব-বাসরে।

তুমি মরুর বুকে পথ-হারা
গোপন ব্যথার ফল্গু-ধারা,
তুমি নীরব বীণা বাণীহীনা।
সঙ্গীত-সভাতে।

৬৫

মালকৌষ মিশ্র—দাদরা

রাত্রি-শেষের যাত্রী আমি
যাই চলে যাই একা।
শুকতারাতে রইল আমার
চোখের জলের লেখা॥

ফোটার আগে ঝরল যে ফুল
সঙ্গী আমার সেই সে মুকুল,
ছায়াপথে জাগে আমার
বিদায়-পদ-রেখা॥

অনেক ছিল আশা আমার
অনেক ছিল সাধ,
ব্যর্থ হলো না পেয়ে কার
আঁখির পরসাদ।

অনেক রাতে ঘুমের ঘোরে
এস না আর খুঁজতে মোরে,
তারার দেশে চন্দ্রলোকে
হবে আবার দেখা॥

৬৬

আশাবরী—দাদরা

ফুলের মতন ফুল্ল মুখে
দেখছি একি ভুল।

হাসির বদল দুলছে সেথায়
অশ্রুকণার দুল॥

রোদের দাহে বালুচরে
মরা নদী কেঁদে মরে,
গাইতে এসে কাঁদছে বসে
বাণ-বেঁধা বুলবুল॥

ভোর গগনে পূর্ণ চাঁদের
এমনি মলিন-মুখ,
ঝড়ের কোলে এমনি দোলে
প্রদীপ-শিখার বুক।

ম্লান-মাধুরী মালার ফুলে
এমনি নীরব কান্না দুলে,
করুণ তুমি বিসর্জনের
দেবীর সমতুল॥

৬৭

ভৈরবী—কার্ফা

ফিরে ফিরে কেন তারই স্মৃতি
মোরে কাঁদায় নিতি
যে ফিরিবে না আর।
ফিরায়েছি যায় কাঁদাইয়া হায়
সে কেন কাঁদায় মোরে বারেবার॥

তার দেওয়া ফুলমালা যত দলিয়াছি পায়
সেই ছিন্নমালা কুড়ায়ে নিরালা
আজি রাখি হিয়ায়।
বারেবারে ডাকি প্রিয় নাম ধরে তার॥

হানি অবহেলা যারে দিয়াছি বিদায়
আজি তারেই খুঁজি, সে কোথায় সে কোথায়।

জ্বালি নয়ন-প্রদীপ জাগি বাতায়নে,
নিশি ভোর হয়ে যায় বৃথা জাগরণে,
আজি স্বর্গ শূন্য মোর তার বিহনে,
কাঁদি আকাশ বাতাস মরে করে হাহাকার ॥

৬৮

জয়জয়ন্তী মিশ্র—দাদরা

আঁধার রাতের তিমির দুলে আমার সামনে।
দুলে গো আমার ঘুমে জাগরণে ॥

হুতাশ-ভরা বাতাস বহে
আমার কানে কি কথা কহে,
দিনগুলি মোর যায় যে ঝরে
ঝরা পাতার সনে ॥

গিয়াছে চলি, সুখের যাহারা ছিল গো সাথী,
গিয়াছে নিভে জ্বলিতেছিল যে শিয়রে বাতি।

স্মৃতির মালার ফুল শুকাইয়া
একে একে হায় পড়িছে ঝরিয়া,
বিদায় বেলায় শুনি যে বাঁশি ক্ষণে ক্ষণে ॥

৬৯

ভৈরবী মিশ্র—দাদরা

(আগমনী)

দশ হাতে ঐ দশ দিকে মা
ছড়িয়ে এল আনন্দ।
ঘরে ফেরার বাজল বাঁশি
বইছে বাতাস সুমন্দ।
আনন্দ রে আনন্দ ॥

আমার মায়ের মুখের হাসি
শরৎ-আলোর কিরণ রাশি,
কমল-বনে উঠছে ভাসি
মায়ের গায়ের সুগন্ধ।
আনন্দ রে আনন্দ॥

উঠছে বেজে দিগ্বিদিকে ছুটির মাদল মৃদঙ্গ,
মনে আজি নাই ঠিকানা, যেন বনের কুরঙ্গ।

দেশান্তরী ছেলে-মেয়ে
মায়ের কোলে এল ধেয়ে,
শিশির-নীরে এল নেয়ে
স্নিগ্ধ অকাল-বসন্ত।
আনন্দ রে আনন্দ॥

৭০

বাউল-ভাটিয়ালি মিশ্র—দাদ্‌রা

(আগমনী)

মা এসেছে মা এসেছে
উঠ্‌ছে কলরোল।
দিকে দিকে উঠল বেজে
সানাই কাঁসর ঢোল॥

ভরা নদীর কূলে কূলে,
শিউলি শালুক পদ্মফুলে—
মায়ের আসার আভাস দুলে,
আনন্দ-হিল্লোল।
সেই-পুলকে পড়ল নিটোল
নীল আকাশে টোল॥

বিনা-কাজের মাতন রে আজ কাজে দে ভাই ক্ষমা,
বে-হিসাবি করব খরচ সাধ যা আছে জমা।

এক বছরের অতৃপ্তি ভাই
এই ক'দিনে কিসে মিটাই,
কে জানে ভাই ফিরব কিনা
আবার মায়ের কোল।
আনন্দে আজ আনন্দকে
পাগল করে তোল॥

৭১

বেহাগ খাম্বাজ—দাদ্‌রা

ঐ কাজল-কালো চোখ
আদি কবির আদি রসের
যেন দু'টি শ্লোক।
ঐ কাজল-কালো চোখ॥

পুষ্প-লতায় পত্র-পুটে
দু'টি কুসুম আছে ফুটে
সেই আলোকে রেঙে উঠে
বনের গহন লোক (গো)
আমার মনের গহন লোক॥

রূপের সায়র সাঁতরে বেড়ায়
পানকৌড়ি পাখি
ঐ কাজল-কালো আঁখি।
মদির আঁখির নীল পেয়ালায়
শারাব বিলাও নাকি,
মদালসা সাকি!

তারার মতো তন্দ্রাহারা
তোমার দুটি আঁখি-তারা
আমার চোখে চেয়ে চেয়ে
অশ্রু-সজল হোক॥

৭২

পাহাড়ী-কার্ফা

ও কালো বউ ! যেয়ো না আর যেয়ো না আর
জল আনিতে বাজিয়ে মল।
তোমায় দেখে শিউরে ওঠে
কাজলা দিঘির কালো জল ॥

দেখে তোমার কালো আঁখি
কালো কোকিল ওঠে ডাকি,
তোমার চোখের কাজল মাখি
হয় সজল ঐ মেঘ-দল ॥

তোমার কালো রূপের মায়া
দুপুর রোদে শীতল ছায়া,
কচি অশথ পাতায় টলে
ঐ কালো রূপ টলমল ॥

ভাদর মাসের ভরা ঝিলে
তোমার রূপের আদল মিলে,
তোমার তনুর নিবিড় নীলে
আকাশ করে ঝলমল ॥

৭৩

বসন্ত মিশ্র—দাদ্‌রা

আগের মতো আমের ডালে বোল ধরেছে বৌ।
তুমি শুধু বদ্‌লে গেছ, আগের মানুষ নও ॥

তেমনি আজো তোমার নামে
উথ্‌লে মধু গোলাপ-জামে,
উঠ্‌ল পুরে জামরুলে রস মহুল ফুলে মউ।
তুমিই শুধু বদ্‌লে গেছ, আগের মানুষ নও ॥

ডালিম-দানায় রঙ লেগেছে, ডাঁশায় নোনা আতা,
তোমার পথে বিছায় ছায়া ছাতিম তরুর ছাতা।

তেমনি আজো নিমের ফুলে
ঝিম হয়ে ঐ ভ্রমর দুলে,
হিজল-শাখায় কাঁদছে পাখি বউ গো কথা কও।
তুমিই শুধু বদলে গেছ, আগের মানুষ নও॥

৭৪

ভাটিয়ালি-কার্ফা

তোর রূপে সই গাহন করে জুড়িয়ে গেল গা।
তোর গাঁয়েরই নদীর ঘাটে বাঁধলাম মোর না॥

তোর চরণের আলতা লেগে
পরান আমার উঠল রেঙে,
তোর বাউরি-কেশে জড়িয়েছে মন, চলতে চায় না পা॥

তোর বাঁকা ভুরু বাঁকা আঁখি বাঁকা চলন, সই,

উড়ে এলি দেশান্তরী
তুই কি ডানা-কাটা পরী?
তুই শুকতারারই সতিনী সই, সন্ধ্যাতারার জা॥

৭৫

মার্চ-সংগীত

ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান, ঘন-বজ্রে বিষাণ বাজে।
জাগো জাগো তন্দ্রা-অলস রে, সাজো সাজো রণ-সাজে॥

দিকে দিকে ওঠে গান, অভিযান অভিযান!
আগুয়ান আগুয়ান হও ওরে আগুয়ান
ফুটায়ে মরুতে ফুল-ফসল।

জড়ের মতন বেঁচে কি ফল?
কে রবি পড়ে লাজে॥

বহে স্রোত জীবন-নদীর,
চল চঞ্চল অধীর,
তাহে ভাসিবি কে আয়,
দূর সাগর ডেকে যায়।
হবি মৃত্যু-পাথার পার
সেথা অনন্ত প্রাণ বিরাজে॥

পাঁওদল রণে চল চল রণে চল
মরুতে ফুটাতে পারে ঐ পদতল
প্রাণ-শতদল।

বিঘ্ন-বিপদে করি সহায়
না-জানা-পথের যাত্রী আয়,
স্থান দিতে হবে আজি সবায়
বিশ্ব-সভা-মাঝে॥

৭৬

বাউল-লোফা

আমার প্রাণের দ্বারে ডাক দিয়ে কে যায়
বারেবারে।
তার নূপুর-ধ্বনি রিনিঝিনি বাজে
বন-পারে॥

নিঝুম রাতে ঘুমাই যবে
সে ডাকে আমায় বেণুর রবে,
স্বপন-কুমার আসে স্বপন-অভিসারে॥

যবে জল নিতে যাই নদীতটে একলা
নাম ধরে সে ডাকে,
ধরতে গেলে পালিয়ে সে যায়
বন-পথের বাঁকে।

বিশ্ব-বধূর মনোচোরা
ধরতে সে চায়, দেয় না ধরা,
আমি তারি স্বয়ম্বরা
সঁপেছি প্রাণ তারে ॥

৭৭

পরজ-বসন্ত—তেতালা

এল ঐ বনান্তে পাগল বসন্ত।
বনে বনে মনে মনে রঙ সে ছড়ায় রে,
চঞ্চল তরুণ দুরন্ত ॥

বাঁশিতে বাজায় সে বিধুর
পরজ-বসন্তের সুর,
পাণ্ডু-কপোল জাগে রঙ নব অনুরাগে
রাঙা হলো ধূসর দিগন্ত ॥

কিশলয়ে পর্ণে অশান্ত
ওড়ে তার অঞ্চল-প্রান্ত
পলাশ-কলিতে তার ফুল-ধনু লঘু-ভার
ফুলে ফুলে হাসি-অফুরন্ত ॥

এলোমেলো দখিনা মলয় রে
প্রলাপ বকিছে বনময় রে
অকারণ মনোমাঝে বিরহের বেণু বাজে
জেগে ওঠে বেদনা ঘুমন্ত ॥

৭৮

সিন্ধু-ভৈরবী মিশ্র—দাদ্‌রা

সহসা কি গোল বাধাল পাপিয়া আর পিকে।
গোলাপ ফুলের টকটকে রঙ চোখে লাগে ফিকে ॥

নাই বৃষ্টি বাদল ওলো
দৃষ্টি কেন ঝাপসা হলো?
অশ্রু-জলের ঝালর দোলে চোখের পাতার চিকে ॥

পলাশ-কুঁড়ির লাল আখরে বনের দিকে দিকে
আমার মনের গোপন কথা কে গেল সই লিখে।
মনের আমার পাইনে লো খেই,
কে যেন নেই, কী যেন নেই,
কে বনবাস দলি আমার মনের বাসন্তীকে॥

৭৯

ভজন

এস কল্যাণী, চির আয়ুষ্মতী!
তব নির্মল করে জ্বালো ভবন-প্রদীপ
জ্বালো জ্বালো জ্বালো সতী॥

মঙ্গল-শঙ্খ বাজাও বাজাও অয়ি অয়ি সুমঙ্গলা!
সকল অকল্যাণ সকল অমঙ্গল করো দূর শুভ-সমুজ্জ্বলা!
এস মাটির কুটিরে দূর আকাশের অরুন্ধতী॥

এস লক্ষ্মী গৃহের, আঁকো অঙ্গনে সুমঙ্গল আলপনা,
তব পুণ্য-পরশ দিয়ে ধুলি-মুঠিরে করো গো সোনা।

স্নান-শুদ্ধা তুমি পূজা-দেউলে যবে করো আরতি,
আনত আকাশ যেন তব চরণে করে প্রণতি।
তব কুণ্ঠিত গুণ্ঠন-তলে
চির-শান্তির ধ্রুবতারা জ্বলে,
সংসার-অরণ্যে ধ্যান-মগ্না তুমি তপতী স্নিগ্ধজ্যোতি॥

৮০

ভজন

দাও শৌর্য দাও ধৈর্য হে উদার নাথ
দাও দাও প্রাণ।

দাও অমৃত মৃত-জনে
দাও ভীত-চিত জনে শক্তি অপরিমাণ
হে সর্বশক্তিমান॥

দাও স্বাস্থ্য দাও আয়ু
স্বচ্ছ আলো মুক্ত বায়ু,
দিও চিত্ত অ-নিরুদ্ধ দাও শুদ্ধ জ্ঞান
হে সর্বশক্তিমান॥

দাও দেহে দিব্যকান্তি
দাও গেহে নিত্য শান্তি,
দাও পুণ্য প্রেম ভক্তি মঙ্গল-কল্যাণ।
হে সর্বশক্তিমান॥

ভীতি-নিষেধের ঊর্ধ্বে স্থির
রহি যেন চির-উন্নত শির,
যাহা চাই যেন জয় করে পাই
গ্রহণ না করি দান
হে সর্বশক্তিমান॥

৮১
ভৈরবী—দাদরা

চাঁদের দেশের পথ-ভোলা ফুল চন্দ্রমল্লিকা।
রঙ-পরিদের সঙ্গিনী তুই
অঙ্গে চাঁদের রূপ-শিখা॥

ঊষর ধরায় আস্‌লি ভুলে
তুষার দেশের রঙ্গিনী,
হিমেল দেশের চন্দ্রিকা তুই
শীত-শেষের বাসন্তিকা॥

চাঁদের আলো চুরি করে
আনলি তুই মুঠি ভরে,

দিলাম চন্দ্র-মল্লিকা নাম
তাই তোরে আদর করে।

ভঙ্গিমা তোর গরব-ভরা,
রঙ্গিমা তোর হৃদয়-হারা,
ফুলের দলে ফুলরানি তুই
তোরেই দিলাম জয়টিকা॥

৮২

হোরি

রঙ্গিলা আপনি রাধা
(হরি) তারে হোরির রঙ দিয়ো না।
ফাগুনের রানিরে, শ্যাম,
আর ফাগে রাঙিয়ো না॥

রাঙা আবির রাঙা ঠোঁটে
গালে ফাগের লালী ফোটে,
রঙ-সায়রে নেয়ে উঠে
অঙ্গে ঝরে রঙের সোনা॥

অনুরাগ-রাঙা মনে
রঙের খেলা ক্ষণে ক্ষণে,
অন্তরে যার রঙের লীলা
(তারে) বাহিরের রঙ লাগিয়ো না॥

৮৩

কালাংড়া—খেমটা

কুঙ্কুম আবির ফাগের
লয়ে থালিকা
খেলিছে 'রসিয়া' হোরি
ব্রজ-বালিকা॥

হোরির অনুরাগে
যমুনায় দোলা লাগে,
রাঙা কুসুম হানে
শ্যামে মাধবিকা ॥

রঙের গাগরিতে
রঙিলা ঘাগরিতে
হোরির মাতন লাগায়
নাগর-নাগরিকা ॥

জেগেছে রঙের নেশা
মাধবী মধু-মেশা
মনে বনে দোলে
রাঙা ফুল-মালিকা ॥

৮৪

ভৈরবী-পিলু—কাওয়ালি

এল ফুল-দোল ওরে এল ফুল-দোল
আনো রঙ-ঝারি।
পলাশ-মঞ্জরী পরি অলকে
এস গোপ-নারী ॥

ঝরিছে আকাশে রঙের ঝরনা,
শ্যামা ধরণী হলো আবির-বরণা,
ত্যাজি গৃহ-কাজ এস চল-চরণা
ডাকে গিরিধারী ॥

পরাগ-আবির হানে বনবালা
সুরের পিচকারি হানিছে কুহু,
রঙিন স্বপন ঝরে রাতের ঘুমে
অনুরাগ-রঙ ঝরে মনে মুহুমুহু।

রাঙে গিরি-মল্লিকা রঙিন বর্ণে,
রাতের আঁচল ভরে জ্যোছনার স্বর্ণে,
কুলের কালি সখি দেবে ধুয়ে
রাঙা পিচকারি॥

৮৫

মাঢ় মিশ্র—কার্ফা

যাবার বেলায় ফেলে যেয়ো একটি খোঁপার ফুল।
আমার চোখে চেয়ে যেয়ো একটু চোখের ভুল॥

অধর কোণের ঈষৎ হাসির ক্ষণিক আলোকে
রাঙিয়ে যেয়ো আমার মনের গহন কালোকে,
যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে দুলিয়ে যেয়ো দুল॥

একটি কথা কয়ে যেয়ো, একটি নমস্কার,
সেই কথাটি গানের সুরে গাইব বারেবার
হাত ধরে মোর বন্ধু ভুলো একটু মনের ভুল॥

৮৬

মার্চের সুর

জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী
জাগো জাগো!
ঐ পোহাল তিমির রাত্রি।
জাগো জাগো॥

দ্রিম দ্রিম দ্রিম রণ-ডঙ্কা
শোনো বোলে, নাহি শঙ্কা!
আমাদের সঙ্গে নাচে রণ-রঙ্গে
দনুজ-দলনী বরাভয়-দাত্রী॥

অসম্ভবের পথে আমাদের অভিযান,
যুগে যুগে করি মোরা মানুষেরে মহীয়ান।
আমরা সৃজিয়া যাই
নূতন যুগ ভাই,
আমরা নবতম ভারত-বিধাত্রী॥

সাগরে শঙ্খ ঘন ঘন বাজে,
রণ-অঙ্গনে চল কুচ্‌কাওয়াজে,
বজ্রের আলোকে মৃত্যুর মুখে
দাঁড়াব নির্ভীক উগ্র সুখে।
ভারত-রক্ষী মোরা নব শাস্ত্রী॥

৮৭

ভীম-পলশ্রী-মিশ্র—দাদরা

ডেকো না আর দূরের প্রিয়া
থাকিতে দাও নিরালা।
কি হবে হায় বিদায়-বেলায়
এনে সুধার পিয়ালা॥

সুখের দেশের পাখি তুমি
কেন এলে এ বনে,
আজ এ বনে জাগে শুধু
কণ্টকের স্মৃতির জ্বালা॥

মরুর বুকে কি ঘোর তৃষা
বুঝিবে কি মেঘ-পরি,
মিটিবে না আমার তৃষা
ঐ আঁখি-জলে বালা॥

আঁধার ঘরের আলো তুমি
আমি রাতের আলেয়া,
ভোলো আমায় চিরতরে,
ফিরিয়া নাও এ ফুল-মালা॥

৮৮

জংলা—দাদ্‌রা

ভেঙো না ভেঙো না ধ্যান
হে মম ধ্যানের দেবতা।
পূজা লহ অর্ঘ্য লহ
কয়ো না কয়ো না কথা॥

পাষাণ-মুরতি তুমি
পাষাণ হইয়া থাকো,
মন্দির-বেদি হতে
ধরার ধুলায় নেমো নাকো,
তুমিও মাটির মানুষ
বুঝায়ে দিও না ব্যথা॥

সহিব সকলি স্বামী
হেনো হেলা ব্যথা দিও,
সহিবে না অপমান
আমার ভালবাসার, প্রিয়!
থাকো তুমি প্রাণের মাঝে
তোমার মন্দির যথা॥

৮৯

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ

যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম
সকলি নিয়ো হে স্বামী
যত সাধ আশা প্রীতি ভালোবাসা
সঁপিনু চরণে আমি॥

পুতুল-খেলায় মায়ার ছলনায়
ভুলাইয়া প্রভু রেখেছিলে আমায়,
ভুলেছি সে খেলা, আজি অবেলা
তোমার দুয়ারে থামি॥

ধরে রাখি যারে আমার বলিয়া,
সহসা কাঁদায়ে যায় সে চলিয়া,
অনিমেষ-আঁখি তুমি ধ্রুবতারা
জাগো দিবস যামী॥

৯০

দেশ-খাম্বাজ—কাওয়ালি

মোর বুক-ভরা ছিল আশা
ছিল প্রাণ-ভরা ভালোবাসা।
হায় আসিল সে যবে কাছে
মোর মুখে সরিল না ভাষা॥

আমি পেয়েছিনু তায় একা,
তার চোখে ছিল প্রেম-লেখা,
তবু বলিতে নারিনু, প্রাণে
মোর কাঁদিছে কোন দুরাশা॥

আমি পান না করিনু বারি
এসে ভরা সরসীর তীরে,
হায় আমার মতন 'শহিদ'
কেহ দেখেছে কোথাও কি রে?
এই তৃষ্ণা-কাতর বুকে ছিল
মরুভূমির পিপাসা॥

৯১

হাম্বীর মিশ্র—কাহারবা

বনে মোর ফুল-ঝরার বেলা।
জাগিল একি চঞ্চলতা। (অবেলায়)
এল ঐ শুকনো ডালে ডালে
কোন্ অতিথির ফুল-বারতা। (এল ঐ)

বিদায়-নেওয়া কুহু সহসা এল ফিরে,
জোয়ার ওঠে দুলে মরা নদীর তীরে,
শীতের বনে বহে দখিনা হাওয়া ধীরে
জাগায়ে বিধুর মধুর ব্যথা॥ (পরানে)

বেল-কুঁড়ির মালা পরে তেমনি করে
কৈশোরের প্রিয়া এল কি রূপ ধরে?
হারানো সুর আজি কণ্ঠে ওঠে ভরে,
লাজ ভুলে বধূ কহিল কথা॥ (বাসরে)

রুদ্ধ বাতায়ন খুলে দে, চেয়ে দেখি—
হেনার মঞ্জরী আবার ফুটেছে কি?
হারানো মানসী ফিরেছে লয়ে কি
গত বসন্তের বিহ্বলতা॥

৯২

পাহাড়ি মিশ্র—কার্ফা

মিলন-রাতের মালা হব তোমার অলকে।
সজল কাজল-লেখা হব আঁখির পলকে॥

জলকে যাওয়ার কলস হব অলস সন্ধ্যায়,
ছল করে গো অঙ্গে তোমার পড়ব ছলকে॥

তাম্বুল রাগ হব তোমার অরুণ অধরে,
দুলবে স্বপন-কমল হয়ে ঘুমের সায়রে,
জ্যোতি হব তোমার রূপের বিজলি-ঝলকে॥

বক্ষে তোমার হার হব গো নূপুর চরণে,
গোপন প্রেমের দাগ হব গো হিয়ার ফলকে॥

৯৩

ভীমপলশ্রী—কার্ফা

যায় ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে দেহের কূলে
কে চঞ্চল দিগঞ্চলা,
মেঘ-ঘন-কুন্তলা।
দেয় দোলা সে দেয় দোলা
পুব-হাওয়াতে বনে বনে দেয় দোলা॥

চলে নাগরী দোলে ঘাগরী,
কাঁখে বর্ষা-জলের গাগরি,
বাজে নূপুর সুর-লহরী—
রিমিঝিম রিম ঝিম রিম ঝিম
চল-চপলা॥

দেয়ার তালে কেয়া কদম নাচে,
ময়ূর-ময়ূরী নাচে তমাল-গাছে,
চাতক চাতকী নাচে।
এলায়ে মেঘ-বেণী কাল-ফণী
আসিল কি
দেব-কুমারী নন্দন-পথ-ভোলা॥

৯৪

কাজরী-লাউনী

কাজরী গাহিয়া চলো গোপ-ললনা।
শ্রাবণ-গগনে দোলে মেঘ-দোলনা॥

পরো সবুজ ঘাগরি চেলি নীল ওড়না,
মাখো অধরে মধুর হাসি, চোখে ছলনা॥

কদম-চন্দ্রহার পরে এস চন্দ্রাবলী,
তমাল-শাখা-বরণা এস বিশাখা-শ্যামলী।
বাজায় করতাল দূরে তাল-বনা॥

লাবণি-বিগলিতা এস সকরুণ ললিতা,
যমুনা-কূলে এস ব্রজবধূ কুল-ভীতা
অলকে মাখিয়া নব জল-কণা॥

৯৫
কাফি মিশ্র—ঠুংরি

তরুণ-তমাল-বরণ এস শ্যামল আমার।
ঘন শ্যাম তুলি বুলায়ে মেঘ-দলে
এস দুলায়ে আঁধার॥

কাঁদে নিশীথিনী তিমির-কুন্তলা
আমারি মতো সে উতলা,
এস তরুণ দুরন্ত ভাঙি হৃদয়-দুয়ার॥

তপ্ত গগনে ঘনায়ে ঘন দেয়া,
ফুটায়ে কদম কেয়া
আমার নয়ন-যমুনায় এস জাগায়ে জোয়ার॥

বুলবুল
দ্বিতীয় খণ্ড

বুলবুল : দ্বিতীয় খণ্ড

১

নৌরোচকা—তেতালা

বুলবুলি নীরব নার্গিস-বনে
ঝরা বন-গোলাপের বিলাপ শোনে॥

শিরাজের নওরোজ ফাল্গুন মাসে
যেন তার প্রিয়ার সমাধির পাশে
তরুণ ইরান কবি কাঁদে নিরজনে॥

উদাসীন আকাশ থির হয়ে আছে
জল-ভরা মেঘ লয়ে বুকের কাছে।

সাকির শারাবের পিয়ালার 'পরে
সকরুণ অশ্রুর বেলফুল ঝরে
চেয়ে আছে ভাঙা চাঁদ মলিন আননে॥

২

পূরবী-তেতালা

বিদায়ের বেলা মোর ঘনায়ে আসে।
দিনের চিতা জ্বলে অস্ত-আকাশে॥

দিনশেষে শুভদিন এলো বুঝি মম,
মরণের রূপে এলে মোর প্রিয়তম,
গোধূলির রঙে তাই দশদিশি হাসে॥

দিন গুনে নিরাশার পথ চাওয়া ফুরালো,
শ্রান্ত এ জীবনের জ্বালা আজ জুড়ালো।
ওপার হইতে কে এলো তরী বাহি'
হেরিলাম সুন্দরে, আর ভয় নাহি।
আঁধারের পারে তার চাঁদমুখ ভাসে॥

৩

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই
কেন মনে রাখ তারে।
ভুলে যাও তারে ভুলে যাও একেবারে॥

আমি গান গাহি আপনার দুখে,
তুমি কেন আসি দাঁড়াও সুমুখে,
আলেয়ার মতো ডাকিও না আর
নিশীথ-অন্ধকারে॥

দয়া কর, মোরে দয়া কর, আর
আমারে লইয়া খেলো না নিঠুর খেলা ;
শত কাঁদিলেও ফিরিবে না সেই
শুভলগনের বেলা।

আমি ফিরি পথে, তাহে কার ক্ষতি,
তব চোখে কেন সজল মিনতি,
আমি কি ভুলেও কোনোদিন এসে
দাঁড়ায়েছি তব দ্বারে॥
ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে॥

৪

আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেব না ভুলিতে।
আমি বাতাস হইয়া জড়াইব কেশে, বেণী যাবে যবে খুলিতে॥

তোমার সুরের নেশায় যখন
ঝিমাবে আকাশ কাঁদিবে পবন,
রোদন হইয়া আসিব তখন তোমার বক্ষে ঝুরিতে॥

আসিবে তোমার পরমোৎসবে কত প্রিয়জন কে জানে,
মনে পড়ে যাবে—কোন্ সে ভিখারি পায়নি ভিক্ষা এখানে
তোমার কুঞ্জ-পথে যেতে হায়!
চমকি থামিয়া যাবে বেদনায়,
দেখিবে, কে যেন মরে মিশে আছে তোমার পথের ধূলিতে॥

৫

সবার কথা কইলে কবি, নিজের কথা কহ।
(কেন) নিখিল ভুবন অভিমানের আগুন দিয়ে দহ।
নিজের কথা কহ॥
কে তোমারে হানল হেলা, কবি!
সুরে সুরে আঁক কি গো সেই বেদনার ছবি?
কার বিরহ রক্ত ঝরায় বক্ষে অহরহ!
নিজের কথা কহ॥

কোন্ ছন্দোময়ীর ছন্দ দোলে তোমার গানে গানে,
তোমার সুরের স্রোতে বয়ে যায় কাহার প্রেমের টানে গো
কাহার চরণ পানে?

কাহার গলায় ঠাঁই পেল না বলে
(তব) কথার মালা ব্যথার মত প্রতি হিয়ায় দোলে।
(তোমার) হাসিতে যে বাঁশি বাজে, সে ত তুমি নহ!
নিজের কথা কহ॥

৬

ওরে ডেকে দে দে লো, মহুয়া-বনে ফুল ফোটাত
বাজিয়ে বাঁশি কে।

বনের হরিণ নাচাত, পাখিকে গান গাওয়াত, ঢেউ ওঠাত
ঝর্নাজলে—পাহাড়তলাতে॥

তার গানের কথা জানিয়ে দিত ফুলের মধুকে,
(তার) সুরের নেশা করত ব্যাকুল মনের বঁধুকে গো
মনের বঁধুকে
বুকের মাঝে বাজত নূপুর চপল হাসিতে লো
তার চপল হাসিতে॥

আঁধার রাতে ফোটাত সে হলুদ গাঁদার ফুল
সে বন কাঁদাত, মন কাঁদাত, কাজ করাত ভুল লো
কাজ করাত ভুল।

আর সে বাঁশি শুনি না
ধোঁয়ার ছলে কাঁদি না,
আর রাঙা শাড়ি পরি না,
নোটন খোঁপা বাঁধি না,
আমি রইতে নারি না হেরে সেই বন-উদাসীকে লো
বন-উদাসীকে॥

৭

নয়ন-ভরা জল গো তোমার আঁচল-ভরা ফুল।
ফুল নেবো না অশ্রু নেবো, ভেবে হই আকুল॥

ফুল যদি নিই তোমার হাতে
জল রবে গো নয়ন-পাতে,
অশ্রু নিলে ফুটবে না আর প্রেমের মুকুল॥

মালা যখন গাঁথ তখন পাওয়ার সাধ যে জাগে,
মোর বিরহে কাঁদ যখন আরো ভালো লাগে।
পেয়ে তোমায় যদি হারাই
দূরে দূরে থাকি গো তাই,
(তাই) ফুল ফুটায়ে যাই গো চলে চঞ্চল বুলবুল॥

৮

আমি চাঁদ নহি, চাঁদ নহি অভিশাপ।
শূন্য গগনে আজো নিরাশায় আকাশে করি বিলাপ॥

শত জনমের অপূর্ণ সাধ লয়ে
(আমি) গগনে কাঁদি গো ভুবনের চাঁদ হয়ে,
জোছনা হইয়া ঝরে গো আমার অশ্রু বিরহ-তাপ॥

কলঙ্ক হয়ে বুকে দোলে মোর তোমার স্মৃতির ছায়া,
এত জোছনায় ভুলিতে পারি না তোমার মধুর মায়া।

কোন সে সাগর-মন্থন শেষে মোরে
জড়াইয়া যেন উঠেছিলে প্রেমভরে,
(হায়) তুমি গেছ চলে, বুকে তবু দোলে তব অঙ্গের ছাপ॥

৯

আমি আছি বলে দুখ পাও তুমি, অই আমি যাব চলে।
এবার ঘুমাও, প্রদীপের কাজ শেষ হয়ে গেছে জ্বলে॥
আর আসিবে না কোনো অশান্তি,
আর আসিবে না ভয়ের ভ্রান্তি,
আর ভাঙিব না ঘুম নিশীথে গো, জাগো প্রিয়া জাগো বলে॥
হয়তো আবার সুদূর শূন্য-আকাশে বাজিবে বাঁশি,
গোপীচন্দন-গন্ধ আসিবে বাতায়ন-পথে ভাসি।
চম্পার ডালে বিরহী পাপিয়া
পিয়া পিয়া বলে উঠিবে ডাকিয়া,
বৃন্দাবন কি ভাসিবে আবার সেদিন রোদন-যমুনা-জলে॥

১০

আর অনুনয় করিবে না কেউ কথা কহিবার তরে।
আর দেখিবে না স্বপন রাতে গো কেহ কাঁদে হাত ধরে॥

তব মুখ ঘিরে মোর দুনয়ন
ভ্রমরের মতো করিবে না জ্বালাতন,
তব পথ আর পিছল হবে না আমার অশ্রু ঝরে॥

তোমার ভুবনে পড়িবে না আর কোনোদিন ছায়া মম,
তোমার পূর্ণ চাঁদের তিথিতে আসিব না রাহু-সম।

আর শুনিবে না করুণ কাতর
এই ক্ষুধাতুর ভিখারির স্বর,
আর শুনিবে না কাহারও রোদন রাতের আকাশ ভরে॥

১১

মোরা আর-জনমে হংস-মিথুন ছিলাম নদীর চরে।
যুগলরূপে এসেছি গো আবার মাটির ঘরে॥

তমালতরু চাঁপা-লতার মতো
জড়িয়ে কত জনম হল গত,
সেই বাঁধনের চিহ্ন আজো জাগে হিয়ার থরে থরে॥

বাহুর ডোরে বেঁধে কারে ঘুমের ঘোরে যেন
ঝড়ের বন-লতার মতো লুকিয়ে কাঁদ কেন?

বনের কপোত, কপোতাক্ষীর তীরে
পাখায় পাখায় বাঁধা ছিলাম নীড়ে,
চিরতরে হল ছাড়াছাড়ি
(কোন) নিঠুর ব্যাধের শরে॥

১২

গভীর রাতে জাগি' খুঁজি তোমারে
দূর গগনে প্রিয় তিমির-পারে॥

জেগে যবে দেখি হায় তুমি নাই কাছে,
আঙিনায় ফুটে ফুল ঝরে পড়ে আছে,
বাণ-বেঁধা পাখি সম আহত এ প্রাণ মম
লুটায়ে লুটায়ে কাঁদে অন্ধকারে॥

মৌনা নিঝুম ধরা, ঘুমায়েছে সবে,
এস প্রিয়, এই বেলা বক্ষে নীরবে।

কত কথা কাঁটা হয়ে বুকে আছে বিঁধে,
কত অভিমান কত জ্বালা এই হৃদে,
দেখিবে এস প্রিয় কত সাধ ঝরে গেল কত আশা
মরে গেল হাহাকারে॥

১৩

গভীর-নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়, কে যেন আমারে ডাকে—
সে কি তুমি, সে কি তুমি?
কার স্মৃতি বুকে পাষাণের মতো ভার হয়ে যেন থাকে—
সে কি তুমি, সে কি তুমি?

কাহার ক্ষুধিত প্রেম যেন, হায়?
ভিক্ষা চাহিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়,
কার সকরুণ আঁখি দুটি যেন রাতের তারার মতো
মুখপানে চেয়ে থাকে—
সে কি তুমি, সে কি তুমি?

নিশির বাতাস কাহার হুতাশ দীরঘ নিশাস সম
ঝড় তোলে এসে অন্তরে মোর; ওগো দুরন্ত মম!
সে কি তুমি, সে কি তুমি?
মহাসাগরের ঢেউ-এর মতন
বুকে বাজে এসে কাহার রোদন?
পিয়া পিয়া নাম ডাকে অবিরাম বনের পাপিয়া পাখি
আমার চম্পা-শাখে—
সে কি তুমি, সে কি তুমি?

১৪

রূপের দীপালি–উৎসব আমি দেখেছি তোমার অঙ্গে।
শত ফুলশর মুরছায় প্রিয়া, তোমার নয়ন–ভঙ্গে॥

যে আঁখি পরম সুন্দরে দেখিয়াছে
সেই আঁখি কাঁদে তোমার পায়ের কাছে,
দেখেছে সে আঁখি, বিশ্ব দুলিছে তোমার রূপ–তরঙ্গে॥

তোমারে দেখিতে আমার আকাশ আনত হইয়া কাঁদে,
(তব) মণিহার হতে বিবাদ করে গো কোটি গ্রহ তারা চাঁদে।

তুমি দেখিতে যদি গো আপন রূপের আলো
আমারে ভুলিয়া নিজেরে বাসিতে ভালো,
তোমারে আড়াল করিয়া গো তাই ছায়া–সম ফিরি সঙ্গে॥

১৫

এবার যখন উঠবে সন্ধ্যাতারা—সাঁঝ আকাশে
দেখতে পাবে দুটি নতুন তারা—তাহার পাশে॥

চেয়ে দেখো ভালো করে
কার দুটি চোখ যেন মরে
তারা হয়ে ধরার পানে চাহে
তোমার আঁখি দেখার আশে॥

যে দুটি চোখ নিত্য লোকের মাঝে
তোমায় দিত লাজ
পড়বে মনে গো—
সেই দুটি চোখ চিরতরে এই পৃথিবী হতে
হারিয়ে গেছে আজ।
পায়নি গো, তাই অভিমানে
চলে গেছে দূর বিমানে
(দেখো) সেদিন যেন আজের মত চাইতে ওদের পানে
দ্বিধা নাহি আসে॥

১৬

বলেছিলে, তুমি তীর্থে আসিবে আমার তনুর তীরে।
তুমি আসিলে না, আশার সূর্য ডুবিল সাগর–নীরে॥
চলে যাই যদি, চিরদিন মনে
তোমার সে কথা রহিবে স্মরণে,
শুধু সেই কথা শোনার লাগিয়া হয়তো আসিব ফিরে॥

শুধু সেই আশে হয়তো এ তনু মরণে হবে না লীন,
পথ চেয়ে চেয়ে তব নাম গেয়ে বাজাব বিরহ–বীণ।

হের গো, আমার যাবার সময় হল,
তোমার সে কথা মিথ্যা হবে না বল,
কোন্ শুভক্ষণে নিমেষের তরে জড়াবে কণ্ঠ ঘিরে॥

১৭

ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে, জাগায়ো না জাগায়ো না।
সারা জীবন যে আলো দিল, ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙায়ো না॥

সে সহস্র করে রূপরস দিয়া
জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া,
তাঁহারে শান্তি–চন্দন দাও, ক্রন্দনে রাঙায়ো না॥

যে তেজ শৌর্য শক্তি দিলেন আপনারে করি ক্ষয়
তাই হাত পেতে নাও।
বিদেহ রবি ও ইন্দ্র মোদেরে নিত্য দেবেন জয়
কবিরে ঘুমাতে দাও।

অন্তরে হের হারানো রবির জ্যোতি
সেইখানে তাঁরে নিত্য কর প্রণতি
(আর) কেঁদে তাঁরে কাঁদায়ো না॥

১৮

নূরজাহান ! নূরজাহান
সিন্ধুনদীতে ভেসে
এলে মেঘলামতীর দেশে
ইরানি গুলিস্তান ॥

নার্গিস লালা গোলাপ আঙুর-লতা
শিরি-ফরহাদ শিরাজের উপকথা
এনেছিলে তুমি তনুর পিয়ালা ভরি'
বুলবুলি দিলরুবা রবাবের গান ॥
তব প্রেমে উন্মাদ ভুলিল সেলিম সে যে রাজাধিরাজ,
চন্দন-সম মাখিল অঙ্গে কলঙ্ক লোক-লাজ।

যে কলঙ্ক লয়ে হাসে চাঁদ নীলাকাশে
(যাহা) লেখা থাকে শুধু প্রেমিকের ইতিহাসে
দেবে চিরদিন নন্দন-লোকচারী
(তব) সেই কলঙ্ক সে প্রেমের সম্মান ॥

১৯

বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি
সেই চির-চেনা সুরে।
যে সুরে বিরহী প্রাণ আজও ঝুরে ॥

যে সুরে হৃদয়ে হোরির রং লাগে
ভুলে-যাওয়া যৌবন-স্মৃতি মনে জাগে,
আকাশ কাঁদে যে সকরুণ রাগে
যে সুর ঘুমায়ে আছে প্রিয়ার নূপুরে ॥

যে সুর শুনি আজো পল্লীর প্রান্তে
মল্লিকা-কুঞ্জে শ্রান্ত দিনান্তে
বিরহবিধুর দূর হারানো দিনের
ছায়া ফেলে যে-সুর মনের মুকুরে ॥

২০

সেদিন ছিল কি গোধূলি-লগন শুভ-দৃষ্টির ক্ষণ?
চেয়েছিল মোর নয়নের পানে যেদিন তব নয়ন॥
সেদিন বকুল শাখে কি গো আঙিনাতে
ডেকে উঠেছিল কুহু-কেকা এক সাথে,
অধীর নেশায় দুলে উঠেছিল মনের মহুয়া বন॥

হে প্রিয়, সেদিন আকাশ হতে কি তারা পড়েছিল ঝরে,
যেদিন প্রথম ডেকেছিলে তুমি মোর ডাকনাম ধরে?

(প্রিয়) যেদিন প্রথম ছুঁয়েছিলে ভালোবেসে
আকাশে কি বাঁকা চাঁদ উঠেছিল হেসে?
শঙ্খ সেদিন বাজায়েছিল কি পাষাণের নারায়ণ॥

২১

মোর ভুলিবার সাধনায় কেন সাধ বাদ?
কেন নিরাশা-আঁধারে জ্বালো আশার চাঁদ॥

যে প্রেম লভিয়াছে সমাধি
কি হবে সেথায় আর কাঁদি
বাঁচিবে না নয়নের জলে সে
পুড়ে ছাই হয়ে গেছে যার সুখ-সাধ॥

যে তরুর কাটিয়াছ মূল, কেন ফুল সেথা চাও
নির্জন অরণ্যে বিরহ-তাপে তারে শুকাইতে দাও।

শুভ লগ্নের ক্ষণ ভুবনে
একবার আসে শুধু জীবনে
বয়ে গেছে সেই শুভদৃষ্টির শুভক্ষণ
আর পাইব না তব আঁখির প্রসাদ॥

২২

আমার ভুবন কান পেতে রয় প্রিয়তম তব লাগিয়া।
দীপ নিভে যায়, সকলে ঘুমায়, মোর আঁখি রহে জাগিয়া॥

তারারে শুধাই, 'কত দেরি আর?
কখন আসিবে বিরহী আমার?'
ওরা বলে, 'হের পথ চেয়ে তার নয়ন উঠেছে রাঙিয়া॥'

'আসিতেছে সে কি মোর অভিসারে', কাঁদিয়া শুধাই চাঁদে,
মোর মুখপানে চেয়ে চেয়ে চাঁদ নীরবে শুধু কাঁদে।
ফাগুন-বাতাস করে হায় হায়—
(বলে) 'বিরহিণী তোর নিশি যে পোহায়।'
ফুল বলে, 'আর জাগিতে নারি গো, ঘুমে আঁখি আসে ভাঙিয়া॥'

২৩

আন গোলাপ-পানি, আন আতরদানি গুলবাগে।
সেহেলি গো কিছু ভালো নাহি লাগে।
বেদুইন ছেলের বাঁশি কারে ডাকে
কেঁদে কেঁদে অনুরাগে॥

মরুযাত্রীদের উটের সারি
যেমন চাহে তৃষ্ণার বারি
তেমনি মম পিয়াসী পরান যেন কার
প্রেম-অমৃত বারি মাগে॥

চাঁদের পিয়ালাতে জোছনা-শিরাজি ঝরে যায়,
আমারি হৃদয় কেন গো সে মধু নাহি পায়।

হায়, হায়, বাদাম গাছের আঁধার বনে
নিঃশ্বাস ওঠে যেন বুলবুলির শিসের সনে,
বিরহী মোর কোথায় কাঁদে কোন্ মদিনাতে—
ফোরাত নদীর রোদন সম বুকে ঢেউ জাগে॥

২৪

কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া
কুহরিল মহুয়া-বনে।
চমকি জাগিনু নিশীথ শয়নে॥

শূন্য-ভবনে মৃদুল সমীরে
প্রদীপের শিখা কাঁপে ধীরে ধীরে,
চরণ-চিহ্ন রাখি দলিত কুসুমে
চলিয়া গেছ তুমি দূর-বিজনে॥

বাহিরে ঝরে ফুল আমি ঝুরি ঘরে,
বেণু-বনে সমীরণ হাহাকার করে,
বলে যাও কেন গেলে এমন করে
কিছু নাহি বলে সহসা গোপনে॥

২৫

প্রদীপ নিভায়ে দাও, উঠিয়াছে চাঁদ।
বাহুর ডোর আছে, মালায় কি সাধ?

ফুল আনিও না ভবনে,
কেশের সুবাস তব ঘনাক মনে,
হৃদয়ের লাগি মোর হৃদয় কাঁদে
চন্দন লাগে বিস্বাদ॥

খোলো গুণ্ঠন, ফেলে দাও আভরণ,
হাতে রাখ হাত, তোলো আনত নয়ন।

বাহিরে বহুক বাতাস,
বক্ষে লাগুক মোর তব ঘন শ্বাস,
চম্পার ডালে বসে মোদেরে দেখে
কুহু আর পাপিয়ায় করুক বিবাদ॥

২৬

রেশমি রুমালে কবরী বাঁধি
নাচিছে আরবি নটিনী বাঁদি ॥

বেদুইনি সুরে বাঁশি বাজে
রহিয়া রহিয়া তাঁবু–মাঝে, সুদূরে
—সে সুরে চাহে বোরকা তুলিয়া শাহাজাদি ॥

যৌবন–সুন্দর নোটন কবুতর
নাচিছে মরু–নটী
গাল যেন গোলাপ, কেশ যেন খেজুর–কাঁদি ॥

চায় হেসে হেসে চায় মদির চাওয়ায়,
দেহের দোলায় রং ঝরে যায়, ঝর ঝর
—ছন্দে দুলে ওঠে মরু মাঝে আঁধি ॥

২৭

নিশিরাতে রিম ঝিম ঝিম বাদল–নূপুর
বাজিল ঘুমের মাঝে সজল মধুর ॥

দেয়া গরজে বিজলি চমকে
জাগাইল ঘুমন্ত প্রিয়তমকে
আধো–ঘুমঘোরে চিনিতে নারি ওরে
কে এল কে এল বলে ডাকিছে ময়ূর ॥

দ্বার খুলি পরশি কৃষ্ণা মেয়ে আছে চেয়ে
মেঘের পানে আছে চেয়ে
কারে দেখি আমি কারে দেখি
মেঘলা আকাশ না ঐ মেঘলা মেয়ে।

ধায় নদীজল মহাসাগর পানে
বাহিরে ঝড় কেন আমায় টানে

জমাট হয়ে আছে
বুকের কাছে
নিশির আকাশ যেন মেঘ-ভারাতুর॥

২৮

ভোরে ঝিলের জলে
শালুক পদ্ম তোলে
কে ভ্রমর-কুন্তলা কিশোরী
ফুল দেখে বেভুল সিনান বিসরি'॥

একি নূতন লীলা আঁখিতে দেখি ভুল
কমল ফুল যেন তোলে কমল ফুল
ভাসায়ে আকাশ-গাঙে অরুণ-গাগরি॥

ঝিলের নিথর জলে আবেশে ঢলঢল গলে
পড়ে শত সে তরঙ্গে,
শারদ আকাশে দলে দলে আসে
মেঘ-বলাকার খেলিতে সঙ্গে।

আলোক-মঞ্জরি প্রভাতবেলা
বিকশি' জলে কি গো করিছে খেলা,
বুকের আঁচলে ফুল উঠিছে শিহরি॥

২৯

সন্ধ্যা নেমেছে আমার বিজন ঘরে,
তব গৃহে জ্বলে বাতি।
ফুরায় তোমার উৎসব নিশি সুখে,
পোহায় না মোর রাতি।
প্রিয়া পোহায় না মোর রাতি॥

আমার আশায় ঝরাফুল দিয়া
তোমার বাসর-শয্যা রচিছ প্রিয়া

তোমার ভবনে আলোর দীপালি জ্বলে,—
আঁধার আমার সাথী।
প্রিয়া পোহায় না মোর রাতি॥

ঘুমায় পড়েছে আমার কাননে কুহু,
নীরব হয়েছে গান,
তোমার কুঞ্জে গানের পাখিরা বুঝি
তুলিয়াছে কলতান।
পৃথিবীর আলো মোর চোখে নিভে আসে,
বাজিছে বাঁশরি তোমার মিলন-রাসে,
ওপারের বাঁশি আমারে ডাকিবে কবে
আছি তাই কান পাতি।
প্রিয়া পোহায় না মোর রাতি॥

৩০

মঞ্জুভাষিণী

আজো ফাল্গুনে বকুল কিংসুকের বনে
কহে কোন্ কথা হৃদয় স্বপ্নে আনমনে॥

মৃদু মর্মরে পথের পল্লবের সাথে
গাহে কোন্ গীতি নিশীথে পানসে জ্যোৎস্নাতে
খোঁজে কার স্মৃতি নীরস শুভ্র চন্দনে॥

গ্রহ চন্দ্রে কয়, সে কি গো মৃত্যুদ্বার খুলে
হয়ে সৃষ্টিপার গিয়াছে অমৃতের কূলে,
কাঁদে কোন্ লোকে পরম সুন্দরের

৩১

যখন আমার গান ফুরাবে তখন এসো ফিরে।
ভাঙবে সভা, বসব একা রেবা-নদীর তীরে—
তখন এসো ফিরে॥

শীত-শেষে গগন-তলে
শ্রান্ত তনু পড়বে ঢলে
ভালো যখন লাগবে না আর সুরের সারেঙ্গীরে
তখন এসো ফিরে ॥

মোর কণ্ঠে জয়ের মালা তোমার গলায় নিও
ক্লান্তি আমার ভুলিয়ে দিও, প্রিয় হে মোর প্রিয় !

ঘুমাই যদি কাছে থেকো
হাতখানি মোর হাতে রেখো
জেগে যখন খুঁজব তোমায় আকুল অশ্রু-নীরে—
তখন এসো ফিরে ॥

৩২

ওগো সুন্দর তুমি আসিবে বলিয়া বনপথে পড়ে ঝরি
রাঙা অশোকের মঞ্জরি।
হাসে বনদেবী বেণীতে জড়ায়ে মালতীর বল্লরী,
নব কিশলয় পরি ॥

কুমুদী কলিকা ঈষৎ হেলিয়া,
চাঁদেরে নেহারি হাসে মুচকিয়া,
মহুয়ার বনে ভ্রমর ভ্রমরী ফিরিতেছে গুঞ্জরি ॥

যাহা কিছু হেরি ভালো লাগে আজ লুকাইতে নারি হাসি,
কাজ করি আর শুনি যেন কানে মিঠে পাহাড়িয়া বাঁশি।

এক শাড়ি খুলে পড়ি আর শাড়ি,
বারে বারে মুখ মুকুরে নেহারি,
দুরু দুরু হিয়া ওঠে চমকিয়া, অকারণে লাজে মরি ॥

৩৩

ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এল গো,
সই লো দেখে আয় !
বঁইচি বনে বিরহে বাউরি বাতাস বহে এলোমেলো গো ॥

(সে) আড়বাঁশি বাজায়, আড় চোখে তাকায়,
তীর হানার ভঙ্গিতে ধনুক বাঁকায়,
কুমকুম পাহাড়ে তাহারে দেখে চাঁদ আঁউরে গেল গো॥

ঝাঁকড়া চুলের পাশে টুলটুল চোখ হাসে কতই ছলে,
মৌরলা মাছ যেন খেলে বেড়ায় গো কালো জলে।

মৌটুসকীর মৌ ফেলে ভোমরা রয় তাকিয়ে,
গুরুজনের মত বটের তরু দাঁড়িয়ে জট পাকিয়ে,
আমলকি গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখি
সে দেখতে কি তা পেল গো॥

৩৪

মনে পড়ে আজও সেই নারিকেল কুঞ্জ গুবাক তরুর ঘন-কেয়ারি
বালুচর, বেত বন, দেখা হত দুইজন, মন হত উন্মন দোঁহারি॥

গাছ থেকে টুপটাপ ঝরিত কালো জাম,
জাম ফেলে চুপচাপ মেঘ পানে চাহিতাম,
গাব নিয়ে কাড়াকাড়ি, ভাব হত, হত আড়ি দুজনে,
আমি ছিনু ধনিকের ছেলে গো।
ছিলে ভুঁইমালিদের তুমি ঝিয়ারি॥

ভুঁইমালিদের ঘরে ভুঁইচম্পার কলি ডুমা-পরা উমা সম খেলিতে,
আমার দালান-ঘরে—দোতলায় কেন গো উতলা মনে ছায়া ফেলিতে!

সহসা হেরিনু তব বধূরূপ, ভাঙা চালা হাতে তব চালুনি,
পার্শ্বে দামাল ছেলে কাঁদিছে হেরিয়া পান্তাভাত আলুনি।
ঘোমটা টানিয়া দিলে আমারে হেরিয়া,
উদাস চোখে এলো কালো মেঘ ঘেরিয়া,
তারে চিনিতে কি পেরেছিলে প্রণাম যে করেছিল
কল্যাণী রূপ তব নেহারি॥

৩৫

আমি পূরব দেশের পুরনারী
গাগরি ভরিয়া এনেছি গো অমৃত-বারি॥

পদ্মাকূলের আমি পদ্মিনী বধূ গো,
এনেছি শাপলা পদ্মের মধু গো,
ঘন বনছায়ার শ্যামলী মায়া
শান্তি আনিয়াছি ভরি হেমঝারি॥

আমি শঙ্খনগর হতে আনিয়াছি শাঁখা, অভয়শঙ্খ,
ঝিল ছেনে এনেছি সুনীল কাজল গো
বিল ছেনে অনাবিল চন্দনপঙ্ক।
এনেছি শত ব্রত পার্বণ উৎসব
এনেছি সারস হংসের কলরব
এনেছি নব আশা উষার সিন্দুর
মেঘ-ডমরুর সাথে মেঘডুমুর শাড়ি॥

৩৬

তেমনি চাহিয়া আছে নিশীথের তারাগুলি,
লতা-নিকুঞ্জে কাঁদে আজও বন-বুলবুলি।
ফিরে এসো, ফিরে এসো প্রিয়তম॥

ঘুমায়ে পড়েছে সবে, মোর ঘুম নাহি আসে,
তুমি যে ঘুমায়েছিলে সেদিনো আমার পাশে,
সাজানো সে গৃহ তব ঢেকেছে পথের ধূলি।
ফিরে এসো, ফিরে এসো প্রিয়তম॥

আমার চোখের জলে মুছে যায় পথরেখা,
রোহিণী গিয়াছে চলি, চাঁদ কাঁদে একা একা,
কোন দূর তারালোকে কেমনে রয়েছে ভুলি।
ফিরে এসো, ফিরে এসো প্রিয়তম॥

৩৭

নন্দন বন হতে কে গো ডাক মোরে আধ-নিশীথে,
ক্ষণে ক্ষণে ঘুমহারা পাখি কেঁদে ওঠে করুণ গীতে॥

ভেঙে যায় ঘুম চেয়ে থাকি,
চাহে চাঁদ ছলছল আঁখি,
ঝরা চম্পার ফুল যেন কে
ফেলে চলে যায় চকিতে॥

সহিতে না তিলেক বিরহ ছিলে যবে জীবনের সাথী
বলে যাও আজ দূর অমরায় কেমনে কাটাও দিবারাতি।

জীবনে ভুলিলে তুমি যারে
(তারে) ভুলে যাও মরণের ওপারে,
আঁধার ভুবনে মোরে একাকী
দাও ওগো দাও ঝুরিতে॥

৩৮

শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে নয়নে বারি ঝরে।
ভুলিও স্মৃতি মম নিশীথ স্বপন সম,
আঁচলের গাঁথা মালা ফেলিও পথ পরে॥

ঝুরিবে পূবালী বায় গহন দূর বনে,
রহিবে চাহি তুমি একেলা বাতায়নে।
বিরহী কুহু-কেকা গাহিবে নীপ-শাখে
যমুনা-নদী পারে শুনিবে কে যেন ডাকে।
বিজলি দীপ-শিখা খুঁজিবে তোমায় প্রিয়া
দুহাতে ঢেকো আঁখি যদি গো জলে ভরে॥

৩৯

কাবেরী নদী-জলে কে গো বালিকা
আনমনে ভাসাও চম্পা শেফালিকা॥

প্রভাত-সিনানে আসি আলসে
কঙ্কণ-তাল হানো কলসে,
খেলে সমীরণ লয়ে কবরীর মালিকা॥

দিগন্তে অনুরাগে নবারুণ জাগে
তব জল ঢলঢল করুণা মাগে।
ঝিলম রেবা নদী-তীরে
মেঘদূত বুঝি খুঁজি ফিরে
তোমারেই তন্বী শ্যামা কর্ণাটিকা॥

৪০

বসন্ত মুখর আজি
দক্ষিণ সমীরণে মর্মর গুঞ্জনে
বনে বনে বিহ্বল বাণী ওঠে বাজি॥

অকারণ ভাষা তার ঝরঝর ঝরে
মুহু মুহু কুহু কুহু পিয়া পিয়া স্বরে।
পলাশ বকুলে অশোক শিমুলে
সাজানো তাহার কল-কথার সাজি॥

দোয়েল মধুপ বন-কপোত কূজনে
ঘুম ভেঙে দেয় ভোরে বাসর-শয়নে।
মৌনী আকাশ সেই বাণী-বিলাসে
অস্ত চাওদের মুখে মৃদু মৃদু হাসে
বিরহ-শীর্ণা গিরি-ঝরনার তীরে
পাহাড়ী বেণু হাতে ফেরে সুর ভাঁজি॥

৪১

তুমি সুন্দর, তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ?
চাঁদেরে হেরিয়া কাঁদে চকোরিণী, বলে না তো কিছু চাঁদ॥

চেয়ে চেয়ে দেখি ফোটে যবে ফুল
ফুল বলে না তো সে আমার ভুল
মেঘ হেরি ঝুরে চাতকিনী, মেঘ করে না তো প্রতিবাদ॥

জানে সূর্যেরে পাবে না, তবুও অবুঝ সূর্যমুখী
চেয়ে চেয়ে দেখে তার দেবতাকে, দেখিয়াই সে যে সুখী॥

হেরিতে তোমার রূপ মনোহর
পেয়েছি এ আঁখি, ওগো সুন্দর !
মিটিতে দাও হে প্রিয়তম মোর নয়নের সেই সাধ॥

৪২

তুমি প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী,
শিশির-সজল ভোরের আকাশে ভাসে
তোমারি উদাস ছবি॥

বিষাদ গভীর কার কল্পনা
রূপ ধরে তুমি ফের অনমনা।
তোমারি মূরতি ধেয়ায় স্বপনে
বিরহী সুরের কবি॥

তুমি ধরা দিতে যেন আস নাই ধরণীতে
একা একা খেলা খেল সারাবেলা
সাথীহীন তরণীতে॥

আঘাত হানিয়া সে কোন নিঠুর
জাগাবে তোমাতে আশাবরী সুর
পাষাণ টুটিয়া গলিয়া পড়িবে অশ্রুর জাহ্নবী॥

৪৩

কেন মেঘের ছায়া আজি চাঁদের চোখে
মোর বুকে মুখ রাখি ঝড়ের পাখির সম কাঁদে ও কে॥

গভীর নিশীথে কণ্ঠ জড়ায়ে
শ্রান্ত কেশভার গগনে এলায়ে
হারানো প্রিয়া মোর এল কি লুকায়ে
আমার একা–ঘরে ম্লান আলোকে॥

গঙ্গায় তারি চিতা নিভেছে কবে
মোর বুকে সেই চিতা জ্বলে আজো নীরবে।

স্মৃতির চিতা নিভেছে কবে
নিভিবে না বুঝি আর
কোন সে জনমে কোন সে লোকে॥

৪৪

বন্ধু, আজো মনে যে পড়ে আম–কুড়ানো খেলা।
আম কুড়াইবার যাইতাম দুইজন নিশিভোরের বেলা॥

জোষ্ঠিমাসের গুমোট রে বন্ধু আসত না কো নিঁদ
রাত্রে আসত না কো নিদ,
আম–তলার এক চোর আইস্যা কাটিত প্রাণের সিঁদ ;
(আর) নিদ্রা গেলে ফেলত সে চোর আঙিনাতে ঢেলা॥

আমরা দুজন আম কুড়াইতাম, ডাকেত কোকিল গাছে,
ভোলো যদি—বিহান বেলার সূর্যি সাক্ষী আছে।
(তুমি) পায়ের কাছে আম ফেইল্যা গায়ে দিতে ঠেলা॥

আমার বুকের আঁচল থাইক্যা কাইড়া নিতে আম,
বন্ধু, আজও পায় নাই দাসী সেই না আমের দাম।
(আজ) দাম চাইবার গিয়া দেখি তুমি দিছ মেলা॥

নিশি জাইগ্যা বইস্যা আছি, জোষ্ঠি মাসের ঝড়ে
সেই না গাছের তলায় বন্ধু, এখনো আম পড়ে ;
(আজ) তুমি কোথায় আমি কোথায়, দুইজনে একেলা॥

৪৫

ধর্মের পথে শহিদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি।
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি
আমরা সেই সে জাতি॥

পাপবিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যারা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি শীতল শান্তিধারা
উচ্চ-নীচের ভেদ ভাঙি দিল সবারে বক্ষ পাতি
আমরা সেই সে জাতি॥

কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনি কো ইসলাম
সত্যে যে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম।
আমির-ফকিরে ভেদ নাই সবে ভাই সব এক সাথী
আমরা সেই সে জাতি॥

নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নর-সম অধিকার,
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার,
আঁধার রাতির বোরকা উতারি এনেছি আশার ভাতি
আমরা সেই সে জাতি॥

৪৬

তুমি আমার সকাল বেলার সুর
হৃদয় অলস-উদাস-করা অশ্রুভারাতুর॥

ভোরের তারার মতো তোমার সজল চাওয়ায়
ভালোবাসার চেয়ে সে যে কান্না পাওয়ায়
রাত্রি-শেষের চাঁদ তুমি গো বিদায় বিধুর॥

তুমি আমার ভোরের ঝরাফুল
শিশির-নাওয়া শুভ্র শুচি পূজারিণীর তুল।

অরুণ তুমি তরুণ তুমি, করুণ তারও চেয়ে,
হাসির দেশে তুমি যেন বিষাদ-লোকের মেয়ে,
তুমি ইন্দ্র-সভায় মৌন বীণা, নীরব নূপুর॥

৪৭

তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি গো সকল ফুলের মুখে,
ফুল ঝরে যায় তব স্মৃতি জাগে কাঁটার মতন বুকে॥

তব প্রিয় নাম ধরে ডাকি
ফুল সাড়া দেয় মেলি আঁখি
তোমার নয়ন জাগিল না হায় ফুলের মতন সুখে॥

আকাশে বাতাসে তব নাম লয়ে ওঠে রোদনের বাণী
কানাকানি করে চাঁদ ও তারায় জানি গো তোমারে জানি।

খুঁজি বিজলি প্রদীপ জ্বেলে
কাঁদি ঝঞ্ঝার পাখা মেলে
অন্ধ গগনে আঁধার মেঘের ঢেউ ওঠে মোর দুখে॥

৪৮

মোর গানের কথা যেন আলোকলতা
যেন স্বর্ণলতা।
মূল নাই ফুল নাই
আছে শুধু বর্ণের বিহ্বলতা॥

আকাশ-বনস্পতি জড়ায়ে
ধরণীর বুকে পড়ে গড়ায়ে
কখন কি আবেশে কথা ভাবে সে
কে জানে কেন অযথা॥

রহে কারো বক্ষে, রহে কারো চক্ষে বিরহের অশ্রুজলে,
কণ্ঠলগ্না কারো রহে সে গীত-কলি মঞ্জুরে অধরতলে।

রাখি হয়ে কারও হাত বাঁধে সে
কাহারও চরণতলে কাঁদে সে
সুরে সুরে গুঞ্জিত ও যেন পুঞ্জিত
অকারণ মৌন ব্যথা॥

৪৯

এই বিশ্বে আমার সবাই চেনা, কেউ অচেনা নাই
যারে দেখি হয় মনে সেই বন্ধু প্রিয় ভাই
কেউ অচেনা নাই॥

কোন সে লোকে, নাই তা মনে
চেনা ছিল সবার সনে
দেখে এদের প্রাণ জুড়িয়ে যায় রে আমার তাই।
কেউ অচেনা নাই॥

চোখ যারে কয় 'চিনতে নারি' প্রাণ কেন রে কাঁদে
(তারেই) জড়িয়ে ধরতে চায় এই বুক (যে) শত্রু হয়ে বাঁধে।
সব মানুষের প্রাণের কাছে
আমার চেনা লুকিয়ে আছে
(তাই) অচেনা কেউ চেনা হলে এত আনন্দ পাই
কেউ অচেনা নাই॥

৫০

কত দূরে তুমি, ওগো আঁধারের সাথী।
হাত ধর মোর নিভিয়া গিয়াছে বাতি॥
চলিতে চলিতে তোমার তীর্থপথে
হারায়ে গিয়াছি অন্ধকারের স্রোতে,
এসে তুলে লও তোমার সোনার রথে
(লহ) প্রভাতের তীরে, শেষ হয় যেথা রাতি॥

যে ধ্রুবতারার পথ দেখাইয়া নীরবে চলেছ তুমি
সে পথ ভুলিয়া আসিলাম মায়াতৃষ্ণার মরুভূমি।

সাড়া নাহি পাই আজ আর ডেকে ডেকে
কাঁদিছ কি তুমি মোরে সাথে নাহি দেখে?
হয়তো ফিরিবে অমৃতের তীর থেকে
সেই আশে আছি পথ পানে আঁখি পাতি॥

৫১

অনেক ছিল বলার, যদি সেদিন ভালোবাসতে।
পথ ছিল গো চলার, যদি দুদিন আগে আসতে॥

আজকে মহাসাগর–স্রোতে
চলেছি দূর পারের পথে
ঝরা পাতা হারায় যথা
সেই আঁধারে ভাসতে॥
গহন রাতি ডাকে আমায়
এসে তুমি আজকে
কাঁদিয়ে গেলে হায় গো আমার
বিদায়–বেলার সাঁঝকে।

আসতে যদি হে অতিথি
ছিল যখন শুক্লা তিথি
ফুটত চাঁপা, সেদিন যদি চৈতালী চাঁদ হাসতে॥

৫২

বন্ধু! দেখলে তোমায় বুকের মাঝে
জোয়ার ভাটা খেলে।
আমি একলা ঘাটে কুলবধু, কেন তুমি এলে
বন্ধু, কেন তুমি এলে॥

আমার অঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে, বাজাও যখন বাঁশি ;
খিড়কি–দুয়ার দিয়ে বন্ধু জল ভরিতে আসি,
ভেসে নয়ন–জলে ঘরে ফিরি
ঘাটে কলস ফেলে॥

আমার পাড়ায় বন্ধু, তোমার নাম যদি লয় কেউ
বুকে আমার জেগে ওঠে পদ্মা নদীর ঢেউ।

ওগো ও চাঁদ, এনো না আর
দুকূল–ভাঙা এমন জোয়ার ;

কত ছল করে জল লুকাই চোখের
কাঁচা কাঠের আগুন জ্বেলে।

৫৩

বন-বিহঙ্গ ! যাও রে উড়ে মেঘনা নদীর পারে।
দেখা হলে আমার কথা কইও গিয়া তারে॥

কোকিল ডাকে বকুল-ডালে
সে মালঞ্চে সাঁঝ-সকালে
আমার বন্ধু কাঁদে সেথায় গাঙেরই কিনারে॥

গিয়া তারে দিয়া আইস আমার শাপলা-মালা,
আমার জন্য লইয়া আইস তাহার বুকের জ্বালা।
সে যেন রে বিয়া করে
সোনার কন্যা আনে ঘরে,
আমার পাটের জোড় পাঠাইয়া দিব সে কন্যারে॥

৫৪

এ-কূল ভাঙে ও-কূল গড়ে
এই তো নদীর খেলা
(রে ভাই) এই তো বিধির খেলা।
সকাল বেলা আমির রে ভাই
ফকির সন্ধ্যাবেলা॥

সেই নদীর ধারে কোন ভরসায়
(ওরে বেভুল) বাঁধলি বাসা সুখের আশায়,
যখন ধরল ভাঙন পেলিনে তুই
পারে যাবার ভেলা॥

এই দেহ ভেঙে হয় রে মাটি, মাটিতে হয় দেহ,
যে কুমোর গড়ে সেই দেহ, তার খোঁজ নিল না কেহ।

রাতে রাজা সাজে নাট-মহলে,
দিনে ভিক্ষা মেগে পথে চলে,
শেষে শ্মশান-ঘাটে গিয়ে দেখে
সবাই মাটির ঢেলা।
এই তো বিধির খেলা রে ভাই
ভব-নদীর খেলা॥

৫৫

উজান বাওয়ার গান গো এবার গাসনে ভাটিয়ালি,
আর গাসনে ভাটিয়ালি।
নতুন আশার চাঁদ উঠেছে কুমড়ো জালির ফালি
যেন কুমড়ো জালির ফালি॥

বান এসেছে, বাঁধ ভেঙেছে, নায়ে দোলা লাগে ;
আড় বাঁশিতে তান ছেড়ে তুই দাঁড় বেয়ে চল আগে ;
দেখ জোয়ার জলে ডুবে গেছে চরের চোরাবালি॥

কালো বউ-এর চোখ যেন দেখ মৌরলা মাছ ভাসে,
গাঙচিল আর জল-পায়রা উড়ছে মুখের পাশে,
শোন বৌ কথা কও পাখি মোদের করছে দূতিয়ালি॥

জল নিয়ে বৌ দাঁড়িয়ে আছে, গাছে কচি ডাব,
লোকসানেরই হিসাব দেখিস, লাভের কথা ভাব।
সাজ রে তামুক, নামুক দেয়া, দুক্ষু তো ইজমালি॥

৫৬

যবে ভোরের কুন্দ-কলি মেলিবে আঁখি
ঘুম ভাঙায়ে হাতে বাঁধিও রাখি॥

রাতের বিরহ যবে
প্রভাতে নিবিড় হবে

অকরুণ কলরবে
গাহিবে পাখি
ঘুম ভাঙায়ে হাতে বাঁধিও রাখি ॥

যেন অরুণ দেখিতে গিয়া তরুণ কিশোর
তোমারে প্রথম হেরি ঘুম ভাঙে মোর।

কবরীর মঞ্জরী
আঙিনায় রবে ঝরি,
সেই ফুল পায়ে দলি
এসো একাকী।
ঘুম ভাঙায়ে হাতে বাঁধিও রাখি ॥

৫৭

মোর স্বপ্নে যেন বাজিয়েছিলে করুণ রাগিণী।
হে রূপকুমার। ঘুমিয়েছিলাম, সেদিন জাগিনি ॥

যেন আধোঘুমের ঘোরে
দেখেছিলাম চুরি করে—
চাইতে গিয়ে চোখের জলে চাইতে পারিনি ॥

তন্দ্রা আমার টুটল, তবু সরম ভরে
(হে) চির-চাওয়া ! পারিনি কো ডাকতে আদরে।
চেয়ে চেয়ে আমার পানে
চলে গেলে অভিমানে,
(তোমার) পথের ধূলি হইনি কেন হতভাগিনী ॥

৫৮

আমি সন্ধ্যামালতী বন-ছায়া অঞ্চলে
লুকাইয়া রই ঘন পল্লব-তলে ॥

বিহগের গীতি ভ্রমরের গুঞ্জন
নীরব হয় যখন
আমি চাঁদেরে তখন পূজা করি আঁখি-জলে॥

আমি লুকাইয়া কাঁদি বনের শকুন্তলা,
মনের কথা এ জনমে হল না বলা।

গভীর নিশীথে বন-ঝিল্লির সুরে
ডাকি দূর বন্ধুরে,
আমি ঝরে পড়ি যঁবে প্রভাতে সবার হৃদয়-মুকুল খোলে॥

৫৯

শাওন আসিল ফিরে, সে ফিরে এল না।
বরষা ফুরায়ে গেল, আশা তবু গেল না॥

ধানি রং ঘাঘরি, মেঘ রং ওড়না
আমারে পরিতে মা গো অনুরোধ করো না,
কাজরীর কাজল মেঘ পথ পেল খুঁজিয়া
সে কি ফেরার পথ পেল না মা, পেল না॥

আমার বিদেশিরে চিনিতে অনুখন
বুনো হাঁসের পাখার মতো উড়ু উড়ু করে মন।

অথৈ জলে মা গো মাঠ ঘাট থৈ থৈ,
আমার হিয়ার আগুন নিভিল কৈ,
কদম-কেশর বলে, কোথা তোর কিশোর,
চম্পা-ডালে দোলে শূন্য দোলনা॥

৬০

বেদিয়া বেদিনী ছুটে আয় আয় আয় আয়।
ধাতিনা ধাতিনা তিনা ঢোলক মাদল বাজে
বাঁশিতে পরান মাতায়॥

দলে দলে নেচে নেচে আয় চলে
আকাশের সামিয়ানা তলে
বর্শা তীর ধনুক ফেলে আয় আয় রে
হাড়ের নূপুর পরে পায়॥
বাঘ-ছাল পরে আয় হৃদয়-বনের শিকারি
ঘাঘরা পরে, পরে পলার মালা
আয় বেদের নারী।
মহুয়ার মউ নিয়ে ধুতুরা ফুলের পিয়ালায়
আয় আয় আয়॥

৬১

মোর প্রিয়া হবে, এস রানি, দেব খোঁপায় তারার ফুল।
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল॥

কণ্ঠে তোমার পরাব বালিকা
হংস-সারির দুলানো মালিকা,
বিজলি-জরিন ফিতায় বাঁধিব মেঘ-রং এলোচুল॥

জ্যোৎস্নার সাথে চন্দন দিয়ে মাখাব তোমার গায়,
রামধনু হতে লাল রং ছানি আলতা পরাব পায়।

আমার গানের সাত সুর দিয়া
তোমার বাসর রচিব লো প্রিয়া,
তোমারে ঘিরিয়া গাহিবে আমার কবিতার বুলবুল॥

৬২

ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি।
ভোরের হাওয়ায় কান্না পাওয়ায় তব ম্লান ছবি॥

যে বীণা তোমার পায়ের কাছে
বুক-ভরা সুর লয়ে জাগিয়া আছে,

তোমার পরশে ছড়াক হরষে
আকাশে বাতাসে তার সুরের সুরভি॥

তোমার যে প্রিয়া
গেল বিদায় নিয়া
অভিমানে রাতে
গোলাপ হয়ে কাঁদে তাহারি কামনা
উদাস প্রাতে।
ফিরে যে আসিবে না ভোল তাহারে,
চাহ তাহার পানে দাঁড়ায়ে যে দ্বারে,
অস্ত-চাঁদের বাসনা ভোলাতে অরুণ অনুরাগে
উদিল রবি॥

৬৩

নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায়
কে যায়, কে যায়, কে যায়।
যেন জলে চলে থল-কমলিনী
ভ্রমর নূপুর হয়ে বোলে পায় পায়॥

কলসে কঙ্কণে রিনিঠিনি ঝনকে
চমকায় উন্মন চম্পা বনকে
দলিত অঞ্জন নয়নে ঝলকে
পলকে খঞ্জন হরিণী লুকায়॥

অঙ্গের ছন্দে পলাশ মাধবী অশোক ফোটে
নূপুর শুনি বন-তুলসীর মঞ্জরি উলসিয়া ওঠে।

মেঘ-বিজড়িত রাঙা গোধুলি
নামিয়া এল বুঝি পথ ভুলি ;
তাহারি অঙ্গ-তরঙ্গ-বিভঙ্গে
কূলে কূলে নদী-জল উথলায়॥

৬৪

আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়, চাঁদ নেহারিয়া প্রিয়
মোরে যদি মনে পড়ে, বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিও॥

সুরের ডুরিতে জপমালা সম
তব নাম গাঁথা ছিল প্রিয়তম,
দুয়ারে ভিখারি গাহিলে সে গান
তুমি ফিরে না চাহিও॥

অভিশাপ দিও, বকুল-কুঞ্জে যদি কুহু গেয়ে ওঠে,
চরণে দলিও সেই জুঁই গাছে আর যদি ফুল ফোটে।
মোর স্মৃতি আছে যা কিছু যেথায়
যেন তাহা চির-তরে মুছে যায়,
(মোর) যে ছবি ভাঙিয়া ফেলেছ ধুলায়
আর তুলে নাহি নিও।
(তারে) তুলে নাহি নিও॥

৬৫

আমায় নহে গো, ভালোবাস শুধু ভালোবাস মোর গান।
বনের পাখিরে কে চিনে রাখে গান হলে অবসান॥

চাঁদেরে কে চায়, জ্যোছনা সবাই যাচে,
গীত-শেষে বীণা পড়ে থাকে ধূলি-মাঝে,
তুমি বুঝিবে না, আলো দিতে কত পুড়ে প্রদীপের প্রাণ॥

যে কাঁটা-লতার আঁখি-জল হায়, ফুল হয়ে ওঠে ফুটে,
ফুল নিয়ে তার—দিয়েছ কি কিছু শূন্য পত্রপুটে।

সবাই তৃষ্ণা মিটায় নদীর জলে,
কি তৃষা জাগে সে নদীর হিয়া-তলে
বেদনায় মহাসাগরের কাছে করো তার সন্ধান॥

৬৬

(দোলন-চম্পা)

দোলন-চাঁপা বনে দোলে, দোল-পূর্ণিমা রাতে
চাঁদের সাথে।
(শ্যাম) পল্লব-কোলে যেন দোলে রাধা
লতার দোলনাতে॥

(যেন) দেব-কুমারীর শুভ্র হাসি
ফুল হয়ে দোলে ধরায় আসি,
আরতির মৃদু জ্যোতি প্রদীপ-কলি—
দোলে যেন দেউল-আঙিনাতে॥

বন-দেবীর ও কি রূপালী ঝুমকা চৈতী সমীরণে দোলে।
রাতের সলাজ আঁখি-তারা যেন তিমির আঁচলে।
ও যেন মুঠি-ভরা চন্দন-গন্ধ
দোলে রে গোপিনীর গোপন আনন্দ,
ও কি রে চুরি-করা শ্যামের নূপুর
চন্দ্র-যামিনীর মোহন হাতে॥

৬৭

জুঁই-কুঞ্জে বন-ভোমরা কেন গুঞ্জে গুনগুন!
প্রেম-ঝর্নার মধু-মঞ্জরি বাজে বক্ষে রুনঝুন॥

মন-গোলাপের পাপড়ি কাঁপে কেন গো
স্বপন দেখে পালিয়ে যাওয়া বুলবুলি যেন গো,
চুড়ি কঙ্কণে কোন আনমনা সাকি পেয়ালা বাজায়
রিনিঠিনি ঠুনঠুন॥

ছলছল চোখে চাঁদ আসমানে জলসায়
সঙ্গিনী তারাদের ভুলে ধরায় কুমুদীর পানে কে চায়,
হৃদয়ের এই নির্দয় খেলা দেখে
হাস্নুহানা হেসে খুন॥

৬৮

মমতাজ ! মমতাজ ! তোমার তাজমহল
(যেন) বৃন্দাবনের একমুঠো প্রেম, ফিরদৌসের একমুঠো প্রেম
আজো করে ঝলমল ॥

কত সম্রাট হল ধুলি স্মৃতির গোরস্থানে,
পৃথিবী ভুলিতে নারে প্রেমিক শাজাহানে।
শ্বেত মর্মরে সেই বিরহীর ক্রন্দন-মর্মর
গুঞ্জরে অবিরল ॥
কেমনে জানিল শাজাহান, প্রেম পৃথিবীতে মরে যায় !
(তাই) পাষাণ প্রেমের স্মৃতি রেখে গেল পাষাণে লিখিয়া হায় !
(যেন) তাজের পাষাণ অঞ্জলি লয়ে নিঠুর বিধাতা পানে,
অতৃপ্ত প্রেম বিরহী-আত্মা আজো অভিযোগ হানে,
(বুঝি) সেই লাজে বালুকায় মুখ লুকাইতে চায়
শীর্ণা যমুনা-জল ॥

৬৯

আমি জানি তব মন, আমি বুঝি তব ভাষা।
তব কঠিন হিয়ার তলে জাগে
কি গভীর ভালোবাসা ॥
ওগো উদাসীন। আমি জানি তব ব্যথা,
আহত পাখির বুকে বাণ বিঁধে কোথা,
কোন অভিমানে ভুলিয়াছ তুমি
ভালোবাসিবার আশা ॥

তুমি কেন হানো অবহেলা অকারণে আপনাকে !
বঁধু, যে হৃদয়ে বিষ থাকে, সেই হৃদয়ে অমৃত থাকে।

তব যে বুকে জাগে প্রলয়-ঝড়ে জ্বালা
আমি দেখেছি যে সেথা সজল মেঘের মালা,
ওগো ক্ষুধাতুর, আমারে আহুতি দিলে
মিটিবে কি তব পরানের পিপাসা ॥

৭০

স্বপ্নে দেখি একটি নূতন ঘর। তুমি আমি দুজন
প্রিয়, তুমি আমি দুজন।
বাহিরে বকুল-বনে কুহু পাপিয়ায় করে কূজন॥

আবেশে ঢুলে ফুল-শয্যায় শুই,
মুখ টিপে হাসে মল্লিকা জুঁই,
কানে কানে বলে, 'চিনেছি ঐ উতল সমীরণ॥'

পূর্ণিমা চাঁদ কয়, গান আর সুর চঞ্চল, ওরা দুজন।
প্রেম জ্যোতি : আনন্দ অবিরল ছলছল, ওরা দুজন!

মৌমাছি কয়, গুনগুন গান গাই
মুখোমুখি দুজনে সেইখানে যাই,
শারদীয়া শেফালি গায়ে পড়ে কয়—
'ব্রজের মধুবন এই তো ব্রজের মধুবন।'

৭১

ছড়ায়ে বৃষ্টির বেলফুল
দুলায়ে মেঘলা চাঁচর চুল
চপল চোখে কাজল মেখে আসিলে কে॥
বাজায়ে কে মেঘের মাদল
ভাঙলে ঘুম ছিটিয়ে জল,
একা-ঘরে বিজলিতে এমন হাসি হাসিলে কে॥

এলে কি দূরন্ত মোর ঝোড়ো হাওয়া,
চির-নিঠুর প্রিয় মধুর পথ চাওয়া।
হৃদয়ে মোর দোলা লাগে,
ঝুলনেরই আবেশ জাগে,
ফেলে-যাওয়া বাসি মালায় আবার ভালোবাসিলে কে॥

৭২

রাঙা মাটির পথে লো মাদল বাজে
বাজে বাঁশের বাঁশি।
বাঁশি বাজে বুকের মাঝে লো,
মন লাগে না কাজে লো,
রইতে নারি ঘরে ওলো প্রাণ হল উদাসী লো॥

মাদলিয়ার তালে তালে অঙ্গ ওঠে দুলে,
দোল লাগে শাল-পিয়াল বনে নোটন খোঁপার ফুলে।
মহুয়া বনে লুটিয়ে পড়ে মাতাল চাঁদের হাসি লো॥

চোখে ভালো লাগে যাকে
তারে দেখব পথের বাঁকে,
তার চাঁচর কেশে পরিয়ে দেব ঝুমকো জবার ফুল,
তার গলার মালার কুসুম কেড়ে করব কানের দুল।
তার নাচের তালে ইশারাতে বলব, ভালোবাসি লো॥

৭৩

রিম ঝিম রিম ঝিম ঝিম ঘন দেয়া বরষে
কাজরী নাচিয়া চল পুরনারী হরষে॥

কদম তমাল ডালে দোলনা দোলে।
—কুহু পাপিয়া ময়ূর বোলে।
মনের বনের মুকুল খোলে
নটশ্যাম সুন্দর মেঘ পরশে॥
হৃদয়-যমুনা আজ কূল জানে না গো
মনের রাধা আজ বাধা মানে না গো।

ডাকিছে ঘর-ছাড়া ঝড়ের বাঁশি,
অশনি আঘাত হানে দুয়ারে আসি,
গরজাক গুরুজন ভবনবাসী
আমরা বাহিরে যাব ঘনশ্যাম দরশে॥

৭৪

ওগো প্রিয়, তব গান!
আকাশ-গাঙের জোয়ারে
উজান বহিয়া যায়।
মোর কথাগুলি বুকের মাঝারে
পথ খুঁজে নাহি পায়॥

ওগো দখিনা পবন, ফুলের সুরভি বহ
ওরি সাথে মোর না-বলা বাণী লহ,
ওগো মেঘ, তুমি মোর হয়ে গিয়ে কহ,
বন্দিনী গিরি ঝর্না পাষাণ-তলে
যে কথা কহিতে চায়॥

ওরে ও সুরমা, পদ্মা, কর্ণফুলি, তোদের ভাটির স্রোতে
নিয়ে যা আমার না-বলা বাণীগুলি ধুয়ে মোর বুক হতে।

(ওরে) 'চোখ গেল' 'বৌ কথা কও' পাখি,
তোদের কণ্ঠে মোর সুর যাই রাখি কি?
(ওরে) মাঠের মুরলী কহিও তাহারে ডাকি,
আমার এ কলির না-ফোটা বুলি
ঝরে গেল নিরাশায়॥

৭৫

কেমনে হইব পার
হে প্রিয়, তোমার আমার মাঝে এ
বিরহের পারাবার॥

নিশীথের চখা-চখির মতন
দুই কূলে থাকি কাঁদি দুইজন,
আসিল না দিন মোদের জীবনে
অন্তহীন আঁধার।
কেমনে হইব পার॥

সেধেছিনু বুঝি বাদ
কাহার মিলনে সে কোন জনমে,
তাই মিটিল না সাধ !
স্মৃতির তব ঝরা পালকের প্রায়
লুটায় মনের বালুচরে, হায় !
সে কোন প্রভাতে কোন নবলোকে
মিলিব মোরা আবার।

৭৬

সাপুড়িয়া রে ! বাজাও কোথায়
সাপ খেলানোর বাঁশি !
কালিদহে ঘোর উঠিল তরঙ্গ
কালনাগিনী নাচে বাহিরে আসি !

ফণি-মনসার কাঁটা-কুঞ্জতলে,
গোখরা কেউটে এল দলে দলে,
সুর শুনে ছুটে এল পাতাল-তলের
বিষধর বিষধরী রাশি রাশি॥

শন শন শন শন পুব হাওয়াতে
তোমার বাঁশি বাজে বাদলা রাতে,
মেঘের ডমরু বাজাও গুরু গুরু বাঁশির সাথে।

অঙ্গ জরজর বিষে,
বাঁচাও বিষহরি এসে,
একি বাঁশি বাজালো কালো
সর্বনাশী॥

৭৭

নদীর স্রোতে মালার কুসুম ভাসিয়ে দিলাম, প্রিয় !
আমায় তুমি নিলে না, মোর ফুলের পূজা নিও॥

পথ-চাওয়া মোর দিনগুলির
রেখে গেলাম নদীর তীরে,
আবার যদি আস ফিরে—
তুলে গলায় দিও॥
নিভে এল পরান-প্রদীপ পাষাণ-বেদীর তলে,
জ্বালিয়ে তারে রাখবে কত শুধু চোখের জলে।
তারা হয়ে দূর আকাশে
রইব জেগে তোমার আশে,
চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে
আমারে স্মরিও॥

৭৮

শোক দিয়েছ তুমি হে নাথ,
তুমি এ প্রাণে শান্তি দাও!
দুখ দিয়ে কাঁদালে যদি
তুমি হে নাথ সে দুখ ভোলাও!

যে হাত দিয়ে হানলে আঘাত
তুমি অশ্রু মোছাও সেই হাতে নাথ,
বুকের মানিক হরলে যার—
তারে তোমার শীতল বক্ষে নাও॥

তোমার যে চরণ কমল ফোটায়
সেই চরণ প্রলয় ঘটায়।
শূন্য করলে তুমি যে বুক
সেথা তুমি এসে বুক জুড়াও॥

৭৯

হে অশান্তি মোর এস এস!
(তব) প্রবল প্রেমের লাগি ভবন হতে,
বৈরাগিনী বেশে এসেছি বাহির পথে॥

কুণ্ঠা ভুলায়ে দাও, খোলো গুণ্ঠন,
দস্যু-সম মোরে করো লুণ্ঠন,
তৃণ-সম মোরে ভাসাইয়া লয়ে যাও
কূল-ভাঙা বিপুল বন্যা-স্রোতে॥

নদীরে যেমন করে টানে পারাবার,
তেমনি মরণ-টানে আমারে টানো, হে বন্ধু আমার!

প্রলয়-মেঘের বুকে বিজলি-সম
তোমারে জড়ায়ে রব হে প্রিয়তম!
হবে শুভদৃষ্টি তোমায় আমায়
মরণ-হানা অশনির আলোতে॥

৮০

গান ভুলে যাই মুখ পানে চাই, সুন্দর হে
(সুন্দর মোর!)
তব নয়ন পানে চাহি কণ্ঠের সুর কাঁপে থরথর হে
(সুন্দর মোর!)

তোমার অনুরাগে, ওগো বুলবুল!
মোর গানের লতায় ফোটে কথার ফুল,
অশ্রু হয়ে সেই ফুল তব পায়ে ঝরিতে চায় ঝরঝর হে
(সুন্দর মোর!)

এ নহে গান প্রিয়, কান্না এ যে তব বিরহে,
অন্তর-শিলাতলে রোদনের সুরধুনী সুর হয়ে বহে।

প্রিয়, এ নহে গানের ছন্দ,
এ যে আনন্দে বিষাদে মনের দ্বন্দ্ব,
(এ যে) রাগিণীর তলে তব অনুরাগিণীর
মর্মের ক্রন্দন বিলাপ-মর্মর হে
(সুন্দর মোর!)

৮১

মেঘলা নিশি-ভোরে
মন যে কেমন করে,
তারি তরে গো, মেঘবরণ যার কেশ।
বুঝি তাহারি লাগি
হয়েছে বৈরাগী
গেরুয়া-রাঙা গিরিমাটির দেশ॥

মৌরী ফুলের ক্ষেতে,
মৌমাছি ওঠে মেতে,
এলিয়েছিল কেশ কি গো তার এই পথে সে যেতে।
তার ডাগর চোখের ঝিলিক লেগে রাত হয়েছে শেষ (গো)॥

শিরীষ পাতার ঝিরিঝিরি, বাজে নূপুর তারি,
সোনার ডালে দোলে তাহার কামরাঙা-রঙ শাড়ি।
হয়েছে মন ভিখারি—
বন শিকারি আমি
উঠি পাহাড়-চূড়ায়—
ঝর্ণা-জলে নামি,
কালো পাথর দেখে জাগে কার চোখের আবেশ (গো)॥

৮২

'চোখ গেল' 'চোখ গেল' কেন ডাকিস রে—
'চোখ গেল' পাখি রে!
তোর চোখে কাহার চোখ পড়েছে নাকি রে—
'চোখ গেল' পাখি রে!

তোর চোখের বালির জ্বালা জানে সবাই রে—
জানে সবাই
চোখে যার চোখ পড়ে তার ওষুধ নাই রে—
তার ওষুধ নাই;

কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয় কাহার আঁখি রে—
'চোখ গেল' পাখি রে॥

তোর চোখের জ্বালা বুঝি নিশিরাতে বুকে লাগে
'চোখ গেল' ভুলে সে 'পিউ কাঁহা' 'পিউ কাঁহা' বলে তাই
ডাকিস অনুরাগে রে।

ওরে বন পাপিয়া, কাহার গোপন প্রিয়া
ছিলি আর-জনমে,
আজো ভুলতে নারি আজো ঝুরে হিয়া।
ওরে পাপিয়া বল, যে হারায় তাহারে কি পাওয়া যায় ডাকি রে—
'চোখ গেল' পাখি রে।
চোখ গেল' পাখি॥

৮৩

পদ্মার ঢেউ রে—
ও মোর শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যা যারে
এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা
আমি হারায়েছি তারে॥

মোর পরান-বঁধু নাই
পদ্মে তাই মধু নাই—নাই রে—
বাতাস কাঁদে বাইরে—
সে সুগন্ধ নাই রে—
মোর রূপের সরসীতে আনন্দ-মৌমাছি নাহি ঝঙ্কারে॥
ও পদ্মারে, ঢেউ এ তোর ঢেউ ওঠায় যেমন চাঁদের আলো
মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি ঝিলমিল করে কৃষ্ণ কালো।

সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশি বাজায়
যদি দেখিস, তারে—দিস সে পদ্ম তার পায়
বসিল কেন বুকে আশার দেয়ালী জ্বালিয়ে
নেমে গেল চির-অন্ধকারে॥

৮৪

কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও, মালা গাঁথ অকারণে।
আমি চেয়েছিনু একটি কুসুম, সেই কথা পড়ে মনে॥

তব ফুল-বনে কত ছায়া দোলে
জুড়াইতে চেয়েছিনু, তারি তলে,
চাহিলে না ফিরে, চলে গেলে ধীরে
ছায়া-ঢাকা অঙ্গনে।
সেই কথা পড়ে মনে॥

অঞ্জলি পাতি চেয়েছিনু, তব ভরা ঘটে ছিল বারি,
শুষ্ক কণ্ঠে ফিরিয়া আসিনু পিপাসিত পথচারী।

বহু যুগ পরে দাঁড়াইনু এসে
তোমার দুয়ারে উদাসীন বেশে,
শুকানো মালিকা কেন দিলে তুমি
তব ভিক্ষার সনে?
ভাবি বসি আনমনে॥

৮৫

আমি নহি বিদেশিনী।
(ঐ) ঝিলের ঝিনুক, বিলের শালুক ছিল মোর সঙ্গিনী॥

ঐ বাঁধা-ঘাট, ঐ বালুচর,
মাটির প্রদীপ, ঐ মেটে ঘর
চেনে মোরে ঐ তুলসীতলার নববধূ ননদিনী॥
'বৌ কথা কও' পাখি—
বাদলা নিশীথে মনের নিভৃতে আজও যায় মোরে ডাকি।
এত কালো চোখ এলোকেশ-ভার
এত শ্যাম মেঘ আছে কোথা আর,
(ওই) পদ্ম-পুকুরে মোরে স্মরি ঝুরে সখি মোর কমলিনী॥

৮৬

মেঘ-মেদুর বরষায় কোথা তুমি !
ফুল ছড়ায়ে কাঁদে বনভূমি ॥

ঝরে বারি-ধারা,
ফিরে এস পথ-হারা,
কাঁদে নদীতট চুমি ॥

৮৭

নিরজন ফুলবনে এস পিয়া
রহি রহি বোলে কোয়েলিয়া।
পথ পানে চাহি,
নাহি নিদ নাহি,
ঝরা ফুল জড়ায়ে ঝুরে হিয়া ॥

৮৮

সেই মিঠে সুরে মাঠের বাঁশরি বাজে।
নিঝুম নিশীথে ব্যথিত বুকের মাঝে ॥

মনে পড়ে যায় সহসা কখন
জল-ভরা দুটি ডাগর নয়ন
পিঠ-ভরা চুল সেই চাঁপা ফুল
ফেলে ছুটে যাওয়া লাজে ॥

হারানো সে দিন পাব না গো আর ফিরে,
দেখিতে পাব না আর সেই কিশোরীরে।

তবু মাঝে মাঝে আশা জাগে কেন
আমি ভুলিয়াছি ভোলেনি সে যেন,

গোমতীর তীরে পাতার কুটিরে
আজও পথ চাহে সাঁঝে।
(সে) আজও পথ চাহে সাঁঝে॥

৮৯

(তুমি) শুনিতে চেয়ো না আমার মনের কথা।
দখিনা বাতাস ইঙ্গিতে বোঝে
কহে যাহা বনলতা॥

চুপ করে চাঁদ সুদূর গগনে
মহাসাগরের ক্রন্দন শোনে,
ভ্রমর কাঁদিয়া ভাঙিতে পারে না
কুসুমের নীরবতা॥

মনের কথা কি মুখে সব বলা যায়?
রাতের আঁধার যত তারা ফোটে
আঁখি কি দেখিতে পায়?

পাখায় পাখায় বাঁধা যবে রয়
বিহগ-মিথুন কথা নাহি কয়,
মধুকর যবে ফুলে মধু পায়
রহে না চঞ্চলতা॥

৯০

গাঙে জোয়ার এল ফিরে, তুমি এলে কই।
খিড়কি দুয়ার খুলে পথ-পানে চেয়ে রই॥

কালোজামের ডালের ফাঁকে
আমায় দেখে কোকিল ডাকে,
আজও কেন যায় না দেখা তোমার নায়ের ছই॥

চুল বেঁধে আর সেজে গুজে পিদিম জ্বালাই সাঁজে,
ঠাকুরঝিরা মুচকি হাসে, আমি মরি লাজে।

বাদলা রাতে বৃষ্টি ঝরে,
মন যে আমার কেমন করে,
আমার চোখের জলে বন্ধু মাঠ করে থই-থই॥

৯১

রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম
খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে কে যায়।
ওড়না তাহার ঘূর্ণী হাওয়ায় দোলে
কুসুম ছড়ায় পথের বালুকায়॥
তার ভুরুর ধনুক বেঁকে ওঠে তনুর তলোয়ার,
সে যেতে যেতে ছড়ায় পথে পাথরকুচির হার।
তার ডালিম-ফুলের ডালি
গোলাপ-গালের লালি
(যেন) ঈদের চাঁদও চায়॥

আরবি ঘোড়ার সওয়ার বাদশাজাদা বুঝি
সাহারাতে ফেরে কোন মরীচিকায় খুঁজি।
কত তরুণ মুসাফির পথ হারালো, হায়!
কত বনের হরিণ মরে তারি রূপ-তৃষায়॥

৯২

নিশি-পবন। নিশি-পবন! ফুলের দেশে যাও!
ফুলের বনে ঘুমায় কন্যা, তাহারে জাগাও॥

মউ টুসটুস মুখখানি তার ঢেউ-খেলানো চুল
ভোমরার ঝাঁক ঘেরা যেন ভোরের পদ্ম ফুল!
হাসিতে যার মাঠের সরল বাঁশির আভাস পাও॥

চাঁপা ফুলের পুতলি–ঘেরা চাঁপা রঙের শাড়ি,
তারেই দেখতে আকাশ গাঙে চাঁদ দেয় রে পাড়ি।
(তার) একটুখানি চোখের আদল বাদল–মেঘে পাও॥

ধীরে ধীরে জাগাইও তায়
ঝরা কুসুম ফেলিয়া গায়
জাগলে কন্যা যেন রে মোর পত্রখানি দাও॥

৯৩

কোন সে সুদূর অশোক–কাননে বন্দিনী তুমি সীতা।
আর কতকাল জ্বলিবে আমার বুকে বিরহের চিতা।
সীতা–সীতা ! !

বিরহে তোমার অরণ্যচারী
কাঁদে রঘুবীর বল্কলধারী,
ঝরা চামেলির অশ্রু ঝরায়ে ঝুরিছে বন–দুহিতা।
সীতা—সীতা ! !

তোমরা আমার এই অনন্ত অসীম বিরহ নিয়া
কত আদি কবি কত রামায়ণ রচিবে কে জানে প্রিয়া !
বেদনার সুর–সাগর তীরে
দয়িতা আমার এস এস ফিরে,
আবার আঁধার হৃদি–অযোধ্যা হইবে দীপান্বিতা॥
সীতা—সীতা ! !

৯৪

তব চলার পথে আমার গানের ফুল ছড়িয়ে যাই গো
ফুল ছড়িয়ে যাই।
তারা ধুলায় পড়ে কাঁদে, বলে, 'তোমার পরশ হতে চাই গো
আলতা হতে চাই !'

ওরা রাঙা হয়ে অনুরাগের রসে
তোমার চরণ-তলে পড়ে খসে,
ওদের দলে যেও না যদি হয় বক্ষে তোমার ঠাঁই গো ! !

ওরা বুক পেতে দেয় পায়ের কাছে, অশ্রু-টলমল
বলে, 'ধূলির পথে চলো না গো, ফুলের পথে চল !'

(তুমি) চরণ ফেল কেন ভয়ে ভয়ে,
বিরহ মোর ফুটেছে ফুল হয়ে,
কাঁটা আছে আমার বুকে, ফুলে কাঁটা নাই গো॥

৯৫

শুকনো পাতার নূপুর বাজে দখিন বায়ে !
কে এলে গো কে এলে গো চপল পায়ে॥

ছায়া-ঢাকা আমের ডালে চপল আঁখি
উঠল ডাকি বনের পাখি উঠল ডাকি
নতুন চাঁদের জ্যোৎস্না মাখি
সোনার শাখায় দোল দুলায়ে ! !
সুনীল তোমার ডাগর চোখের দৃষ্টি পিয়ে
সাগর দোলে আকাশ ওঠে ঝিলমিলিয়ে।

পিয়াল বনে উঠল বাজি তোমার বেণু,
ছড়ায় পথে কৃষ্ণচূড়া পরাগ-রেণু,
ময়ূর-পাখা বুলিয়ে চোখে
কে গো দিল ঘুম ভাঙায়ে॥

৯৬

জানি, জানি প্রিয়, এ জীবনে মিটিবে না সাধ।
আমি জলের কুমুদিনী ঝরিব জলে
তুমি দূর গগনে থাকি কাঁদিবে চাঁদ॥

আমাদের মাঝে বঁধু বিরহ-বাতাস
চিরদিন ফেলে যাবে দীরঘ শ্বাস,
কভু পায় না বুকে, তবু মুখে মুখে
চাঁদ কুমুদীর নামে রটে অপবাদ॥

তুমি কত দূরে বঁধু, তবু বুকে এত মধু কেন উথলায়,
হাতের কাছে রহ রাতের চাঁদ মোর, ধরা নাহি যায়
তবু ছোঁওয়া নাহি যায়।

মরুতৃষা লয়ে কাঁদে শূন্য হিয়া,
তবু সকলে বলে, আমি তোমারি প্রিয়া।
সেই কলঙ্ক-গৌরব সৌরভ দিল বুকে,
মধুর হল মোর বিরহ-বিষাদ॥

৯৭

বঁধু তোমার আমার এই যে বিরহ
এক জনমের নহে।
তাই যত কাছে পাই তত এ হিয়ায়
কি যেন অভাব রহে॥

বারে বারে মোরা কত সে ভুবনে আসি
দেখিয়া নিমেষে দুইজনে ভালোবাসি,
দলিয়া সহসা মিলনের সেই মালা
(কেন) চলিয়া গিয়াছি দোঁহে॥
আমরা বুঝি গো বাঁধিব না ঘর, অভিশাপ বিধাতার।
শুধু চেয়ে থাকি, কেঁদে কেঁদে ডাকি, চাঁদ আর পারাবার।

মোদের জীবন-মঞ্জরি দু'টি হায়!
শতবার ফোটে, শতবার ঝরে যায়;
(বঁধু) আমি কাঁদি ব্রজে, তুমি কাঁদ মথুরায়,
(মাঝে) অপার যমুনা বহে॥

৯৮

আনার কলি, আনার কলি, আনার কলি !
স্বপ্ন দেখে কোন ডালিম-কুমারে
এসেছিলে রেবা ঝিলমের পারে
দিতে তব রাঙা হৃদয়ের অঞ্জলি ॥

মরুর মণিকা বাদশাহি নওরোজে
এসেছিলে কোন হারানো হিয়ার খোঁজে ;
তব রূপ হেরি হেরেমের দীপমালা
পতঙ্গ-সম পাপড়ির পাখা মেলি
আনার কলি গো—
সেলিমের অনুরাগ-মোমের প্রদীপে পড়িলে ঢলি গো ॥

মোগলের মসনদ মিলায়েছে মাটিতে,
তুমি আজো দুলিতেছ ফুলের হাসিতে
বিরহীর বাঁশিতে ;
তব জীবন্ত সমাধির বিগলিত পাষাণে
আজিও প্রেম-যমুনার ঢেউ ওঠে উতলি।
আনার কলি, আনার কলি ॥

৯৯

চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা, চাঁদের চেয়েও জ্যোতি
তুমি দেখাইলে, মহিমান্বিতা, নারী কি শক্তিমতি ॥

শিখালে কাঁকন চুড়ি পরিয়াও নারী
ধরিতে পারে যে উদ্ধত তরবারি—
যদি না রহিতে অবরোধের দুর্গে হতো না এ-দুর্গতি ॥
তুমি দেখালে নারীর শক্তি-স্বরূপ চিন্ময়ী কল্যাণী
ভারত-জয়ীর দর্প নাশিয়া, মুছালে নারীর গ্লানি।

তাই গোলকুণ্ডার কোহিনুর হীরা-সম
আজো ইতিহাসে জ্বলিতেছ নিরুপম।
রণরঙ্গিনী ফিরে এসো—
তুমি ফিরিয়া আসিলে, ফিরিয়া আসিবে লক্ষ্মী ও স্বরস্বতী ॥

১০০

এল ওই	পূর্ণিমা চাঁদ	ফুল-জাগানো
বহে বায়	বকুল-বনের	ঘুম-ভাঙানো ॥
লাগিল	জাফরানি-রঙ	শিউলি-ফুলে
ফুটিল	প্রেমের কুঁড়ি	পাপড়ি খুলে,
খুশির আজ	আমেজ লাগে	মন-রাঙানো ॥
চাঁদিনী	ঝিলমিলায় নীল	ঝিলের জলে,
আবেশে	শাপলা ফুলের	মৃণাল টলে,
জাগে ঢেউ	দিঘির বুকে	দোল-লাগানো ॥
এস আজ	স্বপন-কুমার	নিরিবিলি
খুলিয়া	গোপন প্রাণের	ঝিলিমিলি,
এস মোর	হতাশ প্রাণের	ভুল-ভাঙানো ॥

১০১

পঞ্চ প্রাণের প্রদীপ-শিখায়
লহ আমার শেষ আরতি।
ওগো আমার পরম-গতি
ওগো আমার পরম পতি ॥

বহু সে কাল বাহির-দ্বারে
দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে,
এবার দেহের দেউল ভেঙে
দেখব, নিঠুর, তোমার জ্যোতি ॥
আমি তোমায় চেয়েছিলাম,
শুধু এই সে অপরাধে
ধ্যান ভেঙেছ আমার, ফেলে
নিত্য নূতন মায়ার ফাঁদে।

আজ মায়ার ঘরে আগুন জ্বেলে
পালিয়ে গেলাম পাখা মেলে,
জীবন যাহার মিথ্যা স্বপন
মরণে তার নাই কো ক্ষতি ॥

কেটে দিলাম নিঠুর হাতে
যে বাঁধনে বেঁধেছিলে,
রইলো না আর আমার বলে
কোনো স্মৃতি এ-নিখিলে।

আবার যদি তোমার মায়ায়
রূপ নিতে হয় নূতন কায়ায়,
তোমার প্রকাশ রুদ্ধ যেথায়
যেথায় যেন না হয় গতি॥

নাটক ও নাটিকা

বিদ্যাপতি ১৯৩৫
বাসন্তিকা ১৯৩৫

বিদ্যাপতি

(পালা-নাটিকা)

চরিত্র : দেবী দুর্গা, দেবী গঙ্গা, কবি বিদ্যাপতি, শিবসিংহ (মিথিলার রাজা), লছমী (মিথিলার রানি), অনুরাধা (বিষ্ণু-উপাসিকা), বিজয়া (বিদ্যাপতির কনিষ্ঠা ভগ্নী), ধনঞ্জয় (রাজ-বয়স্য)।

প্রথম খণ্ড

কাল—পঞ্চদশ শতাব্দী

[মিথিলার কমলা নদীর তীরে বিসকি গ্রাম। তাহারই উদ্যানবাটিকায় দেবী দুর্গা-মন্দির। কবি বিদ্যাপতি দুর্গাস্তব গান করিতেছেন।]

(স্তব)

জয় জগজ্জননী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-বন্দিতা,
জয় মা ত্রিলোকতারিণী।
জয় আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী নন্দনলোক-নন্দিতা
জয় দুর্গতিহারিণী॥
তোমাতে সর্বজীবের বসতি, সর্বাশ্রয় তুমি মা,
ক্ষয় হয় সব বন্ধন পাপতাপ তব পদ চুমি মা।
তুমি শাশ্বতী, সৃষ্টি-স্থিতি, তুমি মা প্রলয়কারিণী॥
তুমি মা শ্রদ্ধা প্রেমভক্তি তুমি কল্যাণ-সিদ্ধি,
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ তুমি তন-জন-ঋদ্ধি।
জয় বরাভয়া ত্রিগুণময়ী দশপ্রহরণধারিণী
জয় মা ত্রিলোকতারিণী॥

অনুরাধা : ঠাকুর ! ঠাকুর !
বিদ্যাপতি : (মন্দির-অভ্যন্তর হইতে) কে ?

অনুরাধা : আমি অনুরাধা, একটু বাইরে বেরিয়ে আসবে?

বিদ্যাপতি : (মন্দিরদ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া—বিরক্তির সুরে) একটু অপেক্ষা করলেই পারতে অনুরাধা। এত বড়ো ভক্তিমতী হয়ে তুমি মায়ের নামগানে বাধা দিলে?

অনুরাধা : আমায় ক্ষমা করো ঠাকুর। অত্যন্ত প্রয়োজনে আমি তোমার ধ্যানভঙ্গ করেছি। আমার কৃষ্ণগোপালের জন্য আজ কোথাও ফুল পেলাম না। তোমার বাগানে অনেক ফুল, আমার গিরিধারীলালের জন্য কিছু ফুল নেব? আমার গোপালের এখনও পূজা হয়নি।

বিদ্যাপতি : তুমি তো জান অনুরাধা, এ বাগানে ফুল ফোটে শুধু আমার মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য। এ ফুল তো অন্য কোনো দেবদেবীকে দিতে পারিনে! (মন্দিরদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন ; মন্দির-অভ্যন্তরে স্তবপাঠের মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল।)

অনুরাধা : (অশ্রুসিক্ত) ঠাকুর! ঠাকুর! তুমি কি সত্যই এত নিষ্ঠুর? তবে কি আমার ঠাকুরের পূজা হবে না আজ? আমার কৃষ্ণগোপাল! আমার প্রিয়তম! তুমি যদি সত্য হও আর আমার প্রেম যদি সত্য হয়, তা হলে আজ এই বাগানের একটি ফুলও অন্য কারুর পূজায় লাগবে না। এই বাগানের সকল ফুল তোমার চরণে নিবেদন করে গেলাম। (প্রস্থান)

বিদ্যাপতি : (গুনগুন স্বরে)

মা! আমার মনে আমার বনে
ফোটে যত কুসুমদল
সে ফুল মাগো তোরই তরে
পূজতে তোরই চরণতল॥

বিজয়া : দাদা। পূজার ফুল এনেছি। দোর খোলো।

বিদ্যাপতি : (দ্বার খুলিয়া) দে। বিজয়া, মা এখন কেমন আছেন রে?

বিজয়া : আমার তো ভালো মনে হচ্ছে না দাদা, কেমন যেন করছেন। আচ্ছা দাদা, অনুরাধা কাঁদতে কাঁদতে গেল কেন? তুমি কেন যেন তাকে দু-চোখে দেখতে পার না।

বিদ্যাপতি : হাঁ, আমি ওকে এক-চোখোমি করে এক চোখেই দেখি। আমি পূজো সেরেই আসছি। (বিজয়া চলিয়া গেল ; বিদ্যাপতি মন্দিরদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন ; ভিতর হইতে স্তবপাঠের শব্দ শোনা গেল।)

বিদ্যাপতি : নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ—

[অন্তরীক্ষ হইতে প্রত্যাদেশ]

ক্ষান্ত হও বিদ্যাপতি ! ও ফুল শ্রীকৃষ্ণ-চরণে নিবেদিত। বিষ্ণু-আরাধিকা যে ফুল শ্রীহরির চরণে নিবেদন করে গেছে, সে ফুল নেবার অধিকার আমার নেই।

বিদ্যাপতি : মা ! মা ! এ তোর মায়া, না সত্য ?

দেবীদুর্গা : শোনো পুত্র ! তুমি হয়তো জান না যে, আমি পরমা বৈষ্ণবী ! জগৎকে বিষ্ণুভক্তি দান করি আমিই।

বিদ্যাপতি : তোর ইঙ্গিত বুঝেছি মহামায়া। তবে তোরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক ইচ্ছাময়ী। আমি আজ থেকে বিষ্ণুরই আরাধনা করব।

[গান]

আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে জপবো আমি শ্যামের নাম
মা হলো মোর মন্ত্রগুরু, ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম॥

বিজয়া : (কাঁদিতে কাঁদিতে) দাদা ! দাদা ! শিগরির এসো। মা আমাদের ছেড়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

বিদ্যাপতি : বিজয়া ! বিজয়া ! মা নেই, মা চলে গেলেন ? (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শান্ত স্বরে) হ্যাঁ,—মা তো আমার নেই। আমি এই মুহূর্তে মাতৃহারা হলাম। আমার ভুবনের মা আমার ভবনের মা, দু-জনেই একসঙ্গে ছেড়ে গেলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

[মিথিলার রাজ-অন্তঃপুরের উদ্যানবাটিকা]

বিদ্যাপতি : মিথিলার রাজা শিবসিংহের জয় হোক !

রাজা শিবসিংহ : স্বাগত বিদ্যাপতি ! বন্ধু ! তোমার মাতৃশোক ভুলবার যথেষ্ট অবসর না দিয়ে স্বার্থপরের মতো রাজধানীতে ডেকে এনেছি। আমার অপরাধ নিয়ো না সখা।

বিদ্যাপতি : মহারাজ ! আমি আপনার দাসানুদাস। শুধু আমি কেন, আমরা পুরুষানুক্রমে মিথিলার রাজ-অনুগ্রহে ও আশ্রয়ের স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় লালিত-পালিত। আপনার আদেশ আমার সকল দুঃখের ঊর্ধ্বে।

রাজা : তুমি জান সখা, রাজসভার বাইরে তুমি ওভাবে কথা বললে আমি কত বেদনা পাই। আমরা সহপাঠী বন্ধু, আমাদের সে বন্ধুত্বকে

আড়াল করে দাঁড়িয়েছে এই তুচ্ছ রাজ-সিংহাসন। আর তোমরা তো রাজ-অনুগৃহীত নও বন্ধু, মিথিলার রাজারাই তোমাদের কাছে ঋণী, অনুগৃহীত। তোমরা পুরুষানুক্রমে প্রধানমন্ত্রী হয়ে মিথিলার রাজা ও রাজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছ।

বিদ্যাপতি : আমায় ক্ষমা করো সখা। এই রাজসভার বাইরে যখন তোমায় দেখি, তখন ইচ্ছা করে তোমায় আগের মতো করেই বক্ষে জড়িয়ে ধরি। তবু কীসের যেন সংকোচ এসে বাধা দেয়।

রাজা : বিদ্যাপতি ! রাজা ও মন্ত্রীর সম্পর্ক ছাড়াও আমরা আজ বেদনার তীর্থে হয়ে গেছি এক পরমাত্মীয়। তুমি হারিয়েছ তোমার মাকে ; আমিও হারিয়েছি আমরা দেবতুল্য পিতা দেবসিংহকে।

রানি লছমী : তুমি তো শুধু রাজমন্ত্রীই নও বিদ্যাপতি। তুমি রাজকবিও। মিথিলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি !

বিদ্যাপতি : মহারানি এখানে আছেন, তা তো বল নাই সখা।

রাজা : রানি লছমী দেবীর অনুরোধেই তোমায় এত তাড়া দিয়ে এনেছি বন্ধু। তোমার কণ্ঠের গান না শুনলে নাকি ওঁর সে-দিনটাই ব্যর্থ। এত শ্রদ্ধা তোমার ওপর, তবু মাঝে ওই পর্দাটুকু উঠল না। ওই নিরর্থক লজ্জার আবরণ আমাকেই লজ্জা দেয় বেশি।

বিদ্যাপতি : দেবীরা চিরকাল যবনিকার অন্তরালেই থাকতে ভালোবাসেন, বন্ধু ! ওঁরা হলেন অন্তর-লোকের অসূর্যম্পশ্যা, বাইরের আলোর রূঢ়তা ওদের জন্য নয়।

রাজা : তবু যাকে দেখা যায় না, অথচ কথা শুনতে পাওয়া যায় তাকে যে লোক চিরকালই ভয় পেয়ে থাকে বিদ্যাপতি !

রানি লছমী : তার মানে আমি পেতনি, এই তো ! বেশ, আমি তাই। কবি ! আর কথা নয়, এবার আলাপন হোক শুধু গানে গানে।

বিদ্যাপতি : মহারানির আদেশ শিরোধার্য। কোন গান গাইব, দেবী ?

রানি : আমার সেই প্রিয় গান—'জনম জনম হাম রূপ নেহারলুঁ, ও গানটা আমার কাছে কখনও পুরানো হলো না।

বিদ্যাপতি :

[গান]

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ, নয়ন ন তিরপিত ভেল !
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখলুঁ, তবু হিয় জুড়ন ন গেল !
দেখি সাধ না ফুরায় গো !
হিয়া কেন না জুড়ায় গো
হিয়ার উপরে গিয়া
হিয়া তবু না জুড়ায় গো !

তৃতীয় খণ্ড

[অনুরাধার গীত]

সখি লো—
অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মানিক কো হরি লেল॥
(হরি হরিয়া নিল কে)
গোকুলে উছলল করুণাক রোল
নয়নক সলিলে বহয়ে হিলোল।
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী,
শূন ভেল দশদিশি শূন ভেল সগরী।
কৈছন যাওব যমুনা-তীর
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটির।
নয়নক নিন্দ গেও, বয়ানক হাস,
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুখ হম পাশ।
পাপ পরান মম আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুরে।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
রাধারে কাঁদায়ে রহি দুরে॥

রানি : রাজা! কে যায় পথে অমন করুণ সুরে গান গেয়ে? ওকে এখানে ডাকো না!

বিদ্যাপতি : মহারানি! আমি ওকে জানি। আমি যেখানে যাই, ও আপনি এসে হয় আমার প্রতিবেশিনী। ওর নাম অনুরাধা। গিরিধারীলাল শ্রীকৃষ্ণ ওর জপমালা।

রানি : তা হলে তুমিই ওকে ডেকে আনো না, কবি!

বিদ্যাপতি : আমি যাচ্ছি দেবী, কিন্তু জানি না ও আসবে কি না।

(বিদ্যাপতির প্রস্থান)

রাজা : রানি! এখন বোধ হয় বুঝতে পেরেছ—বিদ্যাপতি হঠাৎ কেন বিষ্ণুউপাসক হয়ে উঠল!

রানি : সত্যিকার ভালো না বাসলে কারুর কণ্ঠ এত মধুময় এত আবেগবিহ্বল হয় না। ও যেন মূর্তিমতি কান্না।

(গান গাহিতে গাহিতে অনুরাধার প্রবেশ)

সজল নয়ন করি পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।

(যেন শত যুগ মনে হয়

তারে এক তিল না হেরিলে শত যুগ মনে হয়)

বিধি বড়ো দারুণ তাহে পুন ঐছন

দরহি করলুঁ মুরারি।

আন অনুরাগে পিয়া আনদেশে গেলা

পিয়া বিনু পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা।

নারীর দীর্ঘশ্বাস পড়ুক তাহার পাশ

মোর পিয়া যার পাশে বইসে,

প্যাখি যদি হওঁ পিয়া পাশে উড়ি যাওঁ

সব দুখ কহু তার পাশে।

আনি দেহ মোর পিউ রাখহ আমার জিউ

কো আছ করুণাবান।

বিদ্যাপতি : বিদ্যাপতি কহে ধৈরজ ধরো চিত

তুরিতহি মিলব কান॥

রানি : অনুরাধা, কী মিষ্টি নাম তোমার! তুমি আমার কাছে থাকবে? বিদ্যাপতি! তুমি যদি অনুমতি দাও, অনুরাধাকে আমার কাছে রেখে শ্যামনাম শুনি।

বিদ্যাপতি : আমি তো ওর অভিভাবক নই ; দেবী! ও আমার ছোটো বোন বিজয়ার বন্ধু।

রানি : ওর বাবা-মা কোথায় থাকেন?

বিদ্যাপতি : গতবার দেশে যখন মড়ক লাগে, তখন ওর বাবা-মা দুজনেই মারা যান। যে বিসকি গ্রাম মহারাজ আমায় দান করেছেন, ওর বাবা ছিলেন সেই গ্রামের বিষ্ণু-মন্দিরের পুরোহিত। এখন ওর অভিভাবিকা,

বন্ধু—সব বিজয়া।

রানি : ওর বিয়ে হয়নি?

বিদ্যাপতি : না। (হাসিয়া) ও বলে বিয়ে করবে না।

অনুরাধা : বা রে, আমি বুঝি তোমার গলা ধরে বলেছি যে, আমি বিয়ে করব না। না মহারানি, ঠাকুর জানেন না, আমার বিয়ে হয়েছে।

বিদ্যাপতি : তোমার বিয়ে হয়েছে? কার সাথে?

অনুরাধা : সে তুমি জান না, বিজয়া জানে।

রানি : আমিও হয়তো জানি। তুমি থাকবে ভাই আমার কাছে? আমার সখি হয়ে, আমার বোন হয়ে? আর তার বদলে আমি তোমার বরকে ধরে এনে দেব।

অনুরাধা : তা কি প্রাণ ধরে দিতে পারবে রানি। যে ঠাকুর আমার, সে যে তোমারও।

বিদ্যাপতি : মহারাজ ! ওদের নিভৃত আলাপনের কমল-বনে আমাদের উপস্থিতি মত্ত মাতঙ্গের মতোই ভীতিজনক। আমরা একটু অন্তরালে গেলেই বোধ হয় সুশোভন হতো।

রাজা : চলো বিদ্যাপতি, তোমার ইঙ্গিতই সমীচীন।
(পশ্চাতে রানির ও অনুরাধার হাসির শব্দ)
কবি ! এইখানে এসো ! এই ঝোপের আড়াল থেকে ওদের দুই দেবীকে দিব্যচক্ষে দর্শন করা যাবে।

বিদ্যাপতি : মহারাজ, যে নিজে থাকতে চায় গোপন, তাকে জোর করে প্রকাশের বর্বরতা আমার নেই।

রাজা : আঃ ! কবি হয়ে তুমি কী করে এমন বদরসিক হলে বলো তো ? ওই দেবীর দল যখন চিকের আড়াল থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের দেখতে থাকেন তাতে কোনো অপরাধ হয় না, আর আমরা একটু আড়াল-আবডাল থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে ? আরে এসো এসো।

চতুর্থ খণ্ড

রানি : (একটু দূরে) অনুরাধা, তোমার কবিকে দিয়ো আমার এই কণ্ঠহার !

অনুরাধা : রানি !

রানি : রানি নয় অনুরাধা, লছমী। তুমি আমায় লছমী বলে ডেকো। রানির কারাগারে আমার ডাক-নামের হয়েছিল মৃত্যু। তোমার বরে সে নাম আমার বেঁচে উঠুক।

অনুরাধা : লছমী ! তুমি সত্যিই লছমী। রূপে লছমী, গুণে লছমী, গোলোকের অধীশ্বরী—লক্ষ্মী।

লছমী : আর তুমি বুঝি ব্রজের দূতী ?

অনুরাধা : বেশ, তোমার দূতিয়ালিই করব। এই চাকরিই আমি নিলাম। তোমার কণ্ঠহার আমি যথাস্থানে পৌঁছে দেব, নিশ্চিন্ত থেকো।

(অনুরাধার গান)

ধন্য ধন্য ধন্য রমণী ধন্য জনম তোর।
সব জন কানু কানু করে ঝুরে
সে কানু তোর ভাবে বিভোর।

[উদ্যান-অন্তরালে বিদ্যাপতি ও রাজা শিবসিংহ]

রাজা : বিদ্যাপতি ! বিদ্যাপতি ! দেখেছ ? ওদের দুইজনের মুখে গোধূলির আলো পড়ে ঠিক বিয়ের কনের মতো সুন্দর দেখাচ্ছে। বিদ্যাপতি, বিদ্যাপতি, আরে তুমি যে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে গেলে !

বিদ্যাপতি : অপরূপ পেখলুঁ বামা।
কনকলতা অবলম্বনে উঠল
হরিণীহীন হিমধামা॥
[এ কী অপরূপ রূপ-ফাঁদ
স্বর্ণলতিকা ধরি উঠিয়াছে যেন ওই কলঙ্কহীন এ চাঁদ]
নলিন নয়ান দুটি অঞ্জনে রঞ্জিত
এ কী ভুরু-ভঙ্গিবিলাস,
চকিত চকোর জোড় বিধি যেন বাঁধিল
দিয়া কালো কাজরপাশ।
গুরু গিরিবর পয়োধর পরশিছে
গ্রীবার গজমোতি হারা,
কাম কম্বু ভরি কনক কুম্ভ পরি
ঢালে যেন সুরধুনী-ধারা।
পুণ্য প্রয়াগ-জলে যে করে যজ্ঞ শত
পায় এরে সেই বহুভোগী।
বিদ্যাপতি কহে, গোকুল-নায়ক
গোপীজন-অনুরাগী॥

রাজা : সাধু ! সাধু কবি ! বিদ্যাপতি ! এ কি তোমার গান, না তোমার আত্মার গান ?

পঞ্চম খণ্ড

[বিদ্যাপতি-ভবন]

বিদ্যাপতি : বিজয়া !
বিজয়া : দাদা ! ডাকচ !
বিদ্যাপতি : হ্যাঁ, অনুরাধা কোথায় রে ?
বিজয়া : কী জানি। সে কি বাড়ি থাকে ? কেন মরতে ওকে এনেছিলুম। সকাল হতে না হতে রানির যানবাহন এসে ওকে নিয়ে যায়। ও মাঝে মাঝে পালিয়ে আসে আমার কাছে, আর অমনি সাথে সাথে আসে রানির চেড়িদল। রানির অনুগ্রহ তাকে গ্রহের মতো গ্রাস করেছে।

বিদ্যাপতি : হুঁ। হ্যাঁরে বিজয়া, সেদিন অনুরাধা বলছিল ওর বিয়ে হয়ে গেছে! সত্যিই কি ওর বিয়ে হয়েছিল?

বিজয়া : (সক্রোধে) জানি না। আচ্ছা দাদা, তুমি কবি, সাধক—তুমি তো মানুষের অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখতে পাও, অনুরাধার দিকে কখনও চোখ ফিরিয়ে দেখেছ কি?

বিদ্যাপতি : তা দেখিনি! কিন্তু ভুল তো তুইও করে থাকতে পারিস, বিজয়া, ওর স্বামী যদি থাকেই, সে পৃথিবীর মানুষ নয়, ওর স্বামী গিরিধারীলাল শ্রীকৃষ্ণ।

বিজয়া : হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ওই নামের ছলনা করে ও যাকে পূজা করে, আমি তাকে জানি। তুমি ইচ্ছা-অন্ধ, তাই দেখতে পাও না।

বিদ্যাপতি : তার মানে, তুই বলতে চাস, ওর প্রেমের জ্যোতি আমার চোখে পড়ে আমার দৃষ্টিকে ঝলসে দিয়েছে, এই তো?

বিজয়া : হ্যাঁ, ওর প্রেমের জ্যোতি এত প্রখর যে, সেই জ্যোতির পশ্চাতে বেদনাতুর নারীমূর্তিকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না! আমি চললাম, দেখি হতভাগিনি কোথায় গেল!

[দূরে অনুরাধার গান]

সখী লো মন্দ প্রেম পরিণামা।
বৃথাই জীবন করলু পরাধীন,
নাহি উপকার একঠামা!
কেন বিধি নিরমিল এই পোড়া পিরিতি,
কাহে গড়িল মোরে করি কুলবতী।
বলিতে না পারি, হায় চলিতে না পারি,
পিঞ্জর মাঝে যেন বন্দিনী শারি॥

বিদ্যাপতি : অনুরাধা!

অনুরাধা : ঠাকুর!

বিদ্যাপতি : এ কী, তোমার চোখে জল কেন রাধা?

অনুরাধা : জল? কই, না তো! বিজয়া! (চলিয়া গেল)

বিদ্যাপতি : আমায় এ কী পরীক্ষায় ফেললে, প্রেমের ঠাকুর! তোমাতে নিবেদিত যে-প্রাণ সে-প্রাণ কেন এত বিচলিত হয় মানবীর চোখের জল দেখে?

বিজয়া : দাদা! রানির নাকি হুকুম, অনুরাধাকে এখন রাত্রেও রানির কাছে থাকতে হবে। এ রানির অত্যাচার। তুমি মিথিলার প্রধানমন্ত্রী, এর প্রতিকারের কি কোনো শক্তি নেই তোমার?

বিদ্যাপতি : অনুরাধাকে ডাকো তো। আমি সব শুনে ব্যবস্থা করছি।

বিজয়া : তোমায় ব্যবস্থা করতেই হবে, দাদা। নইলে আমিই রাজার কাছে আবেদন করব।

[বিদ্যাপতির গুনগুন স্বরে গান]

অনুরাধা : আমায় ডাকছিলে ঠাকুর? বিজয়া আমায় পাঠিয়ে দিলে।
বিদ্যাপতি : রাধা। রানি কি তোমায় রাত্রেও তাঁর কাছে থাকতে বলেছেন?
অনুরাধা : হ্যাঁ। রানি বলেন, দূতীর দূতিয়ালির প্রয়োজন রাত্রেই বেশি। তবে এ ওঁর আদেশ নয়, আবদার।
বিদ্যাপতি : কীসের দূতিয়ালি, রাধা?
অনুরাধা : ঠাকুর! তুমি আমায় কী মনে কর! পাগল, নির্বোধ বা ওইরকম একটা কিছু, না? তুমি যে এত যত্ন করে রোজ তোমার নবরচিত গানগুলি শেখাও, তুমি কি মনে কর আমি তার মানে বুঝি না? আর আমি কি শুধু রানির দূতিয়ালিই করি? আমি কি তোমার দূতিয়ালি করিনে?
বিদ্যাপতি : আমি তোমার কাছে আর আত্মগোপন করব না, রাধা। সত্যিই তোমার সুরের সেতু বয়ে হয় আমাদের মিলন। তবে, তুমি তো জান, আমার এ প্রেম নিষ্কলুষ, নিষ্কাম।—তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?
অনুরাধা : বলো।
বিদ্যাপতি : তুমি কি সত্যিই আমায় ভালোবাস?
অনুরাধা : না।
বিদ্যাপতি : না? আঃ, তুমি আমায় বাঁচালে অনুরাধা।
অনুরাধা : তোমায় আমি ভালোবাসি না, কিন্তু আমি ভালোবাসি তাকে, যাকে তুমি ভালোবাস। ঠাকুর! ঠাকুর! আমাকে এই বর দাও যেন জন্মে জন্মে তোমার ভালোবাসার জনকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারি। তুমি যাকে ভালোবেসে সুখ পাও, তারই দাসী হতে পারি। আর দিনান্তে একবার শুধু ওই চরণ বন্দনা করতে পারি।
বিদ্যাপতি : অনুরাধা! এমনি করেই তুমি বৃন্দাবনে ললিতারূপে শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদন করেছিলে। কোনোদিন শ্রীকৃষ্ণকে নিজের করে চাওনি। শ্রীকৃষ্ণের যাতে প্রীতি, সেই শ্রীমতীর সাথে বারে বারে তাঁর মিলন ঘটিয়েছিলে। তোমার সংযম ও তোমার প্রেমের কাছে সেদিন ভগবানের প্রেমও বুঝি হয়েছিল ম্লান।
বিজয়া : অনুরাধা! আজ কী গান শিখলি সই? এ কী, তুই মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে পড়ে কাঁদছিস? (সক্রোধে) দাদা!
বিদ্যাপতি : ভয় নেই বিজয়া; আমি ওকে আঘাত করিনি। (হাসিয়া) ওর দশা হয়েছে!

বিজয়া : অনুরাধা ! তুই যদি ফের দাদার কাছে আসিস, তা হলে তোর ওপর বড়ো দিব্যি রইল। চলে আয় ওখান থেকে !

[বিজয়ার গান]

তোরে সেই দেশে লয়ে যাব—
যথা না শুনিবি শ্যামনাম।
যথা শ্যামের স্মিরিতি নাই
শ্যামের পিরিতি নাই,
যথা বাজে না শ্যামের বাঁশি
নাই ব্রজধাম॥

ষষ্ঠ খণ্ড

[রাজ-উদ্যান—প্রভাত]

রাজা : আমার মুখের দিকে অমন হাঁ করে চেয়ে কী দেখছ ধনঞ্জয় ?

ধনঞ্জয় : ভয় নেই মহারাজ ! ভয় নেই ! আপনি মেঘ নন, আর আমিও চাতক পক্ষী নই। মহারাজ যদি অভয় দেন, তা হলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাজা : (হাসিয়া) তুমি আমার বয়স্য। তোমার তো সাতখুন মাপ। বলো কী বলতে চাও—

ধনঞ্জয় : মহারাজ ! বৃন্দাবনের আয়ান ঘোষের সাথে আপনার কি কোনো কুটুম্বিতা ছিল ?

রাজা : তার মানে ?

ধনঞ্জয় : তার মানে আর কিছু নয়, মহারাজ ! চেহারা তো দেখিনি, তবে তার বুদ্ধির সঙ্গে আপনার বুদ্ধির অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

রাজা : (সক্রোধে) ধনঞ্জয় !

ধনঞ্জয় : দোহাই মহারাজ ! আমার মাথা কাটা যাক, তাতে দুঃখ নেই ; কিন্তু আপনার অরসিক বলে বদনাম রটলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে !

রাজা : (হাসিয়া) আচ্ছা বলো, কী বলছিলে ?

ধনঞ্জয় : আমি বলছিলাম মহারাজ, আপনার ওই প্রধানমন্ত্রী বিদ্যাপতির কথা। ছিলেন দুর্গা-উপাসক ঘোর শাক্ত, হলেন পরম বৈষ্ণব, কৃষ্ণভক্ত। ছিলেন রাজমন্ত্রী—কঠোর রাজনীতিক, হলেন কবি—শান্তকোমল প্রেমিক।

রাজা : তাতে তোমার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হলো, ধনঞ্জয় !

ধনঞ্জয় : কিছু না, মহারাজ ! ক্ষতিবৃদ্ধি যা হবার, তা হচ্ছে রাজার, আর তাঁর রাজ্যের। এ-ক্ষতিও হচ্ছিল এতদিন গোপনে, তাকেও দিনের আলোকে টেনে আনলে বিন্দে-দূতী।

রাজা : বিন্দে-দূতী ? সে আবার কে ?

ধনঞ্জয় : আজ্ঞে ওই হলো, আপনারা যাকে বলেন অনুরাধা, আমাদের মতো দুর্জন তাকেই বলে বিন্দে-দূতী।

রাজা : অর্থাৎ সহজ ভাষায় তোমার কথার অর্থ এইযে, কবি বিদ্যাপতি হচ্ছেন নন্দলাল, আমি হচ্ছি আয়ান ঘোষ, আর শ্রীমতী হচ্ছেন—

ধনঞ্জয় : দোহাই মহারাজ ! মাথা আর ঘাড়ের সন্ধিস্থলে বিচ্ছেদের ভয় যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ও-পাপ কথা কোন সাহসে উচ্চারণ করি !

রাজা : ধনঞ্জয়, আয়ান ঘোষের গোপ-বুদ্ধি আর তোমাদের রাজার ক্ষাত্র-বুদ্ধিতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তোমরা কী বোঝ জানি না, আমি কিন্তু সব শুনি, সব দেখি, সব বুঝি।

ধনঞ্জয় : মহারাজ পরম উদার। আপনার ধনবল জলবলও অপরিমাণ, তবু মহারাজ, জটিলা-কুটিলার মুখ বন্ধ করতে তা কি যথেষ্ট ?

রাজা : দেখো ধনঞ্জয়, চোর যতক্ষণ ঘরের আশেপাশে ঘোরে, ততক্ষণ জাগ্রত বলবান গৃহস্থ তাকে ভয় করে না। হ্যাঁ, তবে তাকে লক্ষ রাখতে হয় যে, ঘরে সিঁদ না কাটে। তা ছাড়া, এইসব নখদন্তজীব কবিদের নিরুপদ্রব প্রেমকে আমার ভয় নেই। ওরা দূরে থেকে খানিক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে, দুটো কবিতা কী গান লিখবে, ব্যাস ! ওর চেয়ে এগিয়ে যাবার দুঃসাহস ওদের নেই ! তুমি কি এর বেশি কিছু লক্ষ করেছ ?—

ধনঞ্জয় : আজ্ঞে, তা মিথ্যে বলতে পারব না। মহারানি প্রত্যহ রাজসভায় এসে চিকের আড়াল টেনে বসেন হয়তো রাজকার্য দেখতেই এবং সে চিক গলিয়ে একটা চামচিকেরও যাবার উপায় নেই। তবু বিদ্যাপতির ওই পর্দামুখী আসনটা অনেকেরই চক্ষুশূল-স্বরূপ হয়ে উঠেছে।

রাজা : ধনঞ্জয় ! আমি লক্ষ রেখেছি বলেই ওদের মাঝের পর্দাটুকু আজও অপসারিত হয়নি। তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো, আর সকলকে জানিয়ে দিয়ো যে, ওদের চেয়ে আমার দৃষ্টির পরিসর অনেক বেশি। ওরা দেখে শুধু রাজসভা আর রাজ-অন্তঃপুর, আর আমাকে দেখতে হয় সমগ্র রাজ্য।

ধনঞ্জয় : আচ্ছা মহারাজ ! তারই পরীক্ষা হোক।

রাজা : কী পরীক্ষা করবে বলো তুমি ?

ধনঞ্জয় : আমি বলি কি, কোনোরকমে দিন-কতকের জন্য রানিকে আটকে রাখুন, তিনি যেন রাজসভায় না আসেন। তারপর রানির অবর্তমানে বিদ্যাপতিকে কিছু নতুন পদ রচনা করে গাইতে বলুন। মহারাজ, আপনার অনুগ্রহে প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠেছেন প্রধান গায়ক, আর রাজসভা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাবাজির আখড়া। মহারাজ, দাসের অপরাধ নেবেন না।

রাজা : তোমার ইঙ্গিত বুঝেছি। আচ্ছা ধনঞ্জয়, তাই হবে।

ধনঞ্জয় : যাবার বেলায় একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই মহারাজ, একদা শ্যাম বনে গিয়ে শ্যামারূপ ধারণ করে আয়ান ঘোষের চোখে ধুলো দিয়েছিলেন।

রাজা : আমার চোখের পর্দা আছে ধনঞ্জয়। এ-চোখে কেউ ধুলো দিতে পারবে না।

সপ্তম খণ্ড

[বিদ্যাপতির বাটীর পুষ্পোদ্যান]

অনুরাধা : ঠাকুর ! আজ দু-দিন থেকে তোমার মুখে হাসি নেই, চোখে দীপ্তি নেই, কণ্ঠে গান নেই। কী হয়েছে তোমার ?

বিদ্যাপতি : কেন তুমি ছলনা করছ অনুরাধা ? তুমি তো সবই জান। আজ দু-দিন ধরে রাজসভায় আমার লাঞ্ছনার আর সীমা নেই। এই দু-দিন রাজাকে একটি নূতন পদও শোনাতে পারিনি। আর তাই নিয়ে শত্রুপক্ষ আমায় বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছে।

অনুরাধা : হা হরি ! এ দু-দিনে একটা গানও লিখতে পারলে না ? তোমার সুরের ঝরনা হঠাৎ এমন শুকিয়ে গেল কেন ?

বিদ্যাপতি : তুমি তো জান রাধা, আমার কাব্যের প্রেরণা, সুরের প্রাণ সবই লছমী দেবী। যেদিন তাঁর উপস্থিতি অনুভব না করি, সেদিন আমার দুর্দিন। সেদিন আমার কাব্যলোকে, সুরলোকে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ !

অনুরাধা : আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো রানিকে একটুও দেখতে পাও না, তবু কী করে বুঝতে পার যে রানি রাজসভায় এসেছেন ? রানি কি কোনো ইঙ্গিত করেন ?

বিদ্যাপতি : না না, অনুরাধা, লছমী তো ইঙ্গিতময়ীরূপে দেখা দেননি আমায়, তিনি আমার অন্তরে আবির্ভূতা হন সংগীতময়ীরূপে। তাঁর আবির্ভাব অনুভব করি আমি আমার অন্তর দিয়ে। যেদিন রানি রাজসভায় আসেন, সেদিন অকারণ পুলকে আমার সকল দেহমন

বীণার মতো বেজে ওঠে। শত গানের শতদল ফুটে ওঠে আমার প্রাণে। আমি তখন আবিষ্টের মতো গান করি। সে আমার আত্মার গান নয়, ও গান পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণের গান !

অনুরাধা : ঠাকুর, আমার প্রণাম নাও। তোমার পা ছুঁয়ে আমি ধন্য হলাম। আমি কাল ভোরেই তোমাকে দেখাব তোমার কবিতালক্ষ্মীকে।

বিদ্যাপতি : পারবে? পারবে তুমি অনুরাধা? (হঠাৎ আত্মসংবরণ করিয়া) এ কী করে সম্ভব হবে জানিনে, তবু জানি রাধা—এ শুধু তোমার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। তুমিই আমার বন্ধ-স্রোত সুরধুনীকে মুক্ত করতে পার।

অনুরাধা : উতলা হোয়ো না ঠাকুর ! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আমি দূতী, আমার অসাধ্য কিছু নেই।

বিদ্যাপতি : অনুরাধা, তুমি হয়তো মনে করছ, আমি কী ঘোর স্বার্থপর, পাষণ্ড, তাই না?

অনুরাধা : নিশ্চয়ই ! পাষাণ না হলে ঠাকুর হবে কী করে? শুধু নেবে, দিতে জানবে না, মাথা খুঁড়ে মরলেও থাকবে অটল, তবে তো হবে দেবতা, তবেই না পাবে পূজা !

বিদ্যাপতি : অনুরাধা ! আমি যদি তোমার প্রেমের এক বিন্দুও পেতাম, তা হলে আজ আমি জগতের শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারতাম।

অনুরাধা : না ঠাকুর, তা হলে তুমি হতে আমার মতোই উন্মাদ। সকলের আকাঙ্ক্ষা সমান নয়, ঠাকুর ! কেউ বা পেয়ে হয় সুখী, আর কেউ বা সুখী হয় না-পেয়ে—

বিদ্যাপতি : তোমার প্রেমই প্রেম, অনুরাধা, যা পায়ে শৃঙ্খলের মতো জড়িয়ে থাকে না, সে প্রেম দেয় অনন্তলোকে অনন্ত-মুক্তি।

অনুরাধা : অত শত ঘোর-প্যাঁচের কথা বুঝিনে, ঠাকুর। আমি ভালোবেসে কাঁদতে চাই, তাই কাঁদি। বুকে পেলে কান্না যাবে ফুরিয়ে, প্রেম যাবে শুকিয়ে—তাই পেতে চাইনে। বুকের ধনকে বিলিয়ে দিই অন্যকে। আমি চললাম ঠাকুর, আমি চললাম। আমি কাল সকালে তোমার কবিতালক্ষ্মীকে দেখাব !

[অনুরাধার গান]

হাম অভাগিনি, দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করি যাম বহি গেলা।
মনে মোর যত দুখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে যত দুখ নাহি জানে লোকে।
জনম অবধি মোর এই পরিণাম
আমিই চাহিব শুধু, চাহিবে না শ্যাম !

বিদ্যাপতি : ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন ধনি রাই,
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই॥

অষ্টম খণ্ড

[রাজ-অন্তঃপুর]

[অনুরাধার গান]

এ ধনি করো অবধান
তোমা বিনা উনমত কান॥
(কানু পাগল হল গো
তোমারে না হেরি কানু পাগল হলো গো)

রানি : কানু পাগল হলো, না তুই পাগল হলি অনুরাধা ?

অনুরাধা : (গান) শুন শুন গুণবতী রাধে।
মাধবে বধিয়া তুই কী সাধিবি সাধে ?
(তুই কোন সাধ সাধিবি ?
মাধবে বধিয়া তুই কোন সাধ সাধিবি ?)

রানি : সতিনকে কাঁদাব ! বুঝলি ?

অনুরাধা : (গান) এতহুঁ নিবেদন করি তোরে সুন্দরী
জানি ইহা করহ বিধান।
হৃদয়-পুতলি তুহুঁ সে শূন্য কলেবর
তুহুঁ বিদ্যাপতি-প্রাণ।

রানি : আ মল ! বিদ্যাপতি-বিদ্যাপতি বলে ছুঁড়ি যে নিজেই পাগল হলি ! বিদ্যাপতির বিদ্যাটুকু বাদ দিয়ে তাঁর ঘর জুড়ে বসলেই তো পারিস।

অনুরাধা : তা হলে তোমার কী দশা হবে সখী ?

রানি : এক কৃষ্ণকে নিয়ে ষোলো হাজার গোপিনী যদি সুখী হতে পারে, আমরা দু'জন আর সুখী হতে পারব না ?

অনুরাধা : সেই প্রেমময়ী গোপিনীদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি ভাই ! আমরা তাঁদের পায়ের ধুলো হবারও যোগ্য নই।

রানি : সে-কথা যাক। অনুরাধা, আমার একটা কথা জানতে বড়ো সাধ হয়। তিনি কি একবারও তোকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন না ?

অনুরাধা : একবারও না।

রানি : না ভাই লক্ষ্মীটি, লুকোসনে। মহারাজার আদেশে আমি আজ দু-দিন রাজসভায় যেতে পাইনি। তাঁকে একবার দেখতে পাইনি, তাঁর গান শুনিনি। মনে হচ্ছে যেন তাঁকে কত জন্ম দেখিনি।

অনুরাধা : তারও ওই দশা ! রোজ নতুন গান লিখেই চিৎকার করে আমায় ডাকতে থাকে—ওই গানটা লিখে নেবার জন্য। আজ দু-দিন বেচারি একেবারে নিশ্চুপ।

রানি : হুঁ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) আচ্ছা, গান লিখিয়ে সে আমার কাছে গাইতে বলে না?

অনুরাধা : উঁহু।

রানি : দূর পোড়ারমুখি ! সত্যি বলো না ভাই, মাথা খাস।

অনুরাধা : তুমি যদি কাল ভোরে ঠিক এইখানে—এই মাধবীকুঞ্জে তাকে দেখতে পাও, তাহলে কী করবে?

রানি : তোর মনের কথা হয়তো বুঝেছি। আচ্ছা অনুরাধা, বিদ্যাপতি তোর বর হলে তুই কী করিস বলো তো।

অনুরাধা : রান্না করি, কান্না করি। মাঝে-মাঝে ঝগড়া করি, কাজে বাগড়া দিই, আর রাত্তির বেলায় পা টেপাই।

রানি : দোহাই তুই থাম। তোর মুখে যে পোকা পড়বে। তুই কী লো?

অনুরাধা : তোমার বোন—সতিন। আর সতিনে নাড়ে-চাড়ে, বোন সতিনে পুড়িয়ে মারে। আচ্ছা ভাই লক্ষ্মী, তুমি যদি ওকে পাও তা হলে কী কর?

রানি : আমার ঠাকুর ঘরে রেখে পূজা করি।

অনুরাধা : মাগো কী শাস্তি !

রানি : শাস্তি কী লো?

অনুরাধা : শাস্তি নয় তো কী? রাতদিন পাষাণ-মূর্তি হয়ে তোমার মন্দিরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, হাঁটু ভেঙে গেলেও বসতে পারবে না, একে শাস্তি ছাড়া কী বলব?

রানি : তবে কি তুই বলিস বুকে পুরে রাখতে, কিংবা দিন-রাত মান-অভিমানের পালা গাইতে?

রাজা : রানি, তোমাদের পালা-গানে কি আমি দোয়ারকি করতে পারি ! যেয়ো না অনুরাধা, আমাদের মতন দু-চার জন দুর্জন বাধা জমায় বলেই প্রেমের আকর্ষণী সংগীত এত বেড়ে যায়। প্রেম যখন গদাই-লশকরি ঢিমেতালে চলতে থাকে, তখন তার শত্রুপক্ষই ন্যাজ মলে তাকে তাতিয়ে তোলে।

অনুরাধা : মহারাজ কি আমায় লছমী দেবীর ছোটো বোন মনে করেছেন?

রাজা : আরে, সে সৌভাগ্য হলে তো তোমায় ডাইনে নিয়ে বসতাম। লছমী দেবী বামে বসে হতেন বামা—আর তুমি হতে ডাইনে।

অনুরাধা : আর এই দুই অবলার মাথায় চাঁটি দিয়ে মহারাজ হতেন তবলাবাদক, না? তা মহারাজ যখন এমন মধুর অধিকারই

দিলেন—তখন আবার বলতে ইচ্ছে করছে—আমি তা হলে আপনাকে নিয়ে সেতারের সুর বাঁধা অভ্যাস করতাম।

রাজা : রানি, তোমার এই সখীটি যেমন মুখরা, তেমনই রসিকা। আর, হবে না? কবির কাছে তালিম পাচ্ছে।

রানি : রাজা, রাজা, তুমি হাসছ—, কিন্তু তোমায় এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন? তোমার চোখে মুখে রক্ত নেই!

রাজা : ঠিক মড়ার মতো, না রানি? ওটা তোমার চোখের ভুল। রানি, আমার একটা কথা রাখবে?

রানি : বলো।

রাজা : আমাকে কাল ভোরেই যেতে হবে আমার রাজ্যের সীমান্ত পেরিয়ে। আমি যখন থাকব না, তখন যেন আমার প্রিয় সখা বিদ্যাপতির কোনো অযত্ন না হয়।

রানি : আমি বুঝতে পারছি, রাজা। তুমি অসুস্থ, তুমি একটু চুপ করে শোও। তোমার সেবা করার কর্তব্য থেকে আমায় বঞ্চিত কোরো না।

রাজা : কর্তব্য-সেবা-তাই করো রানি, তাই করো! লোকে যা চায় ভগবান তাকে তার সব কিছু দেন না। এই বঞ্চিত করেই তিনি টেনে নেন সেই হতভাগ্যকে তাঁর শান্তিময় কোলে। যাকে ভালোবাসার কেউ নেই, সে যদি ভগবানের চরণে আশ্রয় না পায় তার মতো দুর্ভাগা বুঝি আর কেউ নেই।

রানি : তুমি কবে ফিরবে?

রাজা : বহুবার তো গেছি রানি, আবার ফিরে এসেছি। আবার হয়তো আসব তোমার সেবা নিতে। তোমায় বঞ্চিত আমি করব না।

রানি : রাজা! তুমি কেন অমন করছ? তোমার সেই বুকের ব্যথাটা বুঝি আবার বেড়েছে! ভোর হয়ে এলো, তুমি একটু চুপ করে শোও, আমি আসছি এখনই!

নবম খণ্ড

[রাজ-উদ্যান, প্রভাত]

বিদ্যাপতি : মহারাজ! আমি গান শোনাতে এসেছি। আজ আমার গানের বাঁধ, প্রাণের বাঁধ, সুরের বাঁধ ভেঙে গেছে। ভগীরথের মতো সুরের অলকানন্দাকে আমি আহ্বান করে এনেছি।

রাজা : এসো! এসো বন্ধু, এসো বিদ্যাপতি! এত আনন্দ তো তোমার কোনোদিন দেখিনি বিদ্যাপতি! আজ তিন দিন ধরে তুমি ছিলে

বাণীহীন, মূক। হঠাৎ আজ ভোরে তোমার এত কবি-প্রেরণা এলো কোত্থকে, বলো তো?

বিদ্যাপতি : তা জানি না মহারাজ, আমার প্রাণ শোনাতে চায় গান। নিখিল জগৎকে আজ সে গানে গানে পাগল করে দিতে চায়, ডুবিয়ে দিতে চায়, ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। আজ আর তোমার আদেশের অপেক্ষা রাখব না রাজা, আজ গান গাইব স্বেচ্ছায়!

[গান]

আজু রজনি হাম ভাগে পোহায়লুঁ—
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশি ভেল নিরদ্বন্দ্বা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

রাজা : অপূর্ব! সাধু কবি, সাধু! তুমি শুধু রানির কণ্ঠহার পেয়েছিলে, আজ তোমায় রাজার কণ্ঠহার দিয়ে ধন্য হলাম। লজ্জিত হোয়ো না কবি, তোমার বুকের তলে যে লুকানো থাকে রানির দেওয়া কণ্ঠহার, সেকথা আর কেউ না জানলেও আমি জানি। এই রাজ-উদ্যানে এত ভোরে তুমি আমি ছাড়া তো আর কেউ নেই বন্ধু! আর, অন্তরালে যদি কেউ থাকেনই, তিনি তোমার আত্মীয় নন। বিদ্যাপতি, অন্তরিক্ষের দেবী চোখের সুমুখে এসে আবির্ভূতা না হলে মানুষের কণ্ঠে এমন গান আসে না। দেবীর দয়া বন্ধু, এ দেবীর দয়া।

বিদ্যাপতি : মহারাজ কি আমায় বিদ্রূপ করছেন? তা করুন, তবু আমার আজকের আনন্দকে মলিন করতে পারবেন না। এ আনন্দ এই শুভ্র প্রভাতের মতোই অমলিন।

রাজা : তা জানি বলেই তোমায় শ্রদ্ধা করে আজও বন্ধু বলেই সম্ভাষণ করি বিদ্যাপতি !... আজ থেকে আমার রাজ্যে তুমি পরিচিত হবে 'কবি-কণ্ঠহার' নামে।

দশম খণ্ড

[দৃশ্য পূর্ববৎ]

ধনঞ্জয় : এই কণ্ঠহার-এর মাঝে এই অধম কণ্টক-হাড় কি আসতে পারে, মহারাজা ?

রাজা : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ! এসো ধনঞ্জয় এসো ! আজ আমার সভাকবির পরিপূর্ণ প্রকাশের শুভ প্রভাত। এই শুভ প্রভাতে আমি কবিকে দিয়েছি আমার কণ্ঠহার। প্রার্থনা করো, যেন আমার সভাকবির আসন হয় বিশ্ব কবি-সভার সর্বোচ্চ স্থানে।

ধনঞ্জয় : ও-রকম প্রার্থনা আমি করব না, মহারাজ ! মানুষের আসনের উচ্চতার একটা সীমা আছে, তাকে অতিক্রম করে বসলেই আমরা তাকে বলি শাখা-মৃগ। যাক। মহারাজের আজকের আনন্দটা কি সত্যিকার ?

বিদ্যাপতি : তুমি তা বুঝবে না ধনঞ্জয়। যে প্রদীপ তিলে তিলে পুড়ে বুকের স্নেহ-রসকে জ্বালিয়ে অপরকে দান করে আলো, সেই প্রদীপই জানে এই আত্মদানের—আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার কী অপার আনন্দ !

রাজা : ঠিক বলেছে কবি—আরতির প্রদীপ নিববার আগে যেমন করে শেষবার তার উজ্জ্বলতম শিখা মেলে দেবতার মুখ দেখে নিতে চায়--তেমনি করে আমার অন্তর-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখে নিতে চাচ্ছে আমার শ্রান্ত প্রাণ-শিখা। তুমি এমন গান শোনাতে পার কবি, যা আমার অন্তিম সময়ে শুনতে ইচ্ছা করবে ?

ধনঞ্জয় : মহারাজ ! এইবার কিন্তু অরসিকের মতো কথা আরম্ভ হল এবং কাজেই আমাকে সরে পড়তে হলো।

রাজা : ধনঞ্জয় ! ধনঞ্জয় চলে গেলে ? আঃ বাঁচলাম ! বিদ্যাপতি, আমায় একটু ধরবে ? এখানে উঠে এলাম কী করে জানিনে, আর বোধ হয় এখান থেকে উঠে যেতেও পারব না !

বিদ্যাপতি : তুমি এমন করছ কেন সখা ? তোমার কি কোনো অসুখ করেছে ?

রাজা : সখা ! প্রেমের বৃন্দাবন ; আমরা—আমি, তুমি, লছমী, অনুরাধা—জনম জনম ধরে লীলা-সহচর-সহচরী। সেই প্রেমলোকের গান

যেদিন তুমি প্রথম শুনালে, সেই দিন আমার মনে পড়ে গেল প্রেম-লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে। তুমি কাকে লক্ষ করে সে গান লিখেছিলে জানিনে, কিন্তু তোমার গানের মন্ত্রে আমি উপাসনা করতে লাগলাম—রাধাশ্যামের যুগলমূর্তি। আমি আমার উপাস্য দেবতাকে পেয়েছি, তাই তাঁর বিরহ আর সহ্য করতে পারছিনে, বন্ধু! আমি আমার কানুর বাঁশরি শুনতে পেয়েছি।

বিদ্যাপতি : রাজা!

রাজা : (হাসিয়া) তুমি ঠকে গেলে বন্ধু! তুমি গড়লে তরণি, আর আমি তাই চুরি করে গেলাম বৈতরণি পেরিয়ে। বিদ্যাপতি! তুমি কাঁদছ? কেঁদো না সখা, তুমিও আসবে দু-দিন পরে আমাদের চির-লীলানিকেতন বৈকুণ্ঠধামে। জানো বিদ্যাপতি, কাল সারারাত্রি ঘুমোইনি, আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে ডেকেছি আর কেঁদেছি। আজ ভোরে সেই অশান্তের আহ্বান ভেসে এলো কানে—'ওরে আয়, আমার প্রিয় আমার বুকে চলে আয়!' রানি বলছিলেন রাজবৈদ্যকে খবর দিতে, এমন সময়ে এলে তুমি—ভবরোগের বৈদ্য। তুমি এখন গাও সখা—আমার মাধবের নাম গান—

[বিদ্যাপতির গান]

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসীতিল দেহ সমর্পলুঁ—
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ-লেশ না পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার,
তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ-বাহির নহি মুই ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখি কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীটপতঙ্গ
করম-বিপাকে গতায়তি পুন পুন
মতি রহু তুয়া-পরসঙ্গ!
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু—
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

রাজা : আহা, আবার বলো সখা—আবার বলো:
মাধব! তরইতে ইহ ভবসিন্ধু—

তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল-এক দেহ দীনবন্ধু !
আঃ আমার মাথা কার কোলে ?

রানি : রাজা ! আমি দাসী—লছমী।

রাজা : লছমী ! ওঃ ! কে কাঁদে আমার পায়ে পড়ে ?

অনুরাধা : রাজা ! আমি, আমি–অনুরাধা। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু-উপাসক, পরম প্রেমিক—তুমি, আমায় পায়ের ধুলো দিয়ে যাও, আমি ওই চরণধূলির প্রসাদে—মুক্ত হয়ে যাই !

রাজা : অনুরাধা ! আমি যে কৃষ্ণকে পেয়েছি ধ্যানে, সে কৃষ্ণকে তুমি যে রেখেছ বুকে পুরে। অনুরাধা-অনুরাধা—কী মধুর নাম ! এই তো আমার বৃন্দাবন। বিদ্যাপতি, নারায়ণ, লছমী, অনুরাধা—কৃষ্ণনাম গান—এরই মাঝে যেন জন্মে জন্মে আসি—শ্রীকৃষ্ণ মাধব মা-ধ-ব..(রাজার মৃত্যু)

বিদ্যাপতি, অনুরাধা, লছমী : রাজা ! রাজা ! (এক সঙ্গে চিৎকার)

একাদশ খণ্ড

(বিদ্যাপতির ভবন—নিশীথ রাত্রি)

[অনুরাধার গান]

মাধব ! কত পরবোধব রাধা !
হা হরি হা হরি কহতহি বারবার
অব জিউ করব সমাধা।।
ধরণি ধরিয়া ধনি জতনহি বইসই
পুনহি উঠই নাহি পারা,
সহজহি বিরহিণী জগমাহা তাপিনী
বৈরী মদন-শরধারা।
অরুণ নয়ন-লোর তীতল কলেবর
বিলোলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরী গণতমি শেষা।।

বিদ্যাপতি : অনুরাধা ! তুমি একা এখানে গান করছ ? বিজয়া কোথায় ?

অনুরাধা : জানি না ঠাকুর ! তোমায় রানি ডাকছেন। একবার যাবে ?

বিদ্যাপতি : রানি—আমায় ডাকছেন ? এত রাত্রে ? কেন বলো তো ?

অনুরাধা : ভয় হচ্ছে, না আনন্দ?

বিদ্যাপতি : দুই-ই-ই! রাজা শিবসিংহের স্বর্গারোহণের পর এক বৎসর কাল রানির প্রতিভূ হয়ে রাজ্য চালালাম, এই এক বৎসর অবগুণ্ঠিতা রানির মুখের দিকে চাইতে পারিনি। কেবলই ভয় হয়েছে, যদি রানির চোখে চোখ পড়ে—আর চোখ ফিরাতে না পারি। তাই নতনেত্রে—কর্তব্য করে গেছি। রাজ-সিংহাসনে দেখেছি শুধু দু-খানি নিরাভরণ রাঙাচরণ, আর মনে হয়েছে ও চরণ সত্যসত্যই সকল দেবতার আরাধ্যেয়। এই এক বৎসর রানি আমায় কেবল আদেশই করেছেন—রানির মতো মহাগম্ভীর কণ্ঠে! তাই অনুরাধা, আজ এই অন্ধকার নিশীথে তাঁর ডাক শুনে ভয় আনন্দ দুই-ই হচ্ছে।

অনুরাধা : তা হলে আমি কী বলব গিয়ে?

বিদ্যাপতি : আমি তোমার কথার ইঙ্গিতে বুঝলাম অনুরাধা, যে আমার যাওয়া উচিত নয়। তুমি সর্বদা রানির কাছে থাক। তুমি হয়তো রানির ভাবান্তর লক্ষ করেছ। রাজা জীবিত নেই, রানিই এখন রাজ্যেশ্বরী, স্বাধীনা।—হুঁ তুমি বলো অনুরাধা, আমি যেতে পারব না। তোমাকে দিয়ে মিথ্যা বলাব না।

অনুরাধা : ঠাকুর, একটু পা দুটো এগিয়ে দাও দেখি। থাক থাক, তোমরা পাথরের জাত, আমিই এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করি।

[গান]

নাথ, দরশ সুখে বিধি কৈল বাদ
অঙ্কুরে ভাঙল বিধি অপরাধ।
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল,
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল!

[হঠাৎ ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি]

বিজয়া : দাদা! ভীষণ বৃষ্টি নামল যে। ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। দোর জানালাগুলো বন্ধ করে দিই?

বিদ্যাপতি : না, খোলা থাক। অন্ধকারের কালোর সাথে মেঘের কালো মিলে কী অপরূপ কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করেছে প্রকৃতি, দেখেছিস বিজয়া?

বিজয়া : তুমি দেখো দাদা, আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি চললাম। [প্রস্থান]

[বিদ্যাপতির গান]

এ সখী, হমারি দুকের নাহি ওর!
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর॥

ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খরশর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত শত পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া,
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিক পাঁতিয়া,
বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঁয়ায়বি হরি বিনু দিনরাতিয়া॥

দ্বাদশ খণ্ড

[দূরে লছমীর গান]

সজনী ! কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব
মঝু মনে নাহি পতিয়াই॥
এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ—
দিবস দিবস করি মাসা,
মাস মাস করি বরখ খোয়ায়লুঁ
খোয়ায়লুঁ এ তনুক আশা॥

[বিদ্যাপতির গান]

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিফলে গোঙায়বঁ কি করব সো পিয়া লেহে॥

বিদ্যাপতি : কে ? রানি ?

রানি : আমি লছমী, চরণের দাসী।

বিদ্যাপতি : তুমি ? এই নিশীথ রাত্রে ঝড়-বৃষ্টির মাঝে তুমি একা এলে ?

লছমী : হ্যাঁ, একা। আর থাকতে পারলাম না বলেই তো আমার দুখের দোসরের অভিসারে বেরিয়েছি। বিদ্যাপতি। চার বছর ধরে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে আজ তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে এলাম। রাজা যেদিন আমাদের সকল প্রেমকে ম্লান করে চলে গেলেন, সেইদিন থেকেই এই এক বছর তোমায় ভুলতে চেয়েছি, তোমার প্রেম—তোমার গান—তোমার সকল কিছুকে উপেক্ষা করতে, অবহেলা করতে চেয়েছি। যত ভুলতে চেয়েছি, তুমি হয়েছ তত নিকটতম। এ কী দুর্বার আকর্ষণ তোমার ! আমি ক্ষতবিক্ষত হলাম নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে, আর পারিনে। আমার ঠাঁই দাও ওই চরণে।

বিদ্যাপতি : রানি ! তুমি কি সেই লছমী, না তার কঙ্কাল, প্রেত ? সত্যই তুমি আজ একা—তোমার প্রেম তোমায় ছেড়ে গেছে !

রানি : বিদ্যাপতি ! প্রিয়তম ! সত্যই আজ আমি নিঃসম্বল, তুমি ছাড়া ত্রিজগতে আজ আর আমার কেউ নেই। তুমি আমায় তাড়িয়ে দিয়ো না !

বিদ্যাপতি : রানির মহিমা প্রেমের মহিমাকে তুমি এমন করে পদদলিত করবে লছমী, এ আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। শোনো রানি—আমি চেয়েছিলাম তোমাকেই—রাজা যদি জীবিত থাকতেন হয়তো তোমাকেই, শুধু তোমাকেই চাইতাম। কিন্তু আজ আর তোমাকে চাই না। রাজার মৃত্যু তাঁর অচিন্তনীয় ত্যাগ আমাকে সত্যকার প্রেমের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। পাথর কুড়াতে গিয়ে আমি পেয়েছি পরশ-মানিক। তাঁর ছোঁয়ায় আমার সকল কাম হয়ে গেছে সোনা। তোমার মধ্য দিয়ে আমি পেয়েছি সত্যকার লছমী দেবীকে—নারায়ণীকে, নারায়ণকে।

রানি : নিষ্ঠুর ! তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করছ? তুমি তা হলে এতদিন গানে গানে সুরে সুরে আমায় প্রতারণা করেছ? নির্মম ব্যাধের জাত তোমরা, বাঁশির সুরে ডেকে হরিণীকে বধ করাই তোমাদের ধর্ম।

বিদ্যাপতি : দেবী ! আমি তোমায় প্রতারণা করিনি। প্রত্যাখ্যানও করছিনে। তুমি যা চাও আমার সে প্রেম তো তুমি পেয়েছ।

রানি : না, পাইনি ; পেলে আমার অন্তরে এ হাহাকার থাকত না। শোনো বিদ্যাপতি, আমি চাই না শূন্য প্রেম—যাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, আমি চাই তোমাকে—তোমার প্রাণ-মন-দেহ-আত্মা—তোমার সকল কিছুকে।

বিদ্যাপতি : আমি তো বলেছি, আমার কামনা একদিন ছিল—আজ আর নেই। এই কামনাশূন্য-দেহ নিয়ে শবসাধনা করে তোমারও মুক্তি হবে না, আমারও হবে অধোগতি। তোমার এই প্রেম শ্রীকৃষ্ণে—অর্পণ করো, তুমি সুখী হবে, শান্তি পাবে। আর তা না পারলেও তোমার প্রেম যদি সত্য হয়, আমাকে ভালোবেসে তুমি শ্রীভগবানের করুণা লাভ করবে।

রানি : আমি চাই না, চাই না অন্যকিছু, চাই না মুক্তি। আমি চাই তোমাকে—স্বর্গে হোক, নরকে হোক, যেখানে হোক আমি চাই কেবল তোমাকে—বিদ্যাপতি, তোমাকে। আমি তোমাকে পেতে চাই আমার বক্ষে, আমার চক্ষে, আমার প্রতি অঙ্গ দিয়ে তোমার প্রতি অঙ্গের পরশ পেতে !

বিদ্যাপতি : লছমী ! লছমী ! ছাড়ো ! ছাড়ো ! যেতে দাও, পালিয়ে যেতে দাও আমাকে এখান থেকে।... তুমি প্রেম-অপভ্রষ্টা মায়াবিনী রূপ ধরে

আমায় শ্রীভগবানের পথ থেকে ফিরাতে এসেছ। এ কী জ্বালাময় তোমার স্পর্শ! উঃ—আমি পালিয়ে গিয়ে এই তপস্যাই করব লছমী; যেন তোমাকে এই নিচে থেকে উর্ধ্বে টেনে তুলতে পারি। (ছুটিয়া চলিলেন)

লছমী : বিদ্যাপতি! বিদ্যাপতি! নিষ্ঠুর!

ত্রয়োদশ খণ্ড

[ভীষণ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বিদ্যাপতি ছুটিয়া চলিয়াছেন]

অনুরাধা : ঠাকুর! ঠাকুর! ও পথে নয় এই দিকে, এই দিকে—এসো!

বিদ্যাপতি : কে? কে তুমি চলেছ, আমার আগে দীপ জ্বালিয়ে—পথ দেখিয়ে?

অনুরাধা : (তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া) আমি বিষ্ণুমায়া!

বিদ্যাপতি : অনুরাধা! অনুরাধা! নিয়ে চলো, নিয়ে চলো আমায় এই ঝড়বৃষ্টি কৃষ্ণরাতের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। নিয়ে চলো সেইখানে, যেখানে নেই মানুষের লালা-সিক্ত কামনা-সিক্ত ভালোবাসা। যেখানে আছে অনন্ত প্রেম, অনন্ত ক্রন্দন, অনন্ত অতৃপ্তি।

অনুরাধা : এসো কবি, এসো সাধক! এই অশান্ত কৃষ্ণ নিশীথিনীর পরপারেই পাবে অশান্ত কিশোর চিরবিরহী শ্রীকৃষ্ণকে। ওই শোনো তাঁর মধুর মুরলীধ্বনি! (দূরে করুণ বাঁশির সুর)

বিদ্যাপতি : অনুরাধা দাঁড়াও, দাঁড়াও! কে যেন আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। উঃ রাধা! রাধা! আমায় কৃষ্ণ-সর্পে দংশন করেছে। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল! সকল দেহ আমার বিষে জ্বলে গেল।

অনুরাধা : (ছুটিয়া আসিয়া) ঠাকুর! ঠাকুর! দেখছ! ওই কৃষ্ণ-সর্পের মাথায় কী অপূর্ব মণি জ্বলছে। ও কৃষ্ণ-সর্প নয় ঠাকুর! তোমায় দংশন করেছে কৃষ্ণবিরহ। ওই বিরহিণী যাকে দংশন করে, তার মুক্তির আর বিলম্ব থাকে না। ঠাকুর! আমার শ্রীকৃষ্ণ! আমার গিরিধারীলাল। আমার প্রিয়তম! (শেষ কথাকটি বলিতে বলিতে অনুরাধা নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।)

বিদ্যাপতি : অনুরাধা! অনুরাধা! কোথায় নিরুদ্দেশ হলে তুমি? অনুরাধা! বুঝেছি, বুঝেছি তুমি বিষ্ণুমায়া! আমি মনে মনে চেয়েছিলাম গঙ্গায় ডুবে লছমীর স্পর্শ—পাপ স্খালন করতে—তাই তুমি ভুলিয়ে এনেছ গঙ্গার বিপরীত পথে—আলেয়ার আলো দেখিয়ে। বুঝেছি, তোমার মায়ায় ভুলেছিলাম আমি আমার আরাধ্যা দেবীকে। সেই পাপে আমার এই শাস্তি—এই সর্প-দংশন, এই

ভীষণ মৃত্যু।—কিন্তু আমি যাব, আবার গঙ্গার পথেই যাব। যতক্ষণ শেষ নিশ্বাস থাকবে আমার, ততক্ষণ ছুটব পতিতপাবনীকে স্মরণ করে। (ছুটিয়া চলিলেন)

রানি : অনুরাধা ! অনুরাধা ! কেন আমায় ভাগীরথীর কূলে ডেকে আনলি ? বল মায়াবিনী তোর কী ইচ্ছা ?

অনুরাধা : তোমার জন্ম-জন্মান্তরের চাওয়াকে যদি চাও লছমী, তা হলে আমার সাথে এসো। পারবে আমার সাথে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে ?

রানি : তোর ইঙ্গিত বুঝেছি অনুরাধা। এই কলুষিত চিত্ত নিয়ে আমি শরণ নিয়েছিলাম আমার মুখর দেবতার—তাই দেবতা হলেন বিমুখ! তাই চাস এই পতিতপাবনীর জলে আমার এই পাপ-দেহের বিসর্জন। তবে তাই হোক। আমি যেন জন্মান্তরে—পরজন্মে, আমার বিদ্যাপতি—আমার নারায়ণকে আমার করে পাই। মা গো পতিতপাবনী।— (দুই জনে গঙ্গার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন)

বিদ্যাপতি : মা গো। পতিতপাবনী ভাগীরথী আমি তোর কোলের আশায় এত পথ ছুটে এলাম, তবু তোর কোলে আমার এই পাপ-তাপিত বিষ-জর্জরিত দেহ রাখতে পারলাম না মা ! অঙ্গ আমার অবশ হয়ে এলো। আর চলতে পারি না, মা ! মাকে ডেকে, মৃত্যু উপেক্ষা করে সন্তান এলো এতদূর পথ, আর তুই এতটুকু পথ আসতে পারলি না মা ! ভক্ত ছেলের ডাকে ? মা ! মা ! মা গো ! (দূরে গঙ্গার কলকল শব্দ) এ কী ! এ কী ! কোথা হতে ভেসে আসে দু-কূলপ্লাবী জোয়ারের কলকল সংগীত ? তবে কি মা সন্তানের অন্তিম প্রার্থনা শুনেছিস ! মা মকরবাহিনী, সকল কলুষনাশিনী মা গো ! এ কী শীতল স্নিগ্ধ স্পর্শ তোর মা ! আমার সকল মন-প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। কাল-কেউটের দংশনজ্বালা জুড়িয়ে গেল মা তোর মাতৃ-করস্পর্শে। কে ? কে ? তুমি মা পরমেশ্বরী ?

মা ভাগীরথী : বিদ্যাপতি ! পুত্র আমার ! আমার শাপ-ভ্রষ্ট সন্তান তুমি, আমি তোমার ডাকে তোমাকে কোলে তুলে নিতে এসেছি তোমার আপন ঘরে নন্দন-লোকে।

[লছমী ও অনুরাধা দূরে স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে—দূরে লছমীর গান নিকটতর হইতে লাগিল।]

সজনী, আজু শমন দিন হয়।
নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপিল
প্রাণ দেহে নাহি রয়॥
বরষিছে পুন পুন অগ্নি-দাহন যেন
জানিনু জীবন লয়।

[বিদ্যাপতির গান]

বিদ্যাপতি কহে শুন শুন লছমী, মরণ মিলন মধুময়॥

লছমী : কে? বিদ্যাপতি?

বিদ্যাপতি : লছমী? তুমি?

অনুরাধা : হ্যাঁ ঠাকুর! নিয়ে এসেছি আমি তোমার জীবন-মরণের সাথি লছমীকে। পবিত্র সুরধুনী-ধারায় স্নাত হয়ে তোমরা উভয়ে হয়েছ নির্মল। তাই মায়ের কোলে, মরণকে পুরোহিত করে হলো তোমাদের মিলন। (বলিতে বলিতে অনুরাধা দূরে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।)

লছমী : অনুরাধা! সখী! আর তুই কি আমাদের ছেড়ে এমনি দূরে ভেসে যাবি?

অনুরাধা : লছমী! সখী! আমি যেন জন্ম-জন্ম কালস্রোতে ভেসে এমনই যুগলমিলন দেখে মরতে পারি। (ভাসিয়া যাইতে যাইতে অনুরাধার কণ্ঠে গান ভাসিয়া আসিল—)

তোমার যাহাতে সুখ
তাহে আমার সুখ
সুন্দর মাধব হমার।
কোটি জনম যেন তুহার সুখের লাগি
ডারি দেই এ জীবন ছার॥
[ভীষণ স্রোত আসিয়া সকলকে ডুবাইয়া দিল।]

[যবনিকা পতন]

বিদ্যাপতি

(রেকর্ড–নাটিকা)

প্রথম খণ্ড

[মিথিলার কমলা নদীর তীরে গ্রাম। তাহারই উদ্যানবাটিকা দেবীদুর্গা মন্দির। কবি বিদ্যাপতি দুর্গাস্তব গাহিতেছেন।]

(স্তব)

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্‌ব্যাপিকে বিশ্বরূপে
নমস্তে জগদ্বন্দ্য পদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

অনুরাধা : ঠাকুর ! ঠাকুর !

বিদ্যাপতি : (মন্দির–অভ্যন্তর হইতে) কে ?

অনুরাধা : আমি অনুরাধা, একটু বাইরে বেরিয়ে আসবে ?

বিদ্যাপতি : (মন্দির–দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। বিরক্তির সুরে) একটু অপেক্ষা করলেই পারতে, অনুরাধা। এত বড়ো ভক্তিমতী হয়ে তুমি মায়ের নামগানে বাধা দিলে ?

অনুরাধা : আমায় ক্ষমা করো ঠাকুর। অত্যন্ত প্রয়োজনে আমি তোমার ধ্যান ভঙ্গ করেছি। আমার কৃষ্ণগোপালের জন্য আজ কোথাও ফুল পেলাম না। তোমার বাগানে অনেক ফুল, আমার গিরিধারীলালের জন্য কিছু ফুল নেব ? আমার গোপালের এখনও পূজা হয়নি।

বিদ্যাপতি : তুমি তো জান অনুরাধা, এ বাগানে ফুল ফোটে শুধু আমার মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য। এ ফুল তো অন্য দেব–দেবীকে দিতে পারিনে !
(মন্দির দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, মন্দির–অভ্যন্তরে স্তব পাঠের মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল।)

বিদ্যাপতি : (গুনগুন স্বরে)
মা ! আমার মনে আমার বনে
ফোটে যত কুসুমদল

সে ফুল মাগে তোরই তরে
পূজতে তোরই চরণতল॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ—

অনুরাধা : (অশ্রুসিক্ত) ঠাকুর! ঠাকুর! চলে গেলে। তুমি কি সত্যিই এত নিষ্ঠুর? তবে কি আমার ঠাকুরের পূজা হবে না আজ? আমার কৃষ্ণগোপাল! আমার প্রিয়তম! তুমি যদি সত্য হও, আর আমার প্রেম যদি সত্য হয়, তা হলে আজ এই বাগানের একটি ফুলও অন্য কারুর পূজায় লাগবে না। এই বাগানের সকল ফুল তোমার চরণে নিবেদন করে গেলাম। (প্রস্থান)

দেবীদুর্গা : ক্ষান্ত হও বিদ্যাপতি! ও ফুল শ্রীকৃষ্ণ চরণে নিবেদিত। বিষ্ণু–আরাধিকা যে ফুল শ্রীহরির চরণে নিবেদন করে গেছে, সে ফুল নেবার অধিকার আমার নেই।

বিদ্যাপতি : মা! মা!

দেবীদুর্গা : শোনো পুত্র, তুমি হয়তো জান না যে আমি পরমা বৈষ্ণবী, জগৎকে বিষ্ণুভক্তি দান করি আমিই।

বিদ্যাপতি : তোর ইঙ্গিত বুঝেছি, মহামায়া। তবে তোরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক ইচ্ছাময়ী; আমি আজ থেকে বিষ্ণুরই আরাধনা করব।

[বিদ্যাপতির গীত]

আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে জপবো আমি শ্যামের নাম॥
মা হলো মোর মন্ত্রগুরু, ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম॥

বিজয়া : দাদা! দাদা! শিগরির এসো। মা আমাদের ছেড়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

বিদ্যাপতি : অ্যা! বিজয়া! বিজয়া! মা নেই, মা চলে গেলেন?

দ্বিতীয় খণ্ড

[মিথিলার রাজা শিবসিংহের উদ্যানবাটিকা]

বিদ্যাপতি : মিথিলার রাজা শিবসিংহের জয় হোক!

শিবসিংহ : স্বাগত বিদ্যাপতি! বন্ধু! তোমার মাতৃশোক ভুলবার যথেষ্ট অবসর না দিয়ে স্বার্থপরের মতো রাজধানীতে ডেকে এনেছি। আমার অপরাধ নিয়ো না সখা।

বিদ্যাপতি : মহারাজ! আমি আপনার দাসানুদাস। শুধু আমি কেন, আমরা পুরুষানুক্রমে মিথিলার রাজ–অনুগ্রহে ও আশ্রয়ের স্নিগ্ধ শীতল

ছায়ায় লালিত-পালিত। আপনার আদেশ আমার সকল দুঃখের ঊর্ধ্বে, মহারাজ !

রাজা : তুমি জানো সখা, রাজসভার বাইরে তুমি ওভাবে কথা বললে আমি কত বেদনা পাই। আমরা সহপাঠী বন্ধু, তোমরা তো রাজ-অনুগৃহীত নও, বন্ধু, মিথিলার রাজারাই তোমাদের কাছে ঋণী, অনুগৃহীত। তোমরা পুরুষানুক্রমে প্রধানমন্ত্রী হয়ে মিথিলার রাজা ও রাজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছ।

রানি লছমী : তুমি তো শুধু রাজমন্ত্রীই নও বিদ্যাপতি। তুমি রাজকবি। মিথিলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি !

বিদ্যাপতি : মহারানি এখানে আছেন তা তো বলো নাই, সখা।

রাজা : রানি লছমী দেবীর অনুরোধেই তোমায় এত তাড়া দিয়ে এনেছি, বন্ধু ! তোমার কণ্ঠের গান না শুনলে নাকি ওঁর সে দিনটাই নাকি হয় বৃথা। এত শ্রদ্ধা তোমার ওপর, তবু মাঝের ওই পর্দাটুকু আর উঠল না। এ নিরর্থক লজ্জার আবরণ আমাকেই লজ্জা দেয় বেশি। আর কথা নয় কবি, এবার আলাপন হোক শুধু গানে গানে।

বিদ্যাপতি : মহারানির আদেশ শিরোধার্য। কোন গান গাইব, দেবী ?

রানি : আমার সেই প্রিয় গান 'জনম জনম হাম রূপ নেহারলুঁ ও গানটা আমার কাছে কখনও পুরানো হলো না।

[বিদ্যাপতির গীত]

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ নয়ন ন তিরপিত ভেল !
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখলুঁ, তবু হিয় জুড়ন ন গেল !
দেখি সাধ না ফুরায় গো !
রূপ যত দেখি তত কাঁদি সাধ না ফুরায় গো
হিয়া কেন না জুড়ায় গো, হিয়ার উপরে গিয়া
হিয়া তবু না জুড়ায় গো।

তৃতীয় খণ্ড

[অনুরাধার গীত]

সখী লো !
অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মানিক কো হরি লেল॥
হরি হরিয়া নিল কে ?

লছমী : রাজা ! কে যায় পথে অমন করুণ সুরে গান গেয়ে? ওকে এখানে ডাক না !

বিদ্যাপতি : মহারানি ! আমি ওকে জানি। আমি যেখানে যাই, ও আপনি এসে হয় আমার প্রতিবেশিনী। ওর নাম অনুরাধা। গিরিধারীলাল শ্রীকৃষ্ণ ওর জপমালা।

লছমী : তাহলে তুমি ওকে ডেকে আনো না, কবি !

বিদ্যাপতি : আমি যাচ্ছি দেবী কিন্তু জানি না ও আসবে কি না।

[অনুরাধার গীত]

নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস,
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হম পাশ,
পাপ পরান মম আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুরে।

লছমী : অনুরাধা, কী মিষ্টি নাম তোমার ! তুমি আমার কাছে থাকবে? বিদ্যাপতি ! তুমি যদি অনুমতি দাও তা হলে অনুরাধাকে আমার কাছে রেখে শ্যামনাম শুনি !

বিদ্যাপতি : আমি তো ওর অভিভাবক নই, দেবী। ও আমার ছোটো বোন বিজয়ার বন্ধু।

লছমী : ওর বাবা মা কোথায় থাকেন?

বিদ্যাপতি : গতবার দেশে যখন মড়ক লাগে তখন ওর বাবা মা দু-জনেই মারা যান।

লছমী : ওর বিয়ে হয়নি?

বিদ্যাপতি : না। (হাসিয়া) ও বলে ও বিয়ে করবে না।

অনুরাধা : বা রে, আমি বুঝি তোমার গলা ধরে বলতে গেছিলুম যে আমি বিয়ে করব না। না মহারানি, ঠাকুর জানেন না। আমার বিয়ে হয়েছে।

বিদ্যাপতি : তোমার বিয়ে হয়েছে? কার সাথে?

অনুরাধা : সে তুমি জানো না, বিজয়া জানে।

লছমী : আমিও হয়তো জানি ! তুমি থাকবে ভাই আমার কাছে? আমার সখী হয়ে, আমার বোন হয়ে? আর বদলে আমি তোমার বরকে ধরে এনে দেব।

অনুরাধা : তা কি প্রাণ ধরে দিতে পারবে রানি? যে ঠাকুর আমার সে যে তোমারও।

বিদ্যাপতি : মহারাজ ! ওদের নিভৃত আলাপনের কমল বনে আমাদের উপস্থিতি মত্ত মাতঙ্গের মতোই ভীতিজনক। আমরা একটু অন্তরালে গেলেই বোধ হয় সুশোভন হতো।

রাজা : চলো বিদ্যাপতি, তোমার ইঙ্গিতই সমীচীন।
লছমী : আর একটি গান গাও না ভাই।

[অনুরাধার গীত]

সজল নয়ন করি পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
(যেন শত যুগ মনে হয়
তারে এক তিল না হেরিলে শত যুগ মনে হয়)
বিধি বড়ো দারুণ তাহে পুন ঐছন
দরহি করলুঁ মুরারি।

রাজা : কবি ! এইখানে—এই খানে এসো। এই ঝোপের অন্তরাল থেকে ওদের দুই দেবীকে দিব্যচক্ষে দর্শন করা যাবে।
বিদ্যাপতি : মহারাজ ! যে নিজে থাকতে চায় গোপন তাকে জোর করে প্রকাশ করার বর্বরতা আমার নেই।
রাজা : আঃ ! কবি হয়ে তুমি কি করে এমন বেরসিক হলে বলো তো? ওই দেবীর দল যখন চিকের আড়াল থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের দেখতে থাকেন, তাতে কোনো অপরাধ হয় না, আর আমরা একটু আড়াল আবডাল থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

চতুর্থ খণ্ড

লছমী : অনুরাধা ! তোমার কবিকে দিয়ো আমার এই কণ্ঠহার !
অনুরাধা : বেশ ! তা হলে আজ আমি আসি, রানি !
লছমী : রানি নয়, রানি নয়, অনুরাধা লছমী। তুমি আমায় লছমী বলে ডেকো। রানির কারাগারে আমার ডাক-নামের হয়েছিল মৃত্যু। তোমার বরে সে নাম আমার বেঁচে উঠুক।
অনুরাধা : লছমী ! লছমী ! তুমি সত্যিই লছমী। রূপে লছমী, গুণে লছমী, গোলোকের অধীশ্বরী লক্ষ্মী।
লছমী : আর তুমি? তুমি বুঝি ব্রজের দূতী?
অনুরাধা : হ্যাঁগো তোমার দূতিয়ালিই করব, এই চাকরিই আমি নিলাম, সখী ! তোমার কণ্ঠহার আমি যথাস্থানে দেব তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

[অনুরাধার গীত]

ধন্য ধন্য ধন্য রমণী জনম তোর।

সব জন কানু কানু করে ঝুরে
সে কানু তোর ভাবে বিভোর।

[উদ্যান–অন্তরালে বিদ্যাপতি ও শিবসিংহ]

রাজা : বিদ্যাপতি ! বিদ্যাপতি ! দেখেছ ? ওদের দু–জনের মুখে গোধূলির আলো পড়ে ঠিক বিয়ের কনের মতো সুন্দর দেখাচ্ছে। বিদ্যাপতি ! বিদ্যাপতি ! আরে ? তুমি যে নির্বাক নিষ্পন্দ হয়ে গেলে ! বিদ্যাপতি !

[বিদ্যাপতির গীত]

অপরূপ পেখলুঁ বামা।
কনকলতা অবলম্বনে উঠল
হরিণীহীন হিমধামা॥
(একী অপরূপ রূপ–ফাঁদ)
(স্বর্ণলতিকা ধরি উঠিয়াছে যেন ওই কলঙ্কহীন এ চাঁদ)
নলিন নয়ান দুটি অঞ্জনে রঞ্জিত
এ কী ভুরু ভঙ্গি–বিলাস
চকিত চকোর জোড় বিধি যেন বাঁধিল
দিয়া কালো কাজরপাশ।
গুরু গিরিবর পয়োধর পরশিছে
গ্রীবার গজমোতি হারা,
কাম কম্বু ভরি কনক–কুম্ভ পরি
ঢালে যেন সুরধুনী–ধারা।

পঞ্চম খণ্ড

[বিদ্যাপতি-ভবন]

বিদ্যাপতি : বিজয়া !
বিজয়া : দাদা ! ডাকচ ?
বিদ্যাপতি : হ্যাঁ, অনুরাধা কোথায় রে ?
বিজয়া : কী জানি। সে কি বাড়ি থাকে ? সকাল হতে না হতে রানির যানবাহন এসে ওকে নিয়ে যায়। ও মাঝে মাঝে পালিয়ে আসে আমার কাছে, আর অমনি সাথে সাথে আসে রানির চেড়িদল। রানির অনুগ্রহ ওকে গ্রহের মতো গ্রাস করেছে। আবার রাজার নাকি হুকুম হয়েছে এখন থেকে রাত্রেও তাঁর কাছে থাকতে হবে। এ কিন্তু

রানির অত্যাচার দাদা। হয় তুমি এর প্রতিকার করো, নইলে আমিই রাজার কাছে আবেদন করব।

বিদ্যাপতি : হুঁ! হ্যাঁরে বিজয়া, সেদিন অনুরাধা বলছিল, ওর বিয়ে হয়ে গেছে! সত্যিই কি ওর বিয়ে হয়েছিল?

বিজয়া : (সক্রোধে) আমি জানি না। আচ্ছা দাদা, তুমি কবি, সাধক। তুমি তো মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পাও। অনুরাধার দিকে কখনও চোখ ফিরিয়ে দেখেছ কি?

বিদ্যাপতি : তা দেখিনি! কিন্তু ভুল তো তুইও করে থাকতে পারিস, বিজয়া। ওর স্বামী যদি কেউ থাকেনই, সে এ পৃথিবীর মানুষ নয়, ওর স্বামী গিরিধারীলাল শ্রীকৃষ্ণ।

বিজয়া : হ্যাঁগো হ্যাঁ, ওই নামের ছল করে ও যাকে পূজা করে আমি তাকে জানি। তুমি ইচ্ছা-অন্ধ, তাই দেখতে পাও না।

[অনুরাধার গীত]

সখী লো মন্দ প্রেম পরিণামা।

বিজয়া : ওই যে হতভাগিনী আসছে।

বিদ্যাপতি : তুই ওকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দে তো!

বিজয়া : দিচ্ছি দাদা!

বিদ্যাপতি : আমায় এ কী পরীক্ষায় ফেললে ঠাকুর!

অনুরাধা : আমায় ডাকছিলে ঠাকুর!

বিদ্যাপতি : হ্যাঁ রাধা! রানি কি তোমায় রাত্রেও তাঁর কাছে থাকতে আদেশ করেছেন?

অনুরাধা : হ্যাঁ, রানি বলেন দূতীর দূতিয়ালির প্রয়োজন রাত্রেই বেশি। তবে এ তাঁর আদেশ নয়, আবদার।

বিদ্যাপতি : দূতী! কীসের দূতিয়ালি রাধা?

অনুরাধা : ঠাকুর! তুমি আমায় কী মনে কর! পাগল, নির্বোধ বা ওইরকম একটা কিছু, না? তুমি যে এত যত্ন করে রোজ তোমার নব-রচিত গানগুলি শেখাও, তুমি কি মনে কর আমি তার মানে বুঝিনে? আর আমি কি শুধু রানিরই দূতিয়ালি করি? আমি কি লেখার গানেরও দূতিয়ালি করিনে?

বিদ্যাপতি : আমি তোমার কাছে আর আত্মগোপন করব না, রাধা। সত্যই তোমার সুরের সেতু বেয়ে হয় আমাদের মিলন! তবে, তুমি তো জান আমার এ প্রেম নিষ্কলুষ, নিষ্কাম। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

অনুরাধা : বলো।

বিদ্যাপতি : তুমি কি সত্যিই আমায় ভালোবাস?
অনুরাধা : না।
বিদ্যাপতি : তুমি আমায় বাঁচালে, অনুরাধা।
অনুরাধা : তোমায় আমি ভালোবাসিনে। কিন্তু আমি ভালোবাসি তাকে যাকে তুমি ভালোবাস। ঠাকুর! ঠাকুর! আমাকে এই বর দাও যেন জন্মে জন্মে তোমার ভালোবাসার জনকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারি; তুমি যাকে ভালোবেসে সুখ পাও, তারই দাসী হতে পারি। আর দিনান্তে একবার শুধু ওই চরণ বন্দনা করতে পারি।

ষষ্ঠ খণ্ড

[রাজগৃহ]

রাজা : আমার মুখের দিকে অমন হাঁ করে চেয়ে কি দেখছ ধনঞ্জয়?
ধনঞ্জয় : ভয় নেই মহারাজ! ভয় নেই! আপনিও মেঘ নন, আর আমিও চাতক পক্ষী নই। মহারাজ যদি অভয় দেন, তা হলেই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।
রাজা : বলো কী বলতে চাও।
ধনঞ্জয় : আমি বলছিলাম, মহারাজ, বৃন্দাবনের আয়ান ঘোষের সঙ্গে কি আপনার কোনো কুটুম্বিতা ছিল?
রাজা : তার মানে?
ধনঞ্জয় : তার মানে আর কিছু নয় মহারাজ, চেহারা তো দেখিনি, তবে তার বুদ্ধির সঙ্গে আপনার বুদ্ধির অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।
রাজা : ধনঞ্জয়!
ধনঞ্জয় : দোহাই মহারাজ! আমার মাথা কাটা যাক তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আপনার অ-রসিক বলে বদনাম রটলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে!
রাজা : বটে! আচ্ছা বলো কী বলছিলে!
ধনঞ্জয় : আমি বলছিলাম মহারাজ, আপনার ওই প্রধানমন্ত্রী বিদ্যাপতির কথা। ছিলেন দুর্গা-উপাসক, ঘোর শাক্ত, হলেন পরম বৈষ্ণব, কৃষ্ণভক্ত। ছিলেন রাজমন্ত্রী, কঠোর রাজনীতিক, হলেন কবি কান্ত-কোমল প্রেমিক।
রাজা : তাতে তোমার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হলো ধনঞ্জয়?
ধনঞ্জয় : কিছু না মহারাজ! ক্ষতি বৃদ্ধি যা হবার তা হচ্ছে রাজার আর তাঁর রাজ্যের। এ ক্ষতিও হচ্ছিল এতদিন গোপনে, তাকেও আবার দিনের আলোয় টেনে আনলে বিন্দে দূতী!

রাজা : বিন্দে দূতী? সে আবার কে?

ধনঞ্জয় : আজ্ঞে ওই হলো! আপনারা যাকে বলেন অনুরাধা, আমাদের মতো দুর্জন, তাকেই বলে বিন্দে দূতী।

রাজা : অর্থাৎ সহজ ভাষায় তোমার কথার অর্থ এই যে, কবি বিদ্যাপতি হচ্ছেন নন্দলাল, আমি হচ্ছি আয়ান ঘোষ আর শ্রীমতী হচ্ছেন— !

ধনঞ্জয় : দোহাই মহারাজ! মাথা আর ঘাড়ের সন্ধিস্থলে বিচ্ছেদের ভয় যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ও পাপ কথা কোন সাহসে উচ্চারণ করি মহারাজ!

রাজা : ধনঞ্জয়, আয়ান ঘোষের গোপবুদ্ধি আর তোমাদের রাজার ক্ষাত্রবুদ্ধিতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তোমরা কী বোঝ জানি না, আমি কিন্তু সব শুনি, সব দেখি, সবই বুঝি।

ধনঞ্জয় : মহারাজ পরম উদার। আপনার ধনবল জলবলও অপরিমাণ ; তবু মহারাজ, জটিলা কুটিলার মুখ বন্ধ করতে তা কি যথেষ্ট?

রাজা : দেখো ধনঞ্জয়, চোর যতক্ষণ ঘরের আশে পাশে ঘোরে ততক্ষণ জাগ্রত বলবান গৃহস্থ তাকে ভয় করে না। হ্যাঁ, তবে তাকে লক্ষ রাখতে হয় যে ঘরে সিঁধ না কাটে! যাক তুমি কি আর কিছু লক্ষ করেছ?

ধনঞ্জয় : আজ্ঞে তা মিথ্যে বলতে পারব না। মহারানি প্রত্যহ রাজসভায় এসে চিকের আড়াল টেনে বসেন হয়তো রাজকার্য দেখতেই এবং সে চিক গলিয়ে একটা চামচিকেরও যাবার উপায় নেই। তবু বিদ্যাপতির ওই পর্দামুখী আসনটা অনেকেরই চক্ষুশূল স্বরূপ হয়ে উঠেছে।

রাজা : ধনঞ্জয়, আমি লক্ষ রেখেছি বলেই ওদের মাঝের পর্দাটুকু আজও অপসারিত হয় নি। তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো আর তোমাদের সকলকে জানিয়ে দিয়ো যে, ওদের চেয়ে আমার দৃষ্টির পরিসর অনেক বেশি। ওরা দেখে শুধু রাজসভা আর রাজ-অন্তঃপুর, আর আমাকে দেখতে হয় সমগ্র রাজ্য।

ধনঞ্জয় : আচ্ছা মহারাজ! তারই পরীক্ষা হোক।

রাজা : কী পরীক্ষা করতে বলো তুমি?

ধনঞ্জয় : আমি বলি কী কোনোরকমে দিন কতকের জন্য রানিকে আটকে রাখুন। তিনি যেন রাজসভায় না আসেন। তারপর রানির অবর্তমানে বিদ্যাপতিকে কিছু নতুন পদ রচনা করে গাইতে বলুন। মহারাজ আপনার অনুগ্রহে প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠেছেন প্রধান গায়ক আর রাজসভা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাবাজির আখড়া। মহারাজ, দাসের অপরাধ নেবেন না।

রাজা : তোমার ইঙ্গিত বুঝেছি। আচ্ছা ধনঞ্জয়, তাই হবে।
ধনঞ্জয় : যাবার বেলায় একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই, মহারাজ ! একদা শ্যাম বনে গিয়ে শ্যামা রূপ ধারণ করে আয়ান ঘোষের চোখে ধুলো দিয়েছিলেন।
রাজা : আমার চোখের পর্দা আছে ধনঞ্জয়, এ চোখে কেউ ধুলো দিতে পারবে না।

সপ্তম খণ্ড

[বিদ্যাপতির গৃহের পুষ্পোদ্যান]

অনুরাধা : ঠাকুর আজ দু-দিন থেকে তোমার মুখে হাসি নাই, চোখে দীপ্তি নাই, কণ্ঠে গান নেই। কী হয়েছে তোমার ?
বিদ্যাপতি : কেন তুমি ছলনা করছ, অনুরাধা ? তুমি তো সবই জান। আজ দু-দিন ধরে রাজসভায় আমার লাঞ্ছনার আর সীমা নেই। এই দু-দিন রাজাকে একটি নূতন পদও শুনাতে পারি নি। আর তাই নিয়ে শত্রুপক্ষ আমায় বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছে।
অনুরাধা : হা হরি ! এই দু-দিনে একটা গানও লিখতে পারলে না তোমার সুরের ঝরনা হঠাৎ এমন শুকিয়ে গেল কেন ?
বিদ্যাপতি : তুমি তো জানো রাধা, আমার কাব্যের প্রেরণা, সুরের প্রাণ সবই লছমী দেবী। যেদিন তাঁর উপস্থিতি অনুভব না করি সেদিন আমার দুর্দিন। সেদিন আমার কাব্যলোকে সুরলোকে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ।
অনুরাধা : আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো রানিকে একটুও দেখতে পাও না, তবু কী করে বুঝতে পার যে রানি রাজসভায় এসেছেন ? রানি কি কোনো ইঙ্গিত করেন ?
বিদ্যাপতি : না না অনুরাধা ! লছমী তো ইঙ্গিতময়ী রূপে কোনোদিন দেখা দেন নি আমায়, তিনি আমার অন্তরে আবির্ভূতা হন সংগীতময়ী রূপে। তাঁর আবির্ভাব অনুভব করি আমি আমার অন্তর দিয়ে। যেদিন রানি রাজসভায় আসেন, সেদিন অকারণ পুলকে আমার সকল দেহ-মন বীণার মতো বেজে ওঠে। শত গানের শতদল ফুটে ওঠে আমার প্রাণে। আমি তখন আবিষ্টের মতো গান করি। সে আমার আত্মার গান—ও গান পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণের গান।
অনুরাধা : ঠাকুর আমার প্রণাম নাও। তোমার পা ছুঁয়ে আমি ধন্য হলাম। আমি কাল ভোরেই তোমাকে দেখাব তোমার কবিতা-লক্ষ্মীকে।
বিদ্যাপতি : পারবে ? পারবে তুমি, অনুরাধা ?

অনুরাধা : উতলা হোয়ো না ঠাকুর ! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আমি দূতী আমার অসাধ্য কিছু নেই।

বিদ্যাপতি : অনুরাধা ! তুমি হয়তো মনে করছ, আমি কী ঘোর স্বার্থপর, পাষণ্ড না ?

অনুরাধা : নিশ্চয়ই। পাষাণ না হলে ঠাকুর হবে কী করে? শুধু নেবে দিতে জানবে না, মাথা খুঁড়ে মরলেও থাকবে অটল, তবে তো হবে দেবতা ! তবেই না পাবে পূজা !

বিদ্যাপতি : অনুরাধা ! আমি যদি তোমার প্রেমের এক বিন্দুও পেতাম তা হলে আজ আমি জগতের শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারতাম।

অনুরাধা : না ঠাকুর, তা হলে তুমি হতে আমার মতোই উন্মাদ। সকলের আকাঙ্ক্ষা সমান নয় ঠাকুর, কেউ বা পেয়ে হয় খুশি আর কেউ বা খুশি হয় না-পেয়ে।

বিদ্যাপতি : তোমার প্রেমই প্রেম অনুরাধা, যা পায়ে শৃঙ্খলের মতো জড়িয়ে থাকে না, সে প্রেম দেয় অনন্তলোকে অনন্ত মুক্তি।

অনুরাধা : অত শত ঘোর প্যাঁচের কথা বুঝিনে, ঠাকুর। আমি ভালোবেসে কাঁদতে চাই, তাই কাঁদি। বুকে পেলে কান্না যাবে ফুরিয়ে, প্রেম যাবে শুকিয়ে, তাই পেতে চাইনে। বুকের ধনকে বিলিয়ে দিই অন্যকে। আমি চললাম ঠাকুর ! আমি চললাম। আমি কাল সকালে তোমার কবিতা-লক্ষ্মীকে দেখাব !

অষ্টম খণ্ড

(রাজ-অন্তঃপুর)

[অনুরাধার গান]

এ ধনি কর অবধান,
তোমা বিনা উনমত কান।
(কানু পাগল হলো গো। তোমারে না হেরি কানু পাগল হলো গো)

লছমী : কানু পাগল হলো না তুই পাগল হলি রাধা ?

[অনুরাধার গীত]

শুন শুন গুণবতী রাধে,
মাধবে বধিয়া তুই কী সাধিবি সাধে ?
(তুই কোন সাধ সাধিবি ? মাধবে বধিয়া তুই কোন সাধ সাধিবি ?)

লছমী : সতিনকে কাঁদাব ! বুঝলি ?

[অনুরাধার গীত]

এতহুঁ নিবেদন করি তোরে সুন্দরি
জানি ইহা করহ বিধান।
হৃদয়-পুতলি তুহুঁ সে শূন্য কলেবর
তুহুঁ বিদ্যাপতি-প্রাণ।।

লছমী : আ—মল ! বিদ্যাপতি, বিদ্যাপতি বলে ছুঁড়ি যে নিজেই পাগল হলি ! বিদ্যাপতির বিদ্যাটুকু বাদ দিয়ে তার ঘর জুড়ে বসলেই তো পারিস।

অনুরাধা : তা হলে তোমার কী দশা হবে সখী ?

লছমী : এক কৃষ্ণকে নিয়ে ষোলো হাজার গোপিনী যদি সুখী হতে পারে, আমরা দু-জন আর সুখী হতে পারব না কেন ?

অনুরাধা : সেই প্রেমময়ী গোপিনীদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি ভাই ! আমরা তাঁদের পায়ের ধুলো হবারও যোগ্য নই।

লছমী : সে কথা যাক। অনুরাধা, আমার একটা কথা জানতে বড়ো সাধ হয়। তিনি কি একবারও তোকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন না ?

অনুরাধা : আধবারও না।

লছমী : না ভাই লক্ষ্মীটি, লুকোসনে। মহারাজার আদেশে আমি আজ দু-দিন রাজসভায় যেতে পাইনি। তাঁকে একবারও দেখতে পাইনি, তাঁর গান শুনি নি। মনে হচ্ছে, যেন কত জন্ম তাঁকে দেখি নি।

অনুরাধা : আচ্ছা ভাই, তুই যদি আজ ভোরে ঠিক এইখানে এই মাধবীকুঞ্জে তাঁকে দেখতে পাস, তা হলে কী করিস ?

লছমী : আমি গিয়ে তাঁর বামে দাঁড়াই, আর তুই মিলনের পালা গান গাস।

রাজা : রানি !

অনুরাধা : আসি আসি, সখী, মহারাজ আসছেন।

রাজা : যোয়ো না যোয়ো না, অনুরাধা।

লছমী : রাজা, তোমায় এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন ? তোমার চোখে মুখে যেন রক্ত নেই।

রাজা : ঠিক মৃতের মতো না, রানি ? না, ওটা তোমার চোখের ভুল। রানি আমার একটা কথা রাখবে ?

লছমী : বলো ?

রাজা : আমাকে কাল ভোরেই চলে যেতে হবে, চলে যেতে হবে দূরে বহু দূরে আমার রাজ্যের সীমান্ত পেরিয়ে। রানি আমি যখন থাকব না, তখন যেন আমার প্রিয় সখা বিদ্যাপতির কোনো অযত্ন না হয়।

লছমী : আমি বুঝতে পারছি রাজা, তুমি অসুস্থ। তুমি একটু চুপ করে শোও, তোমার সেবা করার কর্তব্য থেকে আমায় বঞ্চিত কোরো না।

রাজা : কর্তব্য ! সেবা ! বেশ তাই করো রানি ! তাই করো ! লোকে যা চায়, ভগবান তাকে তার সব কিছু দেন না। এই বঞ্চিত করেই তিনি টেনে নেন সেই হতভাগ্যকে তাঁর শান্তিময় কোলে। রানি যাকে ভালোবাসার কেউ নেই সে যদি ভগবানেরও চরণে আশ্রয় না পায়, তার মতো দুর্ভাগা বুঝি আর কেউ নেই।

[বিদ্যাপতির গীত]

আজু রজনি হাম ভাগে পোহায়লুঁ

মহারাজ ! আজ আমি গান শোনাতে এসেছি। আজ আমার গানের বাঁধ, প্রাণের বাঁধ, সুরের বাঁধ ভেঙে গেছে।

রাজা : এসো এসো বন্ধু, এসো বিদ্যাপতি !

নবম খণ্ড

[রাজ-উদ্যান]

রাজা : এত আনন্দ তোমার কোনোদিন দেখিনি বিদ্যাপতি ! আজ তিন দিন ধরে তুমি ছিলে বাণীহীন মূক। হঠাৎ আজ ভোরে হয়ে উঠলে আনন্দিত-কণ্ঠ, সংগীত-মুখর। তোমার এত কবি-প্রেরণা এলো কোথা থেকে, বন্ধু !

বিদ্যাপতি : তা জানি না মহারাজ। আমার প্রাণ শুনাতে চায় গান। নিখিল জগৎকে আজ সে গানে গানে পাগল করে দিতে চায়, ডুবিয়ে দিতে চায়। ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। আজ আর তোমার আদেশের অপেক্ষা রাখব না রাজা, আজ গান গাইব স্বেচ্ছায়।

[বিদ্যাপতির গীত]

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ—
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশি ভেল নিরদ্বন্দ্বা।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিধি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥

রাজা : অপূর্ব ! সাধু, কবি, সাধু ! তুমি শুধু রানির কণ্ঠহার পেয়েছিলে, আজ তোমায় রাজার কণ্ঠহার দিয়ে ধন্য হলাম। লজ্জিত হোয়ো না কবি, লজ্জিত হোয়ো না বন্ধু, তোমার বুকের তলে লুকানো থাকে রানির দেওয়া কণ্ঠহার, সে কথা আর কেউ না জানলেও আমি জানি। এই রাজ-উদ্যানে এত ভোরে তুমি আমি ছাড়া আর কেউ নেই বন্ধু ! আর অন্তরালে যদি কেউ থাকে তিনি তোমার অনাত্মীয়া নন। বিদ্যাপতি, অন্তরিক্ষের দেবী চোখের সুম্মুখে এসে আবির্ভূতা না হলে মানুষের কণ্ঠে এমন গান আসে না। দেবীর দয়া, বন্ধু, এ দেবীর দয়া !

বিদ্যাপতি : মহারাজ ! কি আমায় বিদ্রূপ করছেন? তা করুন তবু আমার আজকের আনন্দকে মলিন করতে পারবেন না। এ আনন্দ এই শুভ প্রভাতের মতোই অমলিন।

রাজা : তা জানি বলেই তোমায় শ্রদ্ধা করে আজও বন্ধু বলেই সম্ভাষণ করি, বিদ্যাপতি ! শোনো বন্ধু আজ থেকে আমার রাজ্যে তুমি পরিচিত হবে 'কবি-কণ্ঠহার' নামে।

ধনঞ্জয় : মহারাজ, আজকের এই আনন্দটা কি সত্যিকার?

দশম খণ্ড

বিদ্যাপতি : তুমি তা বুঝবে না ধনঞ্জয়। যে প্রদীপ তিলে তিলে পুড়ে বুকের সমস্ত স্নেহরসকে জ্বালিয়ে অপরকে দান করে আলো, সেই প্রদীপ ধনঞ্জয়, মাত্র সেই প্রদীপই জানে এই আত্মদানের, আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার, কী অপার আনন্দ !

রাজা : ঠিক বলেছ কবি। আরতির প্রদীপ নিববার আগে যেমন করে শেষবার তার উজ্জ্বলতম শিখা মেলে দেবতার মুখ দেখে নিতে চায়, তেমনি করে আমার অন্তর-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখে নিতে চাইছে আমার শ্রান্ত প্রাণশিখা। তুমি এমন গান শুনাতে পার কবি, যা আমার অন্তিম সময়ে শুনতে ইচ্ছা করবে?

ধনঞ্জয় : মহারাজ এইবার কিন্তু অরসিকের মতো কথা আরম্ভ হলো এবং কাজেই আমাকে সরে পড়তে হলো। (প্রস্থান)

রাজা : ধনঞ্জয় ! ধনঞ্জয় ! চলে গেছে? আঃ বাঁচলাম ! বিদ্যাপতি, আমায় একটু ধরো, এখানে উঠে এলাম কী করে জানি না ; আর বোধ হয় এখানে থেকে উঠে যেতেও পারব না !

বিদ্যাপতি : তুমি এমন করছ কেন সখা? তোমার কি কোনো অসুখ করেছে?

রাজা : সখা ! প্রেমের বৃন্দাবনে আমরা—আমি তুমি লছমী অনুরাধা, জন্ম জন্ম ধরে লীলা-সহচর-সহচরী। সেই প্রেমলোকের গান যেদিন তুমি শুনালে সেদিন আমার মনে পড়ে গেল আমার বিস্তৃত জন্মের কথা, মনে পড়ে গেল প্রেমলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে। তোমার গানের মন্ত্রে আমি উপাসনা করতে লাগলাম রাধা-শ্যামের যুগল মূর্তি। আমি আমার উপাস্য দেবতাকে পেয়েছি, তাই তাঁর বিরহ আর সহ্য করতে পাচ্ছি না, বন্ধু ! আমি যে আমার কানুর বাঁশরি শুনতে পেয়েছি।

বিদ্যাপতি : রাজা !

রাজা : তুমি ঠকে গেলে, বন্ধু ! তুমি গড়লে তরণি আর আমি তাই চুরি করে গেলাম বৈতরণি পেরিয়ে। বিদ্যাপতি, তুমি কাঁদছ ? কেঁদো না সখা ! তুমিও আসবে দু-দিন পরে আমাদের চিরলীলা-নিকেতন, বৈকুণ্ঠধামে। জানো বিদ্যাপতি, কাল সারারাত আমি ঘুমোইনি আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে ডেকেছি আর কেঁদেছি। আজ ভোরে সেই অশান্তের আহ্বান ভেসে এলো কানে। সে আমায় ডাকছে, ওরে আয় আয় ; আমার প্রিয়, আমার বুকে চলে আয়। রানি বলছিলেন রাজবৈদ্যকে খবর দিতে, এমন সময়ে এলে তুমি—ভবরোগের বৈদ্য।

একাদশ খণ্ড

রাজা : তুমি এখন গাও সখা আমার মাধবের নাম গান।

[বিদ্যাপতির গীত]

মাধব ! বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলুঁ—
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গনইতে দোষ গুণ- লেশ না পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার,
তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ-বাহির নহি মুই ছার !
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু—
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

রাজা : আহা ! আবার বলো, সখা, আবার বলো !

মাধব ! তরইতে ইহ ভবসিন্ধু—
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল-এক দেহ দীনবন্ধু ! দীনবন্ধু—

আঃ আমার মাথা কার কোলে ?

রানি : রাজা ! আমি দাসী, লছমী।

রাজা : লছমী ! ওঃ ! কে কাঁদে আমার পায়ে পড়ে ?

অনুরাধা : রাজা ! আমি—আমি অনুরাধা। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু উপাসক পরম প্রেমিক তুমি, আমায় পায়ের ধুলো দিয়ে যাও। আমি এ চরণ-ধূলির প্রসাদে মুক্ত হয়ে যাই !

রাজা : অনুরাধা ! অনুরাধা !—কী মধুর নাম ! এই তো আমার বৃন্দাবন। বিদ্যাপতি নারায়ণ, লছমী, অনুরাধা, শ্রীকৃষ্ণ নাম গান এরই মাঝে যেন জন্মে জন্মে আমি শ্রীকৃষ্ণ-মাধব (মৃত্যু)

বিদ্যাপতি : অনুরাধা

লছমী : রাজা ! রাজা !

দ্বাদশ খণ্ড

(বিসকি গ্রাম—বিদ্যাপতির ভবন—দেবীদুর্গা মন্দির)

[বিদ্যাপতির গীত]

হে নিঠুর তোমাতে নাই আশার আলো।
তাই কি তোমার রূপ কৃষ্ণ কালো ?
তুমি ত্রিভঙ্গ তাই তোমার সকলই বাঁকা,
চোখে তব কাজলের ছলনা মাখা।
নিষাদের হাতে বাঁশি সেজেছে ভালো।।

বিজয়া : দাদা ! তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উঠে একটু কিছু মুখে দাও। আজ সাত দিন ধরে নিরম্বু উপবাস করে মায়ের মন্দিরে হত্যা দিয়ে পড়ে আছ, তুমি যোগী ভক্ত—তুমি সব পার কিন্তু আমি যে আর পারিনে, দাদা !

বিদ্যাপতি : এই সাত দিন কি তুইও কিছু খাসনি, বিজয়া ?

বিজয়া : না।

বিজয়া : দাদা। মায়ের প্রসাদ এনেছি, তাই একটু খাও।

বিদ্যাপতি : বিজয়া ! আজ আমার উপবাসের সপ্তমী, কাল অষ্টমী—সেই মহাষ্টমীতে মায়ের পায়ে আত্মবলিদান দিয়ে মায়ের হাতে প্রসাদ গ্রহণ করব। তুই এখন যা। (বিজয়ার প্রস্থান)

বিদ্যাপতি : মা যোগমায়া ! পাষাণী ! আর আমায় কত পরীক্ষা করবি মা ! আমার যারা প্রাণের প্রিয়তম তাদের হরণ করে তাদের আর আমার মাঝে চিরবিচ্ছেদের যবনিকা টেনে দিলি। আমায় নিয়ে এ কী খেলা খেলছিস মা ?

যোগমায়া : পুত্র বিদ্যাপতি ! ওঠো, প্রসাদ গ্রহণ করো। এই সাত দিন ধরে তোমার সাথে আমিও উপবাসী !

বিদ্যাপতি : না আমি আহার গ্রহণ করব না—যতদিন না জানতে পারি কোন অভিশাপে আমার এই শাস্তি ?

যোগমায়া : শোনো পুত্র ! তোমরা সকলেই ছিলে গোলোকধামের অধিবাসী, মহাবিষ্ণুর লীলা সহচর-সহচরী। তোমরা ধরণিতে নিষ্কাম প্রেম প্রচারের করভিক্ষা করেছিলে শ্রীকৃষ্ণের কাছে, তাই পবিত্র প্রেমের ও শ্রীকৃষ্ণের কীর্তনের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছ। তোমাদের যাবার সময় হলো, বৎস। তোমাদের দেহে মনে ধরণির যে ধূলি লেগেছে তা ধুয়ে দেবেন স্বয়ং দেবী ভাগীরথী। তুমি এখনই যাও গঙ্গার পথে, সেই পথে শ্রীকৃষ্ণবিরহ কৃষ্ণ-ফণী রূপে তোমায় দংশন করবে। তার পর হবে তোমাদের চির-মিলন, মৃত্যুকে পুরোহিত করে গঙ্গার পবিত্র বক্ষে।

ত্রয়োদশ খণ্ড

[গঙ্গাবক্ষে ঝড়বৃষ্টি]

বিদ্যাপতি : কে ? কে তুমি চলেছ আমার আগে আগে দীপ জ্বালিয়ে পথ দেখিয়ে ?

অনুরাধা : ঠাকুর, আমি অনুরাধা !

বিদ্যাপতি : অনুরাধা ! অনুরাধা ! নিয়ে চলো, নিয়ে চলো আমায় ! এই ঝড়বৃষ্টি ? কৃষ্ণরাতের মধ্য দিয়ে সেইখানে, যেখানে আছে অনন্ত প্রেম, অনন্ত ক্রন্দন, অনন্ত অতৃপ্তি।

অনুরাধা : এসো কবি, এসো সাধক ! এই অশান্ত কৃষ্ণ-নিশীথিনীর পরপারেই পাবে অশান্ত কিশোর চির-বিরহী শ্রীকৃষ্ণকে।

বিদ্যাপতি : অনুরাধা ! দাঁড়াও দাঁড়াও ! কে যেন আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। উঃ রাধা ! রাধা ! আমায় কৃষ্ণসর্পে দংশন করেছে। জ্বলে গেল, বিষে আমার সকল দেহ জ্বলে গেল, জ্বলে গেল।

অনুরাধা : ঠাকুর! ঠাকুর! দেখছ! ওই কৃষ্ণসর্পের মাথায় কী অপূর্ব মণি জ্বলছে। ও কৃষ্ণসর্প নয় ঠাকুর, তোমায় দংশন করেছে কৃষ্ণ-বিরহ। ওই বিরহ-ফণী যাকে দংশন করে তার মুক্তির আর বিলম্ব থাকে না।

বিদ্যাপতি : অনুরাধা! অনুরাধা! কোথায় গেল অনুরাধা! চলে গেছে! আমি যাব! আবার গঙ্গার পথেই যাব। যতক্ষণ শেষ নিশ্বাস থাকে আমার ততক্ষণ ছুটব পতিতপাবনীকে স্মরণ করে। মাগো! পতিতপাবনী ভাগীরথী! আমি তোর কোলের আশায় এত পথ ছুটে এলাম, তবু তোর কোলে আমার এই পাপ-তাপিত বিষ-জর্জরিত দেহ রাখতে পারলাম না, মা। অঙ্গ আমার অবশ হয়ে এলো, আর চলতে পারি না, মা! যাকে ডেকে মৃত্যু উপেক্ষা করে সন্তান এলো এতদূর পথ, আর তুই এইটুকু পথ আসতে পারবি না মা ভক্ত ছেলের ডাকে? মা! মাগো!

গঙ্গা : বিদ্যাপতি!

বিদ্যাপতি : এ কী—মকরবাহিনী কলুষনাশিনী মাগো—তবে কি সন্তানের অন্তিম প্রার্থনা শুনেছিস মা! আঃ! আমার প্রাণ-মন-দেহ জুড়িয়ে গেল মা, তোর মাতৃকরস্পর্শে।

গঙ্গা : বিদ্যাপতি, আমি এসেছি তোমাদের নিয়ে যেতে, তোমাদের আপন গেহে, নন্দনলোকে। ওই তোমার লছমী অনুরাধা সাথে আসছে—বৎস, তোমাদের লীলা শেষ, কার্য শেষ। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সাথী—তোমরা যুগে যুগে আস, ফিরে চলো বৎস তাঁর প্রেমময় কোলে।

[অনুরাধার গীত]

সজনী আজু শমন দিন হয়।

চতুর্দশ খণ্ড

[অনুরাধার গীত]

সজনী আজু শমন দিন হয়।
নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপিল
প্রাণ দেহে নাহি রয়॥
বরষিছে পুনঃ পুনঃ অগ্নিদাহন যেন
জানিনু জীবন লয়।

[বিদ্যাপতির গীত]

বিদ্যাপতি কহে শুন শুন লছমী
মরণে মিলন মধুময়॥

লছমী : কে? বিদ্যাপতি?
বিদ্যাপতি : লছমী? তুমি?
অনুরাধা : হ্যাঁ ঠাকুর! আমি নিয়ে এসেছি তোমার জীবন-মরণের সাথি লছমীকে। পবিত্র সুরধুনী-ধারায় স্নাত হয়ে তোমরা উভয়ে হলে নির্মল, তাই তো মা পতিতপাবনীর কোলে হলো তোমাদের মিলন।

[গীত]

শেষ হলো মোর কাজ, হে কিশোর! আমারে লহো এবার।

লছমী : অনুরাধা! সখি! কোথায় চলছিস তুই? তুই কি আমাদের ছেড়ে এমনি দূরে দূরেই ভেসে যাবি?
অনুরাধা : লছমী! সখি! আমি যেন জন্মে-জন্মে কালস্রোতে ভেসে এমনই যুগলমিলন দেখে মরতে পারি।

[গীত]

তোমার যাহাতে সুখ তাহে আমার সুখ
সুন্দর মাধব হমার।
কোটি জনম যেন তুহার সুখের লাগি
ডারি দেই এ জীবন ছার॥

বাসন্তিকা

একাঙ্ক নাটিকা

কুশীলব

(পুরুষ)

ফাল্গুনী	হৃদয়-রাজ্যের রাজা
দখিন হাওয়া	ওই মন্ত্রী
কোকিল	ওই দূত
পঞ্চশর	ওই সেনাপতি

ভ্রমর, মৌমাছি, প্রজাপতি, দোয়েল, শ্যামা ... বৈতালিক দল।

(নারী)

বাসন্তিকা	ফুলের দেশের রানি
চৈতালি	রানির প্রিয় সহচরী

প্রথম দৃশ্য

প্রেক্ষাগৃহের সম্মুখে ধোঁয়া রঙের যবনিকা। সেই যবনিকার এক পাশে অস্পষ্ট শ্বেতকরবীর গাছ আঁকা। গাছ থেকে কতক ফুল ঝরে পড়েছে, কতক ফুল ঝর-ঝর। আরেক পাশে আঁকা পল্লবহীন শিমুলতরু—তাতে দু-একটি কুঁড়ি দেখা দিয়েছে। যেন শীত ফুরিয়েছে, বসন্ত আসছে।... যবনিকা তোলার সঙ্গে সঙ্গে রাজাধিরাজ ফাল্গুনীর অগ্রদূত কোকিল মুহুর্মুহু কুহুস্বরে রাজার আগমনবার্তা ঘোষণা করল। দূরে মৃদঙ্গ বীণা বেণুকা বেজে উঠল।

ভ্রমর, মধু-মক্ষী, প্রজাপতি, দোয়েল, শ্যামা প্রভৃতি বৈতালিকদল সমস্বরে গেয়ে উঠল :

(গান)

এলো ওই বনান্তে পাগল বসন্ত।
বনে বনে মনে মনে রং সে ছড়ায় রে
চঞ্চল তরুণ দুরন্ত॥

বাঁশিতে বাজায় সে বিধুর
পরজ-বসন্তের সুর
পাণ্ডু কপোলে জাগে রং নব অনুরাগে,
রাঙা হলো ধূসর দিগন্ত॥
কিশলয়-পর্ণে অশান্ত
ওড়ে তার অঞ্চলপ্রান্ত,
পলাশকলিতে তার ফুলধনু লঘুভার
ফুলে ফুলে হাসি অফুরন্ত॥
এলোমেলো দখিনা মলয় রে
প্রলাপ বকিছে বনময় রে,
অকারণ মনোমাঝে বিরহের বেণু বাজে
জেগে ওঠে বেদনা ঘুমন্ত॥

চৈতালি : ভয় কী সম্রাজ্ঞী ! তব কণ্ঠের বিভব
সীমাহীন মহীয়ান বৈচিত্র্যে সুরের !
বহুরূপী কণ্ঠে তব বহু সুরে গান
শুনিয়াছি বহুবার, মেনেছি বিস্ময়।
গাহো গান আনন্দের। যদি সে পথিক
সত্যই আসিয়া যায়, সে যেন জানিতে
না পারে তোমার সখী মরমের কথা।
সে যেন আসিয়া হেরে, তুমি মূর্তিমতী
আনন্দ-প্রতিমা, তুমি সম্রাজ্ঞী বনের।
রাজাই সে হয় যদি, এসে দেখে যাক
রানির মহিমা তব, শিব নত করি
উদ্দেশে সে নিবেদন করুক প্রণাম।

বাসন্তিকা : সেই ভালো, গাহি গান আমি আনমনে,
এই অবসরে তুই বনরাজ্যে মোর
বিশৃঙ্খল যাহা কিছু অসুন্দর যত
সংযত সুন্দর করি রাখিবি সাজায়ে।
অসুন্দর কোনো কিছু হেরি রাজ্যে মোর
সুন্দরের আঁখি যেন ব্যথা নাহি পায়।

(গান)

দোলা লাগিল দখিনার বনে বনে।
বাঁশরি বাজিল ছায়ানটে মনে মনে॥

চিত্তে চপল নৃত্যে কে
ছন্দে ছন্দে যায় ডেকে,
যৌবনের বিহঙ্গ ওই ডেকে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে॥

বাজে বিজয়ডঙ্কা তারই এলো তরুণ ফাল্গুনী।
জাগো ঘুমন্ত দিকে দিকে ওই গান শুনি।
টুটিল সব অন্ধকার
খোলো খোলো বন্ধ দ্বার,
বাহিরে কে যাবি আয় সে শুধায় জনে জনে॥

চৈতালি : রানি রানি। শোনো ওই দূরাগত গান,
কে যেন পথিক বুঝি পরান-পসারি
পরানের পসরা সে যায় হেঁকে গানে।
প্রথম দিনের দেখা তব সে তরুণ
এ যদি লো সেই হয় কী করিবে তবে?
মুখপানে চেয়ে রবে নির্নিমেষ আঁখি?

বাসন্তিকা : কী মধুর কণ্ঠ, শোন, শোন লো চৈতালি,
শুনিতে দে প্রাণ ভরি, চল অন্তরালে।

(গান গাইতে গাইতে ফাল্গুনীর প্রবেশ)

আমার গানের মালা আমি করব কারে দান।
মালার ফুলে জড়িয়ে আছে করুণ অভিমান॥
চোখে মলিন কাজল লেখা
কণ্ঠে কাঁদে কুহুকেকা
কপোলে যার অশ্রু লেখা
একা যাহার প্রাণ।
মালা করব তারে দান॥
কথায় আমার কাঁটার বেদন
মালার সূচির জ্বালা;
কণ্ঠে দিতে সাহস না পাই
অভিশাপের মালা
এই অভিশাপের মালা।

বিরহে যার প্রেম আরতি
আঁধার লোকের অরুন্ধতী

নাম-না জানা সেই তপতী
তার তরে এই গান।
মালা করব তারে দান॥

চৈতালি : রহিতে পারি না আর দূর-অন্তরালে,
কণ্ঠে মম স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে গান।
পত্রাবগুণ্ঠনে কুঁড়ি রহিতে কি পারে
ভ্রমর আসিয়া সবে শোনায় গুঞ্জন।

বাসন্তিকা : চৈতালি ! চৈতালি ! শোন, শোন মাথা খাস
যাসনে উহার কাছে, ওরে ও চপলা
কী জানি কী কহিবি যে বুঝি মোর নামে,
সত্য-মিথ্যা কত কথা বিদেশির কাছে।

(কুঞ্জান্তরাল হতে গান গাইতে গাইতে চৈতালির প্রবেশ)

বাসন্তিকা : হৃদয় এমনই সখি, যাহারে সে চায়
তারে সে চিনিতে পারে আঁখির পলকে।
এমনই রহস্যময় পৃথিবীর প্রেম,
যখন সে আসে—আসে সহসা সহজে।
দেখিসনি তুই কি লো, এলো সে যেমনই
রাজ্য মোর পূর্ণ হলো রাজ-সমারোহে
রাজ্যের ঐশ্বর্য যত ছিল বনভূমে
লুটায়ে পড়িল সব তার পদতলে॥

চৈতালি : মনের ঐশ্বর্য তব, বনের সে নহে
লুটাইল যাহা সেই পথিকের পায়।
আমি দেখি নাই তার রাজ-সমারোহ,
হয়তো দেখেছ তুমি—এমনই নয়ন !
একের নয়নে যার রূপ সীমাহীন,
অন্যের নয়ন সখি তাহাতে বিরূপ।

বাসন্তিকা : রাখ সখি, কথা আর ভালো নাহি লাগে।
মনে হয়, চুপ করে বসে শুধু ভাবি।

চৈতালি : ভাবনার অঙ্কুরেই এত, এ ভাবনা
ক্রমে যবে হবে মহিরুহ সুবিশাল

সহস্র শিকড় দিয়ে বাঁধিবে তোমায়
তখন কী হবে হায়, তাই আমি ভাবি।
ভালো, কথা নাহি কব, তুমিও কোয়ো না।
তার চেয়ে গাহো গান, আমি বসে শুনি।

[বাসন্তিকার গান]

কত জনম যাবে তোমার বিরহে
স্মৃতির জ্বালা পরান দহে॥
শূন্য গেহ মোর শূন্য জীবনে
একা থাকারই ব্যথা কত সহে ওগো॥
দিয়েছি যে জ্বালা জীবন ভরি হায়,
গলি নয়ন–ধারায় ব্যথা বহে॥

তৃতীয় দৃশ্য

পঞ্চশর : শুনিতেছ, কি মধুর গান আসে ভেসে?

চৈতালি : তোমাদের রাজার বন্দনা গাহিতেছে
বনলক্ষ্মী। বলিতে কি পার বন্ধু তুমি
কি করিছে রাজা–রানি কুঞ্জে নিরালায়?

দখিন হাওয়া : আমি যদি চলে যাই এই স্থান ত্যাজি
যা করিবে নিরালাতে তোমরা দু–জন—
তেমনই একটা কিছু। বেশি কিছু নহে।

চৈতালি : বড়ো লঘু চিত্ত তুমি দক্ষিণের হাওয়া,
ডেকে আনি পুষ্পলতা সখিরে আমার
সমুচিত শাস্তি দেবে, হবে তব সাথি।
শুনিতে হবে না আর তব হা–হুতাশ।

দখিন হাওয়া : কাজ নাই, তার চেয়ে তুমি গাহো গান,
যে গান শুনিয়া কুঞ্জ–মাঝে রাজা–রানি—
বুঝিতে পারিবে মোরা বেশি দূরে নাই,
উৎসাহ দেবার তরে নিকটেই আছি।

বুঝিতেছি সব কিছু, দেখি না যদিও
উপভোগ করিতেছি মনশ্চক্ষু দিয়ে।

চৈতালি : তা হলে আমিও গাই উৎসাহের গান।
জ্বালাইলে কবে রানি ! হায়, পরিচয়
না হতেই মনে মনে মান অভিমান !
পরিচয় ঘন হলে আরও কত হবে !
প্রেমিকা তো নহি, তাই কিছু নাহি বুঝি।

বাসন্তিকা : আঁখি-বিনিময়ে আঁখি চিনি লয় যারে
পলকে যে জিনি লয় সকল হৃদয়
সে বহু জনমের সাথি, বন্ধু, সখা।
চৈতালি ! রহস্য এর তুই বুঝিবি না।
জন্মে জন্মে নব নব রূপে তার সাথে
বিরহ-মিলন, হয় নব জানাজানি।
ব্যথা দিয়ে চলে যায় জন্মান্তর পারে
একজন চলে যায়—সাথি তার খোঁজে
আসে নব রূপ ধরি তারই পিছু পিছু।
আত্মার আত্মীয় যার সাথি প্রিয়তম
শুধু সেই জানে সখি রহস্য ইহার।
হৃদয় বরিয়া লগ্ন হৃদি-দেবতারে।

(দূরে কোকিলের অবিরল কুহুধ্বনি)

চৈতালি : ওই বুঝি এলো তব হৃদিরাজদূত
মুহুর্মুহু কুহুস্বরে কাঁপায়ে কান্তার।
মর্মরিয়া লতাপাতা দখিনা পবন
সহসা আসিল ওই, উতলা কানন।
সহচর অনুচর দূত এলো যবে
রাজাও আসিছে পিছে মনে লাগে মোর।
উষসীর আগমনে বুঝি লো যেমন
তপনের উদয়ের আর নাহি দেরি।

বাসন্তিকা : চৈতালি ! কী হবে তবে ? সত্যই সে যদি
এসে পড়ে, হেরে মোরে বিরহ-বিধুরা
কী হবে, এ মুখ সখি কেমনে লুকাই,
তুই বলে দে লো সখি, কী করিব আমি !

প্রণয় মধুর—যত রহে সে গোপন,
প্রকাশের লজ্জা তার অতি নিদারুণ।
লজ্জায় মরিয়া যাব, সে যদি লো বোঝে
ইঙ্গিতেও মোর পোড়া মরমের ব্যথা!

(পঞ্চশর ও চৈতালির গান)

পঞ্চশর : বন-দেবী এসো গহন বনছায়ে।
চৈতালি : এসো বসন্তের রাজা নূপুর-মুখর পায়ে॥
পঞ্চশর : তুমি কুসুম-ফাঁদ
চৈতালি : তুমি মাধবী চাঁদ
উভয়ে : আমরা আবেশ ফাল্গুনের
ভাসিয়া চলি স্বপন-নায়ে॥
পঞ্চশর : কল্পলোকের তুমি রূপরানি লো প্রিয়া
অপাঙ্গে ফোটাও জুঁই চম্পা টগর মোতিয়া।
চৈতালি : নিঠুর পরশ তব (হায়) যাচিয়া জাগে বনভূমি,
ফুলদল পড়ে ঝরি তব চারুপদ চুমি।
উভয়ে : (মোরা) সুন্দরের পথ সাজাই
ঝরা কুসুম-দল বিছায়ে॥
দখিন হাওয়া : তোমরা পরোক্ষে বুঝি এই ছল করি
কয়ে নিলে তোমাদেরও অন্তরের কথা।
চৈতালি : তুমি বড়ো লঘু, বন্ধু! চলো আলাপন
করি গিয়ে দূরে মোরা কুঞ্জের বাহিরে।

(সকলের প্রস্থান)

ফাল্গুনী : ছল করি উহাদেরে লয়ে গেল দূরে
চৈতালি তোমায় সখি। কেন নত চোখে
চেয়ে আছ? কথা কও চাহো মুখপানে।

(বাসন্তিকার গান)

অঞ্জলি লহো মোর সংগীতে
প্রদীপ-শিখাসম কাঁপিছে প্রাণ মম
তোমায়, হে সুন্দর বন্দিতে।
সংগীতে সংগীতে॥
তোমার দেবালয়ে কী সুখে কী জানি
দুলে দুলে ওঠে আমার দেহখানি

আরতি নৃত্যের ভঙ্গিতে।
সংগীতে সংগীতে॥
পুলকে বিকশিল প্রেমের শতদল
গন্ধে রূপে রসে টলিছে টলমল।
তোমার মুখে চাহি আমার বাণী যত
লুটাইয়া পড়ে ঝরা ফুলের মতো
তোমার পদতল রঞ্জিতে।
সংগীতে সংগীতে॥

চতুর্থ দৃশ্য

বাসন্তিকা : কেন ক্লান্ত আঁখি তব? কেন বারবার
চাহিতেছ মোর মুখে? এই তো তোমার
বাহুর বন্ধনে আমি আছি নাথ বাঁধা।
বিষাদিত ছলছল আঁখি হেরি তব
মনে বড়ো ভয় লাগে, আমি বড়ো ভীরু।
আছ মম বুকে, তবু কাঁদে কেন প্রাণ।

ফাল্গুনী : (গান)
পিয়া পিয়া মোরে ভোলো, ভোলো ভালোবাসা!
হেরো উষার বুকে কাঁদে প্রভাতি তারা
তব বেণির মালা ম্লান, সুরভিহারা
আজি ফুরাল ফাগুন এলো যাবার বেলা,
ভাঙে ভুলের মেলা, ভাঙে ফুলের খেলা।
পিয়া পিয়া মোরে ভোলো, ভোলো ভালোবাসা॥
তব মৃণাল-ভুজে আর বেঁধো না মোরে
ভিরু চাঁদের মতো আজও হাসি অধরে
অনুরাগের কাজল আঁকি আঁখির তীরে
চাহি মুখের পানে বোলো, 'আসিয়ো ফিরে'।
পিয়া পিয়া মোরে ভোলো, ভোলো ভালোবাসা॥
ফিরে আসিবে আবার নব চাঁদের তিথি,
মালা তোমারই গলে দেবে নব অতিথি,
রবে তারই বুকে মোর প্রথম প্রণয়
আজি ফুরাল ফাগুন, এলো যাবার সময়!
পিয়া পিয়া মোরে ভোলো, ভোলো ভালোবাসা॥

বাসন্তিকা : বসন্তের রাজা মোর ! হৃদয়ের নাথ !
এ কী তব অরুন্তুদ অকরুণ গাণ ?
অকারণ কেন মোরে দেখাও এ ভয় ?
তুমি কি জান না নাথ, তুমি চলে গেলে
ফুরাইবে রাজ্যে মোর বসন্ত-উৎসব ?

ফাল্গুনী : আমি চিরচঞ্চল পথিক ঘরছাড়া,
বন্ধুহারা, উদাসীন, বিরাগী প্রেমিক।
সাথি মম পঞ্চশর দক্ষিণ সমীর,
ক্ষণিকের পথভোলা পথিক এরাও।
দু-দিনের পিককুল মোর অগ্রদূত।
প্রজাপতি অলি—এরা মোর বৈতালিক।
ক্ষণিকের অতিথি যে আমরা সকলে,
কেন ভুলিতেছ প্রিয়া ? নাই সাধ্য নাই,
এর বেশি পৃথিবীতে থাকিবার আর।
বসন্ত হয় অবসান, দিগন্তে বিদায়ের বেণু
ওই শোনো বাজি ওঠে সকরুণ রবে।
আমারে যে যেতে হবে। জনমে জনমে
এমনই আসিব কাছে দুদিনের লাগি,
না মিটিতে সাধ শেষে চলে যেতে হবে !
বিধির বিধান ইহা, যথা ভালোবাসা !
মিলন ক্ষণিক সেথা, অনন্ত বিরহ।

বাসন্তিকা : যেতে নাহি দিব আমি। তুমি রাজা, বীর,
আমারে বধিয়া যাও তব রাজ্যে ফিরে।
না, না, তব পায়ে পড়ি, থাকো ক্ষণকাল
পরুষ বচন আর কভু শোনাব না।

(গান)

মিনতি রাখো রাখো, পথিক থাকো থাকো
এখনই যেয়ো না গো না না না।
ক্ষণিক অতিথি বিদায়ের গীতি
এখনই গেয়ো না গো, না না না॥
চৈতি পূর্ণিমা চাঁদের তিথি
পুষ্প-পাগল এ বনবীথি
ধুলায় ছেয়ো না গো—না না না॥
বলি বলি করে হয়নি যা বলা,

যে কথা ভরিয়া ছিল বুকের তলা,
সে কথা না শুনে সুন্দর অতিথি হে
যেতে চেয়ো না গো, না না না॥

ফাল্গুনী : তবু মোরে যেতে হবে! ছিঁড়িবে হৃদয়;
করিতে হইবে তবু ছিন্নএই ডোর।
ভালোবেসে কাঁদি আমি কাঁদিয়া কাঁদাই
এ মোর আত্মার ধর্ম! হে প্রিয়া বিদায়!

(গান)

বল্লরি ভুজবন্ধন খোলো!
অভিসার-নিশি অবসান হলো॥
পাণ্ডুর চাঁদ হেরো অস্তাচলে
জাগিয়া শ্রান্ত তনু পড়েছে ঢলে
মল্লিকা মালা ম্লান বক্ষতলে,
অভিমান-অবনত আঁখি তোলো॥
উতল সমীর আমি নিমিষের ভুল
কুসুম ঝরাই কভু ফোটাই মুকুল।
আলোকে শুকায় মোর প্রেমের শিশির
দিনের বিরহ আমি, মিলন নিশির॥
হে প্রিয় ভীরু এ স্বপন-বিলাসীর
অকরুণ প্রণয় ভোলো ভোলো॥ (প্রস্থান)

বাসন্তিকা : কোথা তুমি প্রিয়তম ফাল্গুনী কিশোর?
নিশীথের ক্ষণিকের সুখ-স্বপ্নসম
আসিয়া গেলে কি চলি না মিটিতে সাধ?
দূরে ওই ওড়ে যেন বৈশাখী ঝড়ের
বিজয়-কেতন তার। বাসন্তী উৎসব
শেষ হোক আজি তবে। ঝরা ফুলদল,
বিরহের রৌদ্রদাহে মোর বনভূমি
পুড়ে যাক, উড়ে যাক, হোক ছারখার।
যোগিনীর গৈরিক নিশান নীলাম্বরে
এবার উড়ুক তবে। বিস্মৃতির ধূলি
ছেয়ে দিক রাজ্য মোর শস্য পুষ্পময়॥

(গান)

ভোরে স্বপনে কে তুমি দিয়ে দেখা
লুকালে সহসা।

মোর তপনের রাঙা কিরণ যেন
ঘিরিল তমসা ॥
না ফুটিতে মোর কথার কুঁড়ি
চপল বুলবুলি গেলে উড়ি
গেলে ভাসিয়া ভোরের সুর যেন
বিষাদ-অলসা ॥
জেগে দেখি হায় ঝরা ফুলে আছে ছেয়ে
তোমার পথতল
ওগো অতিথি, কাঁদিছে বনভূমি
ছড়ায়ে ফুলদল।
মুখর আমার গানের পাখি
নীরব হলো হায় বারেক ডাকি
যেন ফাগুনের জোছনা-হসিত রাতে
নামিল বরষা ॥

[গানের মাঝে উঠল ধূলি-গৈরিক ঝড়, গানের শেষ দিকে 'বাসন্তিকা' ও রঙ্গমঞ্চ আর দেখা গেল না। সেই অন্ধকারেই গানের শেষ হলো।]

মক্তব সাহিত্য

মক্তব সাহিত্য

মোনাজাত

[সুরা ফাতেহা]

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

*   *   *

সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার-দিনের খোদা ! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও
যাদেরে বিলাও দয়া সে পথ দেখাও।
যারা অভিশপ্ত পথভ্রষ্ট এ জগতে
চালায়োনা খোদা যেন তাহাদের পথে।

আলোচনা : মোনাজাত—প্রার্থনা, সুরা—শ্লোক, ফাতেহা—উদ্ঘাটিকা। এই সুরা দিয়াই পবিত্র কোরান শরীফের আরম্ভ। এইজন্য এই সুরার নাম 'ফাতেহা'। ...

প্রশ্ন : ...

বানান কর ও অর্থ বল— ...

হজরত মোহাম্মদের উম্মত পরীক্ষা

কোনো এক ব্যক্তি হজরত মোহাম্মদের নিকট গিয়া তাঁহার উম্মত হইবার প্রার্থনা জানাইল। হজরত তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার হাতে একটি মুরগির বাচ্চা দিয়া বলিলেন, 'তুমি কোনো নির্জন স্থানে গিয়া, ইহাকে জবেহ করিয়া লইয়া আইস।'

লোকটি মুরগির বাচ্চাটিকে লইয়া নির্জন স্থানের খোঁজে বাহির হইল। সে এক এক করিয়া বন, জঙ্গল, গুহা, পর্বত সমস্ত অনুসন্ধান করিল, কিন্তু নির্জন স্থান কোথাও পাইল না।

... যেখানে যায় সেইখানেই তাহার মনে হয় খোদা তো এখানেও ...। তাহা হইলে আমি নির্জন স্থান কোথায় ... ফিরিয়া গিয়া ... বলিল, 'হজরত ! আমি কোথাও নির্জন স্থান ... মুরগির বাচ্চা ফেরৎ লউন।

তখন ... আনন্দের সহিত লোকটিকে বলিলেন, 'তুমিই আমার উম্মত হইবার উপযুক্ত পাত্র।'

বালকগণ, তোমরা মনে কর যে যেখানে কোনো লোক নাই সে স্থান নির্জন। এইরূপ স্থানে কোনো পাপ কাজ করিলে কেহ দেখিতে পাইবে না। কিন্তু ইহা মনে করা তোমাদের ভুল ! এইরূপ নির্জন স্থানেও একজন আছেন, তিনি আল্লাহ। তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাও না বটে কিন্তু তিনি তোমাদের সদা সর্বদা দেখিতে পান। নির্জন স্থান মনে করিয়া তোমরা যেখানে যে কাজ করিতে ইচ্ছা কর ; নিশ্চয় জানিও সেখানে খোদা তোমাদের প্রতি চাহিয়া আছেন। তোমরা যাহা কর, তিনি তাহা দেখিতে পান ও তোমরা যাহা মনে ভাব, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন।

আলোচনা : উম্মত—শিষ্য, নির্জন—জনপ্রাণিশূন্য, গুহা—সুড়ঙ্গ।

প্রশ্ন : গল্পটা পড়িয়া কি উপদেশ পাইলে? ... মোহাম্মদ কে ছিলেন? ... কোথায় ... পাইল না কেন?

আলস্যের ফল

লাঙ্গল কাঁদিয়া বলে ছেড়ে দিয়ে গলা,
'তুই কোথা হতে এলি ওরে ভাই ফলা?
যেদিন আমার সাথে তোরে দিল জুড়ি,
সেই দিন হতে মোর এত ঘোরাঘুরি।'
ফলা বলে,—'ভালো ভাই, আমি যাই খসে,
দেখি তুমি কি আরামে ঘরে থাক বসে।'
টুটে গেল ফলাখানা, হলখানা তাই
খুশি হয়ে বসে থাকে, কোনো কর্ম নাই।
চাষী বলে,—'এ আপদে আর কেন রাখা?
চালা করে এরে আজ ধরাইব আখা।'
হল্ তবে বলে,—'ভাই ফলা আয় ধেয়ে,
খাটুনি যে ভালো আহা জ্বলুনীর চেয়ে।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোচনা : ...

পানি

পানি না হইলে আমরা বাঁচিতে পারি না। পানির অন্য নাম জল। পিপাসার সময় পানি না পাইলে সমস্ত জীবজন্তু প্রাণত্যাগ করে। গোসল করা, অজু করা, রান্না করা, কাপড় ধোয়া, বাসন মাজা ইত্যাদি প্রতিদিনের নানা আবশ্যকীয় কাজ আমাদের পানির সাহায্যে করিতে হয়।

নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতির জলভাগ তোমরা অনেকে দেখিয়াছ। উহাদের অপেক্ষা আরও বৃহৎ জলভাগ আছে তাহাকে সমুদ্র বলে। সমুদ্র দুনিয়ার স্থলভাগকে ঘিরিয়া আছে। ... তাহা হইলে এই দুনিয়ার পানি কত বেশি, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পার। সমুদ্রের পানি লোনা। উহা কেহ পান করিতে পারে না। পানের জন্য যে পানি ব্যবহার করিবে, তাহা বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বিশুদ্ধ পানি বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন। যে পানিতে কোনো বর্ণ বা গন্ধ আছে তাহা দূষিত বলিয়া জানিবে। দূষিত পানিতে নানারূপ রোগের বীজাণু লুকানো থাকে। দূষিত পানি পান করিলে আমাশয়, টাইফয়েড ও কলেরা প্রভৃতি রোগ আক্রমণ করিতে পারে। নানা কারণে নদী, পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতির পানি দূষিত হয়। নদীতে লোকে জীবজন্তুর মৃত দেহ ফেলে, বহু গাছপালার পাতা পড়িয়া পচে, লোকে মল-মূত্র ত্যাগ করে ও গোমহিষাদি স্নান করায়, ইত্যাদি কারণে ... পানি দূষিত হয়। ... এইজন্যই গ্রামে মধ্যে মধ্যে এত বেশি সংক্রামক রোগ দেখা দেয়। তোমরা কদাচ এইরূপ জলাশয়ের পানি পান করিবে না।

দূষিত পানি পান করিতে হইলে উহা আধ ঘণ্টা আগুনে ফুটাইয়া লইয়া একটি পাত্রে রাখিয়া দিবে ; পরে ঠাণ্ডা হইলে পান করিবে। ...

আলোচনা : গোসল—স্নান, পুষ্করিণী—পুকুর, দুনিয়া—পৃথিবী, ...
প্রশ্ন : ...
বানান কর ও অর্থ বল : আবশ্যকীয়, সমুদ্র, বর্ণহীন, দূষিত।

কুটির

ঝিকিমিকি করে জল সোনালি নদীর,
ওইখানে আমাদের পাতার কুটির।

* * *

আকাশে গড়িয়া ওঠে মেঘের মিনার
তারি ফাঁকে দেখা যায় চাঁদের কিনার। ...

ধলি গাই ডাক ছাড়ে বাছুর ফেরার
থমকে দাঁড়িয়ে কাছে ঝুমকো বেড়ার

দু কদম হেঁটে এসে মোদের কুটির,
পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির
চাল আছে ঢেঁকি–ছাঁটা,
রয়েছে পানের বাটা,
কলাপাতা ভরে দেবো ঘরে–পাতা দই,
এই দেখ আছে মোর আয়না কাঁকই। ...

আলোচনা : ... কিনার—ধার, নিকট, কুটুম—আত্মীয়, মাদল—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, কাঁকই—চিরুনি, অঢেল—বিস্তর।

কবিতাটি আবৃত্তি কর। উপরের শব্দগুলির বানান ও অর্থ মুখস্থ কর। 'ঝিকি মিকি করে জল সোনালি নদীর'—অর্থাৎ নদীর উপর যখন বিকেলের সূর্য কিরণ পড়ে, তখন নদীর ঢেউগুলি সোনালি বর্ণ ধারণ করিয়া ঝকঝক করিতে থাকে।

প্রশ্ন : বানান কর ও অর্থ বল : মিনার, কুটির, মাল্লারা, মাদল, ফেরার, টসটসে।

ঈদের দিনে

... ঈদের নামাজ হইয়া গেল ! বালকেরা দল বাঁধিয়া আনন্দের সহিত নানা খেলায় মত্ত হইল। মহানবী মোহাম্মদ বাড়ি ফিরিতেছিলেন ; দেখিলেন, মলিন বসন পরিহিত একটি শীর্ণকায় বালক মাঠের এক প্রান্তে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছে।

হজরত ধীরে ধীরে বালকের নিকট গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাঁদিতেছ কেন বাছা?' বালক সরোষে হজরতের হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, 'ছেড়ে দাও আমাকে?' মহানবী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে পুনরায় বলিলেন, 'একটু বল না, বাবা, শুনি তোমার কি হইয়াছে।' ...

মহানবীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল ; তবু তিনি হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 'বাঃ তাতে কি? আমারও তো পিতামাতা আমার ছোট সময় মারা গিয়াছেন।'

এইবার বালক মুখ তুলিয়া হজরতের মুখের দিকে তাকাইল, এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বিশেষ লজ্জিত হইল।

হজরত কোমলকণ্ঠে বলিলেন, 'আচ্ছা, যদি আমি তোমার পিতা হই, আয়েশা তোমার মাতা হন, আর ফাতেমা তোমার বোন হয় ; ইহাতে তুমি সুখী হইতে পারিবে?' বালক মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

মহানবী বালকের হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ি লইয়া গেলেন এবং বিবি আয়েশাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এই নাও, তোমার একটি ছেলে এনেছি।' ...

আলোচনা : খোশবু—গন্ধ, নামাজ—খোদার উপাসনা, পরিহিত—পরা অবস্থায়, কোমলকণ্ঠে—মিষ্টস্বরে, সরোষে—রাগের সহিত, গোসল—স্নান।

প্রশ্ন : হজরত মোহাম্মদ কে ছিলেন? গল্পটি পড়িয়া তোমরা কি জ্ঞান লাভ করিলে? বালকটি কাঁদিতেছিল কেন?

বানান কর ও অর্থ বল : মলিন, বসন, নীরবে, বিষয়-আশয়, জায়গা, সম্মতি, বিচিত্র।

মৌলবি সাহেব

ওয়ালেদেরই মতন বুজুর্গ
মক্তবের ঐ মৌলবি সাহেব,
তাই উঁহারে কেতাবে কয়
'হজরত রসুলের নায়েব।'

দুনিয়াদারির কাজ নিয়ে সব
দুনিয়ার লোক থাকে মাতি,
মৌলবি সাহেব দুনিয়া ভুলে
জ্বালিয়ে রাখেন দীনের বাতি।

উনিই জ্বালান জ্ঞানের আলো
আমাদের এই আঁধার মনে
ওঁরই গুণে মানুষ বলে
পরিচিত হই ভুবনে। ...

ধন দৌলত চান না উনি
রন মশগুল খোদার নামে
ওয়াজ নসিহত করে তিনি
ঠিক রেখেছেন মোদের গ্রামে।

শিক্ষা দিয়ে দীক্ষা দিয়ে
ঢাকেন মোদের সকল আয়েব
পাক কদমে সালাম জানাই
নবীর নায়েব মৌলবি সাহেব।

আলোচনা : ওয়ালেদ—পিতা, ... বুজুর্গ—শ্রদ্ধাস্পদ, নায়েব—প্রতিনিধি, দীনের বাতি—ধর্মের প্রদীপ, গাফলিয়ত—আলস্য, ফজর—সকাল, নসিহত—উপদেশ, আয়েব-দোষ, পাক—পবিত্র, কদম—চরণ।

প্রশ্ন : ...

চাষী

চাষীকে কেও চাষা বলে
করিও না ঘৃণা,
বাঁচতাম না আমরা কেহ
ঐ যে কৃষাণ বিনা।

রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে সে
ভিজে দিবারাতি,
মোদের ক্ষুধার অন্ন জোগায়
চায় না সে যশঃ খ্যাতি।

আলোচনা : চাষী—কৃষক, অন্ন—খাদ্যদ্রব্য, দিবারাতি—দিন ও রাত্রি, সমস্তক্ষণে, জোগায়—দেয়, যশঃ খ্যাতি—প্রশংসা।

প্রশ্ন : কবিতাটি মুখস্থ বল। চাষী কাহারা? চাষীরা আমাদের কি প্রকারে অন্ন জোগায় তাহা বল।

বানান কর ও অর্থ বল—বাঁচতাম, কৃষাণ, বৃষ্টি, ক্ষুধা।

কাবা শরীফ

... আল্লাহ তায়ালার আদেশে হজরত ইবরাহিম এই মসজিদ নির্মাণ করেন। এখন যে স্থানে কাবা শরীফ অবস্থিত তাহা তখন গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। হজরত ইবরাহিম তাঁহার প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইলের মাতা হাজেরা বিবিকে এই স্থানে বনবাস দিয়াছিলেন। নিকটে কোথাও পানি না থাকায় মাতা-পুত্রে মৃতপ্রায় হন। খোদার মহিমায় ও পুণ্যশীলা বিবি হাজেরার প্রার্থনায় শিশু ইসমাইলের পায়ের আঘাতে সেই স্থানে এক সুপেয় পানি-বিশিষ্ট ঝর্নার উৎপত্তি হয়। সেই ঝর্না আজো 'আবে জমজম' কূপ নামে বিখ্যাত।

যেসব মোমিন হজ করিতে যান, তাঁহারা কাবা শরীফ তওয়াফ করিয়া এই পবিত্র 'আবে জম-জমে'র পানি পান করিয়া পবিত্র হন।

আলোচনা : এবাদতখানা—..., পুণ্যশীলা—যে মহিলার পুণ্যে মতি ..., মোমিন—বিশ্বাসী মুসলমান ... নাজেল—আবির্ভাব।

প্রশ্ন : কাবা শরীফ কাহাকে বলে? 'আবে জমজম' কূপ সম্বন্ধে যাহা জান বল। আমরা পশ্চিম মুখ হইয়া নামাজ পড়ি কেন?

কোরআন শরীফ

কোরআন শরীফ আমাদের হজরত মোহাম্মদের মারফতে প্রেরিত পবিত্র গ্রন্থ। এই পবিত্র কেতাবে আমাদের ইসলাম ধর্মের সমস্ত অনুশাসন লেখা আছে। জিবরাইল ফেরেশতা আল্লাহর যে বাণী আমাদের হজরতের নিকট বহিয়া আনিতেন, পবিত্র কোরআন তাহারই সংগ্রহ। কোরআন মানুষের রচিত নহে। ... আরব দেশে নাজেল হইয়াছিল বলিয়া, এই পবিত্র কেতাবের ভাষা আরবি।

এই কোরআন শরীফের মারফতেই আমরা আমাদের ইসলাম ধর্মের সমস্ত কিছু জানিতে পারি। ভালো মন্দ, পাক নাপাক, হালাল হারাম বাছিয়া লইতে পারি। কোরআন শরীফ পড়িলে হৃদয় মন পবিত্র থাকে, প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়। ইহা রোজ পাঠ করিলে দুঃখ মুসিবতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। যে কোরআন শরীফের অনুশাসন মানিয়া চলে, সে কোনো পাপ কাজ করিতে পারে না। কাজেই সে আল্লাহের এবং রসুলের প্রিয় হয় এবং আখেরে বেহেশতে যায়। আমরা যেন রোজ পাক সাফ হইয়া কোরআন তেলাওত করি এবং তাহার অনুশাসন মানিয়া চলি।

আলোচনা : অনুশাসন—নিয়মাবলী, ফেরেশতা—দূত, বন্দেগি—বন্দনা ...
প্রশ্ন : ...

উদ্ভিদ

শিক্ষক—আজ তোমাদিগকে উদ্ভিদ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

ছাত্র—জনাব, উদ্ভিদ কাহাকে বলে?

শিক্ষক—যাহারা মাটি ভেদ করিয়া উপরে ওঠে তাহাদিগকে উদ্ভিদ বলে। এই উদ্ভিদ আছে বলিয়াই মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতি বাঁচিয়া আছে। উদ্ভিদ কত রকমে আমাদের নিত্য আহার ও বস্ত্র জোগাইতেছে। ধান, কলাই, গম ইত্যাদি শস্য ও

নানাবিধ ফল আমরা নিত্য উদ্ভিদ হইতে পাইতেছি। গোরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি আমাদের নিত্য কত উপকারে লাগে। ইহারাও উদ্ভিদ দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া আছে। ...

শিক্ষক— ... সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিতেছি, মন দিয়া শুন। তুমি, আমি ও সমস্ত জীবজন্তু দিবারাত্র নিঃশ্বাস ছাড়িতেছি ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি। আমরা সে মল মূত্র ত্যাগ করি উহা যেমন দূষিত পদার্থ, তেমনি আমরা যে নিশ্বাস ছাড়ি তাহাও দূষিত পদার্থ। প্রতি মুহূর্তে এই দুনিয়ার সমস্ত জীবজন্তু যে নিশ্বাস ছাড়িতেছে উহা দ্বারা সমস্ত বায়ুমণ্ডল দূষিত হইয়া যাইতেছে। ...

ছাত্র—ওস্তাদজি, উদ্ভিদের যখন প্রাণ আছে তখন নিশ্চয়ই ইহারা খাদ্য গ্রহণ করে।

শিক্ষক—হাঁ, ইহারা খাদ্য গ্রহণ করে বই কি। পাতার সাহায্যে ইহারা সূর্যকিরণ ও বাতাস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। আবার শিকড় দিয়াও ইহারা মাটির মধ্য হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে।

মনে রাখিবে, যে সকল বৃক্ষ একবার মাত্র ফল দান করিয়া মরিয়া যায় তাহাদিগকে ওষধি বলে। যেমন, ধান, কলা, সরিষা ইত্যাদি।

আলোচনা : ...
প্রশ্ন : ...

আল্লাহ তায়ালা

আল্লাহ এক। তিনি লা-শরিক অর্থাৎ তাঁহার কোনো শরিক নাই। তাঁহাকে কেহ পয়দা অর্থাৎ সৃষ্টি করে নাই। এই বিশ্বের যাহা কিছু—আকাশ, বাতাস, গ্রহ, তারা, রবি, শশী, জীব-জন্তু, তরু-লতা, ফুল-ফল সমস্ত তিনিই সৃজন করিয়াছেন। জীবন, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ সকলেরই নিয়ন্তা তিনি। তিনি নিরাকার। তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা পুণ্যাত্মা পরহেজগার কেবল তাঁহারই কিছু স্বরূপ অনুভব করেন মাত্র। পৃথিবীর সমস্ত আওলিয়া, আম্বিয়া, ফকির, দরবেশ তাঁহারই মহিমা গান করেন। তাঁহারই ধ্যান করেন। তিনি ছাড়া দিন দুনিয়ায় আর কেহ উপাস্য নাই। ... আমরা যেন তাঁহারই কাছে শক্তি ভিক্ষা করি, একমাত্র তাঁহারই এবাদত করি।

আলোচনা : শরীক—অংশিদার, নিয়ন্তা—পরিচালক, নিরাকার—যাঁহার কোনো আকার নেই, পুণ্যাত্মা—যাঁহারা কেবল পুণ্য করিয়া জীবন কাটান, পরহেজগার—যাঁহারা পাপ কাজ করেন না, আওলিয়া—পীর, আম্বিয়া—পরগম্বর, এবাদত—উপাসনা।

প্রশ্ন : বানান কর ও অর্থ বল : স্বরূপ, অনুভব, ধ্যান, অশেষ, অনন্তকাল। গল্প পড়িয়া যাহা শিখিলে তাহা নিজের ভাষায় বল।

আমাদের খাদ্য

... ভাত অপেক্ষা রুটি খাইলে গায়ে বেশি জোর হয়। সিপাহিরা ডাল রুটির জোরেই লড়াই করিতে মজবুত।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, ভাত, ডাল, মাছ, তরকারি প্রভৃতি খাবার জিনিস কেন আমরা একসঙ্গে খাই? তাহার কারণ এই যে শরীরের পুষ্টি ও গায়ের জোরের জন্য যে সকল সার পদার্থের দরকার, ইহাদের কোন একটিতে তাহা নাই। সেইজন্য অনেকগুলিকে একত্র মিশাইয়া খাইবার আবশ্যক হয়। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে একমাত্র দুগ্ধে আমাদের শরীর ধারণের উপযোগী সকল রকম প্রয়োজনীয় পদার্থই আছে, কিন্তু শুধু দুধ খাইলে তো চলে না এবং ভালো লাগে না। ভালো লাগিলেই বা কি ! এত দুধ পাওয়া যায় কোথায়? ...

.. অধিক পরিশ্রমের কাজ করিতে হইলে, ভাত, রুটি মাখন, ঘি, চিনি প্রভৃতি পদার্থ বেশি পরিমাণে খাইবার আবশ্যক হয়। মাছ, মাংসে গায়ের জোর বেশি বাড়ে না। অবশ্য অল্প পরিমাণ খাইলে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না।

বাঙলাদেশে মাছ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই জন্য উহা বাঙালি জাতির একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। যাঁহারা মাছ মাংস খান না, তাঁহারা উহাদের পরিবর্তে ছানা ব্যবহার করিলে যথেষ্ট উপকার পাইবেন। ছানা অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং মাছ মাংস হইতে অধিক সারবান। ছানা হইতে সন্দেশ প্রস্তুত হয়। ...

আম, জাম, কাঁঠাল, কমলালেবু, ডাব, আতা, বেল, পেঁপে, কলা, আনারস প্রভৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট ফল ঋতুভেদে আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

খেজুর, বাদাম, আঙুর, নাসপাতি প্রভৃতি ফলের আমদানি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে হইয়া থাকে। ফল একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। ফল খাইলে রক্ত পরিষ্কৃত হয়। তোমরা প্রত্যহ জল খাবারের সঙ্গে কিছু ফল খাইবে। জল খাবারের জন্য যাঁহারা 'বাজারের খাবার' অর্থাৎ ভেজাল ঘি তেলে প্রস্তুত খাদ্য ব্যবহার করেন, তাঁহাদের রোগের শেষ নাই। নানা পীড়ায় তাঁহারা কষ্ট পান। তোমরা সে সকল দূষিত খাদ্য কখনও মুখে দিও না। ...

—ডাঃ চুণীলাল বসু

আলোচনা : জন্মে—হয়, ... আবশ্যক—দরকার, পরিশ্রম—মেহনত, অপেক্ষাকৃত—চেয়ে, উৎকৃষ্ট—ভালো, ব্যাঘাত—বাধা।

প্রশ্ন : সার পদার্থ কি? কতকগুলি ফলের নাম কর যাহা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আমদানি হয়। ফলের গুণ বর্ণনা কর। পাকযন্ত্র কাহাকে বলে?

বানান কর : বাঙালাদেশে, সিপাহিরা, প্রয়োজনীয়, অপেক্ষাকৃত, তাড়াতাড়ি, পাকযন্ত্র।

হজরতের মহানুভবতা

... লজ্জা পাইয়া ক্ষমা চাহি সেই ভিখারি ফিরিয়া যায়,
সহসা কি কথা মনে হয়ে কন হজরত ডেকে তায়—
'ভুলিয়া গেছিনু, ফিরে এস তুমি, আছে আছে কিছু ঘরে,
উসমান কিছু দুধ পাঠায়েছে হাসান হোসেন তরে।
তাই এনে দিই, তুমি কর পান।' বলিয়াই হজরত
গৃহপানে যান টলিতে টলিতে, চলিতে নারেন পথ।
ফাতেমা জননী ছেলেদের মুখে দুধের বাটিটি ধরি
খাওয়াবেন যেই, হজরত গিয়া কহেন মিনতি করি,
'উহাদের চেয়ে ভুখারি আর এক আসিয়াছে মোর কাছে,
হাসান হোসেন খায়নি? সে যে মা দুদিন উপাসী আছে!'
বলিয়াই তাঁর হাত হতে সেই দুধের বাটিটি লয়ে
আনিয়া দিলেন সেই ক্ষুধার্ত ...

আলোচনা : ...
প্রশ্ন : কবিতাটি আবৃত্তি কর ...

গোরু

গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গোরুর দ্বারা আমরা সর্বাপেক্ষা বেশি উপকার পাইয়া থাকি। সাদা, কালো, ঈষৎ লাল প্রভৃতি নানা বর্ণের গোরু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কান দুইটি বড় ও ঘাড় লম্বা, উহাতে গলকম্বল ঝুলিতে থাকে। লেজটি সরু ও লম্বা, নিচে এক গোছা চুল আছে, ইহা দ্বারা ইহারা মশা মাছি প্রভৃতি তাড়ায়।

ইহাদের দুইটি শিং আছে। ইহাদের খুর দুইভাগে বিভক্ত। যে সকল জন্তুর খুর দুইভাগে বিভক্ত, তাহারা তাহাদের খাদ্যদ্রব্য একেবারে না চিবাইয়া গিলিয়া ফেলে ...

গো-জাতি অত্যন্ত নিরীহ। ইহারা মাছ মাংস খায় না। তৃণ, খড়, খৈল, ভূষি প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। এই জন্য ইহাদের আমরা তৃণভোজী বলি।

আমাদের দেশে গোরুর সাহায্যে কৃষিকার্য সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, গাড়ি টানা, ঘানি টানা প্রভৃতি কাজও আমরা গোরুর সাহায্যে করিয়া থাকি। গাভীর দুগ্ধই শিশুদের একমাত্র পানীয়। উহা না পাইলে শিশুদের জীবনরক্ষা কঠিন ...

গোরু যে কত দিক দিয়া আমাদের উপকার করে তাহার ইয়ত্তা নাই। গোরুর দুধে শিশুর প্রাণরক্ষা হয়, চর্মে জুতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। হাড়ে বোতাম, ছুরি ও ছাতার বাঁট

তৈয়ারি হয়, আবার ঐ গোবর পচাইলে উহা উৎকৃষ্ট সার হয়। ঐ সার জমিতে দিলে ভালো ফসল জন্মে

গোরু পৃথিবীর নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বিহার অঞ্চলের গোরু আমাদের দেশের গোরু অপেক্ষা অনেক বড়। ঐ দেশের গাভীগুলি দুধ দেয় বেশি। ...

আলোচনা : ...
প্রশ্ন : ...

আদর্শ ছেলে

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
'মানুষ' হইতে হবে—এই তার পণ।
বিপদ আসিলে কাছে হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত মাংস প্রাণ?
হাত পা সবারি আছে, মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয়? ...

আলোচনা : আগুয়ান—অগ্রসর, বিশ্ব—দুনিয়া, রক্ত—খুন, শোনিত, শক্তি—বল, পণ—প্রতিজ্ঞা, কল্যাণ—মঙ্গল।

প্রশ্ন : কবিতাটি মুখস্থ বল। কবিতাটি পড়িয়া কি শিক্ষা পাইলে?

পরিচ্ছদ

ছাত্র। মহাশয়! ভাই সে দিন বলিতেছিলেন যে বৃক্ষই আমাদের বস্ত্র দেয়। ইহা কি সত্য? আমরা আমাদের জামা কাপড় তো দোকানেই কিনিতে পাই, তাহা হইলে বৃক্ষ কি করিয়া আমাদের ইহা দেয়?

শিক্ষক। তোমার ভাই যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য; বৃক্ষই আমাদের বস্ত্র দেয়। বস্ত্র কি করিয়া প্রস্তুত হয় জান?

ছাত্র। ... উহা তাঁতে তৈয়ারি হয়, ...

শিক্ষক। কয় প্রকারের বস্ত্র আছে জান?

ছাত্র। জি, না, আপনি বলিয়া দিন।

শিক্ষক। সাধারণত আমরা তিন প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রথম সুতি বস্ত্র, দ্বিতীয় রেশমি বস্ত্র, তৃতীয় পশমি বস্ত্র। ...

বিচি হইতে তূলা ছাড়াইয়া পরে পিঁজিয়া চরকা বা টাকু প্রভৃতির সাহায্যে পাকাইয়া সুতা প্রস্তুত হয়। এই সুতা হইতেই আমরা সাধারণত সুতি বস্ত্র পাইয়া থাকি। আজকাল বহু পরিমাণে এই সুতা ও বস্ত্র মিলে তৈয়ারি হইতেছে।

ছাত্র। ইহা তো বলিলেন সুতি বস্ত্রের কথা। রেশমি বস্ত্রের কথা তো কিছুই বলিলেন না।

শিক্ষক। এইবার বলিতেছি, মন দিয়া শুন। গুটিপোকা নামে একজাতীয় পোকা আছে, উহার শরীর হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়, ঐ রসে গুটিপোকা আপনার ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে থাকে ...

ছাত্র। ... পশমি বস্ত্রের কথা বলুন।

শিক্ষক। ... এইরূপ শিখিবার ইচ্ছা দেখিয়া সুখী হইলাম। পশমি কাপড় শীত নিবারণের জন্যই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা ছাগল মেষ প্রভৃতির লোম কাটিয়া তাহার দ্বারা বুনা হয়। বনাত, কাশ্মীরা, সার্জ, ফ্লানেল, কম্বল ইত্যাদি আমরা ভেড়ার লোম হইতেই পাইয়া থাকি। আমাদের এই ভারতবর্ষেও ভালো ভালো পশমি কাপড় তৈয়ারি হইয়া থাকে।

গরিবরা শীত নিবারণের জন্য সস্তার কম্বল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ধনীরা কিন্তু এই উদ্দেশ্যে মূল্যবান শাল, বনাত প্রভৃতি ব্যবহার করেন।

আলোচনা : প্রস্তুত—তৈয়ারি, প্রচলন—চলিত, মূল্যবান—দামি।

প্রশ্ন : কয় প্রকারের বস্ত্র সাধারণত আমার ব্যবহার করি? সুতি বস্ত্র ও রেশমি বস্ত্র আমরা কি করিয়া পাই?

সত্যরক্ষা

বাহরায়েনের শাসনকর্তা ... আছেন। দুইটি যুবক ... দরবারে হাজির হইয়া বলিল—

'জাহাঁপনা, এই যুবক ... হত্যা করিয়াছে; আমরা বিচার চাই।'

নোমান—হাঁ, যুবক, এ অভিযোগ সত্য?

যুবক—সত্য জাহাঁপনা, তবে আমার কিছু বলিবার আছে।

নোমান—বেশ, সংক্ষেপে বলিতে পার।

যুবক—জাহাঁপনা, আমরা মরুবাসী আরব। দেশে অকাল, তাই জাহাঁপনার রাজ্যে আসিয়াছি। পথে একটা বাগানের ধার দিয়া চলিতে আমার একটা উট বাগানের গাছের

একটা ডাল কামড়াইয়া ধরে ; আমি উট ফিরাইয়া আনিতেছি, এমন সময় একজন বৃদ্ধ অতি ক্রুদ্ধভাবে একটা বড় পাথর উটটাকে ছুঁড়িয়া মারে। উটটি তৎক্ষণাৎ ঢলিয়া পড়ে ও মারা যায়।

উটটি আমার বড় প্রিয় ছিল ; আমি রাগের মাথায় ঐ পাথরটা বৃদ্ধকে ছুঁড়িয়া মারি, তাহাতে বৃদ্ধ মারা যায়। তখন এই যুবক দুইজন আমাকে ...

নোমান— ... তোমার অপরাধ ... এ অপরাধের শাস্তি ...

যুবক—বিচার আমি মাথা পাতিয়া লইব ... কয়েকটি ছোট ভাই আছে ; আমিই ... অভিভাবক। পিতা মৃত্যুকালে তাহাদের জন্য আমার হাতে কিছু টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাহা আমি মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু কোথায় রাখিয়াছি, তাহা আমি ছাড়া আর কেহ জানে না। আপনি যদি এখানেই আমার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন, তবে এই অর্থ তাহারা পাইবে না। সেইজন্য আমি ও আপনি দুইজনেই খোদার কাছে দায়ী হইব। তাই প্রার্থনা করি, জাহাঁপনা, আপনি আমায় আজিকার সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় দেন, যাহাতে আমি কোনো লোককে উহাদের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া আমানতি টাকাটা তাঁহার হাতে দিয়া আসিতে পারি।

নোমান—কিন্তু সে অনুমতি দেওয়ার উপায় কোথায় যুবক? এখানে কে তোমার জামিন হইবে?

যুবক—(চারিদিকে চাহিয়া কোনো পরিচিত লোক না দেখিয়া) মহোদয়গণ, দয়া করিয়া আপনাদের কেহ আমার জামিন হউন ; ... যথাসময়ে ফিরিয়ে আসিব।

নোমানের ভাই—জাহাঁপনা ... জামিন হইলাম।

নোমান (ভাইয়ের প্রতি ... যদি এই অপরিচিত বেদুঈন আর ফিরিয়া না আসে, তবে তোমার কি অবস্থা হইবে ভাবিয়া দেখিয়াছ?

নোমানের ভাই—সম্পূর্ণ ভাবিয়া দেখিয়াছি, জাহাঁপনা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ ফিরিয়া আসিবে। আর যদি একান্ত না আসে, তবে জাহাঁপনার ভাইয়ের পক্ষে একটি অপরিচিত বেদুঈনের জন্য জান দেওয়ায় জাহাঁপনার নিন্দা হইবে না।

নোমান—উত্তম। যুবক, তবে এখন যাইতে পার।

যুবক অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া অভিবাদন করত দ্রুত চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। নোমান সভাসদগণসহ দরবারে বসিয়া আছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বেদুঈন যুবকের চিহ্নও দেখা যাইতেছে না। সভাসদগণ বলিতে লাগিলেন 'খুনি আসামি সে কি আর ফিরিবে?' ...

মুহূর্তকাল পরেই বেদুঈন যুবক ... দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যুবক—মাফ করিবেন, জাহাঁপনা, আমার পরিজনবর্গ আমায় আসিতে বাধা দিয়াছিল, তাই আমার ঠিক সময়ে হাজির হইতে একটু দেরি হইয়া গেল। এখন জাহাঁপনার আদেশ কাজে পরিণত করুন ও আমার জামিনদারকে মুক্তি দেন।

নোমানের ভাই—এই অপরিচিত তরুণ যুবক নিতান্ত সঙ্গত কারণে সময় চাহিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহার জামিন হইতে রাজি হয় নাই। তাই আমি জামিন হইয়াছিলাম। কিন্তু মানুষ হিসাবে সে আজ আমার চেয়ে বড় তাহা প্রমাণ করিল।

যুবকদ্বয়—জাহাঁপনা, মহত্ত্ব কি কেবল এঁদের দুজনেরই একচেটিয়া? আমরা কি মহত্ত্বের কোনো শিক্ষা পাই নাই? আমরা আমাদের পিতার ... মাফ করিয়া দিলাম।

নোমান— ... মহত্ত্বের চরম আদর্শ দেখাইয়াছ ; ... শুধু আমাকেই বা তোমরা বঞ্চিত ... তুমি মুক্ত, খাজাঞ্চি, আমার নিজ তহবিল ...

যুবক দ্বয়ের পিতার খুনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ... টাকা দিয়া দাও।

যুবকদ্বয়—মাপ করিবেন, জাহাঁপনা ; আমরা আল্লার ওয়াস্তে যা করিয়াছি, জাহাঁপনার নিকট হইতে তাহার প্রতিদান গ্রহণ করা অসম্ভব।

আলোচনা : অকাল—অজন্মা, ক্রুদ্ধভাব—রাগের সহিত, গেরেফতার—আটক, প্রমাণিত—নিশ্চিত হওয়া, বিষণ্ন—দুঃখিত, প্রতিদান—বিনিময়।

প্রশ্ন : গল্পটি পড়িয়া কি শিখিলে? নোমান, তার ভাই এবং খুনির মধ্যে কে বড়? যুবকদ্বয় জাহাঁপনার টাকা লইল না কেন?

বিড়াল

... বিড়ালের গঠন অনেকটা বাঘের মতো। বাঘের চেহারা দেখিতে বড় বিড়ালের মতো।

বিড়াল খুব সহজে পোষ মানে। ইহারা মাছ, ভাত, দুধ ইত্যাদি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। দুধ মাছ পাইলে ইহারা আর কিছু চায় না। ইঁদুর ধরিতে ইহারা খুব ভালোবাসে। ইহারা গরম স্থানে থাকিতে ভালোবাসে বলিয়া বিছানা ও উনানের ধারে শুইয়া থাকে। ... বিড়াল যখন শিকার ধরিতে যায় তখন পায়ের তলায় মাংসপিণ্ড থাকায় ইহাদের চলাফেরার শব্দ আদৌ শুনা যায় না। শিকার বুঝিতেই পারে না যে বিড়াল তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে।

কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলার একটি বিড়াল ছিল। তিনি যখন লিখিতেন তখন তাঁহার পোষা বিড়ালটি টেবিলের উপর বসিয়া তাঁহার কলমের দিকে চাহিয়া থাকিত। একদিন তিনি লিখিতে লিখিতে অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছেন ... আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার 'টমি' নামে বড় বিড়াল ... তাঁহার মতো লিখিবার চেষ্টা ...

... পোষা বিড়াল ছিল। একদিন .. কাজ করিতেছিলেন ; এমন সময় ... খেলা করিতে করিতে জলের টবের ভিতর ... গিয়াছিল। তিনি তাহা দেখিতে পান নাই। ঘরে প্রাচীরের উপর হইতে বিড়ালটি এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়া গৃহিণীর আঁচল ধরিয়া

টানাটানি করিতে লাগিল। শেষে তিনি বিরক্ত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার শিশু পুত্রটি খেলা করিতে করিতে জলের টবে পড়িয়াছে। তখন তিনি দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে জল হইতে তুলিলেন। আল্লাহর কৃপায় সে যাত্রা সন্তানটি রক্ষা পাইল।

প্রশ্ন : নিজের কথায় বিড়ালের বিষয়টি লিখ। গল্পটি পড়িয়া কি শিখিলে?
বানান কর : ইচ্ছা, গৃহস্থ, সন্তান, রক্ষা, গৃহিণী, ব্যাপার, অন্যত্র।

ঈদের চাঁদ

রমজানেরই রোজার শেষে
উঠেছে আজ ঈদের চাঁদ
চারদিকে আজ খুশির তুফান
নাই ভাবনা নাই বিষাদ।

কাল সকালে ঈদের নামাজ
পড়তে যাব ঈদগাহে
নিঁদ নাই তাই আজকে চোখে
মন ছুটে আল্লার রাহে।

আতর গোলাব মাখব গায়ে
রঙিন পিরহান পরি
শিরনি শেমাই ক্ষীর খাব ভাই
ভর্তি করে তশতরি।...

যে হজরতের উম্মত যাঁর
দোওয়ায় আসে ঈদ এমন,
তাঁহার নামে পড়ব দরুদ
চাইব সদা তাঁর শরণ।

আলোচনা : ঈদগাহ—যেখানে ঈদের নামাজ পড়ে, রাহে—পথে, পিরাহান—জামা, বুজর্গানদেরে—গুরুজনদেরে, দোওয়ায়—আশীর্বাদে।

প্রশ্ন : ঈদ কখন হয়? ঈদের দিনে তোমরা কি কর? রমজানের রোজা কাহাকে বলে?

হার-জিত

ভীমরুল মৌমাছিতে হল রেষারেষি,
দুজনার মহাতর্ক কার শক্তি বেশি।
ভীমরুল কহে,—আছে সহস্র প্রমাণ,
তোমার কামড় নহে আমার সমান।
মৌমাছির কথা নাই, ছলছল আঁখি
হাতেফ কহিল তারে কানে কানে ডাকি,—
'কেন বাছা মাথা হেঁট একথা নিশ্চিত
বিষে তুমি হার মান, মধুতে যে জিত।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোচনা : রেষারেষি—রাগারাগি, ... আঁখি—চক্ষু, জিত—জয় করা।
প্রশ্ন : কবিতাটি আবৃত্তি কর। কবিতাটি পড়িয়া কি শিখিলে?

গ্রন্থ-পরিচয়

[নজরুল-রচনাবলী-র বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশ-কাল ও কতকগুলি রচনা সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হলো। 'পুনশ্চ' শিরোনামে পরিবেশিত তথ্য নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক সংযোজিত। 'জন্মশতবর্ষ সংস্করণের (২০০৭) সংযোজন' বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যোগ করা হয়েছে।]

নতুন চাঁদ

'নতুন চাঁদ' প্রথম সংস্করণ ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : মোহাম্মদ ছদরুল আনাম খান ; মোহাম্মদী বুক এজেন্সি ; ৮৬-এ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। ৬৪ পৃষ্ঠা। দাম দুই টাকা। মুখবন্ধে 'প্রকাশক' বলেন—

> বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ রোগশয্যায়। প্রতিভার দীপ্ত সূর্য ব্যাধির কাল-মেঘে আচ্ছন্ন। এ মেঘ কেটে যাবে, এ আশা আমাদের আছে এবং সত্বর কেটে যাক, আল্লার কাছে এই মোনাজাত করি।
>
> কবির লেখা সর্বশেষ কবিতা-গ্রন্থ 'নতুন চাঁদ' তাঁর রোগাক্রান্ত হওয়ার অনতিপূর্বে লিখিত কবিতাগুলির সঞ্চয়ন। 'নতুন চাঁদ'-এর পর তাঁর আর কোনো গ্রন্থ অচিরে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায় না। তাই এই যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও নজরুল কাব্য-পিপাসুদের হাতে 'নতুন চাঁদ' বহু আয়াস স্বীকার করেও আনন্দের সাথে তুলে দিলাম।
>
> 'নতুন চাঁদ' বাংলার জরাগ্রস্ত জীবনে নতুন আনন্দ ও আশার বাণী ধ্বনিত করুক, এই কামনা করি।
>
> ২৩শে মার্চ ১৯৪৫ প্রকাশক

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে কাব্যখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : মঈনউদ্দীন হোসায়ন বি.এ. : নূর লাইব্রেরি, ১২/১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা-১৪। ৭২ পৃষ্ঠা। দাম দুই টাকা আট আনা। মঈনউদ্দীন হোসায়ন ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৫১ তারিখে 'দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন'-এ বলেন :

> বহু বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণে কবির দুইটি নতুন কবিতা, যথা 'ঈদের চাঁদ' এবং 'চাঁদনি রাতে' সন্নিবেশিত হইল। প্রথম কবিতাটি অধুনালুপ্ত দৈনিক 'নবযুগে' (৪ঠা কার্তিক, ১৩৪৮) প্রকাশিত হয়। 'ঈদের চাঁদ' কবিতাটি 'নবযুগে' প্রকাশিত হওয়ার

> সঙ্গে সঙ্গে এতদূর জনপ্রিয় হইয়া উঠে যে, বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (৫ই কার্তিক বুধবার, ১৩৪৮ সাল, ২২শে অক্টোবর ১৯৪১) নিজের স্তম্ভে উহা মুদ্রিত করিয়া কবির প্রতি অশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

'চাঁদনি রাতে' কবিতাটি কবির 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল।

কাব্যখানির প্রথম কবিতা : 'নতুন চাঁদ' ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় 'নতুন চাঁদ—নৌজোয়ান' শিরোনামে বাহির হইয়াছিল।

'চির-জনমের প্রিয়া' ১৩৪৭ ফাল্গুনের, 'আমার কবিতা তুমি' ১৩৪৭ চৈত্রের এবং 'সে যে আমি' ১৩৪৭ পৌষের 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'অভেদম্' ১৩৪৭ অগ্রহায়ণে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যক এবং 'অভয়-সুন্দর' ১৩৪৭ পৌষে প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যক 'রূপায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'দুর্বার যৌবন' দৈনিক 'আজাদ' হইতে ১৩৪৭ মাঘের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। 'আর কত দিন' সেই মাসেরই 'মাসিক মোহাম্মদী'তে বাহির হইয়াছিল।

'মোবারকবাদ' ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট মোতাবেক ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ তারিখের দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় 'মুকুলের মহফিল' শিরোনামে ছাপা হইয়াছিল।

'কৃষকের ঈদ' ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ঈদ-সংখ্যা সাপ্তাহিক 'কৃষক' পত্রিকায় এবং 'আজাদ' সেই বৎসরেরই ঈদ-সংখ্যা 'আজাদ' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

শেষ সওগাত

'শেষ সওগাত' প্রথম সংস্করণ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : শ্রী জিতেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় বি.এ. ; ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি: ; ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মুদ্রাকর : শ্রী ত্রিদিবেশ বসু বি.এ. ; কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস ; ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬। প্রচ্ছদ-সজ্জা ; শ্রী অজিত গুপ্ত। ১২০ পৃষ্ঠা, দাম চার টাকা। তাহার 'ভূমিকায়' শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন :

> নজরুল ইসলামের পরিণত প্রতিভার দান বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত কবিতা 'শেষ সওগাত'রূপে এই সংকলনে তাঁর অগণন অনুরাগীদের কাছে উপস্থিত করতে পেরে এ গ্রন্থের প্রকাশকের সঙ্গে আমিও অত্যন্ত আনন্দিত।'

এই গ্রন্থের ১৫-সংখ্যক কবিতা ছিল 'করুণ বেহাগ'। উহা ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ওয়াতন' পত্রিকার ঈদ-সংখ্যায় মুদ্রিত

হইয়াছিল ; উহার পাদটীকায় লেখা ছিল : 'সিয়ারসোল-রাজ উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর মিত্র বি. এ. মহাশয়ের বিদায়-উপলক্ষে কবি এই কবিতাটি বাল্যকালে রচনা করেন।' কবিতাটি নজরুল-রচনাবলী প্রথম খণ্ডের 'সংযোজন' বিভাগে সংকলিত হইয়াছে বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল। তাহার পরিবর্তে ২৭ সংখ্যক কবিতা : 'মহাত্মা মোহসিন' সংযোজিত হইয়াছে। 'মহাত্মা হাজী মোহাম্মদ মোহসিন' শিরোনামে ইহা দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার বিশেষ মোহসিন-সংখ্যায় ছাপা হইয়াছে।

'কেন আপনারে হানি হেলা' ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২২শে নভেম্বরের এবং 'নারী' ২৭শে নভেম্বরের দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

'তুমি কি গিয়াছ ভুলে' ১৩৩৮ ফাল্গুনে 'স্বদেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এটি নজরুলের 'নির্ঝর' কাব্যের ১২ সংখ্যক কবিতা-রূপে অন্তর্ভুক্ত হয় ; তাহাতে চতুর্দশ পংক্তির পরে আছে এই শ্লোকটি—

হেরিনু, আকাশে ওঠেনি কি চাঁদ—শূন্য আকাশ কাঁদে,
ও-বিরাট বুক ভরিয়া তোলে কি ঐটুকু ক্ষীণ চাঁদে ?

কিন্তু 'শেষ সওগাত' কাব্যে এই শ্লোকটি নাই এবং অন্যান্য অনেক পংক্তি ও পদ পরিবর্তিত হইয়াছে। এখানে 'নির্ঝর' কাব্যের পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

'ভয় করিও না, হে মানবাত্মা' দৈনিক 'নবযুগ' হইতে ১৩৫৭ সালের বার্ষিকী 'প্রতিভা'য় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

'সুখ-বিলাসিনী পারাবত তুমি' জাহানারা বেগম চৌধুরী-সম্পাদিত বার্ষিক 'রূপরেখা' হইতে ১৩৪৩ বৈশাখের 'বুলবুল'-এ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

'হুল ও ফুল' ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে নভেম্বরের এবং 'জোর জমিয়াছে খেলা' ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বরের দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কবির মুক্তি' ১৩৪৮ চৈত্রের 'সওগাত'-এ ছাপা হইয়াছিল।

'ছন্দিতা' গীতি-গুচ্ছের প্রায় সবগুলি গান সংস্কৃত বৃত্ত-ছন্দে বিরচিত। তাহাতে 'দীপকমালা' ১৬ মাত্রা ; তাহার অস্থায়ী—

— ∨ ∨ — — | — ∨ — ∨ — ∨ ∨ ∨ |
দীপক-মালা গাঁথ গাঁথ গাঁথ সই।
মাধব আসে পারিজাত কই॥

সংস্কৃত রীতি-অনুসারে ইহার প্রথম পংক্তিতে হয় ৮ + ১১ মাত্রা, কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিতে ঠিক ৮ + ৮ মাত্রা। ইহারা প্রকৃত পাঠ হইবে এরূপ—

— ∨ ∨ — — | — ∨ — ∨ ∨ ∨ |
দীপক-মালা গাঁথ গাঁথ সই।
— ∨ ∨ — — | — ∨ — ∨ ∨ ∨
মাধব আসে পারিজাত কই॥

এখানে পংক্তিতে ৮ + ৮ মাত্রার দুটি পদ। প্রথম পদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষর হ্রস্বোচ্চারিত অর্থাৎ একমাত্রিক এবং অবশিষ্ট তিনটি অক্ষর দীর্ঘোচ্চারিত অর্থাৎ

দ্বিমাত্রিক। দ্বিতীয় পদের প্রথম ও তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তিতে দ্বিতীয় পদের শেষ অক্ষর দীর্ঘোচ্চারিত ; ফলে সেগুলিতে ৫ অক্ষরে ৮ মাত্রা পরিমিত হইয়াছে। এই গানটির তৃতীয় পংক্তিতে 'আনত আঁখি' পদের প্রান্তস্থিত অক্ষর 'খি' বিকল্পে দীর্ঘোচ্চারিত এবং সপ্তম পংক্তিতে 'চেয়ো না লাজে' পদে 'য়ো' ও না' অক্ষর হ্রস্বোচ্চারিত। গানের সুরের বিস্তার ভাবানুযায়ী সুসঙ্গত করার প্রয়োজনেই ছন্দতালে এরূপ ব্যতিক্রমের অবকাশ দেওয়া হইয়াছে।

'আত্মগত' ১৩৪৮ সালের জৈষ্ঠ মাসে ১ম বর্ষের ৭ম সংখ্যক 'রূপায়ন' পত্রিকায় 'আর জিজ্ঞাসা করিব না কোনো কথা' শিরোনামে মুদ্রিত হইয়াছিল ; কিন্তু সেই সংখ্যার 'রূপায়ণ' সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও বাজারে বাহির হয় নাই। অতঃপর কবিতাটি ১৩৪৮ মাঘের 'সওগাত' পত্রিকায় 'সাগরের ঢেউ' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সওগাতে' মুদ্রিত কবিতাটিতে ২৪ সংখ্যক পংক্তির পরে আছে এই শ্লোকটি—

মোর কবিতার কবুতরগুলি তোমার হৃদয়াকাশে
উড়িতে যখন চায়, কেন সেথা মেঘ ঘনাইয়া আসে?

এই শ্লোকটি 'শেষ সওগাত' কাব্যে নাই। সেখানে কবিতাটির শেষ ১০টি পংক্তির মুদ্রণেও বিপর্যয় ঘটিয়াছে,—শেষের ৪টি পংক্তি তাহার পূর্ববর্তী ৬টি পংক্তির উপরে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উক্ত ১০টি পংক্তি 'সওগাত'-এ প্রকাশিত 'সাগরের ঢেউ' কবিতাটিতে নাই ; সে-স্থলে আছে নিম্নোদ্ধৃত ১০টি পংক্তি—

প্রেম দিয়ে এক পূর্ণ পরম প্রেমময়ে পাওয়া যায় ;
মজনু পায় না লায়লীরে প্রেম দিয়ে হায় দুনিয়ায়!
প্রেম যে কি চায়, প্রেমিকও জানে না, বিশ্বে জানে না কেউ ;
ঢেউয়ে মিশে ঢেউ শান্ত হয় না, কেন ওঠে আরো ঢেউ?
দেহ চায় দেহ, মন চায় মন, আত্মা আত্মা চায় ;
প্রেম তবু বলে কাঁদিয়া নিত্য—কিছু পাইল না, হায়!
বিরহের মধু-মঞ্জরী তুমি প্রিয়া, নহ মিলনের মধু-মালা ;
কাবার তীর্থ-পথে কেন এত মরু-তৃষ্ণার জ্বালা?
কে বলিতে পারে কেন অনুরাগ—'লোহিত সাগর'-তীরে
তৃষ্ণাকাতর গোবী সাহারার মরুভূমি আছে ঘিরে?

উপরন্তু 'সাগরের ঢেউ' কবিতাটিতে অনেক পংক্তির পদ পরিবর্তিত।

পু ন শ্চ

আবদুল কাদির-সম্পাদিত *নজরুল-রচনাবলীর* অন্তর্ভুক্ত *শেষ সওগাত* এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূমিকা-সংবলিত প্রথম সংস্করণ *শেষ সওগাতের* অনেক কবিতার মধ্যে স্তবক-বিন্যাস, ছন্দ-বিন্যাস এবং শব্দ ও বাক-বন্ধে পার্থক্য দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে

অর্থগত, ভাবগত ও ছন্দোগত দিক বিবেচনা করে আবদুল কাদির এসব পরিবর্তন করেছিলেন বলে মনে হয়। আবার হয়তো তখনকার পরিবেশের বিবেচনায় হিন্দু ঐতিহ্যমূলক কিছু শব্দ ও চিত্রকল্পও পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।

শেষ সওগাতের কবিতাবলী রচনাকালে নজরুল ইসলাম দৈনিক *নবযুগের* সম্পাদক ছিলেন এবং সে-সময়েই তাঁর অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতের কথা মনে রেখে *নজরুল-রচনাবলীর* নতুন সংস্করণে কবিতার ভাষা ও ভঙ্গির ক্ষেত্রে আমরা *শেষ সওগাতের* প্রথম সংস্করণ অনুসরণ করেছি এবং স্তবক ও ছন্দোবিন্যাসের ক্ষেত্রে আবদুল কাদিরকৃত পরিবর্তন রক্ষা করেছি।

শেষ সওগাতে আবদুল কাদির-সংযোজিত 'মহাত্মা মোহসিন' কবিতাটি নতুন সংস্করণে *শেষ সওগাতের* অন্তর্ভুক্ত হয় নি। ওই কবিতাটি পাওয়া যাবে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান অংশে।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্র *শেষ সওগাতে* 'বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত কবিতা' সংকলিত হওয়ার কথা বলেছেন, তবে কবিতাগুলি চিহ্নিত করেন নি। আবদুল কাদির এর অনেকগুলি কবিতার প্রথম প্রকাশের তথ্য উল্লেখ করেছেন। অপ্রকাশিত কবিতা বলতে প্রেমেন্দ্র মিত্র হয়তো গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা বুঝিয়ে থাকতে পারেন।

প্রথম প্রকাশের পরে ডি. এম. লাইব্রেরি থেকে *শেষ সওগাতের* আরেকটি সংস্করণ প্রচারিত হয়। তাতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূমিকাটি থাকলেও তাঁর নাম মুদ্রিত হয় নি।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

'শেষ-সওগাত' গ্রন্থে 'মোহসিন স্মরণে' শীর্ষক গানটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে : '২৭-সংখ্যক কবিতা 'মহাত্মা মোহসিন' সংযোজিত হইয়াছে।' আসলে ২৭-সংখ্যক কবিতা 'মহাত্মা মোহসিন' নয়, বরং 'মোহসিন স্মরণে' শীর্ষক গান। [দ্রষ্টব্য : 'নজরুল-রচনাবলী' নতুন সংস্করণ ৩য় খণ্ড, ১৯৯৩ পৃ: ৩৪০]

'মহাত্মা মোহসিন' শীর্ষক কবিতাটি 'নজরুল-রচনাবলী'র ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) 'কবিতা ও গান' পর্যায়ে ৪৩৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে। কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তা সেখানে উল্লিখিত নেই। কবিতাটি 'শেষ-সওগাত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, 'শেষ-সওগাত' এর গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে, "২৭-সংখ্যক কবিতা : 'মহাত্মা মোহসিন' সংযোজিত হইয়াছে। 'মহাত্মা হাজী মোহাম্মদ মোহসিন' শিরোনামে ইহা দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার মোহসিন-সংখ্যায় ছাপা হইয়াছে।"

উপরোক্ত কারণে 'মহাত্মা মোহসিন' শীর্ষক কবিতাটি 'কবিতা ও গান' [পৃ: ৪৩৭, নজরুল-রচনাবলী, নতুন সংস্করণ ১৯৯৩, ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য] পর্যায়ে মুদ্রিত না হয়ে তা 'শেষ-সওগাত' গ্রন্থে মুদ্রিত হলো।

নজরুলের 'মহাত্মা মোহসিন' শীর্ষক কবিতাটি দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার ১৯৪১ সালের ৩০শে নভেম্বর (১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮) তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, হাজী মোহাম্মদ মোহসিনের ১২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী সভা উদ্বোধন করে নজরুল ঐ অনুষ্ঠানে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন এবং কবিতাটি আবৃত্তি করেন। ১৯৪১ সালের ২৯শে নভেম্বর কলকাতায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে ৮৬নং কলেজ স্ট্রীটস্থ ওভারটুন হলে (ওয়াই এম.সি.এ) উক্ত মৃত্যুবার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণ-সভায় নজরুল-রচিত গান 'মোহসিন স্মরণে' পরিবেশন করেন শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ। গানটি 'মহাত্মা মোহসিন' শিরোনামে দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার ১৯৪১ সালের ২৯শে নভেম্বর (১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮) তারিখের সংখ্যায় সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় ও চতুর্থ কলামের মাঝখানে বক্স করে ছাপা হয়।

মোহসিন-স্মরণ সভার উদ্বোধনী-ভাষণে নজরুল বলেছেন :

> 'আজ মহাত্মা মোহসিনের স্মৃতি-দিবসের সভায় উপস্থিত হয়ে আমি নিজেকে খুব গৌরবান্বিত মনে করছি। এই মহাত্মার দানের প্রতিদান দিতে পারে, এমন লোক আজও পয়দা হয় নাই। আমি আজ এই মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।' [দ্রষ্টব্য : দানবীর হাজী মোহাম্মদ মোহসিনের পুণ্য-স্মৃতিবার্ষিকী সভর বিবরণী। দৈনিক 'নবযুগ' ৩০শে নভেম্বর, ১৯৪১, ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮]

'শেষ-সওগাত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মোহসিন স্মরণে' [গান] এবং 'নজরুল-রচনাবলী'র ৩য় খণ্ডের নতুন সংস্করণ (মে, ১৯৯৩) অন্তর্গত 'কবিতা ও গান' পর্যায়ে মুদ্রিত (পৃ: ৪৩৭) 'মহাত্মা মোহসিন' শীর্ষক কবিতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রচনা। 'কেন আপনারে হানি হেলা' শীর্ষক কবিতাটি দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২২শে নভেম্বর, ১৯৪১, ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ সংখ্যায়। 'নবযুগ' এ প্রকাশিত কবিতাটির সঙ্গে 'নজরুল-রচনাবলী'র নতুন সংস্করণের (মে, ১৯৯৩) ৩য় খণ্ডের অন্তর্গত 'শেষ-সওগাত' গ্রন্থে সংকলিত কবিতার পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো। দৈনিক 'নবযুগ' এ প্রকাশিত কবিতাটির প্রথমাংশ নিম্নরূপ :

বন্ধুরা কহে, 'হায় কবি, কেন এ নিঠুর খেলা,
কোন অকারণ অভিমানে আপনারে হানো হেলা?'
কহিলাম 'মা গো আমি কবি দেশে ফিরি নাকি রস ঢেলে,
সে রসের কিছু পাওনি কি তুমি আর তব মৃত ছেলে?'
কহে সে ভিখারিণী আঁখি-জলে, 'রস পান? সে তো বিলাসীদের!
তেল মাখ তুমি তেলা মাথায়, হায়, কেহ নাই ভিক্ষুকের।'
মরা খোকা লয়ে ভিখারিণী চলে গেল কোন পথে সুদূর,
জ্ঞান হলে আমি আসি চেয়ে দেখি, বুকে জাগে মোর মরা শিশুর।'

'শেষ-সওগাত' গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাটির প্রথমাংশ নিম্নরূপ :

'বন্ধুরা কহে, 'হায় কবি, খেল একি নিঠুর খেলা,
কোন অকারণ অভিমানে আপনারে হানো অবহেলা?'
হাসিয়া কহিনু—'হয়েছে কি? বন্ধুরা কহে—'চুলোর ছাই।

আপন সৃষ্টি করিছ যে নাশ, সেদিকে তোমার দৃষ্টি নাই?'
আমি কহিলাম—'জানি নাত সৃষ্টি করেছি কিছু আমি,
সাগরের তৃষা লয়ে নদী শুধু সম্মুখে ছুটিয়া যায়,
পথে পথে যেতে ঢেউ যে তাহার কত কথা বলে, কত কি গায়।'

'ভয় করিও না, হে মানবাত্মা' শীর্ষক কবিতাটি দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার ১৯৪১ সালেলর ৭ই ডিসেম্বর (২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮) সংখ্যায় ৪র্থ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত হয়।

'সুখ বিলাসিনী পারাবত তুমি' শীর্ষক কবিতাটি নজরুল দার্জিলিং-এ অবস্থানকালে ১৪-৬-৩১ তারিখে অর্থাৎ ১৯৩১ সালের জুন মাসের ১৪ তারিখে স্বহস্তে কবির সফরসঙ্গী জাহানারা চৌধুরীর খাতায় লিখে দেন [১৯৯৮ সালের ১২ই জুন 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকার 'সাময়িকী'তে প্রকাশিত আবদুল মান্নান সৈয়দের 'অপ্রকাশিত নজরুল' শীর্ষক নিবন্ধে মুদ্রিত নজরুলের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির ফটোকপি দ্রষ্টব্য] জাহানারা চৌধুরী সম্পাদিত বার্ষিক 'রূপরেখা' থেকে কবিতাটি ১৩৪৩ সালের বৈশাখের 'বুলবুল' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হলেও রচনাটির নীচে পুনর্মুদ্রণের কোন উল্লেখ নেই। [দ্রষ্টব্য : নির্বাচিত 'বুলবুল' সংকলন, পৃ. ২২৩]

'হুল ও ফুল' শীর্ষক কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় ১৯৪১ সালের ২৪শে নভেম্বর (৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮) তারিখের সংখ্যায়। 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হুল ও ফুল' কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তি কয়টি 'শেষ-সওগাত' গ্রন্থে মুদ্রিত 'হুল ও ফুল' কবিতায় নেই। পংক্তি কয়টি হলো :

চৌদ্দ পুরুষ কাঙাল তার, যে কাঙালের কথা কহে
ওরা! বলে! আমি বলি, 'এ আখ্যা যেন চিরদিন রহে।'

উপরোক্ত পংক্তি দু'টি 'নজরুল-রচনাবলী'র নতুন সংস্করণের (মে, ১৯৯৩) অন্তর্গত 'হুল ও ফুল' কবিতায় : 'ওরা কয়। আমি বলি, 'বেশ করে সে তালায় তালা দিও।'

'নারী' শীর্ষক কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার ১৯৪১ সালের ২৭শে নভেম্বর (১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮) তারিখের সংখ্যায়। উল্লেখযোগ্য যে, নজরুলের এই কবিতাটি তাঁর 'নারী' শীর্ষক দ্বিতীয় কবিতা। কবির 'সাম্যবাদী' গ্রন্থের অন্তর্গত সাম্যবাদী সিরিজের কবিতা 'নারী' তাঁর 'নারী' শীর্ষক প্রথম কবিতা।

'একি আল্লার কৃপা নয়?' শীর্ষক কবিতাটি দৈনিক 'নবযুগ' এর ১৯৪১ সালের ৫ই ডিসেম্বর (১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮) তারিখের সংখ্যায় ৪র্থ পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'তোমারে ভিক্ষা দাও' শীর্ষক কবিতাটি দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার ১৯৪১ সালের ৯ই ডিসেম্বর (২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮) তারিখের সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় (সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়) প্রথম প্রকাশিত হয়।

'শোধ কর ঋণ' শীর্ষক কবিতাটি দৈনিক 'নবযুগ' এর ১৯৪১ সালের ১০ই ডিসেম্বর (২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮) তারিখের সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় (সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা) প্রথম প্রকাশিত হয়।

'কচুরীপানা' শীর্ষক গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় ১৯৪১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর (৯ই পৌষ, ১৩৪৮) তারিখের সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় (সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়)।

'বড়দিন' শীর্ষক কবিতাটি দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় ১৯৪১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর (১২ই পৌষ, ১৩৪৮) তারিখের সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় রচনারূপে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'বকরীদ' শীর্ষক কবিতাটি দৈনিক 'নবযুগ'-এর ১৯৪১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর (১৩ই পৌষ, ১৩৪৮) তারিখের সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় (সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়) প্রথম প্রকাশিত হয়।

'গোঁড়ামী ধর্ম নয়' শীর্ষক কবিতাটি দৈনিক 'নবযুগ'-এর ১৯৪২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী (২০শে মাঘ, ১৩৪৮) তারিখের সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় (সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়) প্রথম প্রকাশিত হয়।

তথ্যসূত্র : 'নবযুগ ও নজরুল-জীবনের শেষ পর্যায়' শেখ দরবার আলম প্রণীত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত, জুলাই ১৯৮৯ দ্রষ্টব্য।'

বি:দ্র: : 'নজরুল-রচনাবলী' ৩য় খণ্ড (নতুন সংস্করণ, মে ১৯৯৩) এর অন্তর্গত 'শেষ-সওগাত' এর গ্রন্থ-পরিচয়-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই এখানে প্রদত্ত তথ্যাদির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধ হবে।

ঝড়

'ঝড়' ১৩৬৭ সালের ১লা অগ্রহায়ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : শ্রী ব্রজকিশোর মণ্ডল ; বিশ্ববাণী ; ১১/এ বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট, কলিকাতা-৭। মুদ্রাকর : শ্রীরতিকান্ত ঘোষ ; দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস ; ১৭/১ বিন্দুপালিত লেন, কলিকাতা-৬। প্রচ্ছদ-শিল্পী : শ্রীগণেশ বসু। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮৮ ; মূল্য তিন টাকা।

'ঝড়' কাব্যে 'উঠিয়াছে ঝড়', 'জীবনে যাহারা বাঁচিল না', 'আমানুল্লাহ', 'ভোরের পাখি', 'বাংলার আজিজ', 'শাখ-ই-নবাত', 'খোকার গপ্প বলা', 'গদাই-এর পদবৃদ্ধি', 'কর্থ্যভাষা', 'দীওয়ান-ই-হাফিজ', 'ক্ষমা করো হজরত', 'সাম্পানের গান', 'চিঠি', 'রীফ-সর্দার', 'খালেদ', 'শরৎচন্দ্র', 'তরুণের গান', 'অনামিকা', 'জীবন', 'যৌবন', 'তর্পণ', 'নগদ কথা', 'জাগরণ' ও 'আরবী ছন্দের কবিতা' শিরোনামে ২৪টি রচনা স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে ৩, ৪, ৫, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ সংখ্যক ১৭টি রচনা নজরুল-রচনাবলীর পূর্ববর্তী খণ্ডসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া

এখানে বর্জিত হইল। 'খোকার গপ্প বলা', 'গদাই-এর পদবৃদ্ধি' ও 'চিঠি' কিশোর-পাঠ্য রচনা ; এগুলি নজরুল-রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে পরিবেশিত হইবে। এই ১৭টি রচনার স্থানে এখানে ২১টি নূতন কবিতা ও গান অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

'উড়িয়াছে ঝড়' ১৩৩৭ শ্রাবণের, 'জীবনে যাহারা বাঁচিল না' ১৩৩৬ চৈত্রের এবং 'শাখ-ই-নবাত' ১৩৩৭ আষাঢ়ের 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কর্থ্যভাষা' ১৩৪২ ভাদ্রের মাসিক মোহাম্মদীতে বাহির হইয়াছিল।

নজরুল একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' প্রথম খণ্ডে 'হিন্দী গান' : ১. 'আজ বন-উপবনে মে', ২. 'খেলত বায়ু ফুলবন-মে', ৩. 'চক্র সুদর্শন ছোড়কে মোহন', ও ৪. 'তুম প্রেমকে ঘনশ্যাম' এবং দ্বিতীয় খণ্ডে, ৫. 'ঝুলন ঝুলায়ে ঝাউ ঝক ঝোরে', ৬. 'ঝুলে কদমকে ডারকে ঝুলনা-মে', ৭. 'প্রেম-নগর কা ঠিকানা কর লে' ও ৮. 'সোওত জাগত আঁঠু জান রাহত প্রভু' সংকলিত হইয়াছে।

পু ন শ্চ

ঝড় কাব্যের অধিকাংশ কবিতা *জিঞ্জীর, সন্ধ্যা, ঝিঙে ফুল, চোখের চাতক* ও *নির্ঝর* প্রভৃতি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই তা এখানে বর্জিত হয়েছে। 'সাম্পানের গান' দুটির প্রথমটি *চোখের চাতকে* রয়েছে। তবে *চোখের চাতক* ও *ঝড়* গ্রন্থভুক্ত গান দুটিতে পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথমোক্ত গ্রন্থে গানের ভাষা চলিত, শেষোক্ত গ্রন্থে তা সাধু। *ঝড়ের* অন্তর্ভুক্ত গানের 'সাম্পান' শব্দের জায়গায় *চোখের চাতকের* গানে ছিল 'তরী'।

ঝড়ের প্রথম সংস্করণ-অবলম্বনে নতুন সংস্করণ *নজরুল-রচনাবলীতে ঝড়* কাব্যে নিম্নলিখিত কবিতা অন্তর্ভুক্ত হলো : 'উঠিয়াছে ঝড়', 'শাখ-ই-নবাত', 'কর্থ্যভাষা', 'গদাই-এর পদবৃদ্ধি', 'দীওয়ান-ই-হাফিজ', 'ক্ষমা করো হজরত', 'সাম্পানের গান' ও 'অনামিকা'। গ্রন্থভুক্ত অন্যান্য কবিতা কবির অন্যান্য কাব্যে এবং আবদুল কাদির-সংযোজিত কবিতাগুলি 'গ্রন্থকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান' অংশে পাওয়া যাবে।

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' সচিত্র প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ পৌষ মোতাবেক ১৯৫৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। চিত্রায়ন : খালেদ চৌধুরী। সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা 'ভূমিকা' সম্বলিত। প্রকাশিকা : জোহরা খানম ; ৯, এন্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯। পরিবেশক : স্টান্ডার্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। মূল্য ১০ টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭০ কার্তিকে প্রকাশিত হয়।

এখানে সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা 'ভূমিকা'-র পরিবর্তে কবির নিজের লেখা 'ভূমিকা' পরিবেশিত হইল। এই ভূমিকাটি মৎসম্পাদিত 'নজরুল-রচনা-সম্ভার' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে 'ওমরের কাব্য ও দর্শন' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

কাজী নজরুল ইসলামের অনূদিত ১-৩১ সংখ্যক রুবাই ১৩৪০ কার্তিকের, ৩২-৪৬ সংখ্যক রুবাই ১৩৪০ অগ্রহায়নের এবং ৪৭-৫৯ সংখ্যক রুবাই ১৩৪০ পৌষের মাসিক মোহাম্মদীতে 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' শিরোনামে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে ১-সংখ্যক রুবাইর অনুবাদ এরূপ—

পূর্বাশায় ঐ মিহির হানে তিমির-বিদার কিরণ-তীর,
কায়খসরুর লাল পিয়ালায় ঝরছে যেন মদ জ্যোতির।
ভোরের শুভ্র বেদীতলে ডাক দিয়ে কয় মোয়াজ্জিন,
জাগো জাগো প্রসাদ পেতে ঊষার ঘটের লাল পানির॥

মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত ১৬ ও ১৭ সংখ্যক রুবাই গ্রন্থে হইয়াছে যথাক্রমে ১৯৬ ও ১৯৭ সংখ্যক রুবাই। বলা বাহুল্য যে, গ্রন্থনের সময় অনুবাদ স্থানে স্থানে সংশোধিত এবং স্তবকের ক্রমঃবিন্যাস কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে।

পু ন শ্চ

সৈয়দ মুজতবা আলী-রচিত *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের* ভূমিকা এখানে সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হলো :

নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, শ্রীরামপুর, হুগলি এবং পরবর্তী যুগে কলকাতায় অনেকখানি আরবি-ফার্সির চর্চা হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ চর্চা খুব ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তার প্রধান কারণ অতি সরল—ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পূর্ব-বাংলার মত ছড়িয়ে পড়তে পারেনি, কাজেই অতি সহজেই অনুমান করা যায়, চুরুলিয়া অঞ্চলে পীর-দরবেশদের কিঞ্চিৎ সমাগম হয়ে থাকলেও মৌলবি-মৌলানারা সেখানে আরবি-ফার্সির বড় কেন্দ্র স্থাপন করতে পারেননি।

তদুপরি নজরুল ইসলাম ইস্কুলে সুবোধ বালকের মত যে খুব বেশি আরবি-ফার্সি চর্চা করেছিলেন তাও মনে হয় না। ইস্কুলে তিনি আদৌ ফার্সি (আরবি সম্ভাবনা নগণ্য) অধ্যয়ন করেছিলেন কি-না, সে সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু জানিনে। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলতে পারবেন।

তারো পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি যে এ সব ভাষায় খুব বেশি এগিয়ে গিয়েছিলেন তাও তো মনে হয় না। পল্টনের হাবিলদার যে জাব্বা-জোব্বা পরে দেওয়ানা-দেওয়ানা ভাব ধরে হাফিজ-সাদীর কাব্য কিম্বা মৌলানা রুমীর মসনবী সামনে নিয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াবে তাও তো মনে হয় না। এমন কি রঙিন সদরিয়ার উপর মলমলের বুটিদার পরে হাতে শিরাজীর পাত্র নিয়ে সাকির কণ্ঠে ফার্সি

গজল আর কসীদা-গীত শুনছেন, এও খুব সম্ভবপর বলে মনে হয় না। কসম খেয়ে এ বিষয়ে কোনো কিছু বলা শক্ত, তবে এটা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, কাব্যে যদ্যপি 'খাকী' এবং 'সাকী'র চমৎকার মিল, তবু বাস্তব জীবনে এদুটোর মিল এবং মিলন সচরাচর হয় না।

তবু নজরুল ইসলাম মুসলিম ভদ্রঘরের সন্তান। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আলিফ, বে, তে করেছেন, দোয়-দরুদ (মন্ত্র-তন্ত্র) মুখস্থ করেছেন, কুরান পড়াটা রপ্ত করেছেন। পরবর্তী যুগে তিনি কুরানের শেষ অনুচ্ছেদ 'আমপারা' বাঙলা ছন্দে অনুবাদ করেন—হালে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে পুস্তিকাতে তাঁর গভীর আরবি জ্ঞান ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে তাঁর কবিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টি এবং আমপারার সঙ্গে তাঁর যে আবাল্য পরিচয়। বিশেষ করে ধরা পড়ে, দরদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী (আল্লার 'কালাম') হৃদয়ঙ্গম করার তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা।

এরই উপর আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। ফার্সি তিনি বহু মোল্লা-মৌলবির চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফার্সি কাব্যের রসাস্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণবাগীশদের চেয়ে কম সংস্কৃত জানতেন, কিন্তু তিনি লিরিকের রাজা মেঘদূতখানা জীবন এবং কাব্য দিয়ে যতখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ততখানি কি কোনো পণ্ডিত পেরেছেন? বহু লোকই বাঙলাদেশের মাটি নিখুঁতভাবে জরিপ করেছেন, কিন্তু ঐ মাটির জন্য প্রাণ তো তারা দেয়নি। কানাইলাল ভালো জরিপ জানতেন একথাও তো কখনো শুনিনি।

কাজী রোমান্টিক কবি। বাঙলাদেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে স্বপ্নলোকে নিয়ে যেত, ঠিক তেমনি ইরান-তুরানের স্বপ্নভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাঙলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনো যাননি, সুযোগ পেলেই যে যেতেন, সে কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না (শুনেছি, পণ্ডিত হয়েও মাক্সম্যুলার ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন এবং তাই বহুবার সুযোগ পেয়েও এদেশে আসতে রাজি হননি।) কিন্তু ইরানের গুল্-বুলবুল, শিরাজী-সাকি তাঁর চতুর্দিকে এমনই কি জানা-অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিল যে গাইড-বুক, টাইম-টেবিল ছাড়াও তিনি তার সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন। গুণীরা বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই দুটি করে মাতৃভূমি—একটি তাঁর আপন জন্মভূমি ও দ্বিতীয়টি ফ্রান্স। কাজীর বেলা বাঙলা ও ইরান। কীটস বায়রনের বেলা যে রকম ইংল্যান্ড ও গ্রীস।

আরব ভূমির সঙ্গে কাজী সায়েবের যেটুকু পরিচয়, সেটুকু প্রধানত ইরানের মারফতেই। কুরান শরীফের 'হারানো ইউসুফের' যে করুণ কাহিনী বহু মুসলিম অমুসলিমের চোখের জল টেনে এনেছে তিনি কবিরূপে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ফার্সি কাব্যের মারফতে।

দুঃখ করো না, হারানো য়ুসুফ
কানানে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ মরু পুন
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥

ইউসুফে গুম্‌গশ্‌তে বা'জ্‌ আয়দ্‌ ব্‌কিনান্‌
গম্‌ ম্‌-খুর।
কুল্‌বয়ে ইহ্‌জান্‌ শওদ্‌ রূজী গুলিস্তান্‌
গম্‌-ম্‌-খূর॥

কাজী সায়েবের প্রথম যৌবনের রচনা এই ফার্সি কবিতাটির বাঙলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়ে'র অনুকরণে 'শাতিল আরব শাতিল আরব' ঐ যুগেরই অনুবাদ।

কোনো কোনো মুসলমান তখন মনে মনে উল্লসিত হয়েছেন এই ভেবে যে, কাজী 'বিদ্রোহী' লিখুন আর যা-ই করুন, ভিতরে ভিতরে তিনি খাঁটি মুসলমান। কোনো কোনো হিন্দুর মনেও ভয় হয়েছিল (যাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন তাঁদের কথা হচ্ছে না) যে, কাজীর হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি বোধ হয় বাঙলার জন্য নয়—তাঁর দরদ বুঝি ইরান-তুরানের জন্য। পরবর্তী যুগে—পরবর্তী যুগে কেন, ঐ সময়ের কবিকে যাঁরা ভালো করে চিনতেন, তাঁরাই জানতেন, ইরানি সাকির গলায় কবি যে বার বার শিউলির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ সে তরুণী মুসলমানী বলে নয়, সে সুন্দরী ইরানের বিদ্রোহী কবিদের নর্ম সহচরী বলে—ইরানের বিদ্রোহী আত্মা কাব্যরূপে, মধুররূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকির কল্পনায়।

সে বিদ্রোহ কিসের বিরুদ্ধে?

এ স্থলে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন।

ইরানি ও ভারতীয় একই আর্যগোষ্ঠীর দুই শাখা। দুই জাতির ইতিহাসেই অনেকখানি মিল দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইরানিরা যে রকম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে একদিকে মিশর প্যালেস্টাইন, অন্য দিকে গ্রীস পর্যন্ত হানা দিয়েছিল, ভারতীয়েরা সে রকম করেনি। দ্বিতীয়ত বিদেশী অভিযানের ফলে ইরানভূমি যে রকম একাধিকবার সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড হয়েছে, ভারতবর্ষের ভাগ্যে তা কখনো ঘটেনি। এ সব কারণেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, ইরানিরা সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই এক উগ্র স্বাজাত্যাভিমানের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষ যেখানে শান্তভাবে বিদেশীর ভালো-মন্দ দেখে-চিনে নিজকে মেলাবার, পরকে আপন করার চেষ্টা করেছে, ইরান সেখানে আদৌ সে চেষ্টা করেনি এবং শেষটায় যখন বাধ্য হয়ে সব কিছু নিতে হয়েছে তখন করেছে পরবর্তীকালে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

গ্রীস-রোমের কাছে পরাজিত হওয়া এক কথা, আর প্রতিবেশী 'অনুন্নত', 'অর্ধসভ্য' আরবদের কাছে পরাজিত হওয়া আরেক কথা। তদুপরি গ্রীক রোমানরা ইরানে যে সভ্যতা এনেছিল, তাতে গরিব-দুঃখীর জন্য নূতন কোনো আশার বাণী ছিল না। যে নবীন ধন-বণ্টন পদ্ধতি দ্বারা হজরৎ মুহম্মদ আরব দেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যসূত্রে গ্রন্থন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর বাণী এসে পৌছল ইরানে। ফলে মুহম্মদ সাহেবের পরবর্তিগণ যখন একদিন অন্যান্য জাতির মত দিগ্বিজয়ে বেরোল তখন ইরানি শোষক সম্প্রদায় দেখে মর্মাহত ও স্তম্ভিত হল যে, ইরানের জনসাধারণ আরবের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হল না। তারপর আরবরা বিজিত দেশের ধর্মজগতে যে সাম্যবাদ ও

অর্থের ক্ষেত্রে যে ধনবণ্টন পদ্ধতি প্রচার করলো, তাতে আকৃষ্ট হয়ে ইরানের জনসাধারণ মুসলমান হয়ে গেল। জ্ঞানাভিমানী ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ও শেষ পর্যন্ত ঐ ধর্ম গ্রহণ করল। তখনকার মত ইরানি সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রায় লোপ পেয়ে গেল।

কিন্তু বিদ্রোহ লুপ্ত হল না।

সেটা দেখা দিল প্রায় চারশ বছর পরে ফিরদৌসীর মহাকাব্য 'শাহনামা'তে। রাষ্ট্রভাষা আরবিকে উপেক্ষা করে ফিরদোসী গাইলেন প্রাক-মুসলিম যুগের ইরানি বীরের কাহিনী, রাজার দিগ্বিজয়, প্রেমিকের বিরহ-মিলন গাথা—নবীন অথচ সনাতন সেই ফার্সি ভাষায়। সে ফার্সি কাব্য-সাহিত্য পরবর্তী যুগে বিশ্বজনের বিস্ময় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, তার প্রথম সার্থক কবি ফিরদৌসী।

এই নূতন ভাষাতে, নবীন প্রাণে উন্মত্ত হয়ে যেসব কবি কাব্যের সর্ব বিষয়বস্তু নিয়ে নব নব কাব্যধারার প্রবর্তন করলেন তার কাছে পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় রেনেসাঁসও এতখানি সর্বমুখী বলে মনে হয় না। দুশ বছর যেতে না যেতেই বিশ্বের কাব্যজগতে ইরান তার অদ্বিতীয় আসন সৃষ্টি করে নিল।

এঁদের মধ্যে সত্য বিদ্রোহী কবি ওমর খৈয়াম।

* * * * *

ইরানে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত তথা পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভিতর বিভিন্ন আন্দোলনের সৃষ্টি হল। তার প্রথম

(১) যাঁরা মুসলিম শাস্ত্রের চর্চা করে যশস্বী হলেন। ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, ইরানিরা আরবির মত কঠিন ভাষা আয়ত্ত করে সে শাস্ত্রে এতখানি ব্যুৎপত্তি অর্জন করলো কি করে? মুসলমানদের মনুর নাম ইমাম আবু হানীফা। পৃথিবীর শতকরা আশি জনেরও বেশি মুসলমান আজ নিজকে হানফী অর্থাৎ আবু হানীফার মতবাদে বিশ্বাসকারী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবার মত কীই বা আছে? শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য তো শুনেছি ভারতবর্ষের দক্ষিণতম কোণের লোক, এবং তাঁর ধমনীতে যে অত্যধিক আর্যরক্ত ছিল তাও তো মনে হয় না, অন্তত একথা তো অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, আর্য উত্তর ভারতের তুলনায় মালাবারে সংস্কৃত চর্চা ছিল অনেক কম। তবু যে তিনি শুধু তাঁর মাতৃভূমি মালাবারে বৌদ্ধদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, আর্য উত্তর ভারতেও তিনি তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইরানি আবু হানীফার মতবাদও একদা ইসলামের জন্মভূমি মক্কা-মদীনা তথা আরব দেশ জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। এ রকম উদাহরণ পৃথিবীতে আরো আছে।

(২) যাঁরা ক্রিয়াকাণ্ড, টীকা-টীপ্পনী, মন্ত্রতন্ত্রে সম্পূর্ণ আস্থা না দিতে পেরে 'রহস্যবাদ' বা সূফীতত্ত্বের প্রচার এবং প্রসার করতে লাগলেন। এঁরা ভগবানের আরাধনা করেন রসের মাধ্যমে এবং বাঙলার বৈষ্ণব তথা 'মরমিয়াদের' সঙ্গে এঁদের তুলনা করা যেতে পারে।

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা

কাজ নাই, সখি, তাঁদের কথায়
বাহিরে থাকেন তাঁরা।

* * *

ঐ চাহনিতে বিশ্ব মজেছে
পড়িয়াছে কত অশ্রুধার
পাগল করিল এ প্রমত্ত আঁখি
কুলমান রাখা হৈল ভার।

এ ধরনের কবিতা সুফী ও বৈষ্ণবদের ভিতর এতই প্রচলিত যে, কোনটি সুফী কোনটা বৈষ্ণব ধরে ওঠা অসম্ভব। যদি বলি,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে
রাধিকার মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।

তবে চট করে কেউ আপত্তি করবেন না। অথচ আসলে আছে,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে।

('সদ্ভাব-শতক' কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের অনুবাদ)

বৈষ্ণবদের সঙ্গে এঁদের আরো বহু মিল আছে। এঁদের সুফীবাদ পরবর্তী যুগে তথাকথিত 'তুর্কি'রা গ্রহণ করে। বাঙলাদেশে প্রথম যে মুসলমানরা আসেন তাঁদের আমরা 'তুর্ক', 'তুরুক', নাম দি (প্রাচীন বাঙলার 'মুসলমান' শব্দের প্রতিশব্দ 'তুর্ক'—তামিল এখনো 'তুরস্কম') এবং তাঁদের চক্রাকারে নৃত্য করে আল্লার নাম জপ ('জিকর'—যার থেকে বাঙলা 'জিগির' শব্দ এসেছে) করা দেখে 'তুর্কি-নাচন-নাচা' প্রবাদটি এসেছে। বৈষ্ণবদের মত এঁরাও জপ করতে করতে 'হাল' ('দশা) প্রাপ্ত হন,—অর্থাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন ও মুখ দিয়ে তখন প্রচুর ফেনা বেরয়। পূর্ব ইয়োরোপে এই নাচ দেখেই ইয়োরোপীয়রা এদের নাম দিয়েছিল 'ডানসিং দরবেশ'। ইংরিজিতে কথাটা এখনো চালু আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অত্যধিক বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন, কারণ আউল-বাউল, ভাটিয়ালি-মুর্শীদীয়া গীত যাঁরাই শুনেছেন, তাঁরাই এই ফার্সি, সুফী, ভক্তিবাদের কিঞ্চিৎ গন্ধস্পর্শ পেয়েছেন।

(৩) দার্শনিক সম্প্রদায়। আর্যোগোষ্ঠীর দুই সম্প্রদায়—ভারতীয় ও গ্রীকরাই প্রধানত দর্শনের চর্চা করেছেন।

মাহমুদ বাদশার সভাপণ্ডিত 'ভারতবর্ষ' পুস্তকের (প্রাচীন তথা অর্বাচীন ভারতের বহুমুখী কার্যকলাপ, চিন্তা অনুভূতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হতে চান তাঁদের পক্ষে এ পুস্তক অপরিহার্য ; বস্তুত বর্তমান লেখক ব্যক্তিগতভাবে এ পুস্তককে 'মহাভারতের' পরেই স্থান দেয়) লেখক পণ্ডিত অল-বীরূনী মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, 'দর্শনের চর্চা করেছেন গ্রীক এবং ভারতীয়েরা—আমরা (অর্থাৎ আরবি লেখকেরা) যেটুকু দর্শন শিখেছি তা এঁদের কাছ থেকেই।' কথাটা মোটামুটি সত্য, যদিও পণ্ডিতসুলভ কিঞ্চিৎ বিনয় প্রকাশ এতে রয়েছে, কারণ আরবরা গ্রীক দর্শনের আরবি অনুবাদ দিয়ে দর্শন চর্চা আরম্ভ

করেছিলেন সত্য কিন্তু পরবর্তী যুগে আভিচেন্না (বু আলী সিনা), আভেরস (ইবন-ই-রুশ্‌দ) ও গজ্‌জালী (অল-গাজেল—এঁর 'সৌভাগ্যস্পর্শমণি' প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙলায় অনূদিত হয়ে রাজশাহীতে প্রকাশিত হয়) বহু মৌলিক চিন্তা দ্বারা পৃথিবীর দর্শন ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখা ভালো, এঁদের দর্শন শঙ্কর-দর্শনেরই ন্যায় ধর্মাশ্রিত এবং যে স্থলে কুরানের বাণীর সঙ্গে গ্রীক দর্শনের দ্বন্দ্ব বেঁধেছে সেখানে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সে-দ্বন্দ্বের সমাধান করার এবং সময়ে সময়ে তখন তাঁরা নিও-প্লাতোনিজম অর্থাৎ ভারতের উপনিষদ-সম্মত অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করেছেন। এঁদের বিশেষ নাম 'মুতকল্লিমুন' এবং পরবর্তী যুগে এদেশের রাজা রামমোহন তাঁর বিশ্বদর্শন (ভোল্টানশাউউঙ) নির্মাণে এঁদের পরিপূর্ণ সাহায্য নিয়েছেন।

(৪) ঐতিহাসিক ও কবিগোষ্ঠী। ইতিহাসচর্চায় আরবদের দক্ষতা সর্বজনমান্য, তবে ইরানিরাও এ-শাস্ত্র তাঁদের কাছ থেকে শিখে নিয়ে এর অনেক উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু আমরা যে যুগের আলোচনা করছি তখনো ইরানিদের কাছে ইতিহাস ও পুরাণের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয়নি। ফিরদৌসীর 'শাহনামা' (রাজবংশ) কাব্যের রাজা-মহারাজা, নায়ক-নায়িকারা অধিকাংশই কবিজনসুলভ কল্পনাপ্রসূত—অন্তত তাঁদের কীর্তিকলাপ তো বটেই। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়, প্রাক-ইসলামী এই সব অগ্নি-উপাসক নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে ফিরদৌসীর কী গগনচুম্বী গরিমা, দম্ভ এবং সময় সময় আস্ফালন। এ যেন বিজয়ী আরবদের বার বার শুনিয়ে শুনিয়ে বলা, 'কালনেমির বিরূপাবর্তনে আজ আমাদের পতন ঘটেছে বটে, কিন্তু এই কাব্যে দেখ, আমরা একদিন সভ্যতার কত উচ্চ শিখরে উঠেছিলুম। সে-দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো। ওখানে তোমরা কখনো পৌঁছওনি, পৌঁছবেও না।' এ সুর কেমন যেন আমাদের চেনাচেনা মনে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ইংরেজকে শুনিয়ে শুনিয়ে বার বার এই গান গেয়েছে। 'অন্য জাতি দিগ্বসন পরিত যখন। ভারতে ঋগ্বেদ পাঠ হইত তখন।' কিন্তু, আফসোস! শাহনামার মত মহাকাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেনি। হেমচন্দ্র ও ইকবালকে ফিরদৌসীর আসনে বসানো কঠিন এবং অন্যান্য কবিরা যে 'নির্লজ্জতা' দেখালেন ('নির্লজ্জতা' শবদটি ভেবে চিন্তেই কুটেশনের ভিতর ফেললুম, কারণ কাব্যে রসস্বরূপে প্রকাশ পেলে চরম নির্লজ্জতাও পাঠকের মনে বিদ্রোহ সঞ্চার করতে পারে না। আমাদের দুই হাইডিয়ার হিরো পরমনন্দন ভীমসেন ও হনুমান যে সব দম্ভ এবং আস্ফালন করেছেন তা স্বকর্ণে শুনতে হলে 'রাম রাম' বলতে হত, কিন্তু কাব্যে পাঠ করে আনন্দাশ্রু বিগলিত হয়, মনে হয়, ঐ সময়ে, ঐ অবস্থায় এ বাক্য ছাড়া অন্য কিছুই এঁদের মুখে মানাতো না, বলতে ইচ্ছে করে, ধন্য ধন্য যুগ্ম-কবি যাঁরা দম্ভকে বিনয়ে, লজ্জাকে শ্লাঘায় পরিণত করতে পারেন!') সেটা ঢাকবার প্রয়াস আজও ইরানে-তুরানে সহজেই চোখে পড়ে। সকলেই জানেন, মুসলমানধর্মে মদ খাওয়া মানা আর সেই মদও যদি খাওয়া হয় তন্বী তরুণী সাকির সঙ্গে—যার সঙ্গে 'বে-থা' হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধেও কবিরা বড় মারাত্মক স্মৃতিশক্তিহীন—তাও আবার ঝর্না তলায়, নির্জনে, সাঁঝের ঝোঁক, যখন কিনা

'মগরিবের আইন ওক্'তে নামাজ পড়ার কথা, আল্লা-রসুলের নাম স্মরণ করার আদেশ--এবং মনে মনে আওড়ানো,

'মস্ত, মাতাল-ব্যসনী আমি গো আমি কটাক্ষ বীর'

তা হলে অবস্থাটা কি রকমের হয়?

কথা সত্য, মোল্লারা সুবো-শাম ভালো ভালো কেতাবপুঁথি পড়েন, কিন্তু মাঝে-মধ্যে, নিতান্ত কালে-কস্মিনে দু' একখানা কাব্যগ্রন্থের পাতাও তো তাঁরা ওলটান। কবি হাফিজ অবশ্য বিস্তর ঢলাঢলির পর ওকীবহাল হয়ে অভয়বাণী বলেছিলেন,

মোল্লার কাছে কোরো না কিন্তু মোর পিছে অনুযোগ,
তারো আছে, জেনো, আমারি মতন, সুরামত্ততা রোগ।

তবু, এ কথাও তো অজানা নয় যে, মোল্লারাই নীতিবাগীশ সাজে আর পাঁচজনের তুলনায় বেশি।

এবং কার্যত দেখা গেল তারা এবং তাদের চেলাচামুণ্ডার দল ঝোপে-ঝাপে বসে আছে, শরাব-কবাব জান-কী-সাকী সুদ্ধ বমাল গ্রেফতার করার জন্য।

কবিরা এবং বিশেষ করে আমাদের মত তাঁদের গুণগ্রাহীরা, উচ্চকণ্ঠে তখন বললেন, এসব কবিতা রূপকে নিতে হয়। মদ্য অর্থ ভগবদপ্রেম, সাকি অর্থ যিনি সে প্রেম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, অর্থাৎ পীর, গুরু, মুরশীদ, পয়গম্বর। এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাফিজ, আত্তার, এমন কি ওমর খৈয়ামের বহু কবিতার কোনো অর্থই করা যায় না, যদি সেগুলো রূপক দিয়ে অর্থ না করা হয়। কিন্তু বাদবাকিগুলো?

আমাদের পদাবলীতেও তাই। এবং এমন সব পদ আছে যাতে মর্ত্য আর অমর্ত্য প্রেম এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে, দুটোকে আদৌ আলাদা করা যায় না—সমস্ত হৃদয়-মন এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় নবরসে আপ্লুত হয়ে যায়।

তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।

মর্ত্যপ্রেমই যদি হবে তবে তো 'পরানে' 'পরানে' প্রেমের ফাঁসি লাগবে! 'পরানে' আর চরণে প্রেমের বাঁধ বেঁধে দিয়ে কী এক অপূর্ব অতুলনীয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে—যার অনুভূতি এ-জগতে আরম্ভ আর পরিপূর্ণতা লাভ করবে সেই অমর্ত্যলোকে, 'ব্যর্থ নাহি হোক এ-কামনা।'

কিন্তু মাঝে মাঝে মনে দ্বিধা জাগে, সর্বত্রই কি রূপকের শরণাপন্ন হতে হবে? যথা:

অদ্যাপ্য-শোক-নব-পল্লব-রক্ত হস্তাং
মুক্তাফল প্রচয়চুম্বিত-চুচুকাগ্রাম।
অন্তঃস্মিতেন্দুসিত পাণ্ডুর গণ্ডদেশাং,
তাং বল্লভাং রহসি সংবলিতাং স্মরামি॥

বিদ্যাপক্ষে

অশোক-পল্লব নব সম পাণিতলে।
কুচাগ্র শোভিত হয়েছে মুক্তাফলে॥
অন্তরে ঈষৎ হাস গণ্ডে বিকসিত।
শততের চন্দ্র যেন ত্রিলোক-মোহিত॥
নির্জনেতে বসি করি সদা সম্ভাবনা।
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা॥
তথাপি বিদ্যার নাহি পাই দরশন।
বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র করি ত্যজিব জীবন॥

দ্বিতীয়ার্থ কালীপক্ষে।

রুধির-খর্পর হস্তে দিবানিশি যার।
রক্তবর্ণ করতল হয়েছে শ্যামার॥
উচ্চ পয়োধরপরি বান্ধিত কাঁচলী।
হীরক জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী॥
অন্তরে গভীর হাস্য ঈষদ্ধাস্য কালে।
কিরণে আছয়ে গণ্ড পাণ্ডুবর্ণা ভালে॥
অন্তর জগতে দেখি আলোক বিরাজে।
কি শোভা প্রকাশে কূলকুণ্ডলিনী মাঝে॥
স্ববল্লভ সংবলিতা বিশ্বের কারিণী।
নিদানে গর্জনে স্মরি তারে গো তারিণী॥

(চৌরপঞ্চাশৎ, ভারতচন্দ্র, বসুমতী সংস্করণ, পৃ. ৮)

পূর্বোল্লিখিত এই সব তাবৎ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ওমরের বিদ্রোহ।

গিয়াসউদ্দীন আবুল ফৎহ ওমর ইবন ইব্রাহীম অল-খৈয়াম ইরানদেশের নিশাপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মদিন কিম্বা সন ঠিকমত জানা যায় নি, এমন কি তাঁর মৃত্যুর সনও মোটামুটি ১১২৩ খ্রিস্টাব্দ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

খৈয়াম শব্দের অর্থ তাম্বু-নির্মাতা। এ ওজনের শব্দ বাঙলায় আরো আছে। 'কওাল' থেকে বাঙলা কোতয়াল, এবং 'খম্মার' থেকে 'খোঁয়ারী' (ভাঙা) শব্দ এসেছে। রান্নার মশলা-বিক্রেতা অর্থে বককাল শব্দও একদা বাঙলাতে সুপ্রচলিত ছিল—আরবিতে শব্দটির অর্থ 'মুদী' বা 'মশলা বিক্রেতা'। ত্রিবর্ণের মূল ধাতুতে—যথা 'দ-খ-ল' 'দখল করা' 'ক-ত-ল' 'কোতল করা' দ্বিতীয় ব্যঞ্জন বর্ণকে দ্বিত্ব করে তাতে দীর্ঘ 'আ'-কার যোগ করলে যে কর্তাবাচক শব্দ উৎপন্ন হয় তার অর্থ 'ঐ কর্ম সে পুন পুন করে থাকে।' তাই 'খম্মার' অর্থ 'যে ঘন ঘন মদ খায়' (বাঙলার তাই সে সকাল বেলা খম্মারী বা খোঁয়ারী ভাঙে) অর্থাৎ 'পাইকারী মাতাল', 'মদ খাওয়া তার ব্যবসা'। 'কতল' করা যার ব্যবসা সে কোতয়াল ('কত্তাল'), 'জল্লাদ'ও ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। 'খয়য়াম' অর্থ 'যে পুন পুন তাম্বু নির্মাণ করে'—'তাম্বু-নির্মাণকারী।' বাঙলায় 'খইআম', 'খইয়াম' বা 'খৈয়াম' লিখলে মোটামুটি মূল উচ্চারণ আসে। অবশ্য 'খ'-র উচ্চারণ বাঙলা মহাপ্রাণ 'খ'-র মত নয়—আমরা বিরক্ত হলে যে রকম 'আখ'-এর 'খ' অক্ষরটি উচ্চারণ করে থাকি অর্থাৎ

খৃষ্ট কণ্ঠ্যব্যঞ্জন। স্কচের 'লখ' ও জর্মনের 'বাখ'-এর 'খ'-এর মত। আসামীতে 'অহমিয়া'র 'হ' অনেকটা সেই রকম।

কিন্তু কবি ওমর তাঁবুর ব্যবসা করতেন না। ওটা তাঁর বংশের পদবী মাত্র। আজকের দিনের কোনো সরকার যে-রকম রাইটারস্ বিল্ডিঙ্গে চিফ সেক্রেটারি (সরকার) নন কিম্বা কোনো ঘটকপদবীধারী যে-রকম সমাজে কুলাচার্যের কর্ম করেন না। ওমর কিন্তু তাঁর পরিবারের এই উপাধিটি নিয়ে তিক্ত ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি :

> জ্ঞান-বিজ্ঞান ন্যায় দর্শন সেলাই করিয়া মেলা
> খৈয়াম কত না তাম্বু গড়িল ; এখন হয়েছে বেলা
> নরককুণ্ডে জ্বলিবার তরে। বিধি-বিধানের কাঁচি
> কেটেছে তাম্বু—ঠোক্কর খায়, পথ-প্রান্তরে ঢেলা।

(লেখকের এমেচারি অক্ষম অনুবাদের রসিক পাঠক অপরাধ নেবেন না। অন্য কারো অনুবাদ না পেয়ে বাধ্য হয়ে মাঝে-মধ্যে এ-ধরনের 'অনুবাদ' ব্যবহার করতে হয়েছে।)

এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন রুবাঈ জাতীয় শ্লোকে প্রায়শ প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রে মিল থাকে—তৃতীয় ছত্রান্ত স্বাধীন। ইরানি আলঙ্কারিকরা বলেন, তৃতীয় ছত্রে মিল না দিলে চতুর্থ ছত্রের শেষ মিলে বেশি ঝোঁক পড়ে এবং শ্লোক সমাপ্তি তার পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্ণতা পায়। কথাটা ঠিক, কারণ আমরাও তেতাল বাজাবার তৃতীয়ে এসে খানিকটা কারচুপি করলে সম মনকে ধাক্কা দেয় আরো জোরো। পাঠককে এই বেলাই বলে রাখি, তৃতীয় ছত্রে মিলহীন এই জাতীয় শ্লোক পড়ার অভ্যাস করে রাখা ভালো। নইলে নজরুল ইসলামের ওমর-অনুবাদ পড়ে পাঠক পরিপূর্ণ রস গ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ কাজী আগাগোড়া ক ক খ ক মিলে ওমরের অনুবাদ করেছেন। কান্তি ঘোষ করেছেন বাঙলা রীতিতে, অর্থাৎ ক ক খ খ।

ভাগ্যক্রমে ওমরের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পাকাপাকি শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে তিনি গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং অবসর কাটাবার জন্য দৈবেসৈবে চতুষ্পদী লিখতেন—তাঁর নামে প্রচলিত গজল, মসনবী বা অন্য কোনো শ্রেণীর দীর্ঘতর কবিতা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এইটুকু সংবাদ ছাড়া বাদবাকি কিংবদন্তী। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যাঁর জন্মের তারিখ কেন, সন পর্যন্ত জানা নেই, যাঁর পরলোকগমনের সন পর্যন্ত পণ্ডিতদের গবেষণাধীনে তাঁর সম্বন্ধে যে প্রচুর কিংবদন্তী প্রচলিত থাকবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

তবে তিনি যে উত্তম গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত। স্মরণ রাখা ভালো যে, ছাপাখানার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত অল্প লোকই গুরুর সাহায্য বিনা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

কথিত আছে, বিখ্যাত ইদাম মুওয়াফফকের কাছে একই সময়ে তিনজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র শিক্ষালাভ করেন। এঁদের ভিতর খেলাচ্ছলে চুক্তি হয় যে, এঁদের কোনো একজন পরবর্তী প্রভাবশালী হতে পারলে তিনি অন্য দুজনকে সাহায্য করবেন। এঁদের একজন কালক্রমে প্রধান মন্ত্রী বা নিজাম-উল-মুল্ক-এর পদ প্রাপ্ত হন। খবর

পেয়ে দ্বিতীয় বন্ধু হাসন বিন সববাহ তাঁর কাছে এসে তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উচ্চ রাজকর্ম চান। বন্ধুর কৃপায় আশাতীত উচ্চপদ পেয়েও হাসন তাঁকে সরিয়ে নিজে প্রধান মন্ত্রী হবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। কিন্তু শেষটায় ধরা পড়ে বাদশার হুকুমেই রাজপ্রাসাদ থেকে বহিষ্কৃত হন। হাসন প্রতিশোধ নেবার জন্য এক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গোপন আততায়ী দিয়ে অনেক লোককে হত্যা করিয়ে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ক্রুসেডের একাধিক খ্রিস্টান নেতা এইসব গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন। এরা ভাঙ জাতীয় এক প্রকার হুশীশ সেবন করতো বলে এদের নাম হয়েছিল 'হুশীশীয়ান' এবং ইংরিজি 'এ্যাসাসিন'—গুপ্তঘাতক—এই শব্দ থেকেই অর্বাচীন লাতিন তথা ফরাসির মাধ্যমে এসেছে। অনেকে বলেন, পরবর্তীকালে নিজাম-উল-মুল্ক যে গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন, সেও হাসন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের সম্বন্ধে লেখকের 'অরিজিন অব দি খোজা' পুস্তক লেখকের বাল্যরচনা বলে দ্রষ্টব্যের মধ্যে ধর্তব্য নয়।

ওমরকে যখন নিজাম-উল-মুল্ক উচ্চপদ দিতে চাইলেন তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নির্জনে অনটনবিহীন জীবনযাপনের সুবিধাটুকু মাত্র চাইলেন। এতো জানা কথা। যে ব্যক্তি স্বর্গ-সুখ বলতে বোঝে,

> সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
> খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
> মৌন ভঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর—
> সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর॥
>
> (কান্তি ঘোষ)

কিম্বা—

> আমার সাথে আসবে যেথায়—দূর সে রেখে সহরগ্রাম
> এক ধারেতে মরু তাহার, আর একদিকে শষ্প শ্যাম।
> বাদশা-নফর নাইকো সেথা—রাজ্য-নীতির চিন্তা-ভার ;
> মামুদ শাহ?—দূরে থেকেই করব তাঁকে নমস্কার।
>
> (কান্তি ঘোষ)

তার রাজপদ নিয়ে কি হবে? নিজাম-উল-মুল্ক বিচক্ষণ লোক ছিলেন, বুঝতে পারলেন, ওমরের খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রত্যাখ্যান মৌখিক বিনয় নয় এবং তাঁর জন্য সচ্ছল জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন। কবিও কখনো তাঁর মত পরিবর্তন করেননি। বস্তুত তাঁর কাব্যের মুল সুর ঐটিই।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ডাক পড়লো রাজদরবারে—পঞ্জিকা সংশোধন করে দেবার জন্য। 'ইরানিদের নরোজ' বা নববর্ষ আসে বসন্ত ঋতুতে, কিন্তু বহু শত বৎসর লীপ-ইয়ার গোণা হয়নি বলে তখন আর নববর্ষ বসন্ত ঋতুতে আসছিল না। ওমর ঐ কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দিলেন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কবিরূপে যে ব্যক্তি বিশ্বজগতে বিখ্যাত তিনি আসলে ছিলেন বৈজ্ঞানিক। শুধু তাই নয়, ফিটজিরাল্ডের মাধ্যমে ইয়োরোপে প্রচারিত হবার পূর্বেই ওমরের বিজ্ঞান চর্চা ফ্রান্সে অনুদিত হয়ে সেখানে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমান লেখক এসব লেখা দেখবার সুযোগ পায়নি, তাই এনসাইক্লোপিডিয়ার 'কোনিক্ সেক্শন' অনুচ্ছেদ থেকে ইয়োরোপে ওমরের বৈজ্ঞানিক যশ সম্বন্ধে উদ্ধৃত দিচ্ছি :

> Greek mathematics culminated in Aopllonius, Little further advance was possible without new methods and higher points of view Much later. Arabs and other Muslims absorbed the classical science greedily : it was the Persian poet Omar Khayyam, one of the most prominent mediaeval mathematicians with his remarkable classifiication and systematic study of equations which he emphasized who blazed the way to the modern union of analysis and geometry. In his 'Algebra' he considered the cubic as soluble only by the intersection of conics and the biquadratic not at all.

শেষ ছত্রটির বাঙলায় অনুবাদ মূল ইংরিজি, এমন কি আধুনিক বাঙলা কবিতার চেয়েও শক্ত হয়ে যাবে বলে গোটা টুকরোটাই অতি অনিচ্ছায় ইংরিজিতেই রেখে দিতে বাধ্য হলুম। বৈজ্ঞানিক পাঠক বিনা অনুবাদেই এটি বুঝতে পারবেন, প্রাঞ্জল অনুবাদেও আমাদের মত অবৈজ্ঞানিকের কোনো লাভ হবে না।

ইরানের অধিকাংশ গুণীই একমত যে, ওমর তাঁর জীবনের প্রায় সব সময়টুকুই কাটিয়েছেন বিজ্ঞানচর্চায় এবং অতি অল্প সামান্য সময় 'নষ্ট' করেছেন কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায়। তাই দীর্ঘ কবিতা লেখার ফুরসৎ তাঁর হয়ে ওঠেনি—এমন কি রুবাঈগুলোও গীতিরস দিয়ে সরস করবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি।

গণিত এবং বিশেষ করে জ্যোতিষ চর্চার ফল ওমরের কাব্যে পদে পদে পাওয়া যায়। বস্তুত গ্রহ-নক্ষত্র যে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মে চলে তার থেকেই তিনি দৃঢ় মীমাংসায় উপনীত হন যে, মানুষেরও কোনো প্রকারের স্বাধীনতা নেই, তার কর্মপদ্ধতি স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অধিকারই সে পায়নি। তাই

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই।

(সত্যেন দত্ত)

পৃথ্বী হতে দিলাম পাড়ি, নভঃগেহে মনটা লীন—
সপ্ত-ঋষি যেথায় বসি ঘুমিয়ে কাটান রাত্রি দিন।
বিদ্যাটা মোর উঠলো ফেঁপে কাটালো কত ধাঁধায় ঘোর—
মৃত্যুটা আর ভাগ্য লিখন—ওইখানে গোল রইল মোর।

(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু এস্থলে আমি ওমর-কাব্যের মল্লিনাথ হবার দুরাশা নিয়ে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হইনি। ওমরের নামে প্রচলিত প্রায় ছ'শটি রুবাইয়াৎ ইরানি বটতলাতেও

পাওয়া যায়—পার্টিশনের পূর্বে কলকাতার ফার্সি বটতলা তালতলা অঞ্চলেও পাওয়া যেত। তার অতি অল্পই অনুবাদ করেছেন ফিটস্‌জেরাল্ড এবং সেই ছ' শ'-র কটি কবিতা ওমরের নিজস্ব, তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাক্‌-বিতণ্ডা এখনো শেষ হয়নি—আমার বিশ্বাস কখনো হবে না। সেই ছ'শ চতুষ্পদীর টীকা পড়ার উৎসাহ ও ধৈর্য রসিকজনের থাকার কথা নয়—পণ্ডিতের থাকতে পারে। আমি রসিকের সেবা করি।

তাই আমিও ওমরের সামান্যতম ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করার চেষ্টা করছি এবং তাও শুধু ওমরের বিদ্রোহী মনোভাব দেখাবার জন্য—কারণ ঐখানেই নজরুল ইসলামের সঙ্গে তিনি সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

ওমরের প্রধান বিদ্রোহ ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে :

খাজা ! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জি এই
থামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই।
দৃষ্টি-দোষে দেখছ বাঁকা আমার সোজা সরল পথ,
আমায় ছেড়ে ভালো করো, ঝাপসা তোমার চক্ষুকেই।
(কাজী সাহেবের অনুবাদ)

O master! grant us only this, we prithee
Preach not! But mutely guide to bliss we prithee!
'we walk not straight'--Nay it is thou who squintest!
Go heal thy sight and leave us in peace, we prithee!
(কার্নের অনুবাদ)

পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক রাজা-রাজড়ার শৌর্যবীর্য নিয়ে যে সব কবি ফিরদৌসীর ন্যায় আস্ফালন করে বর্তমানের আনন্দকে অবহেলা করতেন তাঁদের সম্বন্ধে বলছেন—

ভাগ্য-লিপি মিথ্যা সে নয়—ফুরোয় যা' তা ফুরিয়ে যাক,
কৈকোবাদ আর কৈখসরুর ইতিহাসের নামটা থাক।
রুস্তম আর হাতেম-তায়ের কল্পকথা—স্মৃতির ফাঁস
সে-সব খেয়াল ঘুচিয়ে দিয়ে আজকে এস আমার পাশ।
(কান্তি ঘোষ)

দরবেশ-সুফীরা করতেন কৃচ্ছ্রসাধন এবং যোগচর্চা। পূর্বেই নিবেদন করেছি, তাঁরা নৃত্যের সঙ্গে চিৎকার করে করতেন নাম-জপ, তাঁদের বিশ্বাস, ঐ করেই ভগবদপ্রেম এবং চরম মোক্ষ পাওয়া যায়।

দ্রাক্ষালতার শিকড় সেটি তার না জানি কতই গুণ—
জড়িয়ে আছেন অস্থিতে মোর দরবেশি সাঁই যাই বলুন—
গগনভেদী চিৎকারে তার খুলবে নাকো মুক্তি দ্বার,
অস্থিতে এই মিলবে যে খোঁজ সেই দুয়ারের কুঞ্জিকার।
(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু সবচেয়ে বেশি চতুষ্পদী তিনি রচনা করেছেন দার্শনিক এবং পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে। সেখানে তিনি জ্যোতির্বিদ ওমরকেও বাদ দেননি।

অস্তি–নাস্তি শেষ করেছি, দার্শনিকের গভীর জ্ঞান
বীজগণিতের সূত্র–রেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান ;
বিদ্যারসে যতই ডুবি, মনটা জানে মনে (মানে?) স্থির—
দ্রাক্ষারসের জ্ঞানটা ছাড়া রসজ্ঞানে নই গভীর।

অর্থহীন, অর্থহীন, সমস্তই অর্থহীন। তাই ওমরের বার বার কাতর রোদন, দরদী ফরিয়াদ—

হেথায় আমার আসাতে প্রভু হন নি তো লাভবান
চলে যাবো যবে হবেন না তিনি কোনো মতে গরীয়ান।
এ কর্ণে আমি শুনিনি তো কভু কোনো মানবের কাছে
এই আসা–যাওয়া কি এর অর্থ—খামাখা পোড়েন টান।
(লেখক)

তাই ওমরের শেষ মীমাংসা—একবার মরে যাবার পর তুমি আর এখানে ফিরে আসবে না। অতএব যতটুকু পারো, যতক্ষণ পারো দর্শন–বিজ্ঞান–সাঁই–সূফীদের ভুলে গিয়ে সাকি সুরা নিয়ে নির্জন কোণে আনন্দ করো।

মৃত্যু আসিয়া মস্তকে মোর আঘাত করার আগে
লে আও শরাব—লাও ঝটপট—রাঙানো গোলাপি রাগে।
হায়রে মূর্খ! সোনা দিয়ে মোজা তোর কি শরীর খানা—?
গোর হয়ে গেলে ফের খুঁড়ে নেবে—? ও ছাই কি কাজে লাগে।
(লেখক)

কিন্তু একটা জিনিস ভুল করলে চলবে না। ওমর খাঁটি চার্বাকপন্থী এবং ঐ জাতীয় লোকায়তীদের মত নন। 'ঋণ করে ঘি খাও, কারণ দেহ ভস্মীভূত হলে ঋণ তো আর শোধ করতে হবে না, অর্থাৎ ইহসংসারে কিম্বা পরলোকে অন্য কারো প্রতি তোমার কোনো নৈতিক দায়িত্ব—মরাল রেসপনসিবিলিটি নেই—এ তত্ত্বেও ওমর বিশ্বাস করতেন না। তাই তাঁর একমাত্র উপদেশ—

কারুর প্রাণে দুখ্ দিও না, করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনে শান্তি নাশি বাড়িও না আর মনস্তাপ।
অমর–আশিস লাভের আশা রয় যদি, হে বন্ধু মোর,
আপনি সয়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার চাপ।
(নজরুল ইসলাম)

গুণীরা বলেন 'কুরানই কুরানের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা।' তরুণদের আমি প্রায়ই বলি, রবীন্দ্রনাথের রচনাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা—ঐ কাব্যই বার বার অধ্যয়ন করো, অন্য টীকার প্রয়োজন নাই।' ওমরই ওমরের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লিনাথ এবং কাজীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী।

সৈয়দ মুজতবা আলী

গানের মালা

১৩৪১ সালের আশ্বিন মাসে 'গানের মালা' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স্ ; ২০৩/১/১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য দ্বারা আর্ট কাগজে সবুজাভ রেখাচিত্রের ভিত্তির উপর মুদ্রিত। ৪ + ৯৬ পৃষ্ঠা। দাম দেড় টাকা।

'আমি সুন্দর নহি জানি' ১৩৪১ আশ্বিনের, 'না-ই পরিলে নোটন-খোঁপায়' ১৩৪১ আষাঢ়ের, 'অয়ি চঞ্চল-লীলায়িত-দেহা' ১৩৪১ শ্রাবণের, 'ভুল করে যদি ভালোবেসে থাকি' ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠের, 'বল্ রে তোরা বল্ ওরে রে আকাশ-ভরা তারা' ১৩৪১ বৈশাখের এবং 'বল্ সখি বল্ ওরে সরে যেতে বল্' ১৩৪১ ভাদ্রের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হয়।

'আধো আধো বোল' ১৩৪১ শ্রাবণ-আশ্বিনের, 'যদি সন্ধ্যাবেলায় প্রিয় তুলসী-তলায়' ১৩৪১ বৈশাখ-আষাঢ়ের, 'স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী-বর্ণা এস মালবিকা', 'আমি অলস উদাস আনমনা' এবং 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়' ১৩৪০ পৌষ-চৈত্রের এবং 'তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন-পাতে' ১৩৪০ ভাদ্র-অগ্রহায়ণের 'বুলবুল' পত্রিকায় বাহির হয়।

'ঐ কাজল-কালো চোখ' ১৩৪১ বৈশাখ-আষাঢ়ের 'বুলবুল'-এ ছাপা হয় ; কিন্তু তাহাতে গানটির আস্থায়ী এরূপ—

চিকন কালো ভুরুর তলে কাজল-কালো চোখ।
আদি কবির আদি-রসের যেন দুটি শ্লোক॥

'আজ নিশীথে অভিসার তোমার পথে' ১৩৪১ ভাদ্রের, 'মুঠি মুঠি আবির ও কে কাননে ছড়ায়' ১৩৪১ ফাল্গুন-চৈত্রের এবং 'দাও শৌর্য দাও ধৈর্য হে উদার নাথ' ১৩৪১ অগ্রহায়ণের 'সবুজ বাঙলা'য় বাহির হয়।

'আমি ময়নামতীর শাড়ি দেবো' ১৩৪১ শ্রাবণের, 'এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লীজননী' ১৩৪১ বৈশাখের, 'বুনো ফুলের করুণ সুবাস ঝুরে' ১৩৪০ ফাল্গুনের, 'কলঙ্ক আর জ্যোৎস্নায় মেশা' ১৩৪০ মাঘের, 'রাত্রিশেষের যাত্রী আমি' ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠের এবং 'আঁধার রাতের তিমির দুলে আমার মনে' ১৩৪১ ভাদ্রের 'ছায়াবীথি'তে ছাপা হয়।

'দূর প্রবাসে প্রাণ কাঁদে আজ' ১৩৪০ আশ্বিনের, 'শঙ্কাশূন্য লক্ষ কণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ' ১৩৪০ ভাদ্রের ও 'চল্ রে চপল তরুণ-দল বাঁধন-হারা' 'রণমাদল' শিরোনামে ১৩৪০ আশ্বিনের 'মোয়াজ্জিন'-এ প্রকাশিত হয়।

'শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির-নির্মল' ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' শ্রীজগৎ ঘটক-কৃত স্বরলিপি-সহ বাহির হয়।

বুলবুল : দ্বিতীয় খণ্ড

'বুলবুল' দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিকা : মিসেস প্রমীলা নজরুল ইসলাম ; ১৬ নং রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১০২।

এই গীতিগ্রন্থখানির ৯-সংখ্যক গান : 'ভুল করে যদি ভালবেসে থাকি ক্ষমিও সে অপরাধ', ২১-সংখ্যক গান : 'বলরে তোরা বল ওরে ও আকাশভরা তারা' এবং ৪৯ সংখ্যক গান : 'আগের মতো আমের ডালে বোল ধরেছে বউ' হইতেছে কবির 'গানের মালা' গীতিগ্রন্থের যথাক্রমে ৫ সংখ্যক, ১১ সংখ্যক ও ৭৩ সংখ্যক গান ; সুতরাং এই তিনটি গান এখানে পরিবর্জিত হইল। তাহাদের স্থলে 'আনার কলি ! আনার কলি !', 'চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা' এবং 'এল ঐ পূর্ণিমা-চাঁদ ফুল-জাগানো' এই তিনটি নূতন গান সংযোজিত হইল।

'আনার কলি ! আনার কলি !' গানটি ১৩৫১ মাঘের এবং 'চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা' ১৩৫১ অগ্রহায়ণের 'গুলিস্তাঁ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'এল ঐ পূর্ণিমা চাঁদ ফুল জাগানো' ১৩৪০ সালের পৌষ-চৈত্র সংখ্যক চতুর্মাস্য 'বুলবুল' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

১৩ সংখ্যক গান : 'গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়, কে যেন আমারে ডাকে' ১৩৪৭ মাঘের, ১৮-সংখ্যক গান : 'নূরজাহান ! নূরজাহান !' এবং ৬৮ সংখ্যক গান : 'মোমতাজ ! মোমতাজ !' ১৩৪৮ বৈশাখের 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

৪০-সংখ্যক গান : 'বসন্ত মুখর আজি' ১৩৫১ কার্তিক-পৌষে নজরুল-সংখ্যা 'কবিতা' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। তাহার শিরোদেশে লেখা ছিল : 'বসন্ত মুখারী—তেতালা।'

৪৫ সংখ্যক গান : 'ধর্মের পথে শহীদ যাহারা' ১৩৪১ সালের ১৫ই পৌষ তারিখের ঈদ-সংখ্যা সাপ্তাহিক 'হানাফী' পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন
বিদ্যাপতি

পালানাটিকা, একটি গ্রামোফোন রেকর্ডের এবং অপরটি চলচ্চিত্রের জন্য কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেন। বিদ্যাপতি রেকর্ড নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে সাতটি রেকর্ডে এবং গ্রামোফোন কোম্পানির পত্রিকায় নাটকটি ছাপা হয়েছিল। ছায়াছবি বিদ্যাপতি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩৮ সালের ২রা এপ্রিল। বিদ্যাপতি চলচ্চিত্রের কাহিনী নজরুল ইসলাম, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা দেবকীকুমার বসু, গান রচনা নজরুল ইসলাম

ও শৈলেন রায়। সংগীত রাইচাঁদ বড়াল। 'নজরুল-রচনাবলী' জন্মশতবর্ষ সংস্করণে নজরুলের বিদ্যাপতির পাঠ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী প্রকাশিত 'কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র' চতুর্থ খণ্ড থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ, আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনাবলী' পঞ্চম খণ্ডে মুদ্রিত 'বিদ্যাপতি'র নাটকের পাঠে কিছু বিভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে।

বাসন্তিকা

'বাসন্তিকা' একটি একাঙ্ক নাটক। নাটকটি আবদুল আজিজ আল আমান সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত নজরুল' (১৯৮৯) থেকে ঢাকার বাংলা একাডেমীর 'নজরুল-রচনাবলী'তে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আকাদেমির 'কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র'তে গৃহীত হয়েছে। গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে : "বর্তমান নজরুল রচনা সমগ্রে বাসন্তিকার পাঠ 'অপ্রকাশিত নজরুল-অবলম্বনে সংকলিত হলেও পাঠগত অসঙ্গতি যথা সম্ভব সংশোধিত হয়েছে।"

'অ-প্রকাশিত নজরুল' গ্রন্থে নাটকটির পাঠ-সঙ্গতি যথাসম্ভব সংশোধিত বিদায় 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণে (২০০৭) এ পাঠটি গ্রহণ করা হয়েছে।

মক্তব সাহিত্য

নজরুল ইসলাম প্রণীত স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ 'মক্তব সাহিত্য' ৩১ জুলাই ১৯৩৫-এ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : খোন্দকার আবদুল জব্বার, ২৫এ পঞ্চাননটোলা লেন, কলিকাতা। মুদ্রাকর : এ. সি. সরকার, ক্লাসিক প্রেস, ২১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

'মক্তব সাহিত্যে'র প্রাপ্ত কপিটি কীটদষ্ট হওয়ায় সম্পূর্ণ পাঠ রচনাবলীতে প্রদান করা গেল না। পরিশিষ্টে অংশবিশেষ মুদ্রিত হলো।

'মক্তব সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথের 'আলস্যের ফল' ও 'হার-জিত' নামে যে-কবিতাদুটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, 'কণিকা' (১৮৯৯) কাব্যে তা যথাক্রমে 'অকর্মার বিভ্রাট' ও 'হার-জিত' শিরোনামে ভিন্নপাঠযুক্ত হয়ে সংকলিত হয়েছে।

'আমাদের খাদ্য' শীর্ষক রচনাটির লেখক ডা. চুনীলাল বসু, রায় বাহাদুর, সি. আই.ই. (১৮৬১-১৯৩০) বিখ্যাত চিকিৎসক ও রসায়নবিদ ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম রসায়নের অধ্যাপক পদ লাভ করেন (১৮৯৮)। তাঁর নানা গ্রন্থের মধ্যে 'খাদ্য' নামেও একটি বই আছে।

'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে' কবিতাটির সঙ্গে অজ্ঞাত কারণে রচয়িত্রী কুসুমকুমারী দাশের নাম মুদ্রিত হয়নি।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

'মক্তব সাহিত্য' কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত পাঠ্যপুস্তক। গ্রন্থটির কপি দুর্লভ। নজরুল ইন্সটিটিউট সংগৃহীত একটি কীটদষ্ট কপি থেকে এখানে 'মক্তব সাহিত্য' মুদ্রিত হয়েছে। কীটদষ্ট হওয়ার দরুন গ্রন্থের অন্তর্গত কোনো কোনো রচনার স্থানে স্থানে লেখা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সেসব স্থানে উস-চিহ্ন এবং ডট ডট দেওয়া হয়েছে।

—সম্পাদনা পরিষদ।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন
নজরুল-সঙ্গীতের স্বরলিপি-গ্রন্থ

নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত নজরুল সঙ্গীতের ৩টি স্বরলিপি গ্রন্থের সূচিপত্র।

গানগুলির বাণী বিভিন্ন সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এখানে পুনর্মুদ্রণ করা হলো না। তবে পরিশিষ্টে গানগুলির পাঠান্তর দেওয়া হয়েছে।

নজরুল-স্বরলিপি

স্বরলিপি : কাজী নজরুল ইসলাম। প্রকাশক : শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এন্ড সন্স, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৩৮ এবং ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৩৮। উৎসর্গ : উমাপদ ভট্টাচার্য।

সূচিপত্র :

কে বিদেশী, কেউ ভোলে না কেউ ভোলে, রুমুঝুমু রুমুঝুমু, এলে কি শ্যামল পিয়া, আজি এ শ্রাবণ-নিশি, ফাগুন-রাতের ফুলের নেশায়, গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু, জাগো হে রুদ্র, জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা, কেন উচাটন মন, চল্ চল্ চল্, টলমল্ টলমল্, এ আঁখিজল মোছ, তিমির-বিদারী, বাগিচায় বুলবুলি, আমারে চোখ ইশারায়, কেন কাঁদে পরাণ, ভোরের হাওয়া এলে, আঁধার রাতে কে গো, ভরিয়া পরাণ, কেন আন ফুল-ডোর, আধো ধরণী আলো, রংমহলের রংমশাল মোরা, কানন গিরি সিন্ধুপার, আস্‌ল যখন ফুলের ফাগুন, কার বাঁশরী বাজে, নহে নহে প্রিয়, কোন্ কূলে আজ, আমি কি সুখে লো গৃহে রব, আজি ঘুম নহে, আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল, লুকাবি মা কোথায় কালী, আমার সকলি হরেছ, মোর ঘুমঘোরে, আমার গহীন জলের নদী।

সুরলিপি

স্বরলিপি : জগৎ ঘটক। প্রকাশক : গুরুদাস চ্যাটার্জি এন্ড সন্স, কলকাতা ১৯৩৪। উৎসর্গ : গোপালচন্দ্র সেন।

সূচীপত্র

শুভ্র সমুজ্জল হে চির নির্মল, জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী, আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়, মেঘের হিন্দোলা দেয় পুব হাওয়াতে দোলা, কাজরি গাহিয়া এস গোপললনা, এলো শ্যামল কিশোর তমাল-ডালে, দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি, নিশি না পোহাতে যেয়ো না যেয়ো না, তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন পাতে, তোমায় কূলে তুলে বন্ধু আমি নামলাম জলে, জাগ জাগ রে মুসাফির হয়ে আসে নিশিভোর, কোন দূরে ও কে যায় চলে যায়, কেন করুণ সুরে হৃদয়-পুরে, উচাটন মন ঘরে রয় না, না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়, মরম কথা গেল সই মরমে মরে, পিউ পিউ পিউ বোলে পাপিয়া, বলোনা ব'লোনা ওলো সই, দুধে আলতায় রঙ্ যেন তার সোনার অঙ্গ ছেয়ে, ভারতলক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ ভারতে, পান্‌সে জোছনাতে কে চল গো পান্‌সি বেয়ে, আমার দেশের মাটি, গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরি যমুনা ওই, আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়ন-তারা, দোপাটি লো লো করবী, আধো আধো বোল, শুকনো পাতার নূপুর পায়ে, রঙিলা আপনি রাধা, বাসন্তী রঙ শাড়ি পরো, আজি নন্দদুলালের সাথে, একি অপরূপ রূপে মা।

সুরমুকুর

স্বরলিপি : ললিনীকান্ত সরকার। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা ১৯৩৪।

সূচিপত্র :

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, আমরা শক্তি আমরা বল, কোথা চাঁদ আমার, নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া, করুণ কেন অরুণ আঁখি, সখি বোলো বঁধুয়ারে, এ আঁখিজল মোছ পিয়া, কেমনে রাখি আঁখিবারি, দুরন্ত বায়ু পূরবইয়াঁ, ভুলি কেমনে, বসিয়া বিজনে কেন একা মনে, ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়, কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো, সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি, বউ কথা কও, বউ কথা কও, এ নহে বিলাস বন্ধু, মুসাফির ! মোছ্‌রে আঁখি জল, কোন সুদূরের চেনা বাঁশীর, মোরা ছিনু একেলা, পথিক ওগো চলতে পথে, এত জল ও কাজল চোখে, রে অবোধ ! শূন্য শুধু, তরুণ প্রেমিক ! প্রণয়-বেদন, বেসুর বীণার ব্যথার সুরে, আজি বাদল ঝরে, পরজনমে দেখা হবে প্রিয়, আমার 'সাম্পান' যাত্রী না লয়, ডুবু ডুবু ধর্ম-তরী

জীবনপঞ্জি

১৮৯৯ ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৪শে মে ১৮৯৯ সালে পশ্চিম-বঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ। পিতা কাজী ফকির আহমদ। মাতামহ তোফায়েল আলী। মাতা জাহেদা খাতুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন। ভগ্নী উম্মে কুলসুম। নজরুলের ডাক-নাম ছিল দুখু মিয়া।

১৯০৮ পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু।

১৯০৯ গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাশ, মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারের সেবক, লেটো দলের সদস্য ও পালাগান ইত্যাদি রচনা।

১৯১১ মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১২ স্কুল ত্যাগ, বাসুদেবের কবিদলের সঙ্গে সম্পর্ক, রেলওয়ে গার্ড সাহেবের খানসামা, আসানসোলে এম বখ্‌শের চা রুটির দোকানে চাকুরি, আসানসোলে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ময়মনসিংহের কাজী রফিজউল্লাহ ও তাঁর পত্নী শামসুন্নেসা খানমের স্নেহ লাভ।

১৯১৪ কাজী রফিজউল্লাহ্‌র সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের কাজীর-সিমলা, দরিরামপুর গমন এবং দরিরামপুর স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১৫-১৭ রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন, শৈলজানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রিটেস্ট পরীক্ষার আগে সেনাবাহিনীর ৪৯নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগদান।

১৯১৭-১৯ সৈনিক জীবন, প্রধানত করাচিতে গনজা বা আবিসিনিয়া লাইনে অতিবাহিত, ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নতি, সাহিত্য-চর্চা। কলকাতার মাসিক সওগাতে 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্প এবং ত্রৈমাসিক বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় 'মুক্তি' কবিতা প্রকাশ।

১৯২০ মার্চ মাসে সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটস্থ দফ্‌তরে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে অবস্থান, কলকাতায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন শুরু, 'মোসলেম

ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিবিধ রচনা প্রকাশ।

সাংবাদিক জীবন, মে মাসে এ. কে. ফজলুল হকের সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদক পদে যোগদান, নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ৮-এ টার্নার স্ট্রিটে অবস্থান, সেপ্টেম্বর মাসে 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত এবং নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বরিশাল ভ্রমণ, 'নবযুগ'-এর চাকুরি পরিত্যাগ, বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘর গমন।

১৯২১ দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তন, 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদক আফজাল-উল-হকের সঙ্গে ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটে অবস্থান, পুনরায় 'নবযুগে' যোগদান।

এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা যাত্রা, কান্দিরপাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও বিরজাসুন্দরী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ, আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর গমন ও দুই মাস দৌলতপুর অবস্থান, আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে বিবাহ। কুমিল্লা থেকে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সকলের বিবাহে যোগদান, বিবাহের রাত্রেই নজরুলের দৌলতপুর ত্যাগ ও পরদিন কুমিল্লা প্রত্যাবর্তন এবং অবস্থান। কলকাতায় বিবাহ-সংক্রান্ত গোলযোগের বার্তা প্রেরণ।

জুলাই মাসে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর হয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন, ৩/৪সি তালতলা লেনের বাড়িতে অবস্থান, অক্টোবর মাসে অধ্যাপক (ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নভেম্বর মাসে পুনরায় কুমিল্লা গমন, অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ডিসেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় তালতলা লেনের বাড়িতে বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা। 'বিদ্রোহী' সাপ্তাহিক 'বিজলী' ও মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হলে প্রবল আলোড়ন।

১৯২২ চার মাস কুমিল্লা অবস্থান, আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলার সঙ্গে সম্পর্ক। মার্চ মাসে প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশ। ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু, রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় যোগদান, সত্যেন দত্ত সম্পর্কে রচিত শোক-কবিতা পাঠ। দৈনিক 'সেবকে' যোগদান ও চাকরি পরিত্যাগ। ১২ই আগস্ট অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ, ধূমকেতুর জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশ, অক্টোবর

মাসে 'অগ্নি-বীণা' কাব্য ও 'যুগবাণী' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ, 'যুগবাণী' সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ, ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' বাজেয়াপ্ত; নভেম্বর মাসে নজরুলকে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আটক। 'ধূমকেতু' পত্রিকাতেই নজরুল প্রথম ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ১৩ই অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায়।

১৯২৩ জানুয়ারি মাসে বিচারকালে নজরুলের বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' আদালতে উপস্থাপন, এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, আলিপুর জেলে স্থানান্তর, নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' গীতিনাটক উৎসর্গ, হুগলি জেলে স্থানান্তর, মে মাসে নজরুলের অনশন ধর্মঘট, শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, 'Give up hunger strike, our literature claims you', বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ, জুলাই মাসে বহরমপুর জেলে স্থানান্তর, ডিসেম্বরে মুক্তিলাভ।

১৯২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান। মিসেস এম রহমানের উদ্যোগে এপ্রিলে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহ, হুগলিতে নজরুলের সংসার স্থাপন, অগাস্টে 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' প্রকাশ ও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, শনিবারের চিঠিতে নজরুল-বিরোধী প্রচারণা। হুগলিতে নজরুলের প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও অকালমৃত্যু।

১৯২৫ মে মাসে কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে যোগদান। এই অধিবেশনের গুরুত্ব, মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের যোগদান। জুলাই মাসে বাঁকুড়া সফর, 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক, ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন কর্তৃক ভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত, মজুর স্বরাজ পার্টি গঠন। ডিসেম্বরে শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র 'লাঙল' প্রকাশ, প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। 'লাঙল'-এর জন্যেও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী। 'লাঙল' বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণীসচেতন পত্রিকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ১৬ই জুন। কবিতাসংকলন 'চিত্তনামা' প্রকাশ।

১৯২৬ জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগরে বসবাস। মার্চ মাসে মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলনে যোগদান। এপ্রিল মাসে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংসপথের যাত্রীদল' এবং 'শিকল-পরা ছল' গান শোনান। মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত 'কাণ্ডারী

হুঁশিয়ার', কিষাণ সভায় 'কৃষাণের গান' ও 'শ্রমিকের গান' এবং ছাত্র ও যুব সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' পরিবেশন। জুলাই মাসে চট্টগ্রাম, অক্টোবর মাসে সিলেট এবং যশোর ও খুলনা সফর। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম। আর্থিক অনটন। 'দারিদ্র্য' কবিতা রচনা। নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চ পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয় বরণ। ডিসেম্বর থেকে গজল রচনার সূত্রপাত, 'বাগিচায় বুলবুলি', 'আসে বসন্ত ফুলবনে', 'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ', 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে' প্রভৃতি গান ও 'খালেদ' কবিতা রচনা। নজরুলের ক্রমাগত অসুস্থতা।

১৯২৭ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা সফর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও 'খোশ আমদেদ' গানটি পরিবেশন, 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণবাণী' (সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)–র জন্যে এপ্রিল মাসে 'ইন্টারন্যাশনাল', 'রেড ফ্লাগ' ও শেলির ভাব অবলম্বনে যথাক্রমে 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত–পতাকার গান' ও 'জাগর তূর্য' রচনা। জুলাই মাসে 'গণবাণী' অফিসে পুলিশের হানা। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত বাদ–প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক এবং 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্র–পত্রিকায় বিতর্ক। ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ এবং নজরুলের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধ, 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক। বিতর্কের অবসানে প্রমথ চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা' প্রবন্ধ।

'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ' প্রভৃতি রক্ষণশীল মুসলমান পত্রিকায় নজরুল–সমালোচনা। ইব্‌রাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল হুসেনের নজরুল–সমর্থন।

১৯২৮ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান, এই সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতের জন্যে 'নতুনের গান' রচনা। ঢাকায় অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, ফজিলতুন্নেসা, প্রতিভা সোম, উমা মৈত্র প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। মে মাসে নজরুলের মাতা জাহেদা খাতুনের এন্তেকাল।

	সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শরৎ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনা।
	অক্টোবর 'সঞ্চিতা' প্রকাশ। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় নজরুল বিরোধিতা। 'সওগাত' পত্রিকার নজরুল সমর্থন। ডিসেম্বর মাসে নজরুলের রংপুর ও রাজশাহি সফর।
	কলকাতায় নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলনে যোগদান। নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় নিখিল ভারত সোশিয়ালিস্ট যুবক কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান, কবি গোলাম মোস্তফার নজরুল–বিরোধিতা।
	ডিসেম্বরের শেষে কৃষ্ণনগর থেকে নজরুলের কলকাতা প্রত্যাবর্তন, 'সওগাতে' যোগদান। প্রথমে ১১নং ওয়েলেসলি স্ট্রিটে 'সওগাত' অফিস সংলগ্ন ভাড়া বাড়িতে ও পরে ৮/১ পান বাগান লেনে ভাড়া বাড়িতে বসবাস। নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ।
১৯২৯	১৫ই ডিসেম্বর এলবার্ট হলে নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান, উদ্যোক্তা 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হবীবুল্লাহ্ বাহার প্রমুখ। সংবর্ধনা সভায় সভায় সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র বসু।
১৯৩০	'প্রলয়–শিখা' প্রকাশ, কবির বিরুদ্ধে মামলা ও ছয় মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু গান্ধি–আরউইন চুক্তির ফলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে কারাবাস থেকে রেহাই। কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু।
১৯৩১	সিনেমা ও মঞ্চ–জগতের সঙ্গে যোগাযোগ।
	'আলেয়া' গীতিনাট্য রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ। নজরুলের অভিনয়ে অংশ–গ্রহণ।
১৯৩২	নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে' সভাপতিত্ব।
	ডিসেম্বরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের' পঞ্চম অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন।
১৯৩৩	গ্রীষ্মে 'বর্ষবাণী' সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'ধ্রুব' চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনা।
১৯৩৪	গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান 'কলগীতি' প্রতিষ্ঠা।
১৯৩৬	ফরিদপুর 'মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কনফারেন্সে' সভাপতিত্ব।

১৯৩৮ এপ্রিলে, কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে' কাব্য শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব।
ছায়াচিত্র 'বিদ্যাপতি'র কাহিনী রচনা।

১৯৩৯ ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে'র কাহিনী রচনা।

১৯৪০ কলকাতা বেতারে 'হারামণি', 'নবরাগ মালিকা' প্রভৃতি নিয়মিত সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচার। লুপ্ত রাগ-রাগিণীর উদ্ধার ও নবসৃষ্ট রাগিণীর প্রচার অনুষ্ঠান দুটির বৈশিষ্ট্য।

অক্টোবর মাসে, নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'নবযুগে'র প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত। ডিসেম্বরে কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ।

প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত।

১৯৪১ মার্চে, বনগাঁ সাহিত্য-সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

৫ই ও ৬ই এপ্রিল নজরুলের সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জুবিলি উৎসবে সভাপতিরূপে জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান, 'যদি আর বাঁশি না বাজে'।

১৯৪২ ১০ই জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ১৯শে জুলাই, কবি জুলফিকার হায়দারের চেষ্টায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সহায়তায় নজরুলের বায়ু পরিবর্তনের জন্য ডাঃ সরকারের সঙ্গে মধুপুর গমন। মধুপুরে অবস্থার অবনতি। ২১শে সেপ্টেম্বর মধুপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লুম্বিনি পার্কে' চিকিৎসার জন্য ভর্তি। অবস্থার উন্নতি না ঘটায় তিন মাস পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় নজরুল সাহায্য কমিটি গঠন।

সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ—	ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম সম্পাদক—	সজনীকান্ত দাস
	জুলফিকার হায়দার
কার্যনির্বাহী কমিটির সভ্য—	এ. এফ. রহমান
	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ
	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
	তুষারকান্তি ঘোষ
	চপলাকান্ত ভট্টাচার্য

সৈয়দ বদরুদ্দোজা
গোপাল হালদার।

এই সাহায্য কমিটি কর্তৃক পাঁচ মাস কবিকে মাসিক দুইশত টাকা করে সাহায্য প্রদান।

১৯৪৪ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার 'নজরুল-সংখ্যা' (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১) প্রকাশ।

১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান।

১৯৪৬ নজরুল পরিবারের অভিভাবিকা নজরুলের শাশুড়ি গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ। নজরুলের সৃষ্টিকর্ম মূল্যায়নে প্রথম গ্রন্থ কাজী আবদুল ওদুদ কৃত 'নজরুল-প্রতিভা' প্রকাশ। গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবি আবদুল কাদির প্রণীত নজরুল-জীবনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সংযোজিত।

১৯৫২ 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন। সম্পাদক কাজী আবদুল ওদুদ। জুলাই মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে রাঁচি মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ। চার মাস চিকিৎসা, সুফলের অভাবে কলকাতা আনয়ন।

১৯৫৩ মে মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নী প্রমীলাকে চিকিৎসার জন্য লণ্ডন প্রেরণ করা হয়। 'জল আজাদ' নামক জাহাজে লণ্ডন যাত্রার আগে কবি ও কবি-পত্নী বোম্বাইয়ের (বর্তমানে মুম্বাই) মেরিন ড্রাইভের 'সী গ্রীন হোটেল'-এ অবস্থান করেন। ঐ হোটেলের সভাকক্ষে নজরুলের সম্মানে এক বিরাট সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন উপমহাদেশের বহু খ্যাতনামা চলচ্চিত্র-শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। অশোককুমার, প্রদীপকুমার, কে. এস. ইউসুফ, কামাল আমরোহী, কে. এ. আব্বাস, মুকেশ, নৌশাদ আলী ছাড়াও, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যোশ মালিহাবাদী, কাইফি আজমী, খৈয়াম, সাহীর লুধিয়ানভী, মাজাজ লাখনভী, কাতিল সিপাহী, ফিরাক গোরকপুরী, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ। নজরুল-বন্দনায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কাইফী আজমী ও শাভীর লুধিয়ানভী। নজরুলের 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' গানটি পরিবেশন করেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে কবির চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ৫০ হাজার টাকা তুলে একটি থলিতে কবির হাতে প্রদান করা হয়। এই সংবর্ধনা-অনুষ্ঠান নজরুল-জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। [তথ্যসূত্র : 'নজরুল স্মৃতি', ডঃ অশোক বাগচী, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, জুন, ১৯৯৫]। লন্ডনে মানসিক চিকিৎসক উইলিয়ম স্যারগন্ট, ই. এ. বেটন, ম্যাকসিক ও রাসেল ব্রেনের

মধ্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে মতভেদ, ডিসেম্বর মাসে নজরুলকে ভিয়েনাতে প্রেরণ। ভিয়েনায় বিখ্যাত স্নায়ুচিকিৎসক ডা. হ্যান্স হফ্ কর্তৃক সেরিব্রাল এনজিওগ্রাম পরীক্ষার ফল, নজরুল 'পিকস ডিজিজ' নামে মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত এবং তা চিকিৎসার বাইরে। ডিসেম্বর মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৬০ ভারত সরকার কর্তৃক নজরুলকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান।

১৯৬২ ৩০শে জুন নজরুল-পত্নী প্রমীলা নজরুলের দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন। প্রমীলা নজরুলকে চুরুলিয়ায় দাফন। নজরুলের দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রমে ১৯২৯ ও ১৯৭৪ এবং ১৯৩১ ও ১৯৭৯ সালে।

১৯৬৬ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক 'নজরুল-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশ।

১৯৬৯ সম্বিতহারা কবির সত্তর বৎসর পূর্ণ এবং সর্বত্র কবি কাজী নজরুল ইসলামের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন। কলকাতার রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭১ ২৫শে মে নজরুল জন্মবার্ষিকীর দিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নব পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু।

১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নজরুল-জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নজরুলকে সপরিবার ঢাকায় আনয়ন, ধানমণ্ডিতে কবিভবনে অবস্থান এবং সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড্ডীন। স্বাধীন বাংলাদেশে কবির প্রথম জন্মবার্ষিকী কবিকে নিয়ে উদ্‌যাপন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক কবিভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

১৯৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭৫ ২২শে জুলাই কবিকে পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তর, ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট মোট এক বছর এক মাস আট দিন পিজি হাসপাতালের ১৯৭নং কেবিনে নিঃসঙ্গ জীবন।

১৯৭৬ ২১শে ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' প্রচলন ও নজরুলকে পদক প্রদান।

ঐ বছরেই আগস্ট মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি। ২৭শে আগস্ট শুক্রবার বিকেল থেকে কবির শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি ব্রঙ্কো-

নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ২৯শে আগস্ট রবিবার সকালে কবির দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ ডিগ্রি অতিক্রম করে যায়। কবিকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং সাকশান-এর সাহায্যে কবির ফুসফুস থেকে কফ ও কাশি বের করার চেষ্টা চলে। কিন্তু চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কবির অবস্থার উন্নতি হয় না—সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সাল মোতাবেক ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বেতার এবং টেলিভিশনে কবির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হলে পিজি হাসপাতালে শোকাহত মানুষের ঢল। কবির মরদেহ প্রথমে পিজি হাসপাতালের গাড়ি বারান্দার ওপরে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি-র সামনে রাখা হয়। অবিরাম জনস্রোত এবং কবির মরদেহে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

কবির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাদ আসর সোহ্‌রাওয়ার্দি উদ্যানে। স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শামিল হন। নামাজে জানাজা শেষে শোভাযাত্রা সহযোগে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা শোভিত কবির মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। কবির মরদেহ বহন করেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, বি.ডি.আর. প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন। পরবর্তী কালে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৮-২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে নজরুল-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন।

গ্রন্থপঞ্জি

ব্যথার দান	গল্প। ফাল্গুন ১৩২৮, ১লা মার্চ ১৯২২। উৎসর্গ—'মানসী আমার। মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করোনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম'।
অগ্নি-বীণা	কবিতা। কার্তিক ১৩২৯, ২৫শে অক্টোবর ১৯২২। উৎসর্গ—'ভাঙা-বাংলার রাঙা-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
যুগ-বাণী	প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩২৯, ২৬শে অক্টোবর ১৯২২। বাজেয়াপ্ত ২৩শে নভেম্বর ১৯২২, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬।
রাজবন্দীর জবানবন্দী	ভাষণ। ১৩২৯ সাল, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
দোলন-চাঁপা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩০, অক্টোবর ১৯২৩।
বিষের বাঁশী	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, ১০ই আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে।' বাজেয়াপ্ত ২২শে অক্টোবর ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৫।
ভাঙার গান	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে'। বাজেয়াপ্ত ১১ই নভেম্বর ১৯২৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯।
রিক্তের বেদন	গল্প। পৌষ ১৩৩১, ১২ই জানুয়ারি ১৯২৫।
চিত্তনামা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩২, আগস্ট ১৯২৫, উৎসর্গ—'মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে'।
ছায়ানট	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩২, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫। উৎসর্গ—'আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ করকমলে'।
সাম্যবাদী	কবিতা। পৌষ ১৩৩২, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৫।
পূবের হাওয়া	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৩২, ৩০শে জানুয়ারি ১৯২৬।

ঝিঙে ফুল	ছোটদের কবিতা। চৈত্র ১৩৩২, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৬।
দুর্দিনের যাত্রী	প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৩৩, অক্টোবর ১৯২৬।
সর্বহারা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৩, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৬। উৎসর্গ—'মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র শ্রীচরণারবিন্দে'।
রুদ্রমঙ্গল	প্রবন্ধ। ১৯২৭।
ফণি-মনসা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩৪, ২৯শে জুলাই ১৯২৭।
বাঁধনহারা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭। উৎসর্গ—'সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু'।
সিন্ধু-হিন্দোল	কবিতা। উৎসর্গ—বাহার ও নাহারকে, ১৩৩৪/১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ২রা অক্টোবর ১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৮। উৎসর্গ— 'বিশ্বকবিসম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
বুলবুল	গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৮। উৎসর্গ—'সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপকুমার রায় করকমলেষু'।
জিঞ্জীর	কবিতা ও গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৮।
চক্রবাক	কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ— 'বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু'।
সন্ধ্যা	কবিতা ও গান। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'মাদারিপুর 'শান্তি-সেনা'-র কর-শতদলে ও বীর সেনানায়কের শ্রীচরণাম্বুজে'।
চোখের চাতক	গান। পৌষ ১৩৩৬, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯। উৎসর্গ— 'কল্যাণীয়া বীণা-কণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু'।
মৃত্যু-ক্ষুধা	উপন্যাস। মাঘ ১৩৩৬, জানুয়ারি ১৯৩০।
রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ	অনুবাদ কবিতা। আষাঢ় ১৩৩৭, ১৪ই জুলাই ১৯৩০। উৎসর্গ—'বাবা বুলবুল ! ...'
নজরুল-গীতিকা	গান। ভাদ্র ১৩৩৭, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০। উৎসর্গ— 'আমার গানের বুলবুলিরা ! ....'
ঝিলিমিলি	নাটিকা। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩০।
প্রলয়-শিখা	কবিতা ও গান। ১৩৩৭, আগস্ট ১৯৩০। গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০। কবির বিরুদ্ধে ১১ই ডিসেম্বর মামলা এবং ছয় মাসের কারাদণ্ড, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০

	কবির জামিন লাভ, আপিল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মার্চে অনুষ্ঠিত গান্ধি–আরউইন চুক্তির ফলে সরকার পক্ষের অনুপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ ১৯৩১ কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে কবির মামলা থেকে অব্যাহতি কিন্তু 'প্রলয়-শিখা'র নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।
কুহেলিকা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।
নজরুল-স্বরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৩৮, ২৫শে আগস্ট ১৯৩১।
চন্দ্রবিন্দু	গান। ১৩৩৮, সেপ্টেম্বর ১৯৩১। উৎসর্গ—'পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু'। বাজেয়াপ্ত ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৫।
শিউলিমালা	গল্প। কার্তিক ১৩৩৮, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩১।
আলেয়া	গীতিনাট্য। ১৩৩৮, ১৯৩১। উৎসর্গ—'নটরাজের চির নৃত্যসাথী সকল নট-নটীর নামে 'আলেয়া' উৎসর্গ করিলাম'।
সুরসাকী	গান। আষাঢ় ১৩৩৯, ৭ই জুলাই ১৯৩২।
বন-গীতি	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩২। উৎসর্গ—'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ আমার গানের ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে'।
জুলফিকার	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর।
পুতুলের বিয়ে	ছোটদের নাটিকা ও কবিতা। সম্ভবত চৈত্র ১৩৪০, এপ্রিল ১৯৩৩।
গুল-বাগিচা	গান। আষাঢ় ১৩৪০, ২৭শে জুন ১৯৩৩। উৎসর্গ—'স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিন্নহৃদয়েষু—'
কাব্য-আমপারা	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩। উৎসর্গ—'বাংলার নায়েবে-নবী মৌলবি সাহেবানদের দস্ত মোবারকে'।
গীতি-শতদল	গান। বৈশাখ ১৩৪১, এপ্রিল ১৯৩৪।
সুরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৪১, ১৬ই আগস্ট ১৯৩৪।
সুরমুকুর	স্বরলিপি। আশ্বিন ১৩৪১, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪।
গানের মালা	গান। কার্তিক ১৩৪১, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৪। উৎসর্গ—'পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অনিলকুমার দাস কল্যাণীয়েষু—'।

মক্তব সাহিত্য	পাঠ্যপুস্তক। শ্রাবণ ১৩৪২, ৩১শে জুলাই ১৯৩৫।
নির্ঝর	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৪৫, ২৩শে জানুয়ারি ১৯৩৯।
নতুন চাঁদ	কবিতা। চৈত্র ১৩৫১, মার্চ ১৯৪৫।
মরু-ভাস্কর	কাব্য। ১৩৫৭, ১৯৫১।
বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড)	গান। ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯।
সঞ্চয়ন	কবিতা ও গান। ১৩৬২, ১৯৫৫।
শেষ সওগাত	কবিতা ও গান। বৈশাখ, ১৩৬৫, ১৯৫৯।
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, ডিসেম্বর ১৯৫৯।
মধুমালা	গীতিনাট্য। মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারি ১৯৬০।
ঝড়	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
ধূমকেতু	প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে	ছোটদের কবিতা ও নাটিকা। ১৩৭০, ১৯৬৪।
রাঙাজবা	শ্যামাসঙ্গীত। বৈশাখ ১৩৭৩, এপ্রিল ১৯৬৬।
নজরুল-রচনা-সম্ভার	আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, মে ১৯৬৫।
নজরুল-রচনাবলী	প্রথম খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৬। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	দ্বিতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। পৌষ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৭। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	তৃতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ফাল্গুন ১৩৭৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৭০। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	চতুর্থ খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, মে ১৯৭৭। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, প্রথমার্ধ। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১, মে ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ। পৌষ ১৩৯১, ডিসেম্বর ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
অপ্রকাশিত নজরুল	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, নভেম্বর ১৯৮৯। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
লেখার রেখায় রইল আড়াল	কবিতা ও গান। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। ভাদ্র ১৪০৫, আগস্ট ১৯৯৮। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
জাগো সুন্দর চির কিশোর	সংগ্রহ ও সম্পাদনা : আসাদুল হক। ২৮শে আগস্ট ১৯৯১। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

নজরুলের 'ধূমকেতু'	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। সংগ্রহ ও সম্পাদনা সেলিনা বাহার জামান, ফাল্গুন ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১।
নজরুলের 'লাঙল'	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, মে ২০০১।
কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র	প্রথম খণ্ড। কলকাতা বইমেলা ২০০১। দ্বিতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, জুন ২০০১। তৃতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, জুন ২০০২। চতুর্থ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, জুন ২০০৩। পঞ্চম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, জুন ২০০৪। ষষ্ঠ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জুন ২০০৫। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
নজরুলের হারানো গানের খাতা	সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০৪, জুন ১৯৯৭।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	প্রথম সংস্করণ : সম্পাদক, আবদুল আজিজ আল-আমান। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : সম্পাদক, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। জানুয়ারি ২০০৪। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

‘নজরুল-রচনাবলী’-তে অন্তর্ভুক্ত গানের বাণীর সঙ্গে নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর পাঠান্তর

নজরুল-সঙ্গীতের কোনো কোনো বাণীর সঙ্গে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত নজরুল-সঙ্গীতের বাণীর কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ‘নজরুল-রচনাবলী’তেও এই ধরনের পার্থক্য পাওয়া যায়। নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত এবং নজরুল অনুমোদিত নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর সঙ্গে না মিলানোর দরুন এবং নজরুলের গানের বইয়ে ও পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত বাণীর উপর নির্ভর করার ফলে কোথাও কোথাও এই পার্থক্য ও বাণীর পাঠান্তর রয়ে গেছে। ‘নজরুল-রচনাবলী’তে প্রকাশিত নজরুল-সঙ্গীতের বাণীর সঙ্গে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর যে পার্থক্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে রয়েছে তা নিচে ‘নজরুল-রচনাবলী’ থেকে এবং নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী থেকে যতদূর সম্ভব পাশাপাশি তুলে ধরে দেখানো হলো। এই তুলনামূলক বিষয়টি দেখানো হয়েছে নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত বিভিন্ন নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ এবং ‘আদি গ্রামোফোন রেকর্ডভিত্তিক নজরুল-সঙ্গীতের নির্বাচিত বাণী সংকলন’ শীর্ষক গ্রন্থের (১৯৯৭) ভিত্তিতে।

নজরুল-সঙ্গীত গ্রন্থ ‘গানের মালা’	‘নজরুল-রচনাবলী’	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর	
গানের প্রথম পংক্তি ১	গানের প্রথম পংক্তি ২	গানের প্রথম পংক্তি ৩	রাগ ও তাল ৪
১. আধো আধো বোল	‘আধো আধো বোল’ ‘গানের মালা’ গ্রন্থের অন্তর্গত (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	‘আধো আধো বোল’ (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.N 7301 শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত ‘গানের মালা’র অন্তর্গত একটি পংক্তি নিম্নরূপ : ‘যে কথাটি ধরে রাখে অধরের কোল বলো কানে কানে।’ উপরোক্ত কথাগুলো গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নরূপ : ‘যে কথাটি ধরে রাখে অধরের কোল লুকিয়ে বলো নিরালায় থামিলে কলরোল।’	‘গানের মালা’ গ্রন্থে ‘ভৈরবী পিলু—কার্ফা’ গ্রামোফোন রেকর্ডে ‘কাহারবা’

১	২	৩	৪
২. নিরুদ্দেশের পথে আমি হারিয়ে যদি যাই	'নিরুদ্দেশের পথে আমি হারিয়ে যদি যাই' 'গানের মালা' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ডে গীত নিম্নোক্ত স্তবক দুটি 'গানের মালা' গ্রন্থে নেই : ১. 'তুমি আকুল হয়ে ফিরবে কেঁদে যে বন–পথ বেয়ে ঝরা মুকুল হয়ে আমি সে–পথ দেবো ছেয়ে।' ২. 'তোমায় ভালোবেসে সাধ মেটেনি স্বামী মরেও মরতে পারবো না তাই আমি দূরে গিয়ে দেখবো তোমায় কাছে যদি পাই।	'নিরুদ্দেশের পথে আমি হারিয়ে যদি যাই' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V.N 17309 শিল্পী : পদ্মরাণী গাঙ্গুলী রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'সাঁঝ সকালে জল নিতে যাও যে বন–পথ বেয়ে ঝরা মুকুল হয়ে আমি সে–পথ দেবো ছেয়ে। বাতাস হয়ে লহর তুলে ঘোমটা মুখের দেবো খুলে, বলবে হেসে 'হায় কালা মুখ, তোমার মরণ নাই।'	রেকর্ডে 'দাদরা' 'গানের মালা' গ্রন্থে 'কানাড়া–একতাল।

১	২	৩	৪
৩. 'কার মঞ্জির রিনিঝিনি বাজে	'কার মঞ্জির রিনিঝিনি বাজে 'গানের মালা' গীতি গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) 'গানের মালা'য় একটি স্তবক নিম্নরূপ : 'বন–শিরীষের ঝিরিঝিরি পাতায় ধীরি ধীরি ঝিরি ঝিরি নূপুর বাজায় তমাল ছায়ায় বেড়ায় ঘুরে মায়া–হরিণী। চিনি চিনি॥	'কার মঞ্জির রিনিঝিনি বাজে (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V.N. 7321 শিল্পী : পারুল সোম রেকর্ডে একটি স্তবক নিম্নরূপ : বন–শিরীষের ঝিরি ঝিরি পাতায় ঝিরি ঝিরি ধীরি ধীরি নূপুর বাজায়, তমাল ছায়ায় বেড়ায় ঘুরে মায়া–হরিণী।'	রেকর্ডে 'কাহারবা' 'গানের মালা' গ্রন্থে 'সিন্ধুড়া–কাওয়ালি'
৪. 'নিশি পোহাতে যেয়োনা যেয়োনা'	'নিশি পোহাতে যেয়োনা যেয়োনা' 'গানের মালা' গীতি গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'নিশি পোহাতে যেয়োনা যেয়োনা' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V.N. 7405 শিল্পী : মিস মড কস্টেলো রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'আজো শুকায়নি মালার গোলাপ, আশা–ময়ূরী মেলেনি কলাপ, বাতাসে এখনও জড়ানো প্রলাপ বারেক ফিরিয়া চাও দীপ নিভিতে দাও।'	

১	২	৩	৪
৫. 'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে'	'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে' 'গানের মালা' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়)	'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V.N. 7291 শিল্পী : অনিমা বাদল আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ১. 'দোলে রে গলে দোলে তার খেজুর মতীর সোনার হার ছন্দ দোদুল। মিসরের আনন্দ সে চপল 'রমল' ছন্দ সে, জিয়ানো মিছরী রসে তার হাসি অতুল॥ নারঙ্গী–আঙ্গুর বাগে তার গান গাহে বুলবুল॥ ২. 'মরীচিকা মায়া সে, পালিয়ে সে যায় সুদুর। যায় নেচে সে নটিনী নীল দরিয়ার সতিনী দুলে দুলে দূরে সুদুর॥'	রেকর্ডে 'কাহারবা', 'গানের মালা' গ্রন্থে 'ঈজিপসিয়ান ড্যান্সের সুর।

১	২	৩	৪
৬. 'বকুল বনের পাখি'	'বকুল বনের পাখি' 'গানের মালা' গীতি গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'বকুল বনের পাখি' (গানের স্তবক সংখ্যা দুই) নিম্নোক্ত স্তবকটি গ্রামোফোন রেকর্ডে নেই : 'চাঁদের নয়নে চাহি জাগেনা আর সে নেশা, চাঁপার সুরভি-সুরায় বিরস-বিরহ মেশা। আজি মোর জাগার সাথী একাকিনী নিশীথ নিঝুম।' নিম্নোক্ত দুটি পংক্তি রেকর্ডে আছে : 'ষোড়শী বাসন্তিকার রঙ দেহে মোর হয়েছে ম্লান। খেলার সাথী পরদেশে, কারে দিই এই প্রীতির কুমকুম।'	'গানের মালা' গীতিগ্রন্থে 'খাম্বাজ মিশ্র'
৭. 'আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে'	'আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে' 'গানের মালা' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V.N 31312 শিল্পী : জগন্ময় মিত্র রেকর্ডে নিম্নোক্ত কথাগুলো নেই : 'কত ফুল ফোটে ঝরে উপবনে, তারি মাঝে আছি ফুটি তোমার অধরে গোলাপ পাঁপড়ি দুটি।'	বেহাগ মিশ্র—দাদরা।

১	২	৩	৪
৮. 'মদির স্বপনে মম মন–ভবনে'	'মদির স্বপনে মম মন–ভবনে' 'গানের মালা' গীতি–গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা দুই)	'মদির স্বপনে মম মন–ভবনে' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.N 7498 শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ রেকর্ডে আছে : 'তোমার উতল উত্তরীয় আমার চোখে ছুঁইয়ে দিও (প্রিয়) আমি হব (ও গো) তোমার মালার মণিকা ওগো ক্ষণিকা।' 'গানের মালা'য় আছে : 'তোমার উতল উত্তরীয় আমার চোখে ছুঁইয়ে দিও মম কণ্ঠ–হারে তুমি মণিকা ওগো ক্ষণিকা॥'	রেকর্ডে 'কাহারবা', 'গানের মালা' গ্রন্থে 'পিলু–মিশ্র–কার্ফা'

১	২	৩	৪
৯. 'তরুন অশান্ত কে বিরহী'	'তরুন অশান্ত কে বিরহী' 'গানের মালা' গীতি–গ্রন্থের অন্তর্গত (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'গানের মালা' গ্রন্থের অন্তর্গত নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো সম্ভবত রেকর্ডে গীত হয়নি : ১. 'নয়নের জলে হেরিতে না পারি বাহিরে গগনে ঝরে কত বারি। বদ্ধ কুটিরে অন্ধ তিমিরে চেয়ে আছি কাহার পথ চাহি। ২ 'বন্ধু গো, ওগো ঝড়, ভাঙো ভাঙো দ্বার তব সাথে আজিনিব অভিসার, ঝরা–পল্লব–প্রায় তুলিয়া লহ আমায় অশান্ত ও–বক্ষে হে বিদ্রোহী॥' [দ্রষ্টব্য 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র', নজরুল ইন্সটিটিউট, পৃ. ৪৩৩]	'গানের মালা ' গ্রন্থে 'চাঁদনী কেদারা–ত্রিতালী'
১০. 'বরষা এলো ঐ বরষা'	'বরষা এলো ঐ বরষা' 'গানের মালা' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'বরষা এলো ঐ বরষা' (গানের স্তবক সংখ্যা দুই) রেকর্ড নং H.M.V.P. 11789 শিল্পী : মিস আঙ্গুরবালা রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ১. 'বেনু–বনে মৃদু মিঠে আওয়াজে টাপুর টাপুর জল–নূপুর বাজে। শূন্য শয্যাতলে আনমনে শুনি সেই নূপুরের ধ্বনি অন্তর মাঝে।' ২ 'শ্যাম–সখারে মেঘ–মল্লারে ডাকি বারে বারে তন্দ্রালসা।'	

১	২	৩	৪
১১. 'শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্মল'	'শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্মল' 'গানের মালা' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্মল' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V.N 7290 শিল্পী : মিস আঙ্গুরবালা রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'মন যেন না টলে খল কোলাহলে হে রাজ-রাজ অন্তরে তুমি সতত বিরাজ।'	রেকর্ডে 'ত্রিতাল' 'গানের মালা' গ্রন্থে 'লচ্ছাশাখ-ত্রিতাল'
১২. 'ঘুমাও ঘুমাও। দেখিতে এসেছি'	'ঘুমাও ঘুমাও। দেখিতে এসেছি' 'গানের মালা' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'ঘুমাও ঘুমাও! দেখিতে এসেছি' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V. 37704 শিল্পী : বেচু দত্ত রেকর্ডে শেষ স্তবক নিম্নরূপ : 'মনে কর আমি লোলুপ বাতাস চোর-জ্যোছনা, ফুলের সুবাস ভয় নাই, আমি চলে যাই ডাকি নিশীথিনী নিঃঝুম।' উপরোক্ত স্তবকটি 'গানের মালা' গ্রন্থে নিম্নরূপ : 'মনে কর, আমি ফুলের সুবাস, চোর জ্যোৎস্না, লোলুপ বাতাস, ইহাদের সাথে চ'লে যাব প্রাতে আগোচর নিঝঝুম।'	রেকর্ডে 'দাদরা', 'গানের মালা'য় 'যোগিয়া মিশ্র-দাদরা

১	২	৩	৪
১৩. 'যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম'	'যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম' 'গানের মালা' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম।' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V.K.DB 70029 শিল্পী : প্রফেসর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী নিম্নোক্ত স্তবকটি রেকর্ডে সর্বশেষে এবং 'গানের মালা' গ্রন্থে মধ্যস্থলে : 'পুতুল খেলায় মায়ার ছলনায় ভুলাইয়া প্রভু রেখেছিলে আমায় ভুলেছি সে খেলা, আজি অবেলা তোমার দুয়ারে থামি।' রেকর্ডে 'পুতুল খেলায় মায়ার ছলনায়' এর বদলে 'মায়ার ছলনায় পুতুল খেলায়।'	রেকর্ডে 'যৎ (৮ মাত্রা) 'গানের মালা' গ্রন্থে 'সিন্ধু ভৈরবী-যৎ'

বি. দ্র. : এখানে স্বল্প-পরিসরে ও স্থান-সংকোচের কারণে গানের বাণী যথাযথভাবে মুদ্রণ সম্ভব হয়নি। শত সতর্কতা সত্ত্বেও হয়তো কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটে থাকতে পারে। এ জন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-লিপি' প্রসঙ্গে

কাজী নজরুল ইসলামের সুস্থাবস্থায় নজরুল-সঙ্গীতের স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-লিপি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসে তথা ১৩৪১ সালের শ্রাবণে। 'সুর-লিপি'র অন্তর্গত সবগুলো গানের সুরকার স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম এবং স্বরলিপিকার জগৎ ঘটক। নজরুল-সঙ্গীতের অন্যতম প্রধানভাণ্ডারী ও কবির প্রীতিভাজন সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ জগৎ ঘটককৃত স্বরলিপি গ্রন্থ 'সুর-লিপি'র প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ'-র একস্থানে নজরুল লিখেছেন যে, 'সুর-লিপি'তে প্রকাশিত প্রায় সব গানগুলিই গ্রামোফোন রেকর্ড হয়ে গেছে, গীত-শিল্পীদের মুখে মুখে গীত হয়েও গানগুলি লোক-প্রিয় হয়ে আছে। কাজেই 'সুর-লিপি অন্তর্গত তাদের আনন্দ দান করবে যাঁরা স্বরলিপি দেখে গানের নির্ভুল সুর শিখতে চান।'

নজরুলের নিজের সুরারোপিত এবং জগৎ ঘটক কৃত স্বরলিপির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণেই, 'সুর-লিপি' গ্রন্থের অন্তর্গত কিছু সংখ্যক গানের বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর এবং রাগ ও তাল-এর ভিন্নধর্মী রূপ এখানে তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য, স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-লিপি'তে প্রকাশিত অনেক গানের বাণীর সঙ্গেই অনেক ক্ষেত্রে নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত বাণীর মিল নেই।

বর্ণিত পার্থক্য ও পাঠান্তর তুলে ধরা হয়েছে নজরুল ইন্সটিটিউট কর্তৃক ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে (কার্তিক ১৪১২) পুনর্মুদ্রিত জগৎ ঘটক প্রণীত নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-লিপি'র এবং নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'আদি রেকর্ডভিত্তিক নজরুল-সঙ্গীতের নির্বাচিত বাণী সংকলন' (১৯৯৭) গ্রন্থের সহায়তায়। 'নজরুল-রচনাবলী'র অন্তর্গত নজরুলের সংশ্লিষ্ট গীতি-গ্রন্থের (যে-সব গ্রন্থের গান 'সুর-লিপি'তে স্থান পেয়েছে) গানের বাণীর সঙ্গেও মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

শত সতর্কতা সত্ত্বেও হয়তো কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ রয়ে গেছে। এ জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

নজরুল-সঙ্গীতের স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-লিপি'	'নজরুল-রচনাবলী'	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে বাণীর পার্থক্য
গানের প্রথম পংক্তি ১	গানের বইয়ের নাম ও প্রথম পংক্তি ২	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রথম পংক্তি ৩
১. শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্মল স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক	'গানের মালা' গীতিগ্রন্থ 'শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্মল' 'নজরুল-রচনাবলী'তে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আছে : ১. 'মন যেন বা টলে খল কোলাহল হে রাজ-রাজ অন্তরে তুমি নাথ সতত বিরাজ, হে রাজ-রাজ।'	'শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্মল' 'সুর-লিপি' গ্রন্থের অন্তর্গত নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নেই : ১. 'মন যেন না টলে খল কোলাহলে হে রাজ-রাজ! অন্তরে তুমি নাথ সতত বিরাজ, হে রাজ-রাজ।' রেকর্ড নং H.M.V.N 7290 শিল্পী : মিস আঙ্গুরবালা

১	২	৩
২. কাজরী গাহিয়া এসো গোপ–ললনা স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক	'গানের মালা' গীতি–গ্রন্থ 'কাজরী গাহিয়া এসো গোপ–ললনা' 'নজরুল–রচনাবলী'তে গানের কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : ১. 'কাজরী গাহিয়া চলো গোপ ললনা' ২. পরো সবুজ গাগরি চেলি নীল ওড়না ৩. মাখো অধরে মধুর হাসি, চোখে ছলনা।' 'সুরলিপি' গ্রন্থে উপরোক্ত পংক্তিগুলো নিম্নরূপ : ১. কাজরী গাহিয়া এসো গোপ–ললনা' ২. 'পর সবুজ ঘাগরী চৌলি নীল ওড়না	
৩. এলো শ্যামল কিশোর তমাল–ডালে বাঁধো ঝুলনা স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক	'নজরুল–রচনাবলী'তে 'গানের মালা' গীতি–গ্রন্থের অন্তর্গত গানটিতে শিরোনামে লেখা রাগ ও তাল 'লাউনী–কাজরী'। 'সুর–লিপি' শীর্ষক স্বরলিপি গ্রন্থে লেখা 'কাজরী–কার্ফা'	নজরুল–সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে লেখা : 'কাহারবা'। রেকর্ড নং H.M.V.N. 7250 শিল্পী : সুধীর দত্ত

১	২	৩
৪. নিশি না পোহাতে যেও না যেও না স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক	নিশি না পোহাতে যেও না যেও না 'নজরুল-রচনাবলী'তে গানটি 'কবিতা ও গান'-এর অন্তর্গত। স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-লিপি'র অন্তর্গত গানটির বাণীর সঙ্গে মিল থাকলেও, আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর সঙ্গে পার্থক্য আছে।	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : ১. 'আজও শুকায়নি মালার গোলাপ আশা ময়ুর মেলেনি কলাপ বাতাসে এখনও জড়ানো প্রলাপ বারেক ফিরিয়া চাও॥' নিম্নোক্ত পংক্তিগুলোতে পার্থক্য আছে। 'নজরুল-রচনাবলী'তে ও স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-লিপি'তে পংক্তিগুলো : ক) 'বাঁশরী বাজিতে দাও সুদূর নহবতে উদাস যোগিয়ায়। হে প্রিয় প্রভাতে তব রাঙা পায় বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়, নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে উপরোক্ত বাণী নিম্নরূপ : ক) 'সুদূর নহবতে বাঁশরী বাজিতে দাও উদাস যোগিয়ায় হে প্রিয় প্রভাতে তব ও-রাঙা পায় বকুল ঝরিয়া মরিতে চায়, রেকর্ড নং H.M.V.N. 7405 শিল্পী : মিস মড কস্টেলো

১	২	৩
৫. তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন পাতে স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক	'তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন পাতে' 'গানের মালা' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত।	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'তুমি ভৈরবী সুর উদাস বিধুর অতীত দিনের স্মৃতি সুদূর বৈশাখী হাওয়াতে।' রেকর্ড নং H.M.V.N. 7195 শিল্পী : কুমারী পারুল সেন উপরোক্ত পংক্তিগুলো 'গানের মালা' গীতি-গ্রন্থে এবং 'সুর-লিপি'তে নিম্নরূপ : 'তুমি ভৈরবী সুর উদাস বিধুর, অতীত দিনের স্মৃতি সুদূর তুমি ফোটার আগে ঝরা মুকুল বৈশাখী হাওয়াতে।'
৬. জাগ জাগ রে মুসাফির হয়ে আসে নিশি ভোর স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক	জাগ জাগ রে মুসাফির হয়ে আসে নিশি ভোর 'গীতি-শতদল' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত। 'নজরুল-রচনাবলী'তে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আছে : 'পেয়েছিলি আশ্রয় শুধু পাসনি হেথায় স্নেহ-নীড় হেথায় শুধু বাজে বাঁশী উদাস সুরে ভৈরবীর। তবু কেন যাবার বেলা ঝরে যে তোর নয়ন লোর।'	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে এবং স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-লিপি'তে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'পেয়েছিলি আশ্রয় শুধু পাসনি হেথায় স্নেহ-নীড় হেথায় শুধু বাজে বাঁশী উদাস সুরে ভৈরবীর। তবু কেন যাবার বেলা ঝরে যে তোর নয়ন লোর'

১	২	৩
৭. আধো আধো বোল লাজে বাধো বাধো বোল স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক	আধো আধো বোল লাজে বাধো বাধো বোল 'গানের মালা' গীতি–গ্রন্থের অন্তর্গত	নজরুল–সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত কথাগুলো 'সুর-লিপি' গ্রন্থে সামান্য ভিন্নরূপ। রেকর্ডে পংক্তি নিম্নরূপ : ক) 'যে–কথা লুকায়ে থাকে লাজে নত চোখে না বলিতে যে কথাটি জানাজানি লোকে যে কথাটি ধরে রাখে অধরের কোল লুকিয়ে বলো নিরালায় থামিলে কলরোল বলো কানে কানে কানে। রেকর্ড নং H.M.V.N 7301 শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত নজরুল–সঙ্গীতের স্বরলিপি–গ্রন্থ 'সুর–লিপি'তে নিম্নরূপ : 'কথা লুকানো থাকে লাজ নত মুখে চোখে না–বলিতে যে কথাটি জানাজানি লোকে যে কথাটি ধরে রাখে অধরের কোল ব'লো কানে কানে॥'

১	২	৩
৮. শুকনো পাতার নূপুর পায়ে স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক	শুকনো পাতার নূপুর পায়ে 'গীতি-শতদল' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত।	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রমোফোন রেকর্ডে দুটি পংক্তি নিম্নরূপ : ১. 'জল-তরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে সে যায়॥' ২. 'আসে ধেয়ে সহসা গৈরিক-বরণী বালুকার ওড়না গায়।' রেকর্ড নং N. I. 133 শিল্পী : অসিতা বসু (লিলি) উপরোক্ত পংক্তিগুলো 'গীতি-শতদল' গ্রন্থে এবং 'সুর-লিপি'তে নিম্নরূপ : ১. 'জল-তরঙ্গে ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে সে যায়।' ২. 'ছুটে আসে সহসা গৈরিক বরণী বালুকার উড়নী গায়।'
৯. রঙিলা আপনি রাধা স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক	রঙিলা আপনি রাধা	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন কেরর্ডে গানের প্রথম স্তবক নিম্নরূপ : ১. 'রঙিলা আপনি রাধা তারে হোরির রঙ দিও না। ফাগুনের রাণী রে শ্যাম তারে আর ফাগে রাঙায়ো না।' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-লিপি'তে উপরোক্ত পংক্তিগুলো নিম্নরূপ : ১. 'রঙিলা আপনি রাধা তারে হোরির রঙ দিওনা ফাগুনের রাণী যে রাই তারে রঙে রাঙিও না।'

'নজরুল স্বরলিপি' প্রসঙ্গে

নজরুলের কৃত নজরুল–সঙ্গীতের প্রথম স্বরলিপি–গ্রন্থ 'নজরুল স্বরলিপি' প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে। প্রকাশক : শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এন্ড সন্স, ২১ নন্দনকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা। গ্রন্থে গীতিকার ও স্বরলিপিকার কাজী নজরুল ইসলামের নাম মুদ্রিত হয় নজরুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম নয়। কবি নিজেই সেকালে অনেকক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম লিখতেন। অত্যন্ত অযত্নে ও মুদ্রণ–বিভ্রাটসহ প্রকাশিত 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থটি দেখলে বিভ্রান্ত ও বেদনাহত হতে হয়। কেননা, নজরুলের এই স্বরলিপি–গ্রন্থে রয়েছে তাঁর বহু বিখ্যাত গানসহ ৩৫টি গানের কবিকৃত স্বরলিপি। এমন একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে—গানের 'সূচিপত্র' নজরুলের 'কৈফিয়ৎ' এবং কবি–বন্ধু গীতশিল্পী শ্রী উমাপদ ভট্টাচার্য এম. এ–কে উৎসর্গ করে লেখা নজরুলের কবিতা স্থান পেয়েছে গ্রন্থের শেষে। ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত 'নজরুল স্বরলিপি' একটি অতি দুর্লভ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ একালের কতজন নজরুলানুরাগী জ্ঞানী–গুণী, সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীত–প্রশিক্ষক দেখার ও ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন, আমাদের জানা নেই। প্রখ্যাত নজরুল–সঙ্গীতশিল্পী, প্রশিক্ষক, সুরকার, স্বরলিপিকার ও সঙ্গীতজ্ঞ শ্রদ্ধেয় সুধীন দাসের সৌজন্যে আমরা ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থটি দেখার সুযোগ পেয়েছি।

'নজরুল স্বরলিপি'র অন্তর্গত অধিকাংশ গানের বাণী, পংক্তি ও স্তবক বিন্যাস এবং স্বরলিপির ধরণ ও পদ্ধতি কতটা বদলে গেছে, কবি নিজেই যে অনেক কিছু বদলেছেন, নিজের মনের তাগিদে, গ্রামোফোন রেকর্ডে শিল্পীকণ্ঠে গান রেকর্ড করানোর প্রয়োজনে, 'নজরুল স্বরলিপি'র অন্তর্গত বহু গানের সুর এবং স্বরলিপি পর্যালোচনা করলেই তা অনুধাবন করা যাবে।

'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে স্বরলিপির কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তার উল্লেখ না থাকলেও, গ্রন্থের অন্তর্গত স্বরলিপিতে পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশনা রয়েছে। সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ ও স্বরলিপিকারদের অনেকের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে যে উক্ত স্বরলিপি গ্রন্থে 'আকারমাত্রিক' স্বরলিপি–পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে।

গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণেই এখানে 'নজরুল' স্বরলিপি' সম্পর্কে কিছু তথ্য–উপাত্ত উপস্থাপিত হলো।

'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থের ভূমিকা
কৈফিয়ৎ

এইবার সত্যসত্যই স্বরলিপি প্রকাশিত হইল। প্রকাশক মহাশয়ের শক্তিকে সর্বাগ্রে নমস্কার করি, আমার পর্বত প্রমাণ অটল আলস্য তাঁহারি কৃপায় টলিল।

একা আমার আলস্য-ভঙ্গই যথেষ্ট হইত না, যদি আমার পরম সুহৃদ কিন্নর-কণ্ঠ গীত-রসিক শ্রী গোপাল চন্দ্র সেন, শ্রী উমাপদ ভট্টাচার্য এবং অনুজোপম স্নেহভাজন শ্রীমান জগৎ ঘটক ও শ্রীমান অনিল বাগচি তাঁহাদের অপরিসীম শক্তি ও প্রীতির এতটুকু কার্পণ্য করিতেন।

এই স্বরলিপির প্রতিটি অক্ষর তাঁহাদের চিনে, প্রতি অক্ষরে তাঁহাদের ভালবাসা-মাখা স্পর্শ জড়িত। ফুল যেমন নীরবে তাহার অন্তরের সুরভি দিয়া আলো বায়ু ও শিশিরকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে, তেমনি নীরবে আমি আমার প্রীতি-আবেদন তাঁহাদের পানে তুলিয়া ধরিলাম।

দুই এক জায়গায় সামান্য ভুল-ত্রুটী হয়ত রহিয়া গেল, সে অপরাধের অপরাধী আমি একা।

ইহাতে স্বদেশী, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, গজল, কীর্তন, বাউল, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী প্রভৃতি বিভিন্ন ঢং-এর গানের স্বরলিপি দেওয়া হইল। সকলে স্ব স্ব মনঃপূত সকল গান যে ইহাতে পাইবেন, এমন কথা বলি না। তাহা সম্ভবও নয়। ইহার অধিকাংশ গানই 'নজরুল-গীতিকা'র। যে সকল নূতন গানের স্বরলিপি দেওয়া হইল সে গানের ভাষা স্বরলিপির শীর্ষদেশে দেওয়া হইল।... দ্বিতীয় খণ্ডে অন্যান্য গানের স্বরলিপি দেওয়ার ইচ্ছা রহিল। ইতি

বিনীত
নজরুল ইসলাম

উৎসর্গ

গীত-শিল্পী বন্ধু
শ্রী উমাপদ ভট্টাচার্য এম. এ.
করকমলেষু

ধরার উর্ধ্বে সুর-লোকে তব সনে
পরিচয় মোর, বন্ধু, সঙ্গোপনে।
কোন সে বিগত জন্মে তোমার সাথে
গাহিতাম গান এক সে সুর-সভাতে।
উড়িয়া এলাম সেই গীত-লোক হ'তে
সুরের পাখায় নব জন্মের পথে।
তব অকুণ্ঠ কণ্ঠের সুর তানে
সেই সে অতীত পরিচয় মনে আনে।
বন্ধু আমার, থাকিতে পার কি দূরে,
আমাদের হৃদি গাঁথা যে একই সুরে।
কেহ ত জানেনা, মম গান মম বাণী
বন্ধু, তোমার কাছে ঋণী কতখানি।
কত সে হীরক রতন মাণিক দানে
সাজায়েছ নিরাভরণ আমার গানে।
অশ্রুমতী সে আমার গানের ভাষা
তোমার প্রসাদে পেল কত ভালোবাসা।
তুমি ভগীরত, আমার সুরধুনীরে
শঙ্খ বাজায়ে এনেছ সিন্ধু তীরে।
আজ সে এসেছে দিতে দীন উপহার
সাশ্রু-নয়নে—একটি নমস্কার।

কলিকাতা
১লা শ্রাবণ, ১৩৩৮

নজরুল ইসলাম

'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে গানের বাণী ও পাঠান্তর প্রসঙ্গে

নজরুলের কৃত 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থের অন্তর্গত বিভিন্ন গানের সঙ্গে আদিগ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত এবং 'নজরুল-রচনাবলী'তে সংকলিত কয়েকটি গীতিগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গানের বাণীর, পংক্তি ও স্তবকবিন্যাসের পার্থক্য এবং স্বরলিপির স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কিত কিছু তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপিত হলো। ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থের অতি পুরাতন কপির ভিত্তিতেই তথ্য-উপাত্ত পেশ করা হয়েছে। 'নজরুল স্বরলিপি'র অন্তর্গত অনেক গানের বাণীর, পংক্তির ও স্তবক-বিন্যাসের পার্থক্য এত বেশি যে, এখানে স্বল্প-পরিসরে তা পাশাপাশি উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। গ্রন্থের অন্তর্গত ৩৫টি গান সম্পর্কেই আলোকপাত করা যায়নি।

নজরুল-সঙ্গীতের স্বরলিপি গ্রন্থ 'নজরুল-স্বরলিপি'	'নজরুল-রচনাবলী'	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর	
গানের প্রথম পংক্তি ১	গানের প্রথম পংক্তি ২	গানের প্রথম পংক্তি ৩	রাগ ও তাল ৪
১. কে বিদেশী বন-উদাসী স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'কে বিদেশী বন-উদাসী' 'বুলবুল' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে গানের বাণীর ধারাবাহিকতা 'বুলবুল'-এর এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত বাণীর ধারাবাহিকতা থেকে ভিন্ন। সুরের বৈচিত্র্য সৃষ্টি এবং কারুকার্যের প্রয়োজনে যে এই ভিন্নতা-সেটা গানটির স্বরলিপিতে নজরুলের কিছু বক্তব্য এবং দিক-নির্দেশনা থেকেই অনুধাবনযোগ্য।	'কে বিদেশী বন-উদাসী' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.N 3262 শিল্পী : হরিমতী আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'সহসা জাগি আধেক রাতে শুনি সে বাঁশী বাজে হিয়াতে, বাহু-শিথানে কে কে জানে কাঁদে গো পিয়া বাঁশীর সনে।'	'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে 'খাম্বাজ-গারা মিশ্র', গ্রামোফোন রেকর্ডে 'কাহারবা', 'নজরুল-রচনাবলী'তে 'ভৈরবী-আশা-বরী-কাহারবা'

১	২	৩	৪
২. কেউ ভোলে না কেউ ভোলে স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' 'চোখের চাতক' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.p 11730 শিল্পী : মিস ইন্দুবালা	'নজরুল স্বরলিপি'তে 'মান্দ-কার্ফা, আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'কাহারবা' 'নজরুল-রচনাবলী'তে মান্দ-কাহারবা'
৩. ঝুমুঝুম ঝুমুঝুম স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'ঝুমুঝুম ঝুমুঝুম' 'বুলবুল' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে 'বুলবুল' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত গানটির সবগুলো পংক্তি এবং স্তবকই রয়েছে। কিন্তু পংক্তিগুলোর অনেক কয়টিই স্থান পেয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্তবকে।	'ঝুমুঝুম ঝুমুঝুম' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.p1161 শিল্পী : ইন্দুবালা আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই। 'দুলিছে মেঘলা-হার শ্যামলী মেঘমালায় উড়িছে অলক কার অলকার ঝরোকায়।' 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থের অন্তর্গত অনেক পংক্তি ও স্তবক গ্রামোফোন রেকর্ডে নেই, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতাও রয়েছে।	'নজরুল স্বরলিপি'তে 'পিলু খাম্বাজ-দাদরা', আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'দাদরা' 'নজরুল-রচনাবলী'তে 'পিলু-দাদরা'

১	২	৩	৪
৪. এলে কি শ্যামল পিয়া কাজল মেঘে স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'এলে কি শ্যামল পিয়া কাজল মেঘে 'চোখের চাতক' গীতি–গ্রন্থের অন্তর্গত (গানের স্তবক সংখ্যা চার) 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে অধিকাংশ স্তবকে বাণীর মিল থাকলেও, কোনো কোনো স্তবকে বাণীর পার্থক্যও আছে এবং পংক্তির স্থানান্তর রয়েছে।	'এলে কি শ্যামল পিয়া কাজল মেঘে' রেকর্ড নং F.T. 487 শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	'নজরুল স্বরলিপি'তে 'কাজরী–কার্ফা', 'নজরুল–রচনাবলী'তে ও 'কাজরী–কার্ফা'
৫. ফাগুন রাতের ফুলের নেশায় স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'চোখের চাতক' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার) 'নজরুল স্বরলিপি'তে এবং 'চোখের চাতক' গীতিগ্রন্থে বাণী ও স্তবক বিন্যাসে কোনো পার্থক্য নেই।	'ফাগুন রাতের ফুলের নেশায়' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.N. 11741 শিল্পী : মিস ইন্দুবালা আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে এবং 'নজরুল–স্বরলিপি' গ্রন্থে বাণীর ও স্তবক বিন্যাসের পার্থক্য নেই।	রেকর্ডে 'তাল–ফেরতা', 'নজরুল–রচনাবলী'তে 'পিলু–কাহারবা', 'নজরুল স্বরলিপি'তে 'পিলু–কার্ফা'
৬. গরজে গভীর গগনে স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'গরজে গভীর গগনে' 'বুলবুল' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে গানের বাণীর ও স্তবক–বিন্যাসের বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে, যদিও গানের মূল বিষয় ও চিত্ররূপ বিধৃত।		'নজরুল স্বরলিপি'তে 'মালকোষ–তেওড়া', 'বুলবুল' গীতিগ্রন্থে 'মালকোষ–গীতাঙ্গী'

১	২	৩	৪
৭. জাগো হে রুদ্র স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'জাগো হে রুদ্র' 'প্রলয়-শিখা' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার) 'নজরুল স্বরলিপি'তে বাণীর ও স্তবক-বিন্যাসের পার্থক্য আছে। আগের বাণী ও স্তবক পরে সংস্থাপিত হয়েছে। তবে গানের মূল বিষয় ও বক্তব্য অভিন্ন।		'নজরুল স্বরলিপি'তে 'যোগিয়া মিশ্র-একতালা', 'প্রলয়-শিখা' গীতি-গ্রন্থে 'যোগিয়া টোড়ি—একতালা'
৮. 'জাগো নারী জাগো' স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'জাগো নারী জাগো' (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) 'নজরুল-গীতিকা' গ্রন্থের অন্তর্গত। 'নজরুল স্বরলিপি'তে বাণী ও স্তবকের কিছু পার্থক্য আছে। একটি সম্পূর্ণ নতুন স্তবকও রয়েছে।	'জাগো নারী জাগো' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.N 31049 শিল্পী : জগন্ময় মিত্র (সুর সাগর) 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থের সঙ্গে গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর ও স্তবক বিন্যাসের কিছু কিছু পার্থক্য এবং অবস্থানের ভিন্নতা রয়েছে।	রেকর্ডে 'ত্রিতাল' 'নজরুল-গীতিকা'য় 'সারং-কাওয়ালি', 'নজরুল-স্বরলিপি' গ্রন্থে রাগ ও তালের নাম নেই

১	২	৩	৪
৯. কেন উচাটন মন স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'কেন উচাটন মন' 'বুলবুল' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'ডাকিয়া ফুলবনে থাকে সে আনমনে, কাঁদায়ে নিরজনে কাঁদে সে কিসের তরে॥	'কেন উচাটন মন'	'নজরুল স্বরলিপি'তে 'বেহাগ খাম্বাজ–দাদরা', 'বুলবুল' গীতিগ্রন্থেও উপরোক্ত–রূপ।
১০. চল্ চল্ চল্ স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'চল্ চল্ চল্' 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়)	'চল্ চল্ চল্' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং MEGAPHONE Ng 78 শিল্পী : জ্ঞান দত্ত ও অন্যান্য	গ্রামোফোন রেকর্ডে 'ত্রিমাত্রিক ছন্দ' 'নজরুল স্বরলিপি'তে মার্চের সুর। 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থে রাগ ও তাল–এর নাম নেই।
১১. টলমল টলমল পদভরে স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'টলমল টলমল পদভরে' 'প্রলয়–শিখা' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	'টলমল টলমল পদভরে' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.N 7155 শিল্পী : ধীরেন্দ্রনাথ দাস	গ্রামোফোন রেকর্ডে 'তাল–ফেরতা' 'প্রলয়–শিখা' গ্রন্থে 'সমর–সঙ্গীত'। 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে 'মার্চের সুর'।
১২. এ আঁখি জল মোছ প্রিয়া স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'এ আঁখিজল মোছ প্রিয়া' 'বুলবুল' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়) 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে গানের বাণীর ও স্তবক–বিন্যাসের কিছু কিছু পার্থক্য আছে।	'এ আঁখিজল মোছ প্রিয়া, (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.P-11724 শিল্পী : ইন্দুবালা আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী ও স্তবক বিন্যাসের সঙ্গে 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থের পার্থক্য আছে।	গ্রামোফোন রেকর্ডে 'কাহারবা' 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে 'ভৈরবী কাওয়ালি' 'বুলবুল' গীতি–গ্রন্থে 'ভৈরবী–কাওয়ালি'

১	২	৩	৪
১৩. তিমির বিদারী অলখ বিহারী স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'তিমির বিদারী অলখ বিহারী' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'তিমিরবিদারী অলখবিহারী' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	তাল : দাদরা 'নজরুল-স্বরলিপি' গ্রন্থে 'ভৈরবী-কাওয়ালি'
১৪. বাগিচায় বুলবুলি স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'বাগিচায় বুলবুলি' 'বুলবুল' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) 'নজরুল স্বরলিপি'তে পুরো গানটি ধারাবাহিকভাবে নেই। স্বরলিপির রীতি-ভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যের কারণেই হয়তো এমনটি করা হয়েছে। স্বরলিপির পরিসরও স্বল্প। (স্বরলিপির শীর্ষদেশে গানের বাণী মুদ্রিত নেই। প্রথম পংক্তি আংশিক উদ্ধৃত)	'বাগিচায় বুলবুলি' (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) রেকর্ড নং H.M.V.P 11518 শিল্পী : কে. মল্লিক 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে গানের বাণী ও স্তবক-বিন্যাসের ভিন্নতা রয়েছে। বিভিন্ন পংক্তি সংস্থাপিত হয়েছে আগে-পরে। স্বরলিপির পদ্ধতির কারণে হয়তো এমনটি হতে পারে।	'নজরুল স্বরলিপি'তে 'গজল ভৈরবী-কার্ফা', গ্রামোফোন রেকর্ডে 'কাহারবা' 'বুলবুল' গীতিগ্রন্থে 'ভৈরবী-কাহারবা'
১৫. আমারে চোখ ইশারায় স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'আমারে চোখ ইশারায়' 'বুলবুল' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়) 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থের স্বরলিপির শীর্ষদেশে গানের পুরো বাণী উদ্ধৃত নেই। প্রথম পংক্তির অংশ মাত্র উদ্ধৃত হয়েছে। স্বরলিপিতে গানের বাণী ও স্তবক আগে-পরে বিন্যস্ত হয়েছে। হয়তো স্বরলিপির পদ্ধতিগত কারণেই।	'আমারে চোখ ইশারায়' (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়) রেকর্ড নং P-1157 শিল্পী : কে. মল্লিক 'নজরুল স্বরলিপি'র অন্তর্গত গানের বাণী ও গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর সঙ্গে পংক্তি ও স্তবক-বিন্যাসে পার্থক্য রয়েছে।	রেকর্ডে 'কাহারবা', 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে 'গজল ভৈরবী-কার্ফা'

১	২	৩	৪
১৬. কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায় স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায়' 'বুলবুল' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থের সঙ্গে গানের বাণী অভিন্ন।	কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায়' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.N. 11735 শিল্পী : কে. মল্লিক আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত এবং 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে গানের বাণী অভিন্ন।	'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে 'মিশ্র বেহাগ তিলক কামোদ খাম্বাজ-দাদরা'। রেকর্ডে 'খাম্বাজ-দাদরা'
১৭. ভোরের হাওয়া এলে স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'ভোরের হাওয়া এলে' 'নজরুল-গীতিকা' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা দুই) 'নজরুল স্বরলিপি'। 'নজরুল-গীতিকা'র অন্তর্গত বাণী অভিন্ন। তবে 'ধীরে ধীরে ঝিরিঝিরি, শব্দ দুটি আগে-পরে অবস্থিত। স্বরলিপির শীর্ষদেশে গানের বাণী মুদ্রিত নেই।		'নজরুল স্বরলিপি'তে 'রামকেলি ঠুংরী', নজরুল-গীতিকা' গ্রন্থে 'রামকেলি ঠুংরী'
১৮. 'আঁধার রাতে কে গো একেলা' স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'আঁধার রাতে কে গো একেলা' 'চোখের চাতক' ও 'নজরুল-গীতিকা' গ্রন্থের অন্তর্গত।	'আঁধার রাতে কে গো একেলা'	'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থের শীর্ষদেশে পুরো বাণী মুদ্রিত নেই
১৯. ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান' 'মহুয়ার গান' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান'	'নজরুল স্বরলিপি'তে 'বেহাগ-বসন্ত-একতাল', 'মহুয়ার গান' গ্রন্থেও অনুরূপ।

১	২	৩	৪
২০. কেন আন ফুলডোর স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'কেন আন ফুলডোর' 'বুলবুল' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত' (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে গানের পুরো বাণী স্বরলিপির শীর্ষদেশে মুদ্রিত নেই। 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থের গানের বাণীর' সঙ্গে 'বুলবুল' গীতিগ্রন্থের গানের বাণীর অনেক পার্থক্য। পংক্তির ও স্তবকের বিন্যাসে রয়েছে ভিন্নতা।	'কেন আন ফুলডোর' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.p. 11682 শিল্পী : মিস ইন্দুবালা রেকর্ডের গানের বাণীর সঙ্গে 'নজরুল–স্বরলিপি'র গানের পংক্তি ও স্তবক বিন্যাসে রয়েছে পার্থক্য। স্বরলিপির পদ্ধতিগত কারণে হয়তো এটা করা হয়েছে।	'নজরুল স্বরলিপি'তে 'ভীলপলশ্রী–আদ্ধা কাওয়ালি' 'বুলবুল' গীতি–গ্রন্থে 'ভীমপলশ্রী–কাহারবা'। রেকর্ডে 'ভীম পলশ্রী মিশ্র–আদ্ধা কাওয়ালী'
২১. কানন গিরি সিন্ধু পার স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'কানন গিরি সিন্ধু পার' 'নজরুল–গীতিকা'র অন্তর্গত (গানের স্তবক সংখ্যা এক। আট পংক্তি সমবায়ে), 'নজরুল স্বরলিপি'তে পংক্তি ও স্তবক সংখ্যা বেশি এবং কিছু পংক্তিতে বাণীর পার্থক্যও আছে।	'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থের শীর্ষদেশে গানের পুরো বাণী মুদ্রিত নেই। শুধু প্রথম পংক্তির 'কাননগিরি সিন্ধু পার' মুদ্রিত আছে।	'নজরুল স্বরলিপি'তে 'ভীমপলশ্রী–দাদরা'। 'নজরুল–গীতিকা'য় 'ভীমপলশ্রী–দাদরা'

১	২	৩	৪
২২. 'কার বাঁশী বাজে মুলতানী সুরে' স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'কার বাঁশী বাজে মুলতানী' সুরে 'চোখের চাতক' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত (গানের স্তবক সংখ্যা চার)। 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে 'চোখের চাতক' গ্রন্থের এবং গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর সঙ্গে অনেক অমিল রয়েছে। হয়তো স্বরলিপির পদ্ধতিগত ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্যের দরুণ এমনটি ঘটেছে।	'কার বাঁশরী বাজে মুলতানী সুরে' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী এবং 'চোখের চাতক' গ্রন্থের অন্তর্গত বাণী এক ও অভিন্ন। 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে স্বরলিপির শীর্ষদেশে গানের বাণী মুদ্রিত নেই প্রথম পংক্তিটি ছাড়া।'	মুলতান-একতাল
২৩. নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি জল স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি জল' 'বুলবুল' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার) 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে প্রথম তিনটি স্তবকের স্বরলিপি ও গানের কথা রয়েছে। তবে দুয়েকটি পংক্তির স্থানান্তর ঘটেছে, হয়তো স্বরলিপির পদ্ধতিগত স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতার কারণে। 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে স্বরলিপির শীর্ষদেশে গানের বাণী মুদ্রিত নেই, প্রথম পংক্তি ছাড়া।	'নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি জল' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.P.11670 শিল্পী : মিস আঙ্গুরবালা উল্লেখ্য, 'বুলবুল' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত নিম্নোক্ত স্তবকটি রেকর্ডে নেই : 'মরুতে চরণ ফেলে কেন বন-মৃগ এলে সলিল চাহিতে পেলে মরীচিকা ছল।'	'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে (বেলাওল ঠাটের) দুর্গা-কাওয়ালি, রেকর্ডে : 'দুর্গা কাহারবা'

১	২	৩	৪
২৪. কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী স্বরলিপিকার : নজরুল ইসলাম	'চোখের চাতক' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার) 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থের এবং 'চোখের চাতক'-এর অন্তর্গত গানের বাণী এক ও অভিন্ন। 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে পংক্তির ও স্তবকের ধারাবাহিকতা আছে। তবে স্বরলিপির শীর্ষদেশে গানের বাণী মুদ্রিত নেই, প্রথম পংক্তিটি ছাড়া।	'কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V.N 4187 শিল্পী : ধীরেন্দ্র নাথ দাস রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই 'আমার দুঃখেরে কাণ্ডারী করি আমি ভাসিয়েছিলাম ভাঙা-তরী তুমি ডাক দিলে কে স্বপন-পরী'	উল্লেখিত নেই

বি. দ্র. : ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত নজরুল-কৃত নজরুল সঙ্গীতের স্বরলিপি-গ্রন্থ 'নজরুল-স্বরলিপি'র অন্তর্গত অনেক স্বরলিপিতে নজরুল লিখিতভাবেই স্বরলিপি থেকে গান গাইবার রীতি-পদ্ধতির নির্দেশনা দিয়েছেন। গ্রন্থের ভূমিকা 'কৈফিয়ৎ'-এ অনেক বিষয়ে আলোকপাত করা হলেও, কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে এ-গ্রন্থে যে সব গানের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছে, সে-সব গান গ্রামোফোন রেকর্ডে বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে গীত হয়েছে। এ-ধরনের কোনো কথা না থাকায় এটাই ধরে নেয়া স্বাভাবিক যে, 'নজরুল স্বরলিপি'র অন্তর্ভুক্ত গানগুলো পরবর্তীকালে বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণ করা হয়েছে। এ সব গানের অধিকাংশই সেকালের খ্যাতনামা শিল্পীদের কণ্ঠে গীত নজরুলের বিখ্যাত গান। 'নজরুল স্বরলিপি'র অন্তর্গত (৩৫টি গান) এবং কবির বিভিন্ন গীতি-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এসব গানের স্বরলিপি পরবর্তীকালের, এমন কি একালের কোনো কোনো স্বরলিপিকারও করেছেন। এসব স্বরলিপি করা হয়েছে প্রধানতঃ আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের ভিত্তিতে। নজরুলের কৃত স্বরলিপি ('নজরুল স্বরলিপি'র অন্তর্গত) এবং আদি গ্রামোফোন রেকর্ডভিত্তিক স্বরলিপির তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, গ্রামোফোন রেকর্ডে শিল্পী কণ্ঠে ধারণ করার আগে নজরুল বহু গানের বাণী পরিবর্তন করেছেন। রাগ ও তালে এবং হয়তোবা সুরে ও গায়কীতে পরিবর্তন এনেছেন। নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' শীর্ষক গ্রন্থে 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থের অন্তর্গত সবগুলো গানের বাণীই মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু কোনো গানেই গ্রামোফোন রেকর্ডের নম্বর দেওয়া হয়নি। রেকর্ডে কোন শিল্পীর কণ্ঠে গানটি গীত হয়েছে তারও উল্লেখ নেই।

এখানে স্থান-সঙ্কোচনের কারণে বাণীর স্তবক-বিন্যাস সঠিকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। হয়তো কিছু মুদ্রণ-বিভ্রাটও রয়ে গেছে। এ-জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

নজরুল-সঙ্গীতের স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-মুকুর' প্রসঙ্গে

নজরুল-সঙ্গীতের স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর মুকুর'	'নজরুল-রচনাবলী'	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে বাণীর পার্থক্য	
গানের প্রথম পংক্তি ১	গানের প্রথম পংক্তি ২	গানের প্রথম পংক্তি ৩	রাগ ও তাল ৪
১. দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার হে স্বরলিপিকার : নলিনীকান্ত সরকার	'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারবার হে' [সর্বহারা' গ্রন্থের অন্তর্গত]	'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার হে' নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই। 'কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর। ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর। উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার, রেকর্ড নং H. M. V. N. 27666 শিল্পী : সত্য চৌধুরী	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে 'একতাল', স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-মুকুর'এ 'বৃহন্নট কেদারা-একতালা'

১	২	৩	৪
২. আমরা শক্তি আমরা বল, আমরা ছাত্রদল	'আমরা শক্তি আমরা বল, আমরা ছাত্র দল' ['সর্বহারা' গ্রন্থের অন্তর্গত] 'নজরুল-রচনাবলী'তে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'আমরা ধরি মৃত্যু রাজার যজ্ঞ-ঘোড়ার রাশ মোদের মৃত্যু লেখে মোদের জীবন-ইতিহাস। হাসির দেশে আমরা আনি সর্বনাশী চোখের জল আমরা ছাত্রদল	রেকর্ড নং জি. ই. ৭৮৩৪ শিল্পী : গৌরীকেদার ভট্টাচার্য ও পার্টি	স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুরমুকুর'এ 'কীর্তন-বাউল-লোদা', আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে সুর-চয়ন : 'কীর্তন বাউল'
৩. নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরাণ-পিয়া স্বরলিপিকার : নলিনীকান্ত সরকার	'নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরাণ-পিয়া' ['বুলবুল' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত]	'নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরাণ-পিয়া' রেকর্ড নং TWIN FT3335 শিল্পী : মিস আঙ্গুরবালা গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'কত আর সাজাব ডালা, বাসি হয় নিতি যে মালা কত দূর যাব ভাসিয়া পরাণ-পিয়া,	গ্রামোফোন রেকর্ডে 'কাহারবা' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-মুকুর'এ 'ভৈরবী-কাহারবা'

১	২	৩	৪
৪. করুণ কেন অরুণ আঁখি স্বরলিপিকার : নলিনীকান্ত সরকার	'করুণ কেন অরুণ আঁখি' ['বুলবুল' গীতি গ্রন্থের অন্তর্গত]	'করুণ কেন অরুণ আঁখি' রেকর্ড নং H.M.N.P. 11687 শিল্পী : কে. মল্লিক রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : ক) 'দুর্দিনের এই দারুন দিনে শরণ নিলাম পাস–শালায়' হায় সাহারার প্রখর তাপে পরাণ কাঁপে দিল্ কাবাব।' খ) 'এই শারাবের নেশার রঙে নয়ন জলের রঙ লুকাই দেখছি আঁধার জীবন ভরি ভর পিয়ালার লাল খোয়াব।' গ) 'আমার বুকে শূন্যে কে গো ব্যথার তারে ছড় চালায় গাইছি খুশীর মহফিলে গান কোন গুণীর বীণ রবাব।	গ্রামোফোন রেকর্ডে 'কাহারবা', স্বরলিপি গ্রন্থ 'সুর–মুকুর'এ 'পিলু–কাওয়ালী'

১	২	৩	৪
৫. এ আঁখিজল মোছ পিয়া ভোল ভোল আমারে স্বরলিপিকার : নলিনীকান্ত সরকার	'এ আঁখিজল মোছ পিয়া ভোল ভোল আমারে। ['বুলবুল' গীতি গ্রন্থের অন্তর্গত]	'এ আঁখিজল মোছ পিয়া ভোল ভোল আমারে' রেকর্ড নং H.M.V.P 11724 শিল্পী : ইন্দুবালা নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-মুকুর'এ এবং নজরুল-রচনাবলী'তে আছে, কিন্তু গ্রামোফোন রেকর্ডে নেই। পংক্তিগুলো : ক) 'ঝুরিয়া গেল যে মেঘ রাতে তব আঙিনায়, বৃথা তারে খোঁজ প্রাতে দূর গগন-পায়ে॥' খ) 'আগুনে মেটালি তৃষ্ণা কবি কোন্ অভিমানে, উদিল নীরদ যবে দূর বন-কিনারে।'	রেকর্ডে 'কাহারবা', গীতি-গ্রন্থ 'বুলবুল'এ এবং স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-মুকুর'-এ 'ভৈরবী-কাওয়ালী'

১	২	৩	৪
৬. কেমনে রাখি আঁখিবারি চাপিয়া স্বরলিপিকার : নলিনীকান্ত সরকার	'কেমনে রাখি আঁখিবারি চাপিয়া' 'বুলবুল' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত	'কেমনে রাখি আঁখিবারি চাপিয়া' রেকর্ড নং H.M.V.P 11670 শিল্পী : মিস আঙ্গুরবালা নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো রেকর্ডে নেই ; 'গাঁথিতে ফুলমালা বিঁধে যে কাঁটা হয়ে কাঁটার হার গাঁথি— সে আসে ফুল লয়ে কবিরে জলধি এ, তাহারে মন দিয়ে গেলি রে জল নিয়ে জীবন ব্যাপিয়া ॥'	রেকর্ডে–দুর্গম্মা–আদ্ধা' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-মুকুর' 'দুর্গা খোম্বাজ ঠাটের‍্য –আদ্ধা কাওয়ালী' 'বুলবুল' গীতি-গ্রন্থে 'রাতেরদুর্গা–আদ্ধা কাওয়ালি'
৭. ভুলি কেমনে আজো যে মনে স্বরলিপিকার : নলিনীকান্ত সরকার	'ভুলি কেমনে আজো যে মনে' 'বুলবুল' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত	'ভুলি কেমনে আজো যে মনে' রেকর্ড নং H.M.V.P 9974 শিল্পী : মিস্ আঙ্গুরবালা রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'তরুরা রিক্ত-পাতা আসলো তাই ফুল–বারতা ফুলেরা গলে ঝরেছে বলে ভরেছে ফলে বিটপী শাখা' 'নজরুল–রচনাবলী'তে উপরোক্ত পংক্তিগুলো আছে।	রেকর্ডে : 'তাল ফেরতা' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-মুকুর'–এ 'পিলু কাহারবা–দাদরা'

১	২	৩	৪
৮. বসিয়া বিজনে কেন একা মনে স্বরলিপিকার : নলিনীকান্ত সরকার	'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে' 'বুলবুল' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত	'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে' রেকর্ড নং H.M.V.N 11638 শিল্পী : কে মল্লিক রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : ক) 'সাঁঝ হেরে মুখ চাঁদ মুকুরে ছায়াপথ সিঁথি রচি চিকুরে নাচে ছায়ানটী কানন-পুরে দুলে লটপট লতা-কবরী' খ) "বেলা গেল বধূ" ডাকে ননদী "চলো জল নিতে যাবি লো যদি" কালো হয়ে আসে সুদূর নদী নাগরিকা সাজে সাজে নগরী।'	রেকর্ডে 'কাহারবা' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-মুকুর'-এ 'ইমন মিশ্র-গজল-কাহারবা'

১	২	৩	৪
৯. ছাড়িতে পরাণ নাহি চায় স্বরলিপিকার : নলিনীকান্ত সরকার	'ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়' 'চোখের চাতক' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত।	'ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়' রেকর্ড নং H.M.V.P. 11673 শিল্পী : কুমারী প্রতিভা সোম স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-মুকুর'-এ একটি পংক্তি : 'তুমি রবে যবে পরবাসে' উপরোক্ত পংক্তিটি রেকর্ডে : 'নীরবে রবে যবে পরবাসে'	রেকর্ডে 'বৈতালিক' 'চোখের চাতক' গ্রন্থে 'খাম্বাজ-দাদরা' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-মুকুর'-এ 'জয়-জয়ন্তী-খাম্বাজ-দাদরা'
১০. কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে স্বরলিপিকার : নলিনীকান্ত সরকার	'কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে' 'বুলবুল' গীতি -গ্রন্থের অন্তর্গত	'কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে' রেকর্ড নং H.M.V.N. 11735 শিল্পী : কে. মল্লিক রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'শীতল মেঘ-নীরে ডাকিয়া চাতকীরে, নীর ঢালিতে শিরে বাজ কেন হানিলে যদি ফুটালে মুকুল, কেন শুকাইলে ফুল, কেন কলঙ্ক-টিপে চাঁদের ভুরু ভাঙিলে।'	রেকর্ডে : 'বেহাগ-খাম্বাজ-দাদরা' 'বুলবুল' গীতি-গ্রন্থে এবং স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-মুকুর'-এ 'বেহাগ-দাদরা'

১	২	৩	৪
১১. এ নহে বিলাস বন্ধু, ফুটেছি জলে কমল' স্বরলিপিকার : নলিনীকান্ত সরকার	'এ নহে বিলাস বন্ধু, ফুটেছি জলে কমল" 'বুলবুল' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত।	'এ নহে বিলাস বন্ধু, ফুটেছি জলে কমল" রেকর্ড নং TWINFT 863 শিল্পী : মিস বীণা পাণি রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : ক) 'আমার বুকের কাঁদন তুমি বল ফুলবাসি ফিরে যাও ফেলো না গো শ্বাস দখিনা বায়ু চপল খ) স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-মুকুর' এ দুটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'ফোটে যে কোন ক্ষতমুখে কবিরে তোর গীত-সুর সে ক্ষত দেখিল না কেউ দেখিল তোরে কেবল' রেকর্ডে পংক্তিগুলো : 'কবি রে কোন ক্ষত মুখে ফোটে তোর গীত সুর সে গীতি দেখিল না কেউ শুনিল গীতি কেবল।	রেকর্ডে : 'কাহারবা' স্বরলিপি-গ্রন্থ 'সুর-মুকুর'-এ 'মান্দ-কাহারবা'

বি. দ্র. : স্থান-সঙ্কোচনের কারণে গানের বাণী এখানে সঠিকরূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। বাণী ও স্তবক-বিন্যাসে পার্থক্য রয়ে গেছে। হয়তো মুদ্রণ-ত্রুটিও ঘটেছে। এ জন্য দুঃখিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচি

ই

উ

এ

ঐ

ও

ক

খ

গ

ঘ

ভ

ম

স

হ